এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল ঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদকঃ মাসিক মদীনা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা আবদুল আজীজ (রহঃ)

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা : ৫৫/বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন–(চতুর্থ খণ্ড)
ইমাম গায্যালী (রহঃ)

প্রকাশক :
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীর উদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ :
রবিউল আওয়াল : ১৪১১ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ :
সফর ঃ ১৪২০ হিজরী

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২৩ হিজরী

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
জমাদিউস্সানী ঃ ১৪২৫ হিজরী
ভাদ্র ঃ ১৪১১ বাংলা
আগষ্ট ঃ ২০০৪ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ :
অরণি কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
মদীনা গ্রাফিক্স সিস্টেমস্
৫৫/বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৭০.০০ টাকা

ISBN- 984-8367- 77-0

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালীর (রহঃ) (৪৫০হিঃ—৫০৫ হিঃ) রচিত অমর গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। প্রায় নয় শ' বছর আগে এ মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে সমভাবে পঠিত ও সমাদৃত। মানব রচিত দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হওয়ার নযীর আছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রাঃ) মহান আল্লাহর নিকট কতটুকু মকবুলিয়ত অর্জন করেছিলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোই তা প্রমাণ করে। এ মহান সাধক সম্পর্কে অনেক মনীষীরই মন্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি আশ্চর্য মু'জেযা বিশেষ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের উম্মত যাতে গোমরাহ না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন যেসব লোক সৃষ্টি করবেন বলে হাদীস শরীফে সুসংবাদ রয়েছে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন তারই অন্যতম বাস্তব নমুনা।

'এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন' অর্থ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের নবজীবন দান। কিতাবখানি তার নামের কতটুকু সার্থকতা দান করেছে, সেকথা ব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন করে না।

'এহইয়ার' অনেকগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ-টীকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোক অবশ্য এ মহান গ্রন্থের সমালোচনাও করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ইমাম সাহেব এ গ্রন্থে যে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো কোন্

কিতাব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা যেমন লিখেননি, তেমনি কোন সনদ বা বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করেন নি। ফলে, হাদীসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রকাশভঙ্গী ওয়ায়েজসুলভ, তাঁর আগে কেউ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ধারা অবলম্বন করেননি। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকটা গাম্ভীর্য হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গাযযালী (রহঃ) নিজেই ছিলেন একজন স্বীকৃত ইমাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সনদসূত্র ছিল। তাঁর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আল্লামা জোয়াইনী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সে সূত্রটি ছিল এতই প্রসিদ্ধ যে, প্রতিটি হাদীসের সাথে সে বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী (রহঃ) যে অনন্য রীতিটি অবলম্বন করেছেন এটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। পূর্ববর্তী রচনাশৈলীর সাথে এর মিল না থাকাটা বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত নয় নিশ্চয়ই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম গায্যালীর (রহঃ) পুস্তক পৃথিবীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটিরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদ দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। বাংলা ভাষায় এহইয়ার অনুবাদ ইতিপূর্বেই হয়েছে। তারপরও আমি কেন পুনরায় এ মহাগ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিলাম, সে কৈফিয়ত দিতে চাই না। বিজ্ঞ পাঠকগণই তা অনুভব করতে পারবেন। তাছাড়া, মুসলিম জনগণের নিত্যপাঠ্য এ মহাগ্রন্থটির প্রচার-প্রসার যত বেশী হয়, ততই সেটা কল্যাণকর বলে আমার ধারণা।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি, সে বিচারও পাঠকগণই করবেন।

আল্লাহর রহমতে গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর কাজও চলছে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সেগুলোও পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে।

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত কারণে আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করতে পারি না। তাছাড়া, আমার শক্তিও তো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুবাদ বা মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজ্ঞজনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে দরদের সাথে জানিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। এতদসঙ্গে সকলের দোয়া চাই, আল্লাহ পাক যেন অনুগ্রহ করে অবশিষ্ট খণ্ডগুলোও দ্রুত সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

যশ ও রিয়া

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَخْوَفَ عَلَى أُمَّتِي الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ -

অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে আমি যেসব বিষয়ের আশংকা করি, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়াবহ বিষয় হল রিয়া ও গোপন খাহেশ। অন্ধকার রাত্রিতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিপীলিকা চলাচল করলে যেমন তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না, তেমনি এ গোপন খাহেশও অনুভূত হয় না। একারণেই এর বিপদ সম্পর্কে বড় বড় আলেমগণও জানতে পারেন না। যেনতেন আবেদ ও মুত্তাকীদের তো কথাই নেই। এটা নফসের বিনাশকারী শক্তি ও গোপন প্রতারণা। যেসকল আলেম ও আবেদ আখেরাতের পথ অতিক্রম করতে চায় এবং তজ্জন্যে খুব তৎপর হয়, তাদেরকে রিয়ায় লিপ্ত করা হয়। অর্থাৎ, তারা নিজের নফসকে মুজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে পরাভূত করে কামনা-বাসনা থেকে আলাদা করে নেয় এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে নেয়। এরপর নফসকে বলপূর্বক বিভিন্ন প্রকার এবাদতে মশগুল করে। ফলে, তাদের নফস বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোন বাহ্যিক গোনাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নফস যখন মুজাহাদার পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখে না, তখন এ পরিশ্রমের বিনিময়ে শান্তি, স্বস্তি ও আরামের অভিলাষী হয়। দুনিয়ার মানুষ যখন তাদেরকে মানতে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করে, তখন নফস এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে। এরপর তারা এলম, আমল ও এবাদত প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ভাল বলবেন কেবল এতেই তারা সবর করতে পারে না। তারা দেখে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে গেছে অমুক ব্যক্তি কামনা-বাসনা বর্জনকারী, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং কঠোর এবাদতের শ্রম স্বীকারকারী।

তারা আরও দেখে, অনেক মানুষ তাদের তারীফ ও প্রশংসা করে, তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাদের সাক্ষাতকে বরকত মনে করে, তাদের থেকে দোয়া নিতে আগ্রহী হয়, দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করে, মজলিসের কেন্দ্রস্থলে আসন দেয়, সম্মুখে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং খেদমত ও অন্য কোন মতলবের কথা বললে তা করতে তৎপর হয়ে যায়। এ সব দেখে-শুনে তাদের নফস এমন আনন্দ পায়, যার উপরে কোন আনন্দ নেই। এ আনন্দের আতিশয্যে গোনাহ বর্জন করা তেমন কঠিন হয় না এবং অব্যাহতভাবে এবাদত করা খুব সহজ হয়ে যায়। তারা তো মনে করে যে, তাদের জীবন আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবাদতের জন্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন সেসব কামনা-বাসনা ও আনন্দের প্রত্যাশী হয়ে থাকে, যা সুস্থ বিবেক ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের সম্মান প্রদর্শনের কারণে যে আনন্দ তাদের অর্জিত হয়, তার দরুন এবাদত ও আমলের সমস্ত সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তাদের নাম মুনাফিকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং এটা নফসের এমন এক প্রতারণা, যা থেকে সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। রিয়া যখন এমন একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাধি এবং শয়তানের বড় ফাঁদ, তখন এর স্বরূপ, স্তর, প্রকারভেদ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি অবগত হওয়া একান্ত জরুরী। তাই নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

রিয়ার উৎপত্তিস্থল ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ঃ জানা উচিত যে, প্রকৃত পক্ষে খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় 'জাহ' তথা জাঁকজমক। এরূপ খ্যাতি শুভ নয়; বরং অখ্যাত এবং নাম-নিশানাশূন্য থাকা এরচেয়ে অনেক ভাল। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর দ্বীনকে প্রচার করার সুখ্যাতি দান করেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা-চরিত্রের কোন দখল না থাকে, তবে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত খ্যাতিতে কোন দোষ নেই। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

مِنَ الشَّرِّ اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ اَنْ يُشِيْرَ النَّاسُ
اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِىْ دِيْنِهٖ وَدُنْيَاهُ-

অর্থাৎ, 'অনিষ্টের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, মানুষ কারও দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার কথা স্বতন্ত্র।'

হযরত হাসান (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলে লোকেরা তাঁকে বলল ঃ হে আবু সায়ীদ! আপনাকে দেখে মানুষ আপনার প্রতিও অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে। তিনি বললেন ঃ এ হাদীসে এ ইশারা বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য হলো ধর্মে কোন কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করার কারণে যদি কারও দিকে ইশারা করা হয় অথবা নতুন পাপাচার আবিষ্কার করার কারণে ইশারার পাত্র হয়ে গেলে তা অনিষ্টকর। মোটকথা, তিনি হাদীসটির এমন ব্যাখ্যা দিলেন, যাতে কোন দোষ নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ব্যয় কর, খ্যাত করো না এবং নিজের অস্তিত্বকে বাড়িয়ে উপস্থিত করো না— যাতে মানুষ তোমাকে চিনে ফেলে এবং স্মরণ করে; বরং নিজেকে গোপন কর এবং চুপ থাক। এতে মুক্তি নিহিত রয়েছে। ধার্মিক লোকেরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং পাপাচারীরা জ্বলে-পুড়ে মরবে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ যে খ্যাতিকে ভাল মনে করে, সে আল্লাহকে চিনে না। হযরত আইউব সখতিয়ানী বলেন ঃ যে পর্যন্ত কেউ তার বাসগৃহ মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকাকে পছন্দ না করবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সত্যায়ন হয় না। খালেদ ইবনে মে'দানের ওয়াযের মজলিসে যখন অনেক লোক হয়ে যেত, তখন তিনি খ্যাতির ভয়ে মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন। আবুল আলিয়ার কাছে তিনজনের বেশী লোক সমাগম হলেই তিনি প্রস্থান করতেন। হযরত তালহা (রাঃ) একবার দেখলেন, তাঁর সাথে প্রায় দশজন লোক হেঁটে চলেছে। তিনি বললেন ঃ এরা লালসার মাছি এবং দোযখের ফড়িং। হযরত সোলায়মান ইবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উবাই ইবনে কা'বের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ হযরত উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হল। তিনি দোররা নিয়ে তেড়ে আসলেন। হযরত কা'ব আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি করছেন? একটু ভেবে দেখুন! তিনি বললেন ঃ যেরূপ সাড়ম্বরে তুমি গমন করছ, সেটা তাবেয়ীদের জন্যে ভ্রষ্টতার পথ এবং তোমার জন্যে পরীক্ষা।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একদিন গৃহ থেকে বের হলে অনেক লোক তাঁর পেছনে চলতে লাগল। তিনি তাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা আমার পেছনে আসছ কেন? আল্লাহর কসম, যে কারণে আমি আমার গৃহের দরজা বন্ধ রাখি, তা যদি তোমাদের জানা হয়ে যায়, তবে দুটি লোকও আমার সাথে চলবে না।

হযরত হাসান একদিন বাড়ী থেকে বের হলে লোকজন তাঁর পিছনে চলতে লাগল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকলে ভাল, নতুবা আশ্চর্য নয় যে, এ পিছনে চলা ঈমানদারদের অন্তরে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না। অর্থাৎ এতে আল্লাহর মারেফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনে মাজরিযের সাথে সফরে গেল। অতঃপর তার কাছ থেকে আলাদা হওয়ার সময় আরয করল ঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ সম্ভবপর হলে এটা কর ঃ তুমি অপরকে চিনবে, কেউ যেন তোমাকে না চিনে। পথ চলার সময় কেউ যেন তোমার সাথে না থাকে। তুমি অপরকে জিজ্ঞেস করবে, কেউ যেন তোমাকে জিজ্ঞেস না করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি আবু কেলাবের সঙ্গে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি অনেক পোশাক পরিহিত হয়ে সেখানে এল। তিনি বললেন ঃ এই বাকশক্তিশীল গাধা থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ খ্যাতি অন্বেষণ করো না।

হযরত ছওরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ দুটি খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতেন— একটি উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদের খ্যাতি এবং অপরটি ছিন্ন ও পুরাতন পোশাকের খ্যাতি। কেননা, উভয় পোশাকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সমভাবে নিবদ্ধ হয়। বিশর (রহঃ) বলেন ঃ খ্যাতি পছন্দ করেছে এবং ধর্ম বরবাদ হয়নি এরূপ ব্যক্তি আমার জানা নেই। তিনি আরও বলেন ঃ যে খ্যাতি কামনা করে, সে আখেরাতের স্বাদ পায় না।

খ্যাতিহীনতার ফযীলত ঃ বারা ইবনে' মালেক ও ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ অনেক বিক্ষিপ্তকেশী ধূলিধূসরিত চাদরওয়ালা লোক রয়েছে, যাদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে

না। অথচ যদি তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তবে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেন। যদি বলে, ইলাহী! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি, তবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতই দিবেন এবং দুনিয়াতে কিছু দেবেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জান্নাতী তারাই— যাদের কেশ এলোমেলো এবং পোশাক দুটি মাত্র চাদর। যদি তারা শাসকদের কাছে যেতে চায়, তবে কেউ যেতে দেয় না। বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে কেউ তাদের প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের অভাব-অনটন তাদের বুকের মধ্যেই ঘুরাফেরা করে। কিয়ামতে তাদের নূর বন্টন করা হলে সমস্ত মানুষের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, মুয়ায ইবনে জাবল (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাযারের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে মুয়ায বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সামান্য রিয়াও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এমন আত্মগোপনকারী মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন— যারা উধাও হয়ে গেলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, আর সম্মুখে এলে কেউ তাদেরকে চিনে না। তারা হেদায়াতের প্রদীপ।

মোহাম্মদ ইবনে সুয়ায়দ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার মদীনা মুনাওয়ারায় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনৈক সাধু ব্যক্তি মসজিদে নববীতেই থাকত এবং দোয়া করত। একদিন সকলেই দোয়ায় রত ছিল, এমন সময় জনৈক পুরাতন ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি আগমন করল। সে এসে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়ল এবং হাত তুলে দোয়া করল ঃ ইলাহী! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি– এই মুহূর্তেই বৃষ্টিবর্ষণ কর। লোকটির দোয়া শেষ করে হাত নামানোর আগেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে এত বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, মদীনার লোকজন ডুবে যাওয়ার আশংকায় ফরিয়াদ করতে লাগল। এরপর লোকটি আরয করল ঃ ইলাহী! যদি তুমি মনে কর যে, এই পরিমাণ পানি তাদের জন্যে যথেষ্ট, তবে বৃষ্টি থামিয়ে দাও। তখনি বৃষ্টি থেমে গেল। এরপর লোকটি সেই সাধু ব্যক্তির পেছনে পেছনে চলল এবং তার গৃহের সন্ধান করে ভোরেই তার

খেদমতে গিয়ে বলল ঃ আমি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তা এই যে, আপনি আমার জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করুন। সাধু ব্যক্তি বলল ঃ সোবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে দোয়া করতে বলছ! তোমার অবস্থা তো কালই জানতে পেরেছি। এখন বল এই মর্তবা তুমি কিরূপে লাভ করলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেছি। তাই আমি তাঁর কাছে যে প্রার্থনা করেছি, তিনি তা কবুল করেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হে লোক সকল! জ্ঞানের ঝরণা এবং হেদায়াতের প্রদীপ হও। নিজ নিজ ঘরে বসে থাক। পুরাতন বস্ত্র পরিধান কর, যাতে আকাশের বাসিন্দারা তোমাদেরকে চিনে এবং পৃথিবীর লোক না চিনে। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ وَحَظٍّ مِنْ صَلٰوةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ صَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ

অর্থাৎ, 'আমার ওলীদের মধ্যে সেই মুমিন ব্যক্তি অধিকতর ঈর্ষার যোগ্য, যে নিজের উপর পরিবার-পরিজনের বোঝা কম রাখে, নামাযে অংশগ্রহণ করে, পরওয়ারদেগারের এবাদত করে এবং গোপনে আনুগত্য করে। সে মানুষের মধ্যে এত সুখ্যাত নয় যে, মানুষ তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। এরপর সে এ অবস্থায় সবর করে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি এমনভাবে থাকতে পার যে, তোমাকে কেউ না চিনে, তবে তাই কর। তোমাকে কেউ না চিনলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেউ তোমার প্রশংসা না করলেও কোন দোষ নেই। যদি তুমি মানুষের কাছে মন্দ হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ভাল হও, তবে এতেও কোন অনিষ্ট নেই।

উপরোক্ত হাদীস ও মনীষীর উক্তি থেকে খ্যাতির নিন্দা এবং খ্যাতিহীনতার ফযীলত পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। খ্যাতির আসল লক্ষ্য হচ্ছে

জাঁকজমক তথা মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠা করা। এটা অনর্থের মূল। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পয়গম্বরগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামগণ সর্বাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তাঁদের খ্যাতির চেয়ে অধিক খ্যাতি আর কি হবে? অতএব, তাঁরা খ্যাতিহীনতার ফযীলত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। এর জওয়াব এই যে, যে খ্যাতি অর্জন করে নেয়া হয়, তাই মন্দ। কিন্তু কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ছাড়া যে খ্যাতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, তা নিন্দনীয় নয়।

যশপ্রীতির নিন্দা : আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থাৎ, 'আখেরাতের সে গৃহ আমি তাদেরকে দান করব— যারা পৃথিবীতে উচ্চ হওয়ার এবং গোলযোগ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে না।'

এই আয়াতে দুটি ইচ্ছাকে একত্রিত করা হয়েছে— একটি উচ্চ হওয়ার ইচ্ছা এবং অপরটি গোলমাল সৃষ্টি করার ইচ্ছা। এরপর বলা হয়েছে, আখেরাত তার জন্যেই, যে উভয় প্রকার ইচ্ছা থেকে মুক্ত। অন্য আয়াতে আছে—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি তার আমল দুনিয়াতে পুরাপুরি দিয়ে দেই এবং তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাদের জন্যে আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছুই নেই।' (সূরা হূদ : ১৫-১৬

এই আয়াতও তার ব্যাপকতার মধ্যে জাঁকজমকপ্রীতিকে অন্তর্ভুক্ত

করেছে। কেননা, এটা পার্থিব জীবনের সকল আনন্দের চেয়ে বড় এবং সকল সাজসজ্জার চেয়ে অধিক। হাদীসে বলা হয়েছে—

حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

অর্থাৎ, 'ধনসম্পদ ও জাঁকজমকের মোহ অন্তরে এমনভাবে মোনাফেকী উৎপন্ন করে, যেমন বৃষ্টির পানি শাক-সবজিকে উৎপন্ন করে।'

আরও বলা হয়েছে, দুটি বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে এতটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু ক্ষতি করে গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ মুসলমান ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতার। হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, খেয়াল খুশী ও প্রশংসাপ্রীতির কারণেই মানুষ ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের কাছে দোয়া এই, তিনি আপন কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

জানা উচিত যে, 'মাল' ও 'জাহ' হচ্ছে দুনিয়ার দুটি স্তম্ভ। 'মাল' মানে উপকারী বস্তুসমূহের মালিক হওয়া এবং 'জাহ' বলা হয় সেইসব অন্তরের মালিক হওয়াকে, যাদের কাছ থেকে সম্মান ও আনুগত্য কামনা করা হয়। মালদার ও ধনী সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে টাকা-পয়সার ক্ষমতা রাখে এবং এর মাধ্যমে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্য, খাহেশ ও মানসিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে পারে। এমনিভাবে 'যশশীল' তথা প্রভাবশালী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মানুষের অন্তরকে এমনভাবে বশীভূত করে নেয় যে, তাদের দ্বারা যে কোন মতলব যথেচ্ছ সিদ্ধ করতে পারে। অর্থসম্পদ যেমন বিভিন্ন প্রকার পেশা ও কারিগরি দ্বারা অর্জন করা হয়, তেমনি মানুষের অন্তর বিভিন্ন প্রকার কাজ-কারবারের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়। অন্তর যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে অমুক বিষয়ের পূর্ণতাগুণ রয়েছে, তখন অন্তর তার বশীভূত হয়ে যায়। এখানে সেই গুণটি বাস্তবেও পূর্ণতাগুণ হওয়া শর্ত নয়, বরং ব্যক্তির মতে ও তার বিশ্বাসে পূর্ণতাগুণ হওয়াই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে অন্তর এমন বিষয়কেও পূর্ণতাগুণ বলে বিশ্বাস করে— যা বাস্তবে পূর্ণতাগুণ

নয়; কিন্তু অন্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সেটাকে পূর্ণতাগুণ বলে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয়। এ কারণেই অন্তর তার অনুগত হয়ে যায়। কেননা, আনুগত্য হচ্ছে অন্তরের একটি অবস্থা— যা বিশ্বাসের অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং যেমন বিশ্বাস হবে, তেমনি অবস্থা দেখা দেবে।

যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত পোষণ করে, সে যেমন চায় যে, তার কাছে বাঁদী-গোলাম থাকুক, তেমনি যশপ্রিয় ব্যক্তিও চায়, সকল মানুষ তার গোলামী করুক এবং তাদের অন্তরের উপর তার সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক; বরং যশপ্রিয় ব্যক্তি যা চায়, তা আরও বেশী। কেননা, সম্পদশালী ব্যক্তি বলপূর্বক বাঁদী-গোলামের মালিক হয়। বাঁদী-গোলামরা মন থেকে কোন সময় কারও ক্রীতদাস হতে চায় না। কিন্তু যশপ্রিয় ব্যক্তির আনুগত্য মানুষ সানন্দে গ্রহণ করে। স্বাধীন ব্যক্তি নিজের মনের আগ্রহে তার গোলাম হয় এবং তার গোলামী ও আনুগত্যকে গর্বের বিষয় মনে করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'জাহ' শব্দের অর্থ মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া; অর্থাৎ অন্তরে কোন ব্যক্তির কোন পূর্ণতা গুণের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। সুতরাং পূর্ণতার বিশ্বাস যে পরিমাণে হবে, সে পরিমাণেই আনুগত্য হবে এবং যে পরিমাণে আনুগত্য হবে, সে পরিমাণে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হবে। ক্ষমতা যত বেশী হবে, আনন্দ ও যশপ্রীতি তত অধিক হবে। এ পর্যন্ত 'জাহ' শব্দের অর্থ বর্ণিত হল। এখন এর ফলাফল দেখা উচিত।

যশ তথা প্রভাব-প্রতিপত্তির এক ফল হচ্ছে প্রশংসা কীর্তন করা। যে ব্যক্তি কারও পূর্ণতাগুণে বিশ্বাস করে, সে তার প্রশংসা করার ব্যাপারে চুপ থাকে না। প্রতিপত্তির আরেকটি ফল হচ্ছে খেদমত করা ও সাহায্য-সহায়তা করা। বিশ্বাসী ব্যক্তি আপন বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির খেদমত ও সাহায্যে নিয়োজিত রাখে এবং গোলামের ন্যায় তার অনুগত হয়ে থাকে। এছাড়া যশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম ফলাফল হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অগ্রণী মনে করা, তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং মজলিসে উত্তম জায়গায় বসানো।

যশের মহব্বতে ভাল ও মন্দ বিষয়াদি ঃ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যশের অর্থ হচ্ছে অন্তরসমূহের মালিক হওয়া ও তাদের উপর

ক্ষমতা বিস্তার করা। সুতরাং এর বিধানও ধন-সম্পদের মালিকানার বিধানের অনুরূপ। কেননা, যশও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য, যা মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেহেতু দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, তাই দুনিয়াতে উৎপন্ন বস্তু থেকেই আখেরাতের পাথেয় অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং পানাহার ও পোশাকের জন্যে যেমন সামান্য অর্থসম্পদ জরুরী, তেমনি মানুষের সাথে জীবন যাপনের জন্যেও অল্পবিস্তর যশ-খ্যাতির প্রয়োজন। খোরাক একটি অপরিহার্য বস্তু। প্রয়োজন পরিমাণে খোরাক সংগ্রহ করা অথবা খোরাক ক্রয় করার অর্থ সংগ্রহ করা এবং এগুলোকে প্রিয় মনে করা যেমন জায়েয, তেমনি খেদমতের জন্যে একজন খাদেম, সাহায্য-সহায়তার জন্যে একজন সফরসঙ্গী, পথ প্রদর্শনের জন্যে একজন ওস্তাদ এবং দুষ্ট লোকের অনিষ্ট ও যুলুম থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একজন শাসক থাকাও জায়েয। সুতরাং মালিকের এ বিষয়কে প্রিয় মনে করা যে, খাদেমের মনে তার এমন মাহাত্ম্য ও সম্মান থাকুক, যার কারণে সে খেদমত করতে উদ্বুদ্ধ হয় অথবা সফরসঙ্গীর অন্তরে এমন মর্যাদা থাকুক, যার কারণে সে সাহায্য থেকে বিরত না থাকে অথবা ওস্তাদের মনে এমন আসন থাকুক, যার কারণে সে উত্তমরূপে পদপ্রদর্শন করে অথবা শাসকের মনে এমন সম্মান থাকুক, যার কারণে সে অনিষ্ট দূরীকরণে সম্মত হয়– এসব বিষয়কে প্রিয় মনে করা নাজায়েয ও নিন্দনীয় নয়। কেননা, যশ ধনসম্পদের ন্যায় উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায়। উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

তবে এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত এই যে, স্বয়ং ধনসম্পদ ও যশ-খ্যাতিকে প্রিয় মনে করবে না; বরং এ সবের মহব্বতকে এরূপ মনে করবে, যেমন কারও ঘরে শৌচাগার রয়েছে এবং সে মলত্যাগের জন্যে এই শৌচাগার থাকাকে প্রিয় মনে করে। সে মনে করে, যদি তার মলত্যাগের প্রয়োজন না থাকে, তবে শৌচাগারের সাথেও তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ ব্যক্তিকে বাস্তবে পায়খানাকে মহব্বতকারী মনে করা হবে না। বরং এটা আসল লক্ষ্য অর্জনের উপায়কে মহব্বত করার নামান্তর।

এখন বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা দরকার। জনৈক ব্যক্তি তার বিবাহিত স্ত্রীকে একারণে মহব্বত করে যে, প্রয়োজনের সময় সে তার

সাথে সহবাস করে। যেমন মলত্যাগের জন্যে পায়খানাকে ভাল মনে করা হয়। যদি এই ব্যক্তির মধ্যে কামপ্রবৃত্তির তাড়না না থাকে, তবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে; যেমন মলত্যাগের প্রয়োজন না থাকলে কেউ পায়খানায় যায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ স্বয়ং স্ত্রীকেই ভালবাসে এবং তার রূপ লাবণ্যের জন্যে পাগলপারা থাকে। এমনকি, যদি কখনও সহবাস নাও হয়, তবু তাকে তালাক দিতে চায় না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত। প্রথম প্রকার মহব্বত মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যশখ্যাতি ও অর্থসম্পদের অবস্থাও তেমনি। এগুলো দ্বারা দৈহিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয় বলে এগুলোকে মহব্বত করলে কোন অনিষ্ট নেই। আর যদি স্বয়ং এগুলোকেই মহব্বত করা হয়—উদ্দেশ্য লাভের উপায় হোক বা না হোক, অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণকে মহব্বত করা হয়, তবে তা নিন্দনীয়। তবে এরূপ মহব্বতকারী ব্যক্তি ফাসেক ও গোনাহগার হবে না– যে পর্যন্ত এই মহব্বতের কারণে কোন গোনাহ না করে বসে অথবা ধনসম্পদ ও জাঁকজমক অর্জন করার জন্যে প্রতারণা, চক্রান্ত, মিথ্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন না করে। এগুলো অর্জন করার জন্যে কোন এবাদতকেও ওসীলা করা যাবে না। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করা ধর্ম মতে গোনাহ ও হারাম।

এখন বুঝা দরকার, খাদেম, সফরসঙ্গী, ওস্তাদ ও শাসকের মনে আসন প্রতিষ্ঠিত করার কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে কি না কিংবা যতদূর ইচ্ছা তাদেরকে ভক্তি করতে পারবে? এর ব্যাখ্যা এই যে, তিন উপায়ে অপরকে ভক্তি করা যায়। তন্মধ্যে দুটি উপায় বৈধ ও একটি অবৈধ। অবৈধ উপায় এই যে, অপরকে এমন গুণের ভক্ত করা, যা নিজের মধ্যে নেই। যেমন তাকে বলা—আমি সাধক, পরহেযগার অথবা সৈয়দ বংশীয়; অথচ সে কিছুই না। এটা মিথ্যা ও প্রতারণা হওয়ার কারণে হারাম। বৈধ উপায় দুটির মধ্যে একটি হল নিজে যে গুণে গুণান্বিত, সে গুণের উপযোগী মর্যাদা চাওয়া। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের শাসনকর্তাকে বলেছিলেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

এতে তিনি শাসনকর্তার অন্তরে নিজের হেফাযতকারী ও বিজ্ঞ হওয়ার

গুণ কামনা করেছিলেন। শাসনকর্তার এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজনও ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই উক্তি সঠিক ও সত্য ছিল। দ্বিতীয় উপায় হল, অপরের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের কোন দোষ অথবা গোনাহ গোপন রাখা। এটাও বৈধ। কেননা, পাপকর্ম গোপন রাখা জায়েয এবং প্রকাশ্যে বলা নাজায়েয। এছাড়া এতে কোন ধোকা নেই; বরং যে বিষয় জানার মধ্যে কোন ফায়দা নেই, তা না জানানো মাত্র।

অপরের সামনে উত্তমরূপে নামায আদায় করা, যাতে সে ভক্ত হয়ে যায়– এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা সরাসরি রিয়া ও প্রতারণা। অতএব, এভাবে জাঁকজমক জাহির করা হারাম।

মন আপন প্রশংসায় আনন্দিত ও নিন্দায় নিস্পৃহ হয় কেন ঃ জানা উচিত যে, চার কারণে অন্তর প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়। প্রথম কারণটি সর্বাধিক শক্তিশালী। তা এই যে, প্রশংসার কারণে মন জানতে পারে যে, সে পূর্ণতা গুণসম্পন্ন। কেননা, যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয়, তা প্রকাশ্য অথবা সন্দিগ্ধ গুণ হতে পারে। যদি গুণটি প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তবে আনন্দ কম হয়; যেমন কারও প্রশংসায় বলা হয়, সে দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেতকায়। এটা যদিও এক প্রকার পূর্ণতা-গুণ, কিন্তু মন এ থেকে গাফেল থাকে। ফলে সে মোটেই আনন্দ পায় না। তবে অপর ব্যক্তির বলার কারণে যখন তার চৈতন্যোদয় হয়, তখন কিছু না কিছু আনন্দ পায়। আর যদি প্রশংসার বিষয়টি সন্দিগ্ধ হয়, তবে আনন্দ অনেক বেশী হয়। যেমন কারও শিক্ষাদীক্ষা, পরহেযগারী অথবা রূপলাবণ্যের প্রশংসা করা। মানুষ প্রায়ই এসব গুণের ব্যাপারে সন্দিহান থাকে এবং কোন না কোনরূপে এই সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার বাসনা করতে থাকে। এরপর যখন অপরের মুখ থেকে এই ঈপ্সিত বক্তব্য শ্রবণ করে, তখন অসাধারণ আনন্দ অর্জিত হয়। এ কারণে অধিকতর আনন্দ তখন অর্জিত হয়, যখন এসব গুণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির মুখ থেকে এই প্রশংসা উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ কোন ওস্তাদ তার শাগরিদ সম্পর্কে বলে— তুমি বড় মেধাবী, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। এতে শাগরিদের মনে আনন্দ আর ধরে না। কিংবা খারাপ লাগারও কারণ এটাই। এতে মন তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে। ত্রুটি

পূর্ণতার বিপরীত। সুতরাং পূর্ণতা যেমন প্রিয়, ত্রুটি তেমনি অপ্রিয় হয়ে থাকে। অপরের মুখ থেকে যখন নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হবে, তখন অবশ্যই তা খারাপ লাগার বিষয়, বিশেষত যখন বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নিন্দা করবে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রশংসা দ্বারা জানা যায় প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসিত ব্যক্তির মালিকানাধীন, বশীভূত ও ভক্ত। অন্তরের মালিকানা লাভ করা সকলেরই প্রিয় ও পছন্দনীয়। যখন জানবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি তার ভক্ত এবং তার অন্তর তার ইচ্ছার অনুগামী, তখন নিশ্চিতরূপেই সে আনন্দিত হবে। বিশেষত যদি প্রশংসাকারী ব্যক্তি অধিক ক্ষমতাবান হয় এবং তাকে দিয়ে অধিক কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, তবে আনন্দ আরও বেশী হবে।

আনন্দের তৃতীয় কারণ এরূপ ব্যক্তির প্রশংসা করা, যার কথা সকলেই শুনে এবং মূল্য দেয়। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হল যে, প্রশংসা অথবা নিন্দা জনসমক্ষে হওয়া। সুতরাং সমাবেশ যত বেশী হবে এবং প্রশংসাকারী যত বেশী মান্যবর হবে, আনন্দ তত বেশী হবে। এর বিপরীতে নিন্দা অধিক খারাব লাগবে।

চতুর্থ কারণ, প্রশংসা দ্বারা প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া বুঝা যায়। ফলে, প্রশংসাকারী তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়—মনের আগ্রহে হোক অথবা চাপের কারণে হোক। চাপও মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। কারণ, এতে এক প্রকার প্রাবল্য পাওয়া যায়। এ কারণেই প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাসী না হলেও প্রশংসিত ব্যক্তি আনন্দিত হয়।

যদি উপরোক্ত চারটি কারণই এক প্রশংসাকারীর মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়, তবে চরম পর্যায়ের আনন্দ ও স্বাদ অর্জিত হয়।

প্রশংসা দ্বারা অন্তরের আনন্দ লাভ করার কারণ এবং নিন্দা দ্বারা দুঃখিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত এ আলোচনাটির অবতারণা এ জন্যে করা হল, যাতে প্রশংসার মহব্বত ও নিন্দার কারণে দুঃখ পাওয়ার চিকিৎসা জানা যায়। কেননা, যে রোগের কারণ জানা থাকে না, তার চিকিৎসাও সম্ভব হয় না। রোগের কারণ দূর করাই চিকিৎসা।

যশখ্যাতির চিকিৎসা ঃ প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তির অন্তরকে যশ-প্রীতি আচ্ছন্ন করে নেয়, সে সর্ব প্রযত্নে এ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকে যে, মানুষের সহৃদয়তা যেন হাতছাড়া না হয় এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সে কথায় ও কাজে-কর্মে সর্বদা খেয়াল রাখে, যাতে মানুষের মধ্যে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। বাস্তবে এ বিষয়টি নিফাকের বীজ এবং অনর্থের মূল। এর ফলে ক্রমে ক্রমে এবাদতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হতে থাকে, রিয়ার প্রভাব বেড়ে যায় এবং মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্যে নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একারণেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

অর্থাৎ, 'গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ নিফাক উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক-সবজি উৎপন্ন করে।'

কেননা, নিফাক বলা হয় মানুষের বাহ্যিক অবস্থা তথা কথা ও কাজ তার অন্তরের বিপরীত হওয়াকে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তরে মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক, সে নিফাক সহকারে তাদের সম্মুখীন হবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে উত্তম স্বভাব তাদের সামনে পেশ করবে। অথচ সে এসব স্বভাব থেকে মুক্ত। এ থেকে জানা গেল যে, যশপ্রীতি বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা জরুরী। কেননা, এ রোগটি ধন-সম্পদের মহব্বতের ন্যায় একটি মজ্জাগত রোগ।

যশপ্রীতির চিকিৎসা দু'টি—একটি জ্ঞানগত ও অপরটি কর্মগত। জ্ঞানগত চিকিৎসা এই যে, যে কারণে যশলাভের মোহ সৃষ্টি হয়েছে, তা জানতে হবে। বলা বাহুল্য, এর কারণ হচ্ছে মানুষের দেহ ও মনের উপর ক্ষমতা অর্জন করা। মানুষ যদি এ বিষয়টি অর্জন করতে সক্ষমও হয়ে যায়, তবে চিন্তা করা দরকার, মৃত্যুই এর শেষ সীমা। মৃত্যুর পর এটা কোন উপকারে আসে না। এটি "বাকিয়াতে সালেহাত" তথা অক্ষয় সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, মৃত্যুর পরও এর কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে। ধরে নেয়া যাক, যদি পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ এক ব্যক্তিকে সেজদা করতে থাকে এবং পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সকলেই সেজদারত থাকে,

তবু না সেজদাকারীরা থাকবে, না স্বয়ং সেই ব্যক্তি থাকবে; বরং তারা সকলেই একদিন অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় মাটির সাথে মিশে যাবে। সুতরাং এমন ক্ষয়িষ্ণু বিষয়ের জন্যে অনন্ত ও অক্ষয় জীবন লাভের মাধ্যম ধর্মকে বিসর্জন দেয়া মোটেই উচিত নয়। সত্যিকার পূর্ণতা কি– এ বিষয়টি যে বুঝে নিয়েছে, তার দৃষ্টিতে যশখ্যাতি নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু এটা বুঝতে সে-ই সক্ষম, যে আখেরাতে উপস্থিতিকে চোখের সম্মুখে দেখে, দুনিয়াকে হেয় মনে করে এবং মৃত্যুকে মনে করে যেন এসে গেছে। হযরত হাসান বসরীর অবস্থা তেমনি ছিল। তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ আপনার বিশ্বাস করা উচিত যে, আপনি মরে গেছেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযও এ ব্যাপারে পেছনে ছিলেন না। তিনি জওয়াবে লিখলেন ঃ ধারণা করা উচিত যেন আপনি দুনিয়াতে কখনও আসেননি—চিরকাল আখেরাতেই রয়েছেন।

বলা বাহুল্য, এই বুযুর্গগণের দৃষ্টি আখেরাতেই নিবদ্ধ ছিল। ফলে, তারা দুনিয়াতে যশখ্যাতি ও ধন-সম্পদকে হেয় মনে করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। তারা কেবল দুনিয়াকেই দেখে এবং পরিণতির খেয়াল করে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অর্থাৎ, 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ আখেরাত হল উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।'

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ -

অর্থাৎ, 'কখনও নয়; বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস এবং আখেরাতকে পরিত্যাগ কর।'

সুতরাং যার অবস্থা এরূপ, তার উচিত যশপ্রীতির বিপদাপদকে জানা এবং দুনিয়াতে যশশালী ব্যক্তিরা যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়, সেগুলো চিন্তা করা।

দুনিয়াতে যশশালী ব্যক্তিমাত্রই হিংসার পাত্র হয়ে থাকে। মানুষ তার

ক্ষতিসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সে-ও সর্বক্ষণ আশংকা করতে থাকে যে, কোথাও মানুষের অন্তর থেকে তার মর্যাদা বিলীন হয়ে যায়। কেননা, মানুষের অন্তর সদা পরিবর্তনশীল। কখনও একদিকে এবং কখনও অন্যদিকে থাকে। এক সময় যাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়, অন্য সময় তাকেই জুতার মালা দিতে কসুর করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের মনের উপর ভরসা করে, সে যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর গৃহ নির্মাণ করে। অতএব আপন যশখ্যাতি সংরক্ষণের চিন্তা, হিংসাকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করা এবং শত্রুদের শত্রুতা নিবারণ করা– জাগতিক এসব আপদ-বিপদের কারণে যশখ্যাতির আনন্দ সর্বদাই মলিন থাকে। দুনিয়াতে মানুষ এ থেকে যতটুকু সুখ আশা করে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদাশংকায় জড়িত থাকে। আসল উদ্দেশ্য যে আখেরাতের উপকার, তার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

যশখ্যাতির কর্মগত চিকিৎসা হল এমন কাজ করা, যাতে মানুষ তিরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং অপরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হয়ে যায়। এতে করে জনপ্রিয় হওয়ার নেশা কেটে যাবে। এছাড়া মানুষের কাছে অখ্যাত ও মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার দিকটিকে পছন্দ করে নিতে এবং কেবল আল্লাহর প্রিয় হওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকবে। এটা 'মালামতী' সম্প্রদায়ের অনুসৃত পদ্ধতি। তারা যশখ্যাতির বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এমন গোনাহ ও কুকর্ম করে থাকে, মানুষের দৃষ্টিতে পুরাপুরি অসম্মানের পাত্র হয়ে যায়। কিন্তু এ উপায় পথপ্রদর্শক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা, তাদের কীর্তিকলাপ দেখে মুসলমানদের মনে ধর্মের কাজে শৈথিল্য আসবে। এছাড়া যে ব্যক্তি অনুসৃত নেতা নয়, তার জন্যেও বিশেষ এ চিকিৎসার খাতিরে হারাম কাজ করা জায়েয নয়; বরং তার জন্যে বৈধ কাজসমূহের মধ্যে এমন কাজ করা জায়েয, যা দ্বারা মানুষের মধ্যে তার মূল্য হ্রাস পায়।

উদাহরণতঃ বর্ণিত আছে যে, জনৈক বাদশাহ এক দরবেশের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। যখন দরবেশ শুনল, বাদশাহ তার আস্তানার কাছাকাছি এসে গেছেন, তখন সে খাদ্য ও শাক আনিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। বাদশাহ তাকে এভাবে খেতে দেখে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে

পড়লেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। দরবেশ বলল ঃ আল্লাহ পাকের হাজার শোকর, যিনি বাদশাহকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন বুযুর্গ এমন রঙীন পিয়ালায় শরবত পান করেছেন, যা দেখে লোকেরা তাকে শরাবখোর মনে করে চলে গেছে। যদিও এরূপ করা ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে জায়েয নয়; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের সংশোধন এছাড়া অন্য কোন কাজের মধ্যে পাননি বলে বাধ্য হয়ে এরূপ করেন। পরে অবশ্য তারা এ বাড়াবাড়ির ক্ষতিপূরণ করে নেন। বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি সংসার নির্লিপ্ততায় মশগুল হলে লোকজন তার কাছে ভিড় করতে শুরু করে। তিনি এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একদিন হাম্মামে গেলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান করে বাইরে এলেন এবং প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা চুরি যাওয়া বস্ত্র চিনতে পেরে তাকে ধরল এবং চোর চোর বলে খুব মারপিট করল। এরপর থেকে কোন লোক সেই বুযুর্গের আস্তানায় গেল না।

যশখ্যাতি নির্মূল করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নির্জনবাস এবং এমন জায়গায় চলে যাওয়া, যেখানে কেউ না চিনে। যদি গৃহে বসে থাকে এবং যে শহরে খ্যাত হয়েছে, সেখানেই থাকে, তবে এ নির্জনবাস দ্বারা মানুষের মনে আরও বেশী বিশ্বাস ও মর্যাদা বেড়ে যাবে।

প্রশংসার চিকিৎসা ঃ মানুষের মন্দ বলার ভয় এবং তাদের প্রশংসা পাওয়ার মোহ অধিকাংশ লোকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এরূপ লোকেরা মানুষের মরযী অনুযায়ী সকল কাজকর্ম করার চেষ্টা অবশ্যই করে, যাতে সকলেই প্রশংসা করে এবং নিন্দার ভয় না থাকে। এটা বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। এর চিকিৎসা পদ্ধতি হলো, প্রশংসার মোহ এবং নিন্দার ঘৃণার যে সকল কারণ রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে। উদাহরণতঃ প্রথম কারণ হচ্ছে প্রশংসাকারীর কথায় নিজের পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। এতে প্রশংসিত ব্যক্তির উচিত আপন বিবেক-বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়া এবং মনে মনে চিন্তা করা যে, যে গুণের দ্বারা আমার প্রশংসা করা হয়েছে, সেটা আমার মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তবে সেটা আনন্দিত হওয়ার যোগ্য কি না? বলা বাহুল্য,

জ্ঞান-গরিমা, সংসার নির্লিপ্ততা ইত্যাদি গুণ হলে তা অবশ্যই আনন্দিত হওয়ার যোগ্য। আর ধন-দৌলত, যশখ্যাতি ইত্যাদি পার্থিব বিষয় হলে তা আনন্দিত হওয়ার যোগ্য নয়। যদি আলোচ্য গুণটি পার্থিব বিষয় হয়, তবে তার জন্যে উল্লসিত হওয়া খড়কুটার জন্যে উল্লসিত হওয়ার মতই, যা দু'দিন পরেই শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যাবে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই এ ধরনের আনন্দ হয়ে থাকে। অতএব, পার্থিব আসবাবপত্রের জন্যে আনন্দ করা অনুচিত। আর যদি আলোচ্য গুণটি জ্ঞান-গরিমা ও সংসার নির্লিপ্ততা হয়, তবু উল্লসিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, অন্তিম অবস্থা কি হবে, তা কারও জানা নেই। জ্ঞান ও সংসার নির্লিপ্ততা অবশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণাম অশুভ হওয়ার আশংকা লেগেই থাকে। যদি শুভ পরিণামের আশা সঞ্চারিত হয়, তবে জ্ঞান ও সংসার নির্লিপ্ততাকে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ মনে করে আনন্দিত হওয়া উচিত– প্রশংসাকারীর প্রশংসার জন্যে নয়। জানা দরকার যে, প্রশংসার দরুন ফযীলত বৃদ্ধি পায় না।

পক্ষান্তরে যদি গুণটি এমন হয়, যা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে নেই, তবে এরূপ গুণের জন্যে আনন্দিত হওয়া পাগলামি বৈ কিছু নয়। এর উদাহরণ এমন, যেমন কোন ব্যক্তি অপরকে হাসির ছলে বলে ঃ আপনার পেটের বিষ্ঠা কত সুবাসিত। যখন আপনি মলত্যাগ করেন, তখন সুবাসে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে যায়। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানে, তার পেটে নেহায়েত দুর্গন্ধযুক্ত নাপাকী রয়েছে। এরপরও যদি সে প্রশংসার কারণে উল্লসিত হয়, তবে সেটা পাগলামি নয় কি? সারকথা, প্রশংসাকারী যদি সত্য প্রশংসা করে, তবে প্রশংসতি ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ভেবে আনন্দ প্রকাশ করবে, আর মিছামিছি প্রশংসা করলে দুঃখ প্রকাশ করবে। প্রশংসার জন্যে কোন অবস্থাতেই উল্লাস করা উচিত নয়।

প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এতে বুঝা যায়, প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসিত ব্যক্তির বশীভূত হয়ে গেছে এবং আরও হবে। এর পরিণতি এবং যশপ্রীতির পরিণতি একই, যার চিকিৎসা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আনন্দের তৃতীয় কারণ প্রশংসিত ব্যক্তির ভয়ভীতি। যার কারণে প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এটা একটা সাময়িক ও অস্থায়ী ক্ষমতা। ফলে আনন্দ করার যোগ্য নয়। বরং এ কারণে প্রশংসা করা হলে সেজন্য দুঃখ করা, খারাপ মনে করা, রাগ করা উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রশংসায় আনন্দিত হয়, সে নিজের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করার পথ করে দেয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম প্রশংসাকে খুব ভয় করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন এক ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি রাগ করে বললেন ঃ আমাকে পাকসাফ বলার আদেশ আমি তোমাকে করিনি।

নিন্দাকে ঘৃণা করার চিকিৎসা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, নিন্দাকে ঘৃণা করার কারণ প্রশংসাপ্রীতির কারণের বিপরীত। সুতরাং চিকিৎসাও প্রশংসাপ্রীতির চিকিৎসা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে, যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয় এবং হিতাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিন্দা করে, তবে তার উপর রাগ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং মন্দ কথা বলা উচিত নয়। কেননা, এরূপ ব্যক্তি তোমার দোষ বর্ণনা করে তোমাকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে চায়। আর যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয়ার নিয়তে নিন্দা করে, তবু তার কথায় তোমার উপকারই হবে। কেননা, সে তোমার সে দোষ বলে দিয়েছে, যা তুমি জানতে না। বলা বাহুল্য, এটা সৌভাগ্যের কারণ। অবশ্য কষ্ট দেয়ার নিয়ত করে নিন্দাকারী নিজেরই অনিষ্ট করে। কিন্তু তোমার জন্যে তার উক্তি নেয়ামতস্বরূপ। আর যদি নিন্দাকারী তার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তবে এমতাবস্থায়ও খারাপ লাগা উচিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দেখা দরকার, যদিও সেই বিশেষ দোষটি তোমার মধ্যে নেই; কিন্তু এর মত দোষ আরও থাকতে পারে। অতএব, শোকর করা উচিত যে, নিন্দাকারী সেসব দোষ সম্পর্কে অবগত হয়নি এবং এমন দোষ বলেই ক্ষান্ত হয়ে গেছে, যা তোমার মধ্যে নেই। এ ছাড়া যে ব্যক্তি তোমার দোষ বলে, সে তার পুণ্যসমূহ তোমাকে উপহার দেয়, আর যে তোমার প্রশংসা করে, সে হাদীস অনুযায়ী তোমার কোমর ভেঙ্গে দেয়। অতএব, কোমর ভাঙ্গার কারণে তুমি

আনন্দিত হবে, আর পুণ্য আসার কারণে দুঃখিত হবে, এটা কেমন কথা! পুণ্য এলে তো আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, যার জন্য তুমি আগ্রহী থাক। আরও একটি বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, নিন্দাকারী ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে নিজের ধর্ম বরবাদ করেছে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে। অতএব, তোমার রাগ করা ও তাকে বদদোয়া দেয়া উচিত নয়। বরং এরূপ দোয়া করা দরকার– ইলাহী! তাকে যোগ্যতা দাও, তার প্রতি রহম কর এবং তার তওবা কবুল কর। দেখ, উহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা রসূলে আকরাম (সাঃ) -এর দন্ত মোবারক শহীদ করেছিল, মস্তক ক্ষত-বিক্ষত করেছিল এবং তাঁর পিতৃব্য আমীর হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল, তখন তিনি এই দোয়া করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমার কওমকে সৎপথ প্রদর্শন কর। কারণ, তারা অজ্ঞ।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) এমন এক ব্যক্তির জন্যে নেক দোয়া করেছিলেন, যে তার মাথায় আঘাত করেছিল। লোকেরা বলল ঃ এ ক্ষেত্রে নেক দোয়া করার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে জানি, তার এ আচরণের কারণে আমি সওয়াব পাব। কাজেই আমি এটা ভাল মনে করি না যে, যার দিক থেকে আমি সওয়াব পাব, সে আমার দিক থেকে আযাব ভোগ করুক।

রিয়ার নিন্দা ঃ কোরআন পাকের আয়াত, হাদীস এবং বুযুর্গগণের উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, রিয়া হারাম এবং রিয়াকার আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

অর্থাৎ, 'দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামায থেকে গাফেল, যারা লোক দেখানো নামায পড়ে অর্থাৎ রিয়া করে।'

আরও আছে–

اَلَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَيَبُوْرُ

অর্থাৎ, 'যারা কুকর্মের চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।'

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত লোকেরা হচ্ছে রিয়াকার। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَاشُكُوْرًا -

অর্থাৎ, 'আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে তোমাদেরকে অন্ন দেই। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা আশা করি না।'

এতে আন্তরিকতাসম্পন্ন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু আশা করে না। রিয়া হচ্ছে এরই বিপরীত। আরও বলা হয়েছে—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ, 'অতএব, যে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর এবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

আয়াতটি এমন লোকদের শানে নাযিল হয়েছে, যারা তাদের এবাদত ও সৎকর্মের মজুরী ও প্রশংসা কামনা করত। রসূলে করীম (সাঃ)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুক্তি কিসের মধ্যে? তিনি বললেন ঃ

ان لايعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس -

অর্থাৎ, 'আল্লাহর আনুগত্যে এমন কাজ না করার মধ্যে, যার উদ্দেশ্য হয় মানুষ।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত শহীদ, দাতা ও কারী

সম্পর্কিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে বলবেন— তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করনি। বরং এ জন্যে করেছ, যাতে মানুষ তোমাকে বীর বলে। তুমি আল্লাহর জন্যে দান-খয়রাত করনি; বরং দাতা বলে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্যে করেছ। তুমি আল্লাহর জন্যে কোরআন পাঠ করনি; বরং কারী বলে খ্যাত হওয়ার জন্যে করেছ। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তারা সওয়াব পায়নি এবং রিয়া তাদের সকল কর্ম বরবাদ করে দিয়েছে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমি তোমাদের জন্যে যেসব বিষয়ের ভয় করি, তন্মধ্যে অধিক ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে "শিরকে আসগর" তথা ক্ষুদ্র শিরক। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ক্ষুদ্র শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। এরপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ -

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন বলবেন ঃ তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানোর জন্যে আমল করতে, তাদের কাছে যাও, এরপর দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা?'

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন মাথায় ও দাড়িতে যেন তৈল লাগিয়ে নেয় এবং ঠোঁটের উপর যেন হাত বুলিয়ে নেয়, যাতে মানুষ তাকে রোযাদার মনে না করে। যখন কেউ ডান হাতে কিছু দান করে, তখন যেন বাম হাত তা জানতে না পারে। আর নামায পড়ার সময় দরজায় পর্দা ছেড়ে দেয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাও তেমনি বণ্টন করেন, যেমন রুযী বণ্টন করেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন তার উপরকার বস্তুসমূহ কাঁপতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

পর্বতমালা সৃষ্টি করে সেগুলোকে পৃথিবীর জন্যে পেরেক স্বরূপ করে দিলেন। ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পর্বত অপেক্ষা অধিক শক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লোহা সৃষ্টি করলেন। সে পাহাড়-পর্বতকে কেটে দিল। এরপর আল্লাহ্ আগুন সৃষ্টি করলেন। সে লোহাকে গলিয়ে দিল। এরপর পানিকে আদেশ করা হল। সে আগুনকে নিভিয়ে দিল। অতঃপর বায়ুকে আদেশ করা হল। সে পানিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল। এসব কাণ্ড দেখে ফেরেশতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল যে, সকলের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী কোন্ বস্তুটি? তারা বলল ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সেমতে তারা আরয করল ঃ ইলাহী আপনার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ বস্তুটি সর্বাধিক শক্ত? এরশাদ হল ঃ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী শক্ত আদম সন্তানের অন্তর। সে ডান হাতে খয়রাত করে; কিন্তু বাম হাতকে তা জানতে দেয় না। তার চেয়ে অধিক শক্ত কোন বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি।

রিয়ার স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, রিয়া শব্দটি আরবী 'রুইয়ত' ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ, দেখা। এমনিভাবে খ্যাতির অর্থে ব্যবহৃত "সুমআ" শব্দটি "সেমা" ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শ্রবণ করা। রিয়ার আসল অর্থ হচ্ছে মানুষকে ভাল স্বভাব-চরিত্র দেখিয়ে তাদের কাছে মর্যাদাবান হওয়া। যেহেতু এবাদত দ্বারাও যশ ও মর্যাদা অর্জিত হতে পারে, তাই সাধারণের পরিভাষায় রিয়া বিশেষভাবে সেই অবস্থাকে বলা হয়, যাতে এবাদতের দিক দিয়ে অন্তরে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত দ্বারা নিজের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। অতএব, এখানে চারটি বিষয় একত্রিত রয়েছে। (১) রিয়াকার। সে হচ্ছে এবাদতকারী। (২) যার জন্যে রিয়া করা হয়। সে হচ্ছে মানুষ। মানুষকে দেখানোই লক্ষ্য থাকে। (৩) যা দেখানো উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, এবাদত ও অভ্যাস, যা রিয়াকার প্রকাশ করতে চায়। (৪) স্বয়ং রিয়া; অর্থাৎ, এবাদত প্রকাশ করার ইচ্ছা।

মানুষ পাঁচ প্রকার বস্তুর মধ্যে রিয়া করতে পারে—শরীর, আকার-আকৃতি, কথা, কর্ম ও সঙ্গী-সাথী। কিন্তু এবাদত নয়—এমন বস্তুতে রিয়া করা এবাদতে রিয়া করার তুলনায় হাল্‌কা।

রিয়ার প্রথম প্রকার হচ্ছে শরীর প্রদর্শন করা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি শরীরে ক্ষীণতা-শীর্ণতা ও ফ্যাকাসে ভাব প্রকাশ করা, যাতে মানুষ মনে করে, এ ব্যক্তি ধর্মকর্মে খুব মেহনত করে এবং তার মধ্যে ধর্মের ভয় প্রবল। অথবা সে খাদ্য কম খায়। কিংবা ফ্যাকাসে ভাব দেখে মানুষ ধারণা করে যে, সে রাত্রি জাগরণ করে এবং এবাদত করে। এর কাছাকাছি ক্ষীণস্বরে কথা বলা, চক্ষু কোটরাগত হওয়া ও ঠোঁট শুষ্ক থাকা। এগুলো দ্বারা বুঝা যায়, লোকটি চির রোযাদার। এ কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন যেন মাথায় তৈল মালিশ করে, চিরুনি করে এবং চোখে সুরমা ব্যবহার করে, যাতে সে রিয়াপ্রবণ না হয়ে যায়। দ্বীনদার ব্যক্তিরা এভাবে শরীর প্রদর্শন করে। কিন্তু দুনিয়াদাররা এর বিপরীতে স্থূলদেহ, স্বচ্ছবর্ণ, সুঠাম দেহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে থাকে।

রিয়ার দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে আকার-আকৃতি ও পোশাক প্রদর্শন করা। উদাহরণতঃ মাথার কেশ এলোমেলো রাখা, গোঁফ মুণ্ডন করা, পথে মাথানত করে ধীরে ধীরে চলা, কপালে সেজদার চিহ্ন বাকী রাখা এবং অধৌত ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করা। এগুলো এজন্যে করা হয়, যাতে বোঝা যায় যে, লোকটি সুন্নতের অনুসারী এবং আল্লাহর নেকবান্দা। এর মধ্যে দাখিল রয়েছে তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করা এবং সুফীগণের ন্যায় নীলরঙের পোশাক পরা, আলেম না হয়ে আলেমদের বিশেষ পোশাক পরিধান করা, যাতে মানুষ তাকে আলেম মনে করে, এটাও রিয়ার মধ্যে শামিল।

রিয়ার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কথা। অর্থাৎ, লোক-দেখানোর জন্যে ওয়ায-নসীহত করা, জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞ কথাবার্তা বলা, দৈনন্দিন বাচন পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্যে হাদীস ও মহাজন-উক্তি মুখস্থ করা, মানুষের সামনে যিকরের জন্যে ঠোঁট নাড়াচাড়া করা, জনসমক্ষে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা।

রিয়ার চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, আমল। অর্থাৎ, লোক দেখানোর জন্যে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা, রুকু ও সেজদা লম্বা করা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করা। এমনিভাবে রোযা, জেহাদ, হজ্জ, সদকা ও খাদ্য খাওয়ানোর মধ্যে রিয়া হয়ে থাকে।

রিয়ার পঞ্চম প্রকার হচ্ছে সঙ্গী-সাথী ও সাক্ষাতকামী ব্যক্তিবর্গ। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি কামনা করে যে, অমুক আলেম অথবা আবেদ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসুক, যাতে মানুষ জানে যে, সে খুব দ্বীনদার। তাই এমন আলেম ও আবেদ তার কাছে আসা-যাওয়া করে। অথবা কেউ কোন শাসনকর্তার আগমন প্রত্যাশা করে , যাতে মানুষ মনে করে যে, সে ধর্মে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাই শাসনকর্তাও বরকত লাভের জন্যে তার কাছে আসে।

রিয়ার বিভিন্ন স্তর ঃ জানা উচিত যে, রিয়ার চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হল, সওয়াবের ইচ্ছা মোটেই না থাকা। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি জনসমক্ষে নামায পড়ে এবং একাকী হলে পড়ে না; বরং মাঝে মাঝে উযু ছাড়াই মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা কেবল রিয়াই রিয়া। ফলে, সে আল্লাহর কাছে গযবের যোগ্য। রিয়ার এ স্তরটি কঠোরতর।

দ্বিতীয় স্তর হল, সায়াবের ইচ্ছা থাকবে, কিন্তু তা খুব দুর্বল। এমনকি, একান্তে থাকলে এ ইচ্ছা এতটুকু থাকে না যে, তার কারণে সেই আমলটি করে। এরূপ ব্যক্তিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাছাকাছি। কেননা, তার এমন ইচ্ছা নেই, যার কারণে আমলটি করতে পারে। এরূপ ইচ্ছা থাকা-না থাকা সমান।

তৃতীয় স্তর হল, সওয়াবের ইচ্ছা এবং রিয়ার ইচ্ছা উভয়টি সমান থাকা। ফলে, উভয় ইচ্ছা একত্রিত হলে সে আমল করে এবং একটি অনুপস্থিত থাকলে আমল করে না। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা এই যে, সে যতটুকু নষ্ট করে, ততটুকুই গড়ে। ফলে, আশা করা যায় যে, তার সওয়াবও হবে না এবং আযাবও হবে না অথবা যে পরিমাণ আযাব হবে, সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, এরূপ ব্যক্তিও আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

চতুর্থ স্তর হল, রিয়ার ইচ্ছা দুর্বল এবং সওয়াবের ইচ্ছা প্রবল হওয়া। অর্থাৎ, মানুষ তার আমল জানতে পারলে তার স্ফূর্তি ও আনন্দ বেড়ে যায়; কিন্তু একাকী অবস্থায়ও এবাদত বর্জন করে না। আমাদের ধারণায় এরূপ

ব্যক্তির মূল সওয়াব বাতিল হবে না; বরং কিছুটা হ্রাস পাবে অথবা রিয়া পরিমাণে আযাব হবে এবং সওয়াবের ইচ্ছা পরিমাণে সওয়াব হবে।

আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা রিয়া করা হলে সেদিকে লক্ষ্য করে রিয়ার দু'টি স্তর রয়েছে—মূল এবাদত দ্বারা রিয়া করা ও এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা। প্রথম স্তরের রিয়া অত্যন্ত মন্দ। এর তিনটি সোপান রয়েছে। প্রথম সোপান হচ্ছে মূল ঈমান দ্বারাই রিয়া করা। এরূপ রিয়াকার অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। এ রিয়াকার সে ব্যক্তি, যে মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে; কিন্তু অন্তরে তাকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে। নিছক লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানী প্রকাশ করে। কোরআন পাকের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা এ রিয়াকারদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ -

অর্থাৎ, '(হে রসূল!) যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

অর্থাৎ, তাদের উক্তি তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلٰى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -

অর্থাৎ, 'কোন কোন লোকের কথা পার্থিব জীবনে আপনাকে অবাক

করবে। সে তার মনের কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষী করে; অথচ সে কঠোর তার্কিক। যখন সে প্রস্থান করে, তখন চেষ্টা করে পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করতে, শস্যক্ষেত্র বিনাশ করতে এবং প্রাণহানি ঘটাতে। আল্লাহ গোলযোগ পছন্দ করেন না।'

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন ওরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের উপর ক্রোধে অঙ্গুলি চর্বণ করে।'

আরও বলা হয়েছে ঃ

يُرَاءُونَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ -

অর্থাৎ, 'তারা লোক-দেখানো আমল করে। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। তারা মানুষের মধ্যে দোদুল্যমান– না এই দলে, না ঐ দলে।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিফাক অনেক বেশী ছিল। তখন কিছু লোক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে বাহ্যত মুসলমান হয়ে যেত। বর্তমানে এটা কম হলেও এর ধরন ও নমুনা অনেক রয়েছে। উদাহরণতঃ কিছু লোক ধর্মদ্রোহীদের উক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে মনে মনে দোযখ, জান্নাত ও কিয়ামত অস্বীকার করে অথবা শরীয়ত ও শরীয়তের বিধানাবলীকে বিধর্মীদের উক্তি অনুযায়ী অবশ্যপালনীয় মনে করে না। অথচ মুখে এর বিপরীত বর্ণনা করে। এ শ্রেণীর লোকও মুনাফিক ও রিয়াকার। এরা অনন্তকাল দোযখে থাকবে। কেননা, এর চেয়ে বড় কোন নিফাক নেই। এরা প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়েও মন্দ। কারণ, কাফের বাইরেও শত্রু এবং ভিতরেও বেঈমান। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে, এরা মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলে এবং বগলে ছুরি লুকিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে মূল ঈমান স্বীকার করে মৌলিক এবাদত দ্বারা রিয়া করা। এ স্তরটিও আল্লাহ তা'আলার খুবই অপছন্দনীয়। এর দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি জনসমাবেশে উপস্থিত রয়েছে, এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। সকলেই যখন নামায পড়ল, তখন সে-ও পড়ে নিল। অথচ একাকীত্বে নামায না পড়াই তার অভ্যাস। অথবা রমযান মাসে রোযা রাখল। কিন্তু যাতে রোযা রাখতে না হয়, সেজন্যে মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে। অথবা জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যায়; কিন্তু লোকের নিন্দার আশংকা না থাকলে কখনও যেত না। অথবা জেহাদ কিংবা হজ্জ কেবল মানুষের ভয়ে করে– মনের আগ্রহে নয়। এ ধরনের রিয়াকারের মধ্যে মূল ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে না। কেউ অন্য কিছুকে সেজদা করতে বললে সে করবে না। কিন্তু অলসতার কারণে আল্লাহর এবাদত করে না এবং জনসমাবেশে করলে খুশী হয়। অতএব, আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের তুলনায় মানুষের কাছে মর্যাদা লাভ তার কাছে ভাল মনে হয়। তার কাছে মানুষের মন্দ বলার ভয় আল্লাহর আযাবের ভয়ের চেয়ে বেশী। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার আগ্রহ আল্লাহর সওয়াবের প্রতি আগ্রহের তুলনায় বেশী। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বিশ্বাস চরম মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এরূপ ব্যক্তি মূল ঈমানে বিশ্বাসী হলেও আল্লাহর গযবে পতিত হওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় সোপান হচ্ছে নফল ও মুস্তাহাব এবাদত দ্বারা রিয়া করা, যেগুলো বর্জন করলে কেউ গোনাহগার হয় না। কিন্তু একাকী থাকলে এর সওয়াব লাভ করতে সচেষ্ট হয় না এবং রিয়ার কারণে পালন করে। উদাহরণতঃ নামাযের জমাতে শরীক হওয়া, রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া, আশূরার রোযা রাখা অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা। রিয়াকাররা এসব এবাদত মানুষের নিন্দার ভয়ে এবং তাদের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, একাকী হলে তারা ফরযসমূহের বেশী কিছু করত না। এ ধরনের রিয়াকার মন্দ হলেও পূর্ববর্তী সোপানসমূহের তুলনায় কম মন্দ।

এবাদতের গুণাবলীতে রিয়া করা হলে তারও তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর হল এমন কাজে রিয়া করা, যা বর্জন করলে এবাদতে ত্রুটি দেখা দেয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একাকী অবস্থায় নামায পড়লে দ্রুতগতিতে এবং কম সময়ে নামায সমাপ্ত করে নেয়; কিন্তু জনসমক্ষে নামায পড়লে রুকু-সেজদা উত্তমরূপে করে এবং সর্বাঙ্গীণ সুন্দর রূপে নামায আদায় করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে তার পরওয়ারদেগারকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ, নির্জন অবস্থায়ও যে আল্লাহ তা'আলা তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন, সে বিষয়ে পরওয়া করে না।

পিপীলিকার চলনের চেয়েও গোপন রিয়া ঃ রিয়া দু' প্রকার— 'জলী' (প্রকাশ্য) ও 'খফী' (গোপন)। যে রিয়া সওয়াবের নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে, এটাই প্রকাশ্য রিয়া। এ প্রকার রিয়া দ্রুত বুঝা যায় এবং রিয়াকারও জেনে নেয় যে, সে রিয়া করছে। এর চেয়ে সামান্য গোপন সেই রিয়া, যা আমল করার কারণ তো হয় না; কিন্তু সওয়াবের নিয়তে যে আমলটি করা হয়, তা এই রিয়ার কারণে সহজ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি প্রত্যহ তাহাজ্জুদ পড়ে; কিন্তু কিছুটা কষ্ট ও অবহেলার সাথে পড়ে। তবে বাড়ীতে কোন মেহমান আগমন করলে তাহাজ্জুদ পড়া তার জন্যে সহজ ও আনন্দের কাজ হয়ে যায়। সে এটাও জানে যে, সওয়াবের আশা না থাকলে কেবল এই মেহমানকে দেখানোর জন্যে সে তাহাজ্জুদ পড়ত না।

এরচেয়েও অধিক গোপন সেই রিয়া, যা আমলের কারণও হয় না এবং আমলকে সহজও করে না। এতদসত্ত্বেও তা অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। আমলের উপর এর কোন প্রভাব নেই বিধায় আলামত ছাড়া একে জানাও সম্ভবপর নয়। এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত এই যে, এই রিয়াকারের আমল সম্পর্কে মানুষ অবগত হলে সে খুশী হয়। যেমন, অনেক আবেদ রয়েছে, যারা নিষ্ঠা সহকারে এবাদত করে এবং রিয়ায় বিশ্বাস করে না; বরং একে খারাপ মনে করে। কিন্তু যখন তাদের এবাদত সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়, তখন তারা আনন্দ অনুভব করে— যেন এবাদতে পরিশ্রম করার একটি বোঝা অন্তর থেকে নেমে গেল। বলা বাহুল্য, একটি গোপন রিয়া থেকেই এই আনন্দের উৎপত্তি। কারণ, অন্তর যদি মানুষের দিকে

ভ্রূক্ষেপ না করত, তবে মানুষের অবগত হওয়ার কারণে এই আনন্দ কখনও হত না। অতএব জানা গেল যে, পাথরে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, তেমনি এই রিয়াও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, যার মধ্যে মানুষের অবগতি চকমকি পাথরের কাজ করেছে এবং আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলেছে। এরপর এই অবগতি থেকে উদ্ভূত আনন্দের স্বাদ যদি আবেদ গ্রহণ করে এবং ঘৃণা দ্বারা ক্ষতিপূরণ না করে, তবে এ আনন্দই গোপন রিয়ার শক্তি ও খাদ্য হয়ে যায়।

এরচেয়েও অধিক গোপন সেই রিয়া, যাতে মানুষের অবগতির খাহেশও থাকে না এবং এবাদত প্রকাশ পেলে আনন্দও হয় না; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা ভাল মনে হয় যে, মানুষ তাকে দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করুক, সসম্ভ্রম ব্যবহার করুক, তার কাজে সন্তুষ্ট থাকুক এবং কেনাবেচায় তার খাতির করুক। এসব ব্যাপারে কেউ ত্রুটি করলে সেটা তার কাছে দুঃসহ কষ্টের কারণ ও অবাস্তব মনে হয়। এমতাবস্থায় সে যেন এই সম্মান ও সম্ভ্রম সেই এবাদতের কারণেই চায়, যা সে গোপনে করে এবং কাউকে জানায় না। পূর্বে এই এবাদত না করলে সম্মান প্রদর্শনে মানুষের ত্রুটি তার কাছে অবাস্তব মনে হত না। সুতরাং এ ধরনের এবাদতে আবেদ কেবল আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে সন্তুষ্ট থাকে না বিধায় তার সাথে গোপন রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, যা পিপীলিকার চলন থেকেও অধিক গোপন। এই রিয়া যদি সওয়াব বরবাদ করে দেয়, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না। সওয়াব বরবাদ করার দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর এই উক্তি– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ক্বারীগণকে বলবেন ঃ তোমাদের জন্যে লোকেরা কি পণ্যদ্রব্যের দাম সস্তা করত না? তোমাদেরকে কি প্রথমে সালাম করত না? তোমাদের অভাব-অনটন কি দূর করত না? অতএব, আজ তোমাদের জন্যে কোন পুরস্কার নেই। তোমাদের পুরস্কার তোমরা দুনিয়াতেই আদায় করে নিয়েছ।

এখন প্রশ্ন হয়, এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়লে আনন্দিত হয় না– এমন লোক আমরা দেখি না; বরং এ ব্যাপারে প্রত্যেক এবাদতকারীই কিছু না কিছু আনন্দ অনুভব করে। অতএব, সকল প্রকার আনন্দই কি নিন্দনীয়, না

কিছু নিন্দনীয় ও কিছু প্রশংসনীয় আছে? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, সকল প্রকার আনন্দই নিন্দনীয় নয়; বরং এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার আনন্দ পাঁচ প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে চার প্রকার ভাল এবং এক প্রকার মন্দ। ভাল চার প্রকারের প্রথম প্রকার এই যে, এবাদত গোপন ও একনিষ্ঠ থাকুক– এটাই আবেদের কাম্য। কিন্তু প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আবেদ এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি কৃপা ও সদয় ব্যবহার করতে চান। তাই আমার গোনাহসমূহ গোপন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে দেন। আমার ইচ্ছা ছিল গোনাহ ও আনুগত্য উভয়টি গোপন থাকুক। অতএব এরচেয়ে বড় কৃপা আর কি হবে যে, তিনি গোনাহকে ঢেকে রেখেছেন এবং এবাদতকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের কথা ভেবে আবেদের এহেন আনন্দ খারাপ নয়; বরং উত্তম। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

অর্থাৎ, 'বলুন, আল্লাহর কৃপায় ও রহমতে। অতএব এতেই আনন্দিত হওয়া উচিত।'

এ আনন্দের কারণ এই হল যে, আবেদ জানতে পারল সে আল্লাহ তা'আলার একজন প্রিয় বান্দা।

দ্বিতীয় প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যেমন আমার গোনাহ ঢেকে রেখেছেন এবং এবাদত প্রকাশ করে দিয়েছেন, তেমনি আখেরাতেও করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

مَاسَتَرَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا اِلَّا سَتَرَهٗ عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যে গোনাহ গোপন রাখেন, আখেরাতেও তাই গোপন রাখেন।'

অতএব, এ আনন্দের কারণ হচ্ছে ভবিষ্যতে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আশা।

তৃতীয় প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, এই আনুগত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে মানুষ আমার অনুসরণ করবে এবং এমনি ধরনের আনুগত্য করবে। ফলে আমার সওয়াব আরও বেড়ে যাবে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি কোন সওয়াবের কাজ করে এবং মানুষ তার অনুসরণ করে, সে অনুসারীদের সমান সওয়াব পেতে থাকে এবং তাদের সওয়াব হ্রাস করা হয় না। বলা বাহুল্য, সওয়াব বৃদ্ধির আশা করা আনন্দদায়ক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবাদতকে গোপন করার সওয়াবও পাবে এবং পরে প্রকাশ হয়ে পড়ার কারণেও সওয়াব পাবে।

চতুর্থ প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, যারা তার এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়ে তার প্রশংসা করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার মরযী ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করেছে। কারণ, তারা তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রিয়পাত্র মনে করেছে। এতে বুঝা যায়, তাদের মন-মেজায আনুগত্যপ্রবণ। নতুবা কতক ঈমানদার এমনও রয়েছে, যারা এবাদতকারীদেরকে দেখলে হিংসা করে, নিন্দা করে এবং রিয়াকার আখ্যা দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সুতরাং প্রশংসা দ্বারা জানা গেল যে, প্রশংসাকারীদের ঈমান সঠিক। এক্ষেত্রে এবাদতকারীর আন্তরিকতার আলামত এই যে, মানুষ অন্য কোন এবাদতকারীর প্রশংসা করলেও সে ততটুকুই আনন্দিত হয়, যতটুকু নিজের প্রশংসার কারণে হয়।

পঞ্চম প্রকার আনন্দ যা মন্দ, তা হচ্ছে এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, এবাদতের কারণে মানুষের মনে আমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ফলে, তারা আমার তারীফ ও তাযীম করতে শুরু করেছে, উঠাবসায় আমাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং আমার প্রয়োজনে সহায়তা করছে। এবাদতকারীর এই প্রকার আনন্দ নিঃসন্দেহে গর্হিত।

গোপন ও প্রকাশ্য রিয়ার মধ্যে যেগুলো বাতিল ঃ জানা উচিত যে, বান্দা যখন কোন এবাদতকে এখলাস তথা আন্তরিকতা সহকারে সম্পন্ন করে, এরপর তার মধ্যে রিয়া আসে, তখন এই রিয়া হয় এবাদত শেষ করার পরে, না হয় আগে, না হয় এবাদতের সাথে সাথে আসবে। যদি এবাদত শেষ করার পর কেবল তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আনন্দ হয় এবং নিজে প্রকাশ না করে, তবে এই আনন্দ এবাদতকে বাতিল করবে না। কেননা, এবাদত তো রিয়া ছাড়াই এখলাস সহকারে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

পরবর্তীতে যে রিয়া হবে, তার প্রভাব আশা করা যায় এবাদত পর্যন্ত পৌঁছবে না। বিশেষত যখন এবাদতকারী নিজে তা প্রকাশ করেনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ করার কারণে প্রকাশ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি রিয়া ছাড়াই এবাদত সম্পন্ন হয়, কিন্তু এবাদতকারী পরে তা সাগ্রহে প্রকাশ করে দেয়, তবে এতে ভয়ের কারণ আছে এবং হাদীস ও মনীষীদের উক্তি থেকে জানা যায় যে, এটা এবাদতকে বাতিলও করে দেবে। সেমতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ আমি কাল রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন ঃ এই এবাদতে এই ব্যক্তির অংশ এতটুকুই।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আরয করল ঃ আমি সারা জীবন রোযা রেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি রোযাও রাখনি এবং রোযাহীন অবস্থায়ও জীবন অতিবাহিত করনি। কেউ কেউ এই উক্তির কারণ এটাই বর্ণনা করেন যে, লোকটি তার এবাদত প্রকাশ করে দিয়েছিল। কারও মতে এর কারণ এই ছিল যে, সারা জীবন রোযা রাখা অপছন্দনীয়।

মোটকথা, রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর উক্তি একথা জ্ঞাপন করে যে, এবাদত করার সময় লোকটির অন্তর রিয়া থেকে মুক্ত ছিল না। তাই সে নিজে বলে তা প্রকাশ করে দিয়েছে। যে রিয়া এবাদতের পরে প্রকাশ পায়, তা এবাদতের সওয়াব বাতিল করে দেবে—এটা অবশ্য কিয়াস তথা অনুমানের খেলাফ। কিয়াস বলে, রিয়ার পূর্বে সম্পন্ন আমলের সওয়াব সে পাবে এবং আমলের পরে যে রিয়া অস্তিত্ব লাভ করে, তার কারণে শাস্তি পাবে।

যদি কেউ এখলাস সহকারে নামায আদায় করে; কিন্তু আদায় করার সময় কিছু রিয়াও হয়ে যায়, তবে নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যখন নফল নামায পড়ছিল, তখন তার কাছে কিছু দর্শক আগমন করল অথবা কোন বাদশাহ আগমন করল। ফলে তার মনে বাসনা দেখা দিল যে, আগন্তুকরা তাকে দেখুক। অথবা নামাযের মধ্যে কোন বিস্মৃত বস্তু স্মরণ হল এবং তা তালাশ করার বাসনা জাগ্রত হল। এমনকি, লোকজন না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়েই তা তালাশ করতে প্রবৃত্ত

হত। কেবল লোকনিন্দার ভয়েই নামায পূর্ণ করল। এমতাবস্থায় তার নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। ফরয নামাযে এরূপ হলে সেই ফরয নামায পুনরায় আদায় করা উচিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে—

اَلْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ اٰخِرُهُ طَابَ اَوَّلُهُ

অর্থাৎ, 'আমল পাত্রের মত। তার শেষ ভাল হলে শুরুও ভাল হবে।'

এতে বুঝা গেল যে, সমাপ্তি পর্যন্ত ভাল করা জরুরী। এক রেওয়ায়েতে আছে— যে ব্যক্তি তার আমলে এক মুহূর্ত রিয়া করবে, তাঁর পূর্ব আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ রেওয়ায়েতটি কেবল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– সদকা ও তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, সদকা ও তেলাওয়াতের প্রত্যেকটি অংশ আলাদা। সুতরাং যে অংশে রিয়া হবে, তা এবং তার পরবর্তী অংশ বাতিল হবে—পূর্ববর্তী অংশ বাতিল হবে না।

যদি কেউ নামাযের নিয়ত করার সাথে সাথে রিয়ার ইচ্ছা করে এবং তা সালাম ফিরানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে তার নামায মূল্যহীন। সর্ব সম্মতিক্রমে এরূপ নামায মূল্যহীন। এ নামাযের কাযা করা উচিত। আর যদি নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই নামাযের মধ্যে অনুতপ্ত হয়ে এস্তেগফার করে এবং রিয়া বর্জন করে, তবে তার নামায সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। (১) কেউ কেউ বলেন ঃ সে রিয়ার ইচ্ছা সহকারে নামায শুরু করেছিল বিধায় তার নামাযই হয়নি। তাই নতুনভাবে নিয়ত করা দরকার। (২) কারও মতে এরূপ ব্যক্তির নিয়ত ঠিক থাকবে এবং রুকূ, সেজদা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম শুদ্ধ হবে না। তাই রুকূ-সেজদা পুনরায় করতে হবে। (৩) আবার অনেকে বলেন, এরূপ ব্যক্তির পুনরায় কোন কিছু করতে হবে না; বরং সে মনে মনে এস্তেগফার করে এখলাস সহকারে নামায খতম করবে। কেননা, শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য। যদি এখলাস সহকারে নামায শুরু করত এবং রিয়ার উপর শেষ করত, তবে নামায বাতিল হয়ে যেত। এখানে এর বিপরীত হয়েছে; অর্থাৎ রিয়া দ্বারা শুরু করে এখলাসের উপর শেষ করা হয়েছে। সুতরাং নামায বাতিল না হওয়া উচিত। এটা এমন, যেমন কোন পাক-সাফ কাপড়ে নাপাকী লেগে গেল। এরপর সেই নাপাকী দূর করা হল। এমতাবস্থায় কাপড়টি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

আমাদের মতে পূর্বোক্ত দুটি উক্তিই কেফাহর দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল। বিশেষত যারা বলে যে, শুধু রুকূ-সেজদা পনুরায় করে নেবে--তাকবীরে তাহরীমার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কেননা, রুকূ-সেজদা শুদ্ধ না হলে এগুলোকে নামাযে অতিরিক্ত কাজ বলে গণ্য করতে হবে, যা নামাযকে ফাসেদ করে দেয়। তৃতীয় উক্তিটিও অগ্রাহ্য। কেননা, শুরুতে রিয়া থাকার কারণে নিয়ত ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।

অতএব, ফেকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি শুদ্ধ, তা এই যে, যদি এই নামাযের প্রেরণাদাতা শুধু রিয়া হয়—সওয়াব অন্বেষণ না হয়, তবে তাহরীমাই শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এর পরে যা যা করবে, তার কোনটিই শুদ্ধ হবে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি একা থাকলে নামায পড়ত না; কিন্তু জনসমাবেশ দেখে নিয়ত বেঁধে নিল। তার এই নামাযে নিয়তই নেই। কেননা, নিয়ত সেই ইচ্ছাকে বলা হয়, যার প্রেরণাদাতা হয় ধর্মের আদেশ পালন। এখানে এই প্রেরণাদাতা নেই। হাঁ, যদি অবস্থা এমন হত যে, জনসমাবেশ না থাকলেও নামায পড়ত; কিন্তু জনসমাবেশ থাকার কারণে তাদের ভাল বলারও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তবে এক্ষেত্রে দুটি প্রেরণাদাতা একত্রিত হয়—ধর্মের আদেশ পালন এবং মানুষের ভাল বলার আকাঙ্ক্ষা। এখানে যে পরিমাণে নিয়ত শুদ্ধ হবে, সে পরিমাণে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং যে পরিমাণে নিয়ত ফাসেদ হবে, সেই পরিমাণে আযাব। একটির উপস্থিতিতে অপরটি নিষ্ফল হবে না।

নিয়তে ত্রুটির কারণে যে নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তা যদি নফল নামায হয়, তবে তার বিধান সদকার অনুরূপ। অর্থাৎ, এটা একদিক দিয়ে আনুগত্য এবং একদিক দিয়ে নাফরমানী। কেননা, এরূপ নামাযীর অন্তরে ভাল ও মন্দ দুটি প্রেরণাদাতা বিদ্যমান। সুতরাং এরূপ বলা যায় না যে, তার নামায শুদ্ধ নয় এবং তার এক্তেদাও শুদ্ধ নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি তারাবীহর নামায আদায় করল এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা জানা গেল যে, তার ইচ্ছা কেবল সুন্দর কেরাআত যাহির করাই ছিল। যদি জামাত না হত এবং সে তার গৃহে একা থাকত, তবে তারাবীহ পড়ত না। এখানে এটা বলা যায় না যে, এই ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া দুরস্ত নয়। তার সম্পর্কে

এরূপ ধারণা করা অবান্তর; বরং মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই করতে হবে যে, সে নফল নামায দ্বারা সওয়াবের ইচ্ছা রাখে। এই ইচ্ছার দিক দিয়ে তার নামাযও শুদ্ধ এবং তার পিছনে নামায পড়াও জায়েয, যদিও সওয়াবের ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছাও যুক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি ফরয নামাযে দুই প্রেরণাদাতা একত্রিত হয় এবং উভয়টি মিলে নামায আদায় করার কারণ হয়, তবে নামাযী ফরয থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, ফরযের প্রেরণাদাতাটি তার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়নি।

কোন্ কোন্ স্থানে এবাদত প্রকাশ করা জায়েয ঃ প্রকাশ থাকে যে, এবাদত গোপন রাখার মধ্যে যেমন এখলাস অবলম্বন এবং রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপকারিতা রয়েছে, তেমনি প্রকাশ করার মধ্যেও উপকারিতা নিহিত আছে। তা হচ্ছে মানুষের অনুসরণ করা এবং তাদের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু এতে রিয়ারও বিপদ আছে। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ সকল মুসলমান জানে যে, এবাদত গোপন রাখার মধ্যে অনেক সাবধানতা কিন্তু প্রকাশ করার মধ্যেও ফায়দা আছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা গোপন এবাদত ও প্রকাশ্য এবাদত উভয়ের প্রশংসা করে বলেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ -

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা খুব ভাল কথা। আর যদি গোপনে ফকীরদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম।'

এবাদত প্রকাশ করা দ্বিবিধ উপায়ে হয়ে থাকে। এক, আসল এবাদতকে প্রকাশ করা এবং দুই, এবাদত করার পর তা মানুষের কাছে বলে দেয়া। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত যেমন জনসমক্ষে খয়রাত করা, যাতে মানুষও খয়রাত করতে উৎসাহিত হয়। বর্ণিত আছে যে, জনৈক আনসারী

সর্বাগ্রে একটি টাকার থলে দান করেন। এরপর অন্যরা তার দেখাদেখি দান করতে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنِ اتَّبَعَهُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রচলন করে, এরপর মানুষ তা করে, সে সেই সৎকর্মের সওয়াব এবং যারা এর অনুসরণ করে তাদের সওয়াব পাবে।'

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবাদতের অবস্থাও তাই। কিন্তু দান-খয়রাতে মানুষ একে অপরের অধিক অনুসরণ করে থাকে। গাযী যখন জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সর্বপ্রথম সওয়ারী প্রস্তুত করবে, যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়। এটা উত্তম। কেননা, জেহাদে যাওয়া মূলত বাহ্যিক ও প্রকাশ্য এবাদত। এটা গোপনে করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে মানুষ মাঝে মাঝে সজোরে তাহাজ্জুদ পড়ে, যাতে গৃহের অন্যরা জেগে উঠে এবং তার অনুসরণ করে। মোটকথা, হজ্জ, জেহাদ, জুমআ ইত্যাদির মত যে সকল এবাদত গোপনে পালন করা সম্ভব নয়, সেগুলো রিয়ার মিশ্রণ না থাকার শর্তে প্রকাশ্যে পালন করা উত্তম। পক্ষান্তরে যে সকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব যেমন দান-খয়রাত, সেগুলো প্রকাশ্যে পালন করলে যদিও অপরকে উৎসাহিত করা হয় কিন্তু মিসকীন ব্যথা পায়, তাই গোপনে দান-খয়রাত করাই উত্তম। কেননা, মিসকীনকে ব্যথা দেয়া হারাম। যদি মিসকীন ব্যথা না পায়, তবু কারও কারও মতে গোপনে দেয়াই উত্তম এবং কারও মতে গোপনে দেয়া সেই প্রকাশ্যে দেয়ার চেয়ে উত্তম, যার মধ্যে অপরের অনুসরণ নেই। কিন্তু যে প্রকাশ্যে দেয়ার মধ্যে অপরের অনুসরণ আছে, তা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ পাক পয়গম্বরগণকে প্রকাশ্যে আমল করারই আদেশ করেছেন, যাতে অন্যরা তাঁদের অনুসরণ করে। এছাড়া لَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (সে তার নেকীর সওয়াব এবং যে অনুসরণ করে, তার সওয়াব পাবে)—এই হাদীস দ্বারাও প্রকাশ্যে আমল করার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

এক হাদীসে বলা হয়েছে—গোপন আমলের সওয়াব প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। কিন্তু যে প্রকাশ্য আমলের অন্যরা অনুসরণ করে, তার সওয়াব গোপন আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। এই হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কেননা, অন্তর রিয়ার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হলে এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থায় আমল এখলাস সহকারে সম্পন্ন হলে প্রকাশ্য আমলই নিঃসন্দেহে উত্তম হবে। কারণ, এতে অপরের অনুসরণ অর্জিত হবে। প্রকাশ্যে আমল করার একমাত্র ভয় হচ্ছে রিয়া। যদি রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তবে নিজে ধ্বংস হয়ে অপরের অনুসরণে কোন ফায়দা নেই। এমতাবস্থায় প্রকাশ্যে আমল করার তুলনায় গোপনে আমল করা সকলের মতে উত্তম।

কিন্তু যে ব্যক্তি আমলকে প্রকাশ করতে চায়, তার দুটি বিষয় ভেবে নেয়া উচিত। প্রথম, এমন জায়গায় প্রকাশ করতে হবে, যেখানে অপরের অনুসরণের নিশ্চিত অথবা প্রবল বিশ্বাস থাকে। দ্বিতীয়, অন্তরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তাতে গোপন রিয়ার প্রতি মহব্বত না থাকে এবং এরই কারণে অনুসরণের ছলে আমল প্রকাশ না করে।

মোটকথা, নফসের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। প্রকাশ্য আমল খুব কম বিপদমুক্ত হয়ে থাকে। আমল গোপনে করার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। আমল প্রকাশ করার মধ্যে এমন বিপদাশংকা রয়েছে, যা অতিক্রম করার ক্ষমতা আমাদের মত লোকদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমাদের এবং সকল দুর্বলমনাদের উচিত প্রকাশ্যে আমল করাকে ভয় করা।

গোপনে আমল সম্পন্ন করার পর তা মানুষের কাছে বলে দেয়াও কম বিপজ্জনক নয়, এর বিধানও প্রকাশ্যে আমল করার অনুরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মযবুত মন ও পূর্ণ এখলাসের অধিকারী এবং মানুষের নিন্দা ও প্রশংসা যার কাছে সমান, সে এমন লোকদের কাছে আপন আমলের কথা ব্যক্ত করতে পারে, যাদের দিক থেকে অনুসরণ আশা করা যায় এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ জানা যায়। নিয়ত পরিষ্কার এবং মন বিপদমুক্ত হলে এরূপ প্রকাশ করা জায়েয; বরং মোস্তাহাব। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এ

ধরনের প্রকাশ করার কথা বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত সাদ ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে নামায ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আমার মনে উদিত হয়েছে এবং এমন কোন জানাযার পিছনে যাইনি, যাতে তার সওয়াল-জওয়াব ছাড়া অন্য কিছু মনে মনে ভেবেছি। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে যখনই কোন কথা শুনেছি, তাকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছি।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি কখনও এ বিষয়ের পরওয়া করি না যে, আমি ধনী না গরীব। কেননা, ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতার মধ্যে কোন্টি আমার জন্যে মঙ্গলজনক, তা আমার জানা নেই। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার পর থেকে আমি কখনও যিনা করিনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। নিঃসন্দেহে এসব রেওয়ায়েত নিজের উত্তম অবস্থা প্রকাশ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশকারী অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হওয়ার শর্তে এরূপ প্রকাশ করা উত্তম। পক্ষান্তরে রিয়াকারের মুখ থেকে এসব কথা ঘৃণ্য রিয়াকারী ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, আমল প্রকাশ করার দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা সমীচীন নয়। কেননা, মানুষের মন দেখাদেখি কাজ করা ও অনুসরণ করা পছন্দ করে। এটা তার মজ্জার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, রিয়াকারও যদি তার এবাদত প্রকাশ করে এবং মানুষ তার রিয়া না জানে, তবে এতেও মানুষের অনেক উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু এটা বিশেষ করে তার নিজের জন্যে ক্ষতিকর। অনেক এখলাস সম্পন্ন ব্যক্তির এখলাসের কারণ রিয়াকারের অনুসরণ হয়ে থাকে। যদিও সে আল্লাহর কাছে রিয়াকার; কিন্তু তার অনুসরণ দ্বারা অপরের উপকার হয়ে যায়।

এক সময় বসরার অলিগলি দিয়ে ফজরের নামাযের পর কেউ গমন করলে সে চতুর্দিক থেকে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেত। কিন্তু যখন জনৈক আলেম রিয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে একটি পুস্তক রচনা করলেন, তখন সকলেই তেলাওয়াত বর্জন করল এবং তারা বলতে লাগল ঃ এ গ্রন্থটি রচিত না হলেই ভাল হত। মোটকথা, রিয়াকারের প্রকাশ করা দ্বারাও উপকার হয় যদি মানুষ না জানে যে, সে রিয়ার কারণে আমল করছে। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامٍ لَّا خَلَاقَ لَهُمْ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তি এবং ভূমিকাহীন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ইসলামকে শক্তি যোগান।'

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত রিয়াকারও এই হাদীসের প্রতীক।

রিয়ার **ভয়ে সৎকর্ম বর্জন করা** ঃ কোন কোন লোক রিয়াকার হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমলই বর্জন করে বসে। এটা তাদের ভ্রান্তি এবং শয়তানের সাথে সহযোগিতা। জানা দরকার যে, আমল দু'প্রকার। প্রথম, যার মধ্যে কোন আনন্দ নেই; বরং আছে শুধু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও জেহাদ। এসব আমল এদিক দিয়ে আনন্দদায়ক হয় যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার সেসব আমল, যেগুলো স্বয়ং আনন্দদায়ক। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই দেহের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত; যেমন খলীফা হওয়া, বিচারপতি হওয়া, শাসক হওয়া, নামাযের ইমাম হওয়া, উপদেশদাতা ও শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এসব আমলের মধ্যে বিপদাপদ বেশী।

প্রথম প্রকার আমল অর্থাৎ নামায, রোযা ও জেহাদের মধ্যে ত্রিবিধ উপায়ে রিয়ার আশংকা থাকে। প্রথম, রিয়া আমলের পূর্বে আসে এবং মানুষকে দেখানোর জন্যে আমল শুরু করা হয়। কোন ধর্মীয় কারণ এর সাথে থাকে না। রিয়ার ভয়ে এরূপ আমল বর্জন করা উচিত। কেননা, এটা পরিষ্কার গোনাহ্। এতে এবাদত নেই; বরং এটা এবাদতের ছদ্মাবরণে মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের অপচেষ্টা। দ্বিতীয়, আমল আল্লাহ্র জন্যেই করতে প্রস্তুত থাকার পর মাঝখানে অথবা শুরুতে রিয়া আসা। এমতাবস্থায় আমল বর্জন করা উচিত নয়। কেননা, এতে ধর্মীয় কারণ পাওয়া যায়। এখানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে রিয়া দূর করা দরকার। তৃতীয়, এখলাস সহকারে আমলের নিয়ত করা, অতঃপর রিয়া ও রিয়ার কারণসমূহ আমল সম্পাদন করার সময় আত্মপ্রকাশ করা। এমতাবস্থায়ও রিয়া দূর করার জন্যে অধ্যবসায় জরুরী এবং আমল বর্জন করা অসমীচীন। কেননা,

শয়তান প্রথমে এটাই চায় যে, মানুষ আমল না করুক। যদি কেউ শয়তানকে অমান্য করে আমল শুরু করে দেয়, তবে শয়তান তাকে রিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। কেউ এটাও উপেক্ষা করলে শয়তান বলে ঃ তোর আমলে এখলাস নেই। তুই রিয়াকার। এখলাসহীন আমল দ্বারা তোর কোন উপকার হবে না। শয়তান এ কথাটি উপর্যুপরি বলে যেতে থাকে যে পর্যন্ত সে আমল বর্জন না করে।

সারকথা, যে পর্যন্ত আমলের প্রেরণাদাতা ধর্ম হয়, সে পর্যন্ত আমল বর্জন করবে না; বরং যথাসম্ভব রিয়ার কুমন্ত্রণাকে দূর করবে এবং মনে মনে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লজ্জিত হবে।

মানুষের কাছে খ্যাত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমল বর্জন করার নযীর পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইবরাহীম নখয়ী একবার তেলাওয়াতে রত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তার খেদমতে আগমন করল। তিনি কোরআন বন্ধ করে তেলাওয়াত মওকুফ করে বললেন ঃ আগন্তুক যেন না জানে যে, আমি প্রতিনিয়ত তেলাওয়াত করি। ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ যখন কথা বলা তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়, তখন চুপ করে থাকবে এবং যখন চুপ থাকা সুখকর মনে হয়, তখন কথা বলবে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ কোন কোন বুযুর্গ পথিমধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকতে দেখেও খ্যাতির ভয়ে সেটি সরাতেন না। কেউ কেউ ভাবাবেগে কান্না এলে সেটিকে হাসিতে রূপান্তরিত করে দিতেন। এ সম্পর্কে এমনি ধরনের আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলোর জওয়াব এই যে, আমল বর্জনের রেওয়ায়েতসমূহের মোকাবিলায় আমল অব্যাহত রাখার রেওয়ায়েত অসংখ্য বুযুর্গ থেকে বিদ্যমান আছে। এছাড়া নফল আমল হলে তা বর্জন করা জায়েয।

দ্বিতীয় প্রকার আমল যা সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তাতে রিয়ার বিপদাশংকা অধিক। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বিপদাশংকা খেলাফতের মধ্যে, এরপর শাসক হওয়ার মধ্যে, এরপর উপদেশ, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের মধ্যে। অতএব, প্রত্যেকটি বিশদভাবে জানা দরকার।

খেলাফতের অর্থ হচ্ছে মুসলমান জনগণের নেতা হওয়া। এটা ইনসাফ

ও এখলাস সহকারে হলে উত্তম এবাদত। হাদীসে বলা হয়েছে—

عِبَادَةُ الْيَوْمِ مِنْ اِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سِتِّيْنَ عَامًا

অর্থাৎ, 'ন্যায়পরায়ণ খলীফার একদিনের এবাদত এক ব্যক্তির একাকী ষাট বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম।'

অতএব এরচেয়ে বেশী এবাদত আর কি হবে, যার একদিন ষাট বছরের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। অন্য হাদীসে আছে—

اول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط احدهم

অর্থাৎ, 'সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ খলীফা তাদের একজন।

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে আছে—

ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل احدهم

অর্থাৎ, 'তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক তাদের একজন।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন—

اقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة امام عادل

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটে বসবে ন্যায়পরায়ণ শাসক।'

মোটকথা, খেলাফত একটি মহান এবাদত। এতে বিপদাশংকা অধিক বিধায় খোদাভীরু ব্যক্তিগণ সর্বকালেই এ থেকে দূরে রয়েছেন। কেননা, এর কারণে মনের মধ্যে যশপ্রীতি এবং জয়ী হওয়ার আনন্দ প্রবল হয়ে যায়, যা জাগতিক আনন্দসমূহের অন্যতম। শাসক ব্যক্তি সাধারণত তার মানসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে, আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে সত্য বিষয়কেও বর্জন করতে পারে— যদি তা তার যশপ্রীতির প্রতিকূল হয়। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে যশ বেশী, তা বাতিল হলেও

বাস্তবায়িত করতে পারে এবং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এহেন বিপদাশংকার কারণেই হযরত উমর (রাঃ) বলতেন ঃ এই পদে যখন এত বিপদ, তখন এটি কে গ্রহণ করতে পারে? রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَا مِنْ وَالِي عَشَرَةٍ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ اِلَى عُنُقِهِ اَطْلَقَهُ عَدْلُهُ اَوْ اَوْبَقَهُ جَوْرُهُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি দশজনেরও শাসক, সেও কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় আসবে যে, তার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা থাকবে। তার ন্যায়পরায়ণতা তাকে মুক্ত করবে অথবা তার যুলুম তাকে ধ্বংস করবে।'

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মা'কাল ইবনে ইয়াসারকে কোন প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন আমার এ পদ কবুল করা উচিত কি না? খলীফা বললেন ঃ যদি আমার পরামর্শের উপরই নির্ভর কর, তবে আমার মতে কবুল না করাই ভাল। কিন্তু আমার এ পরামর্শের কথা অন্য কাউকে বলবে না।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! শাসক পদের জন্য আবেদন করো না। যদি আবেদন ছাড়াই পেয়ে যাও, তবে এর জন্যে তুমি অদৃশ্য জগত থেকে সাহায্য পাবে। আর আবেদন করে পেলে সাহায্য পাবে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার রাফে' ইবনে উমরকে বললেন ঃ দু'ব্যক্তির উপরও শাসক হয়ো না। কিন্তু পরে যখন হযরত আবূ বকর নিজে খলীফা হলেন, তখন রাফে দাঁড়িয়ে তাঁর খেদমতে আরয করলেন ঃ আপনি কি আমাকে বলেননি যে, দু'ব্যক্তির উপরও শাসক হয়ো না? এখন তো আপনাকে সমগ্র উম্মতের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর বললেন ঃ আমি এখনও সেকথাই বলি। যে ব্যক্তি শাসক হয়ে ন্যায়বিচার করে না, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

যে সকল হাদীসের মধ্যে শাসক হওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং

যে সকল হাদীসে শাসক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোন স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তি সেগুলোকে হয়তো পরস্পরবিরোধী মনে করবে। অথচ এরূপ নয়। এ সম্পর্কে সত্য কথা এই যে, যারা শক্তিশালী ধার্মিক, তাদের শাসক হতে অস্বীকার করা উচিত নয়। আর যারা দুর্বল, তাদের অবশ্যই এর ধারে-কাছে না যাওয়া উচিত। গেলে নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে। শক্তিশালী ধার্মিক তারাই, যারা আল্লাহর কাজে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না এবং দুনিয়া যেদিকেই যাক, তারা লোভ ও লালসার জালে আবদ্ধ হয় না। এ ধরনের ব্যক্তিদের প্রতিটি নড়াচড়া ও উঠাবসা ন্যায়ানুগ হয়ে থাকে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রাণনাশের আশংকা থাকলেও তারা পরওয়া করে না। সুতরাং শাসক হওয়া এরূপ ব্যক্তিদেরই কাজ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানে যে, এসব গুণ তার মধ্যে নেই, শাসক হওয়া তার জন্যে হারাম।

শক্তিশালী ও দুর্বলের উপরোক্ত পার্থক্য জানার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আবূ বকরের রাফে'কে শাসক হতে নিষেধ করা এবং নিজের শাসক হয়ে যাওয়া পরস্পর বিরোধী নয়।

বিচারকের পদ শাসনকর্তার নিম্নে হলেও এর বিধানও শাসনকর্তার পদের অনুরূপ। এতেও শাসনক্ষমতা আছে, যা স্বভাবতই প্রিয়। বিচারকের পদে যদি ন্যায়ের অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক সওয়াব, আর যদি ন্যায় থেকে বিচ্যুতি ঘটে, তবে আযাবও অনেক। হাদীসে বর্ণিত আছে, বিচারক তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে এবং দু'প্রকার জাহান্নামে যাবে। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নিজে বিচারক হওয়ার আবেদন করে, সে ছুরি ছাড়াই যবেহ হয়ে যায়। সারকথা, যারা দুর্বল ধার্মিক এবং যাদের দৃষ্টিতে জাগতিক সামগ্রীর কদর আছে, তারা বিচারকের পদ থেকে দূরে থাকবে। আর যারা শক্তিশালী, কেবল তারাই এ পদ গ্রহণ করবে। যদি শাসনকর্তা যালেম হয় এবং জানা থাকে যে, বিচারককে তার মরযী মেনে চলতে হবে, তবে কোনক্রমেই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ হয়ে যায়, তবে তার কর্তব্য হবে বিচারকার্যে শাসনকর্তাকে সর্বসাধারণের মত গণ্য করা। এক্ষেত্রে পদচ্যুতির অজুহাত মোটেই কল্যাণকর নয়।

ন্যায়ানুগ বিচারকার্যের কারণে যদি বিচারক পদচ্যুতও হয়ে যায়, তবে এজন্যে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বিপদ টলিয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি পদচ্যুতিকে অসহনীয় মনে করে শাসনকর্তার মরযী অনুযায়ী ন্যায়বিচার বিসর্জন দেয় এবং এতে কোন দোষ না দেখে, তবে এরূপ বিচারক খেয়াল-খুশীর অনুসারী ও শয়তানের চেলা বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সওয়াবের আশা করা দূরের কথা, সে যালেমদের তালিকাভুক্ত হয়ে দোযখের নিম্নস্তরে স্থান পাবে।

ওয়ায, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের অবস্থাও তদ্রূপ। অর্থাৎ, এগুলোর মাধ্যমেও প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ ও সম্মান বৃদ্ধি পায় বিধায় বিপদাশংকাও বেশী। পূর্ববর্তী মনীষীগণ যতটা সম্ভব ফতোয়াদান থেকে বিরত থাকতেন। ওয়ায়েয যখন ওয়ায দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত, ক্রন্দনরত ও তার প্রতি আকৃষ্ট দেখতে পায়, তখন তার মনে এমন অনাবিল আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, যার সমান কোন আনন্দ নেই। তখন তার মনে চায়, এমন ওয়াযই করা উচিত, যা মানুষের কাছে ভাল লাগে যদিও তা ভ্রান্ত হয়। আর যে কথা সত্য হলেও মানুষের কাছে ভাল লাগে না, তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এরপর মানুষের মনে সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ওয়ায়েয কেবল এমন ওয়ায করে, যাতে শ্রোতাদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সে কোথাও হাদীস ও জ্ঞানের কথা শুনলে এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, এবারের ওয়াযে এটি বর্ণনা করব এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে ধন্যবাদ কুড়াব। অথচ এই ভেবে আনন্দিত হওয়া সমীচীন ছিল যে, আমার সৌভাগ্য যে, হাদীসটি পেয়েছি। সুতরাং প্রথমে আমি আমল করব, অতঃপর অন্যদের কাছে পৌঁছাব, যাতে তারাও আমল করে উপকৃত হয়। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) নিজে খোতবা দিতেন এবং ওয়ায করতেন। কিন্তু যখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইল, তখন তাকে নিষেধ করলেন। এতে লোকটি বলল ঃ আপনি কি মানুষকে উপদেশ দিতে নিষেধ করেন? তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হয়, তুমি ভুলক্রমে আকাশে পৌঁছে যাবে। এরূপ বলার কারণ এই, তিনি লোকটির মধ্যে যশ ও মর্যাদার মোহ আঁচ করতে পেরেছিলেন।

এবাদতের আগে-পরে ও মাঝে মুরীদের কি করা উচিত ঃ প্রকাশ

থাকে যে, আপন এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জানা নিয়েই মুরীদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার জানা নিয়ে সে-ই সন্তুষ্ট থাকে, যে আল্লাহকেই ভয় করে এবং তাঁর কাছেই প্রতিদান আশা করে। যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে ভয় করে এবং তার কাছে আশা করে, সে তাকে নিজের এবাদত সম্পর্কে জানাতেও আগ্রহী হয়। সুতরাং কারও অবস্থা এরূপ হলে তার উচিত জ্ঞান ও ঈমানের কারণে মনে মনে এর নিন্দা করা। কেননা, এ কারণে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির আশংকা আছে। যখন কেউ কোন কঠিন ও দুরূহ এবাদত করে, যা অপরের দ্বারা সচরাচর হয় না, তখন আপন নফসের হেফাযত করা জরুরী। কারণ, নফস এ ধরনের এবাদত অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিতে পুরাপুরি আগ্রহী থাকে। নফস বলে ঃ তোমার এই বড় এবাদত ও মহান খোদাভীতি সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত হলে তারা ভক্তির আতিশয্যে তোমাকে সেজদা করতে শুরু করবে। কারণ, তাদের মধ্যে কে আছে, যে এরূপ এবাদত করতে পারে? মোটকথা, কেউ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার কর্তব্য হবে দৃঢ়পদ থাকা এবং নিজের এবাদতের মোকাবিলায় পরকালের মাহাত্ম্য ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে স্মরণ করা। তার আরও চিন্তা করা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার এবাদত দ্বারা বান্দার কাছ থেকে প্রশংসা কুড়ানোর মধ্যে খোদায়ী গযব ও ক্রোধ নিহিত রয়েছে। সুতরাং এবাদত প্রকাশ করা অন্যের কাছে ভাল মনে হলেও আল্লাহ তাআলার কাছে অবনতি ও আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ। তার এই মনে করে নিরাশ হওয়া উচিত নয় যে, এখলাস তথা আন্তরিকতা তো বড়দের কাজ। যারা মিশ্র আমল করে, তারা এই মর্তবা কোথায় পাবে! বরং তার জানা উচিত যে, যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু, তাদের তুলনায় যারা মুত্তাকী নয়, এখলাসের প্রয়োজনীয়তা তাদের বেশী। কেননা, মুত্তাকীদের যদি নফল এবাদত বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে ফরয এবাদত পূর্ণই থেকে যাবে। কিন্তু যারা মুত্তাকী নয়, তাদের তো ফরয এবাদতও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের এই ত্রুটি নফল এবাদত দ্বারা পূর্ণ করা হবে। যদি নফল এবাদত সঠিক না হয়, তবে ফরয এবাদত ত্রুটিপূর্ণই থেকে যাবে। তামীম দারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে,

কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের সময় যদি ফরযে ত্রুটি দেখা যায়, তবে আদেশ হবে, দেখ, তার কোন নফল এবাদত আছে কি না। থাকলে তা দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূরণ করা হবে। অন্যথায় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, কিয়ামতে মিশ্র আমলকারীর ফরয এবাদত ত্রুটিযুক্ত হবে এবং গোনাহ প্রচুর হবে। ফরযের ত্রুটি দূর করা এবং গোনাহের কাফফারা নফল এবাদতে এখলাস ছাড়া সম্ভবপর নয়। এ থেকে জানা গেল যে, এবাদত করার সময় এবং এবাদত সমাপ্ত করার পরও অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকা উচিত, যাতে এবাদতকে মানুষের কাছে প্রকাশ না করে। এজন্যে এবাদত কবুল হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান থাকা জরুরী। এই সন্দেহ ও ভয় এবাদতের সময় ও এবাদতের পর করা উচিত—নিয়তের শুরুতে নয়। বরং শুরুতে নিজের এখলাস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হবে, যাতে এবাদত সঠিক হয়। শুরু করার পর যখন এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে অনবধান ও ভুল হতে পারে, তখন আশংকা করা সমীচীন যে, এই অনবধানতার মধ্যে সম্ভবত কোন রিয়া অথবা আত্মপ্রীতি এসে গেছে, যাতে এবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে। তবে এবাদত কবুল হওয়ার আশা প্রবল থাকা উচিত। কেননা, এবাদতের মধ্যে এখলাস নিশ্চিতরূপেই রয়েছে। তবে রিয়ার কারণে তা বাতিল হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ের আশা প্রবল থাকা দরকার। এ বিষয়টি জানার কারণে মোনাজাত ও এবাদতে খুব আনন্দ পাওয়া যায়। কেননা, এখলাস তো নিশ্চিত এবং রিয়ার মধ্যে সন্দেহ। যে ব্যক্তি এই সন্দেহকেও ভয় করে, তার ভয় তাকে সংশোধনে উৎসাহিত করে।

যে ব্যক্তি পরোপকার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, তারও নিজের জন্যে সওয়াবের আশা করা উচিত। কেননা, যার উপকার করা হবে, তার মন তুষ্ট হবে এবং যাকে শিক্ষাদান করা হবে, সে শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে। এগুলো সওয়াবেরই বিষয়। কিন্তু শুধু সওয়াবেরই আশা করা উচিত—কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান ও প্রশংসা কীর্তনের আশা করা উচিত নয়—যাকে শিক্ষাদান করা হয়, তার কাছ থেকেও নয়

এবং যার উপকার হয়, তার কাছ থেকেও নয়। অন্যথায় আমল বরবাদ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ যদি শিক্ষার্থীদের কাছে আশা করা হয় যে, শিক্ষাদানের বিনিময়ে সে আমার কাজকর্ম ও খেদমত করবে অথবা দল ভারী হওয়ার জন্যে পথে আমার সঙ্গে চলবে, তবে বুঝতে হবে যে, সে তার মজুরী আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া সে কোন সওয়াব পাবে না। কিন্তু শিক্ষক যদি কোন আশা না করে এবং শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খেদমত করে, তবে আশা করা যায়, শিক্ষকের সওয়াব বাতিল হবে না। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণ এ ধরনের খেদমত এরূপ করতেও আপত্তি করতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক আলেম কূপে পড়ে যান। তাকে কূপ থেকে উপরে তোলার জন্যে লোকজন দৌড়ে এল এবং কূপের ভেতরে রশি ফেলল। কিন্তু তিনি কূপের মধ্য থেকে কসম দিলেন যে, যে ব্যক্তি তার কাছে কোরআন পাকের একটি আয়াতও পাঠ করেছে অথবা একটি হাদীসও শুনেছে, সে যেন এই রশি স্পর্শ না করে। তিনি আশংকা করছিলেন যে, এতটুকু খেদমত গ্রহণ করার কারণেও আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে।

হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি একটি বস্ত্র হযরত সুফিয়ান ছওরীর কাছে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ হুযুর, আমি তো আপনার কাছে হাদীস পড়িনি। আপনি উপহারটি ফেরত পাঠালেন কেন? হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ তুমি পড় না ঠিক; কিন্তু তোমার ভাই তো পড়ে। আমি আশংকা করি যে, এই উপহারের কারণে তার প্রতি আমার অন্তর অন্যের তুলনায় অধিক না ঝুঁকে পড়ে।

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ানের খেদমতে একটি মুদ্রার থলে নিয়ে আগমন করল। লোকটির পিতা তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তিনি প্রায়ই তার কাছে চলে যেতেন। লোকটি আরয করল ঃ আমার পিতা সম্পর্কে আপনার অন্তরে কোন খটকা আছে কি? তিনি বললেন ঃ না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। সে তো অত্যন্ত সাধু ব্যক্তি ছিল। লোকটি আরয করল ঃ আপনি জানেন যে, এই থলেটি তারই ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে

আমার অধিকারে এসেছে। অতএব আপনিও এর দ্বারা আপনার পরিবারের কিছুটা ভরণ-পোষণ করুন। একথা শুনে হযরত সুফিয়ান থলেটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু লোকটি চলে যাওয়ার পর তিনি নিজের পুত্র মোবারককে বললেন ঃ শীঘ্র যাও এবং লোকটিকে আমার কাছে ডেকে আন। লোকটি পুনরায় আগমন করলে তিনি বললেন ঃ এখন আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার থলেটি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি খুব পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, লোকটির পিতার সাথে তাঁর আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ছিল। কাজেই তার সম্পত্তি থেকে কিছু নেয়া পছন্দ করেননি। তাঁর পুত্র মোবারক বলেন ঃ লোকটি তার অর্থ নিয়ে চলে গেলে আমি থাকতে পারলাম না এবং পিতার খেদমতে এসে আরয করলাম ঃ আপনার কি হল? এই সামান্য মুদ্রা আপনি ফিরিয়ে দিলেন কেন? আমাদের এখানে পরিবার-পরিজন রয়েছে। আপনার ভ্রাতারা আছেন। আপনার কি আমাদের প্রতি দয়া হয় না? তিনি বললেন ঃ মোবারক, আল্লাহ্কে ভয় কর। মজা করে খাবে তোমরা, আর এর জওয়াবদিহি করব আমি, এটা হতে পারে না। এ থেকে জানা গেল, আলেমের কাছ থেকে কেউ কোন ফয়েয পেলে আলেম তার সওয়াব কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছেই আশা করবে। শিষ্যও সর্বদা আল্লাহর কাছেই সওয়াব ও মর্যাদা অন্বেষণ করবে। মাঝে মাঝে শিষ্য মনে করে যে, প্রকাশ্যে আল্লাহর এবাদত করলে ওস্তাদের অন্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং লেখাপড়া ভাল হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা, অন্যকে তুষ্ট করার নিয়তে আল্লাহর এবাদত করার ক্ষতি নগদ এবং লেখাপড়ার উপকার হওয়া-না হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। সুতরাং নগদ আমলকে সন্দিগ্ধ উপকারের বিনিময়ে নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। বরং শিষ্যের উচিত আল্লাহর জন্যেই লেখাপড়া করা, তাঁরই জন্যে এবাদত করা এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে ওস্তাদের খেদমত করা। এরূপ হলে লেখাপড়াও এবাদত বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে পিতামাতার সেবাও এই মনে করে করবে যে, পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। এই মনে করে নয় যে, সেবা করলে তাদের অন্তরে আমার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অহংকার ও আত্মপ্রীতি

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ الحديث

অর্থাৎ, 'অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয়ে আমার সাথে বিরোধ করে, আমি তাকে চুরমার করে দেব।'

অন্য এক হাদীসে আছে—

ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

অর্থাৎ, 'তিনটি বিষয় বিনাশকারী। এক, কৃপণতা, মানুষ যার অনুগত হয়। দুই, মানসিক প্রবৃত্তি, মানুষ যার অনুগামী হয়। তিন, আত্মপ্রীতি।'

অতএব, অহংকার ও আত্মপ্রীতি মারাত্মক ব্যাধি। অহংকারী ও আত্মপ্রিয় ব্যক্তি রুগ্ন এবং আল্লাহর দুশমন। এ খণ্ডে বিনাশকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য বিধায় অহংকার ও আত্মপ্রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা নেহায়েত জরুরী। নিম্নে দুটি বিষয়কে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হচ্ছে।

অহংকারের নিন্দা ঃ কোরআন পাকে বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা অহংকার ও অহংকারীদের নিন্দা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ এরশাদ হয়েছে ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, 'যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দাম্ভিকতা করে, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে হটিয়ে দিব।' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

অর্থাৎ, 'এমনিভাবে আল্লাহ মোহর এঁটে দেন প্রত্যেক দাম্ভিক অবাধ্যের অন্তরে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

অর্থাৎ, তারা ফয়সালা চাইতে লাগল এবং ব্যর্থ হল প্রত্যেক অবাধ্য হটকারী।

لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না।

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا

অর্থাৎ, তারা মনে মনে খুব অহংকার করে এবং মারাত্মক সীমালঙ্ঘন করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার এবাদতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

মোটকথা, অহংকারের নিন্দা কোরআন মজীদে বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ ،

অর্থাৎ,' যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না এবং যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না।'

আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন—একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর মারওয়ায় একত্রিত হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর প্রথমোক্ত জন চলে গেলেন এবং শেষোক্ত জন দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে গেলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—মানুষ নিজেকে এত উঁচুতে নিয়ে যায় যে, পরিণামে সে অহংকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। ফলে যে শাস্তি অহংকারীরা পায়, তা সে-ও পায়।

হযরত সোলায়মান (আঃ) একদিন মানুষ, জিন ও পশুপক্ষীদেরকে ময়দানে সমবেত হতে আদেশ করলেন। সেমতে দু'লাখ মানুষ, জিন ইত্যাদি সমবেত হল। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আঃ) এত উঁচুতে উঠলেন যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ্ তাঁর শ্রুতিগোচর হল। এরপর তাঁকে নিম্নে নামানো হল, এমনকি তাঁর পদযুগল সমুদ্র স্পর্শ করল। সেখানে তিনি এই আওয়াজ শুনতে পেলেন— যদি তোমাদের প্রভু অর্থাৎ সোলায়মানের অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার থাকে, তবে তাকে যতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে, তার চেয়েও বেশী পাতালে নামিয়ে দেব।

বর্ণিত আছে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যে কথোপকথন হল। দোযখ বলল ঃ আমি অহংকারী ও শক্তিধরদেরকে পাব। জান্নাত বলল ঃ তা হলে আমি কি অপরাধ করলাম যে, দুর্বল ও অক্ষমরাই আমার মধ্যে স্থান পাবে? আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন ঃ তুমি আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে রহমত দেব। অতঃপর দোযখকে বললেন ঃ তুই আমার আযাব। আমি যাকে ইচ্ছা, তোর মাধ্যমে আযাব দেব এবং জান্নাত ও দোযখ উভয়কে পরিপূর্ণ করে দেব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—দুষ্ট বান্দা সে-ই, যে জবরদস্তি ও সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশক্তিমানকে ভুলে যায়। দুষ্ট বান্দা সেই, যে যুলুম করে ও অহংকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দেয় না। মন্দ বান্দা সেই, যে ভ্রান্তি ও ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকে এবং কবরে মাটি হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করে না। অধম বান্দা

সেই, যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সূচনা ও পরিণতির কথা একবারও ভেবে দেখে না। হযরত ছাবেত (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল—অমুক ব্যক্তি সাংঘাতিক অহংকারী। তিনি বললেন ঃ তার কি মৃত্যু নেই?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি আপন পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি এবং দুটি বিষয়ের আদেশ করছি। শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি এবং কালেমায়ে তাইয়েবার আদেশ করছি। কেননা, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কালেমায়ে তাইয়েবা অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমায়ে তাইয়েবার পাল্লাই ভারী হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ের আদেশ করছি, তা হচ্ছে "সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী"। কেননা, এরই মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক দেয়া হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন, মোবারক সেই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব শিক্ষা দেন এবং সে নিরহংকার হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। অন্য এক হাদীসে আছে—কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিপীলিকার আকৃতিতে পুনরুত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে চলবে। সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোযখীদের পুঁজ ও কাদা তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রতাপশালী ও অহংকারী লোক কিয়ামতে পিঁপড়ার আকারে উত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পায়ের নিচে পিষ্ট করবে। কেননা, তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে হেয় মনে করেছিল।

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বলেন ঃ আমি বেলাল ইবনে আবী বুরদার কাছে গিয়ে বললাম, তোমার পিতা আমার কাছে তার পিতার বাচনিক রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন— দোযখে "মুহিব" নামক একটি জঙ্গল আছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অহংকারীরা তাতে বাস করুক। সুতরাং হে বেলাল, তুমি নিজেকে অহংকারমুক্ত রাখ। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে

মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে– এক, অহংকার, দুই, ফরয এবং তিন, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গকরণ।

অহংকারের নিন্দায় অনেক মনীষীর উক্তিও বর্ণিত আছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ এক মুসলমান যেন অন্য মুসলমানকে হেয় জ্ঞান না করে। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র, সে আল্লাহর কাছে বড়। ওয়াহাব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা "জান্নাতে আদম"-কে সৃষ্টি করার পর তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ অহংকারী ব্যক্তির জন্যে তুমি হারাম। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ প্রত্যহ একবার অথবা দু'বার আপন হাতে পায়খানা ধৌত করে, এরপরও অহংকার করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যিনি প্রতাপশালী তাঁর মোকাবিলা করে। হযরত মোহাম্মদ ইবনে হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষের অন্তরে যে পরিমাণে অহংকার আসে, সেই পরিমাণের জ্ঞানবুদ্ধি হ্রাস পায়। অহংকার কম হলে বুদ্ধির ক্ষতিও কম হবে এবং বেশী হলে বেশী। হযরত সালমান (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ সেই কুকর্ম কোনটি যার উপস্থিতিতে সৎকর্ম উপকারী হয় না? তিনি বললেন ঃ অহংকার। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানের অনেক ফাঁদ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে অহংকার করা এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন।

কাপড় ঝুলিয়ে অথবা সদর্পে চলা ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهٗ بَطَرًا

অর্থাৎ, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যে লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে সদর্পে চলে।'

যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর খেদমতে গেলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ নতুন পোশাক পরিধান করে তার কাছ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বললেন ঃ বৎস! লুঙ্গি আরও উঁচুতে পরিধান কর। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে কেউ সদর্পে লুঙ্গি টেনে চলবে কিয়ামতের

দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। বর্ণিত আছে, একদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) নিজের হাতের তালুতে থুথু নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তাতে অঙ্গুলি রেখে বললেন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার কবল থেকে বেঁচে যাবে? আমি তোমাকে এরই মত বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন তোমাকে সবল ও বলিষ্ঠ করেছি, তখন পোশাক পরে এমন সদর্পে চল যে, পৃথিবী পর্যন্ত আর্তনাদ করে। তুমি ধন সঞ্চয় কর এবং কাউকে কিছু দাও না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন বলতে শুরু কর, আমি দান-খয়রাত করব। সেটা কি দান-খয়রাতের সময়? এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মত অহংকার করে চলতে শুরু করবে এবং পারস্য ও রোমবাসীরা তাদের খেদমত করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের একেকে অপরের উপর চাপিয়ে দেবেন। এক হাদীসে আরও এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আপন মনে মনে বড় সাজে এবং দর্প ভরে চলে, সে যখন আল্লাহর কাছে যাবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন।

আবূ বকর হুযালী বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন হযরত হাসান বসরীর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় শাসক ইবনে আহতাম সেখান দিয়ে পায়খানায় যাচ্ছিল। সে কয়েকটি রেশমী কোর্তা পরিধান করেছিল, যা পায়ের গোছার উপর ভাঁজে ভাঁজে রাখা ছিল। তার চলনভঙ্গিতে দর্প ও অহংকার পরিস্ফুট ছিল। হযরত হাসান বসরী একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এই নাক বাড়ানো, কোমর বাঁকানো এবং গ্রীবা ঘুরানোর জন্যে আফসোস। হে নির্বোধ! তুমি ডানে-বামে ঘুরে ঘুরে কি দেখছ? তোমার ডানে-বামে আল্লাহর নেয়ামতরাজি রয়েছে, সেগুলোর তুমি শোকর আদায় করনি। ইবনে আহতাম একথা শুনে ফিরে এল এবং তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না। আল্লাহর সামনে তওবা কর। তুমি কি আল্লাহ পাকের এই উক্তি পাঠ করনি—

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

অর্থাৎ, 'গর্বভরে পদচারণা করো না। কেননা, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং লম্বা হয়ে পর্বতশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।'

একবার জনৈক উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত যুবক হযরত হাসানের সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ মানুষ তার যৌবন ও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে। মনে করা উচিত যে, কবর দেহকে আবৃত করেছে এবং কতকর্ম সামনে এসেছে। যাও, অন্তরের চিকিৎসা কর। বান্দার অন্তর সংশোধিত হোক—এটাই আল্লাহ তা'আলার কাম্য।

বর্ণিত আছে, একবার খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) হজ্জ করেন। হযরত লাউস (রহঃ) তাঁর চালচলনে কিছুটা অহংকার লক্ষ্য করলেন। তিনি তার পেটের এক পার্শ্বে অঙ্গুলি দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন ঃ যার পেট বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, তার চালচলন এমন হয় না। হযরত উমর ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললেন ঃ চাচা, এ চালচলন শিক্ষা দেয়ার জন্যে আমার বড়রা আমার প্রতিটি অঙ্গে প্রহার করেছে। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে আপন পুত্রকে অহংকার করতে দেখে কাছে ডেকে বললেন ঃ তুমি কে জান? তোমার মাকে আমি দু'শ' দেরহাম দিয়ে ক্রয় করেছিলাম। আর তোমার পিতা এমন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে এরূপ লোক বেশী সৃষ্টি না করলেই ভাল হয়।

বর্ণিত আছে, মুতারিক ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) মুহাল্লাবকে রেশমী জুব্বা পরিধান করে গর্ব করতে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, তোমার এই চলনকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন না। মুহাল্লাব বলল ঃ আপনি জানেন, আমি কে? মুতারিক বললেন ঃ হাঁ, জানি। প্রথমে তুমি নাপাক বীর্য ছিলে এবং পরিণামে নাপাক মাটি হয়ে যাবে। বর্তমানে ময়লা বহন করে ফিরছ। মুহাল্লাব একথা শুনে চলে গেল এবং গর্ব পরিত্যাগ করল।

আমরা যেখানে অহংকার ও গর্বের নিন্দা লিপিবদ্ধ করেছি, সেখানে কিছুটা বিনয়ের ফযীলত লেখাও সমীচীন মনে হয়।

বিনয় ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

مَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِالْعَفْوِ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, 'ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'আলা কেবল বান্দার ইযযতই বৃদ্ধি করেন এবং আল্লাহর জন্যে যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উঁচুতে তুলে দেন।'

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে। তারা বলগার সাহায্যে তাকে নিমন্ত্রণ করে। যদি সে ব্যক্তি নিজেকে উঁচু করে, তবে ফেরেশতারা বলগা টেনে ধরে এবং বলে ইলাহী, তুমি এই ব্যক্তিকে নিচু করে দাও। আর যদি বিনয় ও আনুগত্য করে, তবে ফেরেশতারা দোয়া দেয় এবং বলে, ইলাহী, একে উঁচু কর। আরও বলা হয়েছে—সে ব্যক্তি সুখী, যে দরিদ্র না হয়েও বিনয় করে, সৎপথে উপার্জিত ধন ব্যয় করে, অবহেলিত ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

আবূ সালমা মুদায়নী তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রেখে মসজিদে কুবায় অবস্থান করছিলেন। ইফতারের সময় আমরা এক পিয়ালা দুধের সাথে সামান্য মধু মিশ্রিত করে পেশ করলাম। তিনি তা মুখে দিয়ে যখন মধুর স্বাদ আস্বাদন করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? আমরা বললাম ঃ দুধের সাথে সামান্য মধু মিশ্রিত করেছি। তিনি পিয়ালা রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি একে হারাম করি না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত বাক্যাবলী উচ্চারণ করলেন—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ
اِقْتَصَرَ اَغْنَاهُ وَمَنْ بَذَّرَ اَفْقَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ-

অর্থাৎ, 'যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ তাকে উঁচু করেন। যে অহংকার করে আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন। যে মধ্যপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ফকীর করেন, আর যে আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাকে বন্ধু করে নেন।'

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিলেন—হয় আমি দাস ও রসূল হব, না হয় বাদশাহ ও নবী হব। কিন্তু কোন্‌টি বেছে নিব, তা আমার জানা ছিল না। ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু জিবরাঈল উপস্থিত ছিলেন। আমি তার দিকে মাথা তুলে তাকালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সামনে বিনয় করুন। সেমতে আমি আরয করলাম ঃ আমি দাস ও রসূল হতে চাই। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে ওহী করেন যে, আমি এমন ব্যক্তির নামায কবুল করি, যে আমার মাহাত্ম্যের সামনে বিনয়ী হয়, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার করে না, অন্তরে আমার ভয় রাখে, অষ্টপ্রহর আমাকে স্মরণ করে এবং আমার খাতিরে নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

অর্থাৎ, 'মহত্ত্ব হচ্ছে খোদাভীতি, গৌরব হচ্ছে বিনয় এবং বিশ্বাস হচ্ছে ধনাঢ্যতা। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে বিনয়ী হয়। তারা কিয়ামতে মিম্বরের উপর উপবেশন করবে। সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। কিয়ামতে তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হবে। সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে আপন অন্তরকে পাক রাখে। কিয়ামতে তাদের আল্লাহর দীদার নসীব হবে। অন্য এক হাদীসে আছে—চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যা কেবল সে ব্যক্তি পায়, যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নেন—(১) চুপ থাকা, যা এবাদতের সূচনা, (২) আল্লাহর উপর ভরসা করা, (৩) বিনয় এবং (৪) সংসারবিমুখতা।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উচ্চতা দান করেন। রসূলে করীম (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মধ্যে এবাদতের মিষ্টতা পাই না কেন? তারা আরয করলেনঃ এবাদতের মিষ্টতা কি? তিনি বললেন ঃ বিনয়।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তার জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দেন। আর যখন অহংকার ও যুলুম করে, তখন তাকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেন এবং আদেশ করেন—দূর হ! আল্লাহ্ তোকে দূর করেছেন। এরূপ ব্যক্তি স্বজ্ঞানে বড় হলেও মানুষের দৃষ্টিতে ছোট।

হযরত ফুযায়ল (রহঃ)-কে কেউ বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ বিনয় হচ্ছে সত্যের সামনে বিনম্র ও অনুগত হওয়া যদিও সেই সত্য কোন বালক অথবা মূর্খের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ বিনয় হচ্ছে নিজেকে সে ব্যক্তির চেয়ে কম মনে করা, যে পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে কম এবং নিজেকে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক মনে করা, যে পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে বেশী। কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধন, রূপ অথবা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তাতে বিনয় করে না, কিয়ামতে এসব বিষয় তার জন্য শাস্তির কারণ হয়ে যাবে। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতে যে নেয়ামত দান করেন, সে যদি তার শোকর করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই নেয়ামতের উপকার তাকে দুনিয়াতেও দান করেন এবং আখেরাতেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে যদি বান্দা সেই নেয়ামতের শোকর এবং বিনয় প্রদর্শন না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও তার উপকার মওকুফ রাখেন এবং আখেরাতে তার জন্যে জাহান্নামের স্তর খুলে দেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রীতি ছিল যে, তিনি সকালে বড়লোক, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে মনোযোগ দিতেন, এরপর ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে আসতেন এবং তাদের কাছে এই বলে বসে যেতেন যে, মিসকীন মিসকীনদের মধ্যেই এসেছে।

বর্ণিত আছে, একবার ইউসুফ, আইয়ুব ও হাসান (রহঃ) পথে বের হলেন। চলতে চলতে বিনয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। হযরত হাসান জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিনয় কি জান? বিনয় হল গৃহ থেকে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে যে মুসলমানের সাথে দেখা হয়, তাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করা। হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ যখন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে

নিমজ্জিত হল, তখন প্রত্যেক পাহাড় একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হতে লাগল। কিন্তু জুদী পাহাড় বিনয় অবলম্বন করল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন এবং নূহ (আঃ)-এর নৌকা তার উপর অবস্থান নিল। যিয়াদ নুমায়রী বলেন ঃ যে দরবেশের মধ্যে বিনয় নেই, সে ফলহীন বৃক্ষসদৃশ। হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ) বলেন ঃ ব্যক্তি যতক্ষণ মনে করে যে, মানুষের মধ্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট কেউ আছে, ততক্ষণ সে অহংকারী। লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ তা হলে বিনয়ী কখন হবে? তিনি বললেন ঃ যখন নিজের জন্যে কোন স্থান ও মর্যাদা চিন্তা না করে। মানুষ যে পরিমাণে আল্লাহকে ও নিজেকে চিনে, সে পরিমাণে বিনয়ী হয়। ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী (রহঃ) বলেন ঃ ভদ্রলোক এবাদতকারী হলে বিনয়ী হয় এবং নির্বোধ ও অভদ্র ব্যক্তি এবাদতকারী হলে নিজেকে বুযুর্গ মনে করতে থাকে। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেনঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের কারণে তোমার সাথে অহংকার করে, তার সাথে তোমার অহংকার করাই বিনয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিনয় দান করুন।

অহংকারের স্বরূপ ও তার লাভ-লোকসান ঃ অহংকার দু'প্রকার। একটি বাহ্যিক, অপরটি অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ অহংকার হচ্ছে মনের অভ্যাস এবং বাহ্যিক অহংকার হচ্ছে ক্রিয়াকর্ম, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাস্তবে অভ্যন্তরীণ অভ্যাসকেই অহংকার বলা সঙ্গত। ক্রিয়াকর্ম এই অভ্যাসেরই ফলাফল। অভ্যাসই ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। অঙ্গের উপর যখন অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠে, তখন 'অহংকার করেছে' বলা হয়। মোটকথা, মানসিক চরিত্রসমূহের মধ্যে একটি চরিত্রকে বলা হয় অহংকার। তা হচ্ছে নিজেকে অন্যের উপর সেরা দেখে আনন্দ পাওয়া এবং তাতেই আকৃষ্ট হওয়া।

বলা বাহুল্য, অহংকার একটি আপেক্ষিক বিষয়। এতে একাধিক বিষয়ের উপস্থিতি দরকার—(১) অহংকারী, (২) যার সাথে অহংকার করা হয়, (৩) যে বিষয় নিয়ে অহংকার করা হয়। অহংকার ও আত্মপ্রীতির মধ্যে তফাৎ এখানেই। আত্মপ্রীতিতে কেবল কর্তার উপস্থিতিই যথেষ্ট। মানুষ যদি একাই সৃজিত হয় এবং তার সাথে অন্য কোন কিছু না থাকে, তবে সে

আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত হতে পারবে—অহংকার করতে পারবে না। এ থেকে বুঝা গেল, অহংকারে কেবল নিজেকে বড় মনে করা যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু অপরকে নিজের চেয়েও বড় অথবা সমান জ্ঞান করে। এতে অহংকার হয় না। অনুরূপভাবে অপরকে হেয় মনে করাও অহংকারের জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ অপরকে হেয় মনে করে; কিন্তু নিজেকে তার চেয়েও অধিক হেয় মনে করে। এমতাবস্থায় সে অহংকারী হয় না। অপরকে নিজের অনুরূপ মনে করলেও অহংকার হয় না। অহংকারের জরুরী বিষয় হচ্ছে নিজের একটি মর্যাদা জানা এবং অপরের একটি মর্যাদা জানা। অতঃপর নিজের মর্যাদাকে অপরের মর্যাদার চেয়ে সেরা মনে করা। বিশ্বাসের মধ্যে এ তিনটি বিষয় একত্রিত হলে অহংকার হবে। কেবল নিজের মর্যাদা জানার নাম অহংকার নয়; বরং এই জানার কারণে ও বিশ্বাসের ফলে মনের মধ্যে একটি ফুৎকার পড়ে এবং মান-সম্মান ও আনন্দের দিকে গতিশীল হয়। সম্মান ও আনন্দের দিকে এই গতিশীলতাকেই অহংকার বলা হয়। হাদীস শরীফেও উপরোক্ত ফুৎকার উল্লিখিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

অর্থাৎ, '(হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অহংকারের ফুৎকার থেকে।'

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফজরের নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি এমনিভাবে তাকে বলেছিলেন ঃ আমার আশংকা হয় যে, তুমি ফুলে-ফেঁপে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষ যখন অহংকার করে, তখন ফুলে উঠে। এই ফুলে উঠাকে মাহাত্ম্যবোধও বলা হয়। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাই বলেছেন—

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ

অর্থাৎ, 'তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই রয়েছে, যে পর্যন্ত তারা পৌঁছতে সক্ষম হবে না।'

অর্থাৎ এমন মাহাত্ম্যবোধ যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ক্রিয়াকর্মকে অহংকার বলা হয়। অর্থাৎ, যখন কারও কাছে তার নিজের মর্যাদা অপরের চেয়ে বড় সাব্যস্ত হয়, তখন সে অপরকে হেয় জ্ঞান করে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবে। তার কাছে বসা, তার সাথে আহারে শরীক হওয়া অপছন্দ করবে। অহংকারের মাত্রা বেশী হলে মনে করবে, এ লোকটির উচিত আমার সামনে গোলামের মত নত হয়ে দাঁড়ানো।

অহংকারের অনিষ্ট খুব মারাত্মক। এর কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আবেদ, সংসারত্যাগী এবং শিক্ষিত লোকগণ কমই এ থেকে মুক্ত থাকে, জনসাধারণের তো কথাই নেই। অহংকার যে ধ্বংসাত্মক, তার বড় প্রমাণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উক্তি ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থাৎ, 'যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না।'

এর কারণ এই যে, অহংকারের কারণে বান্দা ঈমানের কোন চরিত্র অর্জন করতে পারে না। উদাহরণতঃ মানুষ যে পর্যন্ত অহংকারী থাকে, সে নিজের জন্যে যা প্রিয়, তা অন্য মুমিনের জন্যে প্রিয় মনে করবে না। বিনয় হল পরহেযগারদের চরিত্রের মূল বিষয়, অহংকারী ব্যক্তি তা করতে পারবে না। অহংকারে থাকা অবস্থায় কেউ হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করতে পারবে না। সদা সত্য কথা বলতে পারবে না। ক্রোধ ও রাগ দমন করতে সক্ষম হবে না। নিজে নম্রতা সহকারে কাউকে উপদেশ দেবে না এবং অন্যের উপদেশে কান লাগাবে না। মোটকথা, এমন কোন মন্দ অভ্যাস নেই, যা অহংকারী ব্যক্তি নিজের অহংকার রক্ষার খাতিরে করতে বাধ্য না হবে। পক্ষান্তরে এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নেই, যা সে নিজের মানহানির ভয়ে বর্জন না করবে। এ কারণেই বলা হয়েছে, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না। আর মন্দ চরিত্র কখনও একা বিদ্যমান থাকে না। কারও মধ্যে একটি মন্দ চরিত্র থাকলে সে অপরটিকে টেনে আনে।

সে অহংকার সর্বনিকৃষ্ট, যা কারও কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্যকে মেনে নিতে ও তার অনুগত হতে দেয় না। এমনি ধরনের অহংকার সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ -

অর্থাৎ, 'ফেরেশতারা হাত প্রসারিত করে বলবে—বের কর তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে অপমানজনক শাস্তি। কারণ, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।'

وَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ, 'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম।'

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ নরম মাটিতে ফসল উৎপন্ন হয়, পাথরে হয় না। এমনিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনম্র অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে; অহংকারীর অন্তরে করে না। লক্ষণীয়, যদি মানুষ তার মাথা অতিমাত্রায় উঁচু করে এবং ছাদ পর্যন্ত নিয়ে যায়, তবে ছাদে টক্কর লেগে তার মাথাই চূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি নুয়ে থাকবে, সে ছাদ দ্বারা আরাম ও ছায়া সবই পাবে।

যার সাথে অহংকার করা হয়, তার স্তর এবং অহংকারের ফল ঃ

মানুষ মজ্জাগতভাবে যালেম ও মূর্খ বিধায় সে কখনও স্রষ্টার সাথে এবং কখনও সৃষ্টির সাথে অহংকার করে। এদিক দিয়ে অহংকার তিন প্রকার। প্রথম, আল্লাহর সাথে অহংকার। এটা সর্বনিকৃষ্ট অহংকার। এর কারণ কেবল মূর্খতা ও অবাধ্যতাই হয়ে থাকে। যেমন নমরূদ

অহংকারবশত স্থির করেছিল যে, সে আল্লাহর সাথে লড়াই করবে অথবা যেমন অভিশপ্ত ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিল। সে আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেছিল। এই প্রকার অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

অর্থাৎ, 'ঈসা মসীহ এবং নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে অপছন্দ করে না। যে কেউ তাঁর বান্দা হওয়াকে অপছন্দ করবে এবং যারাই আমার এবাদত করতে অহংকার করবে, তারা জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।'

দ্বিতীয়, রসূলগণের সাথে অহংকার করা। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞান করে তাদের মতই কোন ব্যক্তির অনুসারী হতে অস্বীকার করে। এই অহংকার কখনও চিন্তাভাবনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, রেসালত কি, তা চিন্তাই করা হয় না। এ কারণেই সর্বক্ষণ অহংকারের দরুন মূর্খতার মধ্যে থেকে আনুগত্য করে না এবং নিজেকে সত্যপন্থী বলে ধারণা করতে থাকে। কখনও চিন্তা-ভাবনা করে; কিন্তু মন রসূলগণের আনুগত্য করে না। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে কাফেরদের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারা বলত ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا -

অর্থাৎ, 'আমরা কি আমাদের মতই মানুষকে মেনে নেব?'

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থাৎ, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।'

لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের অনুগত হয়ে যাও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, 'যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, আমাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হল না কেন অথবা আমরা পরওয়ারদেগারকে দেখে নিতাম। তারা মনের মধ্যে খুব অহংকার পোষণ করে।'

ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, 'সে নিজে এবং তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছে।'

ফেরাউন আল্লাহ ও রসূল উভয়ের সাথে অহংকার করেছিল। সেমতে হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে বলেছিলেন ঃ তুমি ঈমান আন। তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে। ফেরাউন বলল ঃ আমি হামানের সাথে পরামর্শ করে নিই। হামানকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ এখন তো আপনি উপাস্য। লোকজন আপনার উপাসনা করে। ঈমান আনলে আপনি দাস হয়ে যাবেন এবং অন্যের উপাসনা করবেন। অতঃপর ফেরাউন আল্লাহ তা'আলার দাস হতে এবং মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করতে অস্বীকার করল। মক্কার কোরায়শদের উক্তি কোরআন পাক এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ, 'এই কোরআন মক্কা ও তায়েফ এ দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হল না কেন?'

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ এটা ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবূ মসউদ ছাকাফীর উক্তি। তারা বলত, মোহাম্মদ তো একজন এতীম বালক। তাকে আল্লাহ কিরূপে আমাদের নবী করলেন? কোন বড় সরদার ব্যক্তিকে নবী করলেন না কেন? আল্লাহ তাদের জওয়াবে বলেন ঃ

أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

অর্থাৎ, 'তারাই কি আপনার প্রভুর রহমত বন্টন করে?'

কোরায়শরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে আরও বলেছিল, আমরা আপনার দরবারে কিরূপে বসতে পারি? এখানে তো দরিদ্র মুসলমানরা সব সময় আনাগোনা করে। তাদের এই হেয় জ্ঞান করার জওয়াবে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

অর্থাৎ, 'আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।'

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

অর্থাৎ, 'আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। আপনার চক্ষু যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র না যায়।'

মোটকথা, কতক কোরায়শ কাফের এমন ছিল, যারা অহংকারের কারণে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত ছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সত্য নবী ছিলেন, এ বিষয়ে মূর্খ ছিল। আবার কতক এমন ছিল, যারা জানত তিনি সত্য নবী; কিন্তু অহংকারের কারণে মুখে তা স্বীকার করত না। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا

অর্থাৎ, 'যখন তাদের কাছে তাদের জানা বিষয় আগমন করল, তখন তারা অস্বীকার করে বসল।' এই দ্বিতীয় প্রকার অহংকার প্রথম প্রকারের চেয়ে কম হলেও তার কাছাকাছি।

তৃতীয়, বান্দার সাথে অহংকার করা, অর্থাৎ নিজেকে বড় ও অপরকে হেয় জ্ঞান করার কারণে কারও আনুগত্য না করা। এটা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহংকারের তুলনায় কম হলেও দু'কারণে খুবই মারাত্মক। প্রথম কারণ, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও ইযযত সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যেই শোভনীয়। বান্দা দুর্বল ও অক্ষম বিধায় তার অহংকার করা উচিত নয়। অতএব, বান্দা যখন অহংকার করে, তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর অংশীদার হতে চায়। এটা মাথায় বাদশাহের মুকুট পরিধান করে কোন গোলামের সিংহাসনে বসে পড়ার মত। এখানে চিন্তা করা দরকার যে, বাদশাহ এরূপ গোলামের প্রতি কতটুকু ক্রুদ্ধ হবেন। কেননা, গোলামের কাজটি নিরতিশয় ধৃষ্টতাপূর্ণ। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং অহম আমার চাদর। এতে যে আমার সাথে বিরোধ করবে, আমি তাকে চুরমার করে দেব। বান্দার সাথে অহংকার করা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য বিধায় যে ব্যক্তি বান্দার সাথে অহংকার করবে, সে আল্লাহর সাথে বিরোধকারী সাব্যস্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, অহংকারের কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের বিরোধিতা করতে বাধ্য। কেননা, অহংকারী ব্যক্তি যখন কারও মুখ থেকে সত্য কথা শুনে, তখন অহংকারবশত তা মেনে নেয় না; বরং অস্বীকার করতে তৎপর হয়ে উঠে। এ কারণেই যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে মোনাযারা তথা বিতর্ক করে, তারা দাবী এটাই করে যে, নিছক সত্য আবিষ্কার করা ও তা প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এরপর তারা সত্যকে মেনে নিতে অহংকারীদের ন্যায় অস্বীকার করে। এক পক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেলে অপরপক্ষ তা মানে না এবং মিথা প্রমাণ করার জন্যে ও তা খন্ডন করার জন্যে সচেষ্ট থাকে। এটা কাফের ও মোনাফিকদের অভ্যাস। কোরআন পাকে আছে—

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ, 'কাফেররা বলল ঃ তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করো না এবং এতে গোলমাল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা প্রবল থাক।'

যারা প্রবল হওয়ার জন্যে এবং অপরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্যে বাহাস করে—সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, তারা এই অভ্যাসে মোনাফিকদের সাথে শরীক।

মোটকথা, মানুষের সাথে অহংকার অত্যন্ত মন্দ অভ্যাস। এর কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীর সাথে অহংকার হয়ে যায়। অহংকারে বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ইবলীশের কথা কোরআন মজীদে এ কারণেই উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। সে বলেছিল ঃ আমি মানুষের চেয়ে উত্তম। আমি আগুন দ্বারা সৃজিত, আর মানুষ মাটির দ্বারা। ইবলীশের এই অহংকারের পরিণতিতে সে সেজদার আদেশ মানতে অস্বীকার করেছে। অতএব, তার অহংকার সূচনাতে ছিল আদম (আঃ) -এর সাথে এবং পরিণামে আল্লাহর সাথে হয়ে গেল। ফলে, সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি জানেন, আমি অত্যধিক পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। এটা কি অহংকারে গণ্য হবে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ না, এটা অহংকার নয়; বরং অহংকার হচ্ছে সত্য বিষয়ের অবাধ্য হওয়া, মানুষের দোষ অন্বেষণ করে তাদেরকে হেয় করা। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, অন্য মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাখ্যান করে, সে বান্দার ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করতে লজ্জাবোধ করে এবং রসূলের অনুসরণ করে বিনম্র হতে কুণ্ঠিত হয়, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে।

অহংকারের কারণসমূহ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এমন লোকই অহংকার করে, যে নিজেকে বড় মনে করে। আর নিজেকে সে-ই বড় মনে করে, যে জানে তার মধ্যে কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক পূর্ণতার গুণ বিদ্যমান

রয়েছে। পারলৌকিক পূর্ণতা দু'টি— এলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম)। অপরপক্ষে পার্থিব পূর্ণতা পাঁচটি—বংশ, সৌন্দর্য, শক্তি, ধনসম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের প্রাচুর্য। অতএব, এ সাতটি বিষয়ই হচ্ছে অহংকারের কারণ। নিম্নে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

অহংকারের প্রথম কারণ এলম তথা জ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তিরা দ্রুত অহংকারী হয়ে পড়ে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে—

آفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ

অর্থাৎ, 'জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে অহংকার।'

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে মূর্খ ও তুচ্ছ মনে করতে থাকে। ফলে, পার্থিব কাজ-কারবারে সে নিজেকে অগ্রগণ্য মনে করে। অপরের কাছ থেকে প্রথমে সালাম পাওয়ার আশা করে। অন্যরা তার সাথে সদাচরণ করে, কিন্তু সে কারও সাথে সদাচরণ করে না। করলেও এটাকে তার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং কৃতজ্ঞতা আশা করে। আর ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের সাথে এভাবে অহংকার করে যে, সে নিজেকে আল্লাহর কাছে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে। ফলে অন্যের জন্যে সে যতটুকু ভয় করে, নিজের জন্যে ততটুকু করে না; বরং নিজের মুক্তির ব্যাপারে অন্যের চেয়ে বেশী আশাবাদী হয়।

বলা বাহুল্য, এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকে মূর্খ বলাই অধিক সঙ্গত। তাকে জ্ঞানী কে করেছে? সত্যিকার জ্ঞান তো তাকে বলে, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহকে, নিজেকে এবং পরিণামের বিপদকে চিনে ও বুঝে। জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি, বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন হয়, জ্ঞানের কারণে কিছুসংখ্যক লোকের অহংকার ও নির্ভীকতা বেড়ে যায় কেন? এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত এ সকল লোক এমন জ্ঞান চর্চায় মশগুল হয়, যা কেবল নামে মাত্রই জ্ঞান— সত্যিকার জ্ঞান নয়। সত্যিকার জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি বৃদ্ধি পাবেই। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

অর্থাৎ 'জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে।'

দ্বিতীয়ত এ সকল লোক যখন জ্ঞান চর্চা করে, তখন তাদের বাতেন অর্থাৎ অন্তরদেশ সংশোধিত থাকে না; বরং কুচরিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ফলে যে শিক্ষাই লাভ করুক না কেন, তা তাদের অন্তরে ভাল আসন পায় না। পরিণামে জ্ঞানের ফলও ভাল হয় না।

হযরত ওয়াহাব (রহঃ) এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে আকাশের পানির মত, যা পরিষ্কার ও মিষ্ট থাকে। কিন্তু বৃক্ষসমূহ আপন শিরা-উপশিরা দ্বারা যখন সেই পানিকে নিজেদের মধ্যে টেনে নেয়, তখন মূলত যে বৃক্ষের যে স্বাদ, সে পানিকে সেইভাবে বদলে নেয়। পানি পেয়ে তিক্ত বৃক্ষের তিক্ততা আরও বেড়ে যায় এবং মিষ্ট বৃক্ষের মিষ্টতাও তেমনি বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। যে জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ সাহসিকতা ও খাহেশ থাকে, সে জ্ঞান তার জন্যে তেমনি হয়ে যায়। ফলে এর কারণে অহংকারীর অহংকার এবং বিনয়ীর বিনয় বেড়ে যায়।

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমল অর্থাৎ, এবাদত। অনেক সংসারত্যাগী এবাদতকারী অহংকার, ইযযত ও মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকে না। তাদের আচরণ থেকেও পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কাজকর্মে অহংকার বুঝা যায়। পার্থিব কাজকর্মে যেমন তাদের কাছে মানুষের আসা, মানুষের কাছে তাদের যাওয়ার তুলনায় উত্তম বিবেচিত হয়। তারা মানুষের কাছে আশা করে যে, মানুষ তাদের অভাব-অনটন পূর্ণ করুক, সম্মান করুক, মজলিসে সবার আগে বসাক এবং পরহেযগার ও মুত্তাকীরূপে স্মরণ করুক। পারলৌকিক ব্যাপারে তাদের অহংকার এই যে, তারা নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অন্য সকলকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করে। অথচ বাস্তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত তারাই?

রসূলে আকরাম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ সব মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে— যখন তোমরা কাউকে একথা বলতে শুন, তখন মনে কর, সর্বাধিক বরবাদ সেই হবে। যে ব্যক্তি এবাদতকারীকে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রিয় মনে করে এবং আল্লাহর এবাদতের কারণে তার সম্মান করে, তার মধ্যে ও এবাদতকারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল হবে। কিন্তু এবাদতকারী যেহেতু মানুষকে হেয় জ্ঞান করে

তাদের কাছে উঠাবসা করতে ঘৃণা পোষণ করত, তাই সে আল্লাহর গযবের যোগ্য হবে। আশ্চর্যের বিষয় বটে, মানুষ তো তাকে ভালবাসার কারণে তার এবাদতের মর্তবা পাবে, আর সে নিজে কি না মানুষকে হেয় জ্ঞান করার কারণে আল্লাহর অসন্তোষের পাত্র হবে। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি অধিক গুণ্ডামির কারণে "গুণ্ডা" নামে খ্যাত ছিল। অপরদিকে অন্য এক ব্যক্তি অধিক এবাদতের কারণে, "আবেদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তার অধিক এবাদতের ফলস্বরূপ একখণ্ড মেঘ তাকে সর্বক্ষণ ছায়া দান করত। একদিন গুণ্ডা লোকটি আবেদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করল— এই আবেদ এবাদতে অনেক নাম করেছেন। আমি একজন গুণ্ডা। তার কাছে বসলে আল্লাহ আমার প্রতি রহম করতে পারেন। অতঃপর সে ভক্তি সহকারে আবেদের কাছে গিয়ে বসল। এদিকে আবেদ ভাবল— আমি তো একজন আবেদ। এই গুণ্ডা লোকটি এখানে বসল কেন? এই ভেবে সে গুণ্ডাকে সরোষে বলল ঃ চলে যা এখান থেকে! আল্লাহ তা'আলা সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ তাদের উভয়কে নতুন করে আমল করতে বল। আমি গুণ্ডাকে ক্ষমা করেছি এবং আবেদের সকল এবাদত বাতিল করে দিয়েছি। অতঃপর মেঘখন্ডের ছায়াও গুণ্ডার উপর চলে গেল।

অহংকারের তৃতীয় কারণ বংশ-মর্যাদা। যার বংশ সম্ভ্রান্ত, সে নীচ বংশের লোকদেরকে হেয় মনে করে, যদিও তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মে বেশী হয়। কেউ কেউ বংশগত অহমিকায় এত বেশী ক্ষিপ্ত যে, তারা অন্যদেরকে গোলাম মনে করে এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করতে ঘৃণা করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ধার্মিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণও এ ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এটা তাদের মধ্যে গোপন থাকে—মুখে ফুটে উঠে না। তবে ক্রোধ প্রবল হলে জ্ঞানবুদ্ধির নূর বিলীন হয়ে যায়। তখন অহংকার কথাবার্তায়ও ফুটে উঠে।

এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। ক্রোধের আতিশয্যে আমি তাকে বলে বসলাম—হে কৃষ্ণকায় নারীর সন্তান! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যর!

طَفُّ الصَّاعِ طَفُّ الصَّاعِ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ

অর্থাৎ, 'উভয় পাল্লা সমান। কৃষ্ণকায় নারীর সন্তানের উপর শ্বেতকায় নারীর সন্তানের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

আবূ যর বলেন ঃ একথা শুনে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে বললাম ঃ তুমি আমার গণ্ডদেশকে পদতলে পিষ্ট কর। এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত আবূ যর যখন নিজেকে শ্বেতকায় মহিলার সন্তান বলে গর্ব করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কিভাবে সতর্ক করে দিলেন। আরও লক্ষণীয়, তিনি কিভাবে তওবা করলেন এবং মন থেকে অহংকার মূলোৎপাটন করে দিলেন। তিনি বুঝে নিলেন, ইযযতের শিকড় যিললত ছাড়া উৎপাটিত হয় না। তাই যার সাথে অহংকার করেছিলেন, তারই পদতলে আপন গণ্ডদেশ স্থাপন করলেন।

অহংকারের চতুর্থ কারণ রূপ-লাবণ্য। এ কারণটি মহিলাদের মধ্যে অধিক পাওয়া যায়। এই অহংকারের ফলে অপরের দোষ-ত্রুটি ও গীবত মুখে উচ্চারিত হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার এক মহিলা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে আমি হাতের ইশারায় বললাম ঃ "বেঁটে"। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তুমি তার গীবত করেছ। বলা বাহুল্য, গোপন অহংকারই ছিল এর কারণ। হযরত আয়েশা নিজে যদি বেঁটে হতেন, তবে মহিলাকে বেঁটে বলতেন না। অতএব, তিনি যেন নিজের দেহাবয়বকে উত্তম জ্ঞান করেছেন। এর বিপরীতে মহিলাকে খর্বাকৃতির মনে করে বেঁটে বলে দিয়েছেন।

পঞ্চম কারণ ধন-সম্পদ। এ ধরনের অহংকার রাজা-বাদশাহরা তাদের ধন-ভাণ্ডার নিয়ে, ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে, গ্রামীণ লোকেরা তাদের ভূ-সম্পত্তি নিয়ে এবং সাজ-সজ্জাকারীরা তাদের পোশাক ও যানবাহন নিয়ে করে থাকে। সুতরাং ধনাঢ্য ব্যক্তি নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাথে অহংকার করে বলে ঃ মিয়া, তুমি তো ভিখারী-মিসকীন। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে কিনে নিতে পারি। ধনাঢ্যতার বিপদ ও দারিদ্র্যের ফযীলত

সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ধনীরা এসব কথা বলে। কোরআন পাকে এই ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

অর্থাৎ, 'অতঃপর কথাবার্তায় সে তার সঙ্গীকে বলল ঃ আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ এবং অধিক জনশক্তি আছে।'

সঙ্গী জওয়াব দিল ঃ

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا

অর্থাৎ, 'যদি তুমি আমার ধন ও জন কম দেখ, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে কল্যাণ দান করবেন, যা তোমার বাগ-বাগিচার চেয়ে উত্তম হবে এবং তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করবেন, ফলে তা হয়ে যাবে বৃক্ষহীন ময়দান অথবা তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তা খোঁজাখুঁজি করেও পাবে না।

কারূনের অহংকারও তেমনি ছিল। সে যখন খুব সাজগোছ করে সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হাযির হত, তখন তারাও তার মত ধন-সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে লাগল।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ দৈহিক শক্তি-বল, যা নিয়ে দুর্বল ও অসমর্থদের সাথে অহংকার করা হয়।

সপ্তম কারণ অনুগামী, সাহায্যকারী, মুরীদ, চাকর-নওকর, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের সংখ্যাধিক্য। রাজা-বাদশাহরা অধিক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এবং শিক্ষিতরা অধিক শিষ্য নিয়ে অহংকার করে– যদিও তাদের সৈন্য সামন্ত ও শিষ্যবর্গ ধ্বংস ও আযাবের কারণ হয়।

অহংকারের প্রতিকার ও বিনয় অর্জনের উপায় ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, অহংকার একটি ধ্বংসমূলক বিষয়। খুব

কম মানুষই এ থেকে মুক্ত। এই অহংকার দূর করা ফরযে আইন। কেবল বাসনা করলেই এটা দূর হবে না; বরং এমন ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, যা তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। দ্বিবিধ উপায়ে এর প্রতিকার সম্ভব। এক, অন্তরে নিহিত এর মূল শিকড় উপড়ে ফেলে এবং দুই, যে সকল কারণে মানুষ অহংকার করে, সেগুলোকে দূর করে। মূল শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে দু'রকম চিকিৎসা দরকার— একটি শিক্ষাগত ও অপরটি কর্মগত। শিক্ষাগত চিকিৎসা এই যে, মানুষ নিজেকে চিনবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে। এতেই ইনশাআল্লাহ অহংকার দূর হয়ে যাবে। কেননা, মানুষ যখন নিজেকে যথাযথরূপে চিনবে, তখন বিশ্বাস করবে যে, সে নিজে সকল হেয় বস্তুর চেয়েও হেয়তম এবং সকল সামান্য বস্তুর চেয়েও সামান্যতম। অনুনয়, বিনয় ও লাঞ্ছনা ছাড়া কোন কিছুই তার প্রাপ্য নয়। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে, তখন জানতে পারবে বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্যে শোভনীয় নয়।

আল্লাহকে চিনা ও তার মাহাত্ম্য অনুধাবন করার বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, এটাই এলমে মুকাশাফার চূড়ান্ত সীমা। যদিও আত্মজ্ঞান অর্জন করাও দীর্ঘ ব্যাপার। কিন্তু আমরা এখানে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করব, যতটুকু বিনয় অর্জনের ক্ষেত্রে উপকারী। বলা বাহুল্য, এর জন্যে কোরআন পাকের একটি আয়াতের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নেয়াই যথেষ্ট। আয়াতটি এই ঃ

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهٗ
فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ -

অর্থাৎ, 'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত যে অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? বীর্য দ্বারা তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার বিকাশ সাধন করেছেন, অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

এ আয়াতে মানুষের প্রথম সৃষ্টি, পরিণতি ও মধ্যবর্তী অবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। মানুষ এসব অবস্থা চিন্তা করলে আয়াতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে।

উদাহরণতঃ প্রথম অবস্থায় মানুষের কোন উল্লেখও ছিল না। সে ছিল নাস্তির পর্দায় আবৃত। দীর্ঘকাল এ অবস্থাই অব্যাহত থাকে। নাস্তির সূচনা কখন হয়েছে, তাও জানা নেই। যে বস্তু অস্তিত্বহীন, তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত আর কি হবে? জন্মের পূর্বে মানুষ এরূপই ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হীন বস্তু অর্থাৎ মৃত্তিকা দিয়ে গড়ে তুলেন এবং অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেন। অতঃপর বীর্য থেকে জমাট রক্ত এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। এরপর অস্থি গঠন করেন এবং অস্থিকে মাংস ও ত্বকের আবরণ দান করেন। এ সব স্তর অতিক্রম করার পর মানুষ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। এরপরও জন্মের সাথে সাথে তার মধ্যে অনেক নিচ স্বভাব বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে পাথরের ন্যায় জড় অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়। সে কোন কিছু শুনত না, দেখত না, হৃদয়ঙ্গম করত না, নড়াচড়া করত না, কথা বলত না এবং কোন কিছু ধরত না। এক কথায়, সে যেন জীবন্ত ছিল না। সে ছিল শক্তিশালী হওয়ার পূর্বে নিঃশক্তি, জ্ঞানী হওয়ার পূর্বে অজ্ঞান, চক্ষুষ্মান হওয়ার পূর্বে অন্ধ, শ্রবণকারী হওয়ার পূর্বে বধির, বক্তা হওয়ার পূর্বে মূক, পথপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে পথভ্রষ্ট এবং সমর্থ হওয়ার পূর্বে অসমর্থ।

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

পর্যন্ত আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে–

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ -

অর্থাৎ, জীবন লাভের পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। বলা বাহুল্য, এখানেও পূর্বোক্ত বক্তব্য বিধৃত হয়েছে।

সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা মানুষের পথ সহজ করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যা ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে। এতে মানুষ আমৃত্যু যা কিছু অর্জন করে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا-

অর্থাৎ, 'তাকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।'

সুতরাং যে মানুষের জন্ম ও জন্ম পরবর্তী অবস্থা এই, তার জন্যে গর্ব ও অহংকার করা কেমন করে বৈধ হবে? সে তো বাস্তবে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং দুর্বল থেকে দুর্বলতম সত্তা। হাঁ, মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গ সৃজিত হত, তার সব কাজ তারই এখতিয়ারভুক্ত থাকত এবং সে আপন ক্ষমতায় চিরঞ্জীব হত, তবে আপন সূচনা ও পরিণতি বিস্মৃত হয়ে অবাধ্য ও অহংকারী হওয়া তার জন্যে শোভা পেত। কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম। তার স্বল্পকালীন জীবনে মারাত্মক রোগ-ব্যাধি এবং বিভিন্ন বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। ক্ষুধা, পিপাসা, জরামৃত্যু আরও কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে দিন অতিবাহিত করতে হয়। নিজের লাভ-লোকসান, ইষ্ট ও অনিষ্টের এখতিয়ার তার নেই। সে অনেক কিছু জানতে চায়; কিন্তু অজ্ঞ থাকে। অনেক কিছু বিস্মৃত হতে চায়, কিন্তু পারে না। সার কথা, মানুষের অন্তর ও মন তার আয়ত্তের বাইরে। সে এমন বস্তু কামনা করে, যাতে তার ধ্বংস নিহিত এবং এমন বস্তুকে বর্জন করতে চায়, যাতে তার জীবন লুক্কায়িত। সে এমন খাদ্যকে সুস্বাদু মনে করে, যা খেয়ে বদহজমিতে ভোগে, মৃত্যুবরণ করে এবং তিক্ত ঔষধ, যা উপকারী ও জীবনদানকারী, তা খেতে চায় না। এমতাবস্থায় সে যদি নিজেকে চিনে, তবে অবশ্যই জানতে পারবে যে, তার চেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। সুতরাং অহংকার করা মূর্খতা বৈ নয়।

এরপর যখন মানুষের মৃত্যু হবে, তখন সে পূর্বে যেরূপ জড় পদার্থ ছিল, তেমনি জড় পদার্থে পরিণত হবে। সে হবে একটি চেতনা ও অনুভূতিহীন কাঠামো। তাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে।.তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গলে যাবে, অস্থিসমূহ পচে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বিভিন্ন কীট কিলবিল করে তার দেহকে খেয়ে ফেলবে। তখন কোন প্রাণী তার কাছে ভিড়বে না। মানুষ তাকে নাপাক মনে করবে এবং তীব্র দুর্গন্ধের কারণে তার কাছ থেকে দূরে পালাবে। কত ভাল হত যদি এই অবস্থায় মাটি হয়ে যাওয়ার পর সে মুক্তি পেত। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। সে পুনরুজ্জীবিত হবে। দেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ পুনরেকত্রিত হয়ে সে কবর থেকে উঠবে এবং কিয়ামতকে উপস্থিত দেখতে পাবে। সে দেখবে, আকাশ বিদীর্ণ, পৃথিবী পরিবর্তিত, পর্বতমালা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তারকারাজি নিষ্প্রভ এবং সূর্য গ্রহণে আবৃত। সর্বত্র অন্ধকারই অন্ধকার। তার সামনে আমলনামা রাখা হবে এবং বলা হবে এটা পাঠ কর। সে বলবে ঃ এটা কিসের আমলনামা? উত্তর হবে—তোমার জীবদ্দশায় তোমার কাঁধে দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত ছিল। তুমি যা বলতে এবং যে কাজ করতে, তা তারা লিখে রাখত। তোমার ছোট-বড় সকল আমল এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তুমি ভুলে গেলে কি হবে, আল্লাহ ভুলে যাননি। এখন চল এবং হিসাব-নিকাশ দাও। একথা শুনতেই সে ব্যাকুল হয়ে পড়বে। এরপর আমলনামা পাঠ করে বলবে—হায় হায়! এতে তো ছোট-বড় সকল গোনাহই বিদ্যমান। এ হচ্ছে সকল মানুষের শেষ পরিণতি, যা ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, যে মানুষের এই অবস্থা, অহংকারের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আস্ফালন করা ও বড়াই করা তো দূরের কথা, তার তো এক মুহূর্তও আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। এ হচ্ছে অহংকারের শিক্ষাগত চিকিৎসার বর্ণনা।

এখন কর্মগত চিকিৎসা হল, প্রকাশ্যে বিনয় অবলম্বন করা এবং সকল মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার ও সদাচরণ করা। যেমন আমরা ইতিপূর্বে সৎকর্মপরায়ণদের অবস্থা বর্ণনা করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত ও রীতিনীতির অনুসরণ করবে। বর্ণিত আছে, তিনি মাটিতে বসে আহার

করতেন এবং বলতেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা। তাই বান্দার মতই আহার করি। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি নতুন বস্ত্র পরিধান করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি গোলাম; যেদিন মুক্তি পাব, সেদিন নতুন পোশাক পরিধান করব। এখানে মুক্তি বলে তিনি কিয়ামতের মুক্তি বুঝিয়েছেন।

বিনয় কর্মের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। তাই আরব জাতিকে ঈমান ও নামাযের আদেশ করা হয়েছিল। কেননা, বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাবের বিপরীত ছিল। এমনকি, কারও হাত থেকে বেত পড়ে গেলে তা উঠানোর জন্যে তারা নত হত না। জুতার ফিতা খুলে গেলে তা নুয়ে বেঁধে নিত না। সেমতে হাকীম ইবনে হেযাম যখন প্রথম বায়আত হয়েছিল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শর্ত করেছিল যে, সে রুকু-সেজদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে। তিনি এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য হাকীম বুঝতে পারে এবং পাক্কা নামাযী হয়ে কামালাতের শীর্ষে পৌঁছান। মোটকথা, আরব জাতির কাছে সেজদা করা ও নত হওয়া ছিল চরম অপমানজনক। তাই নামাযের আদেশ হয়, যাতে তাদের অহংকার চূর্ণ হয় এবং অন্তরে বিনয় আসন গাড়ে। বলা বাহুল্য, নামাযের রুকূ, সেজদা ও দণ্ডায়মান থাকার মধ্যে পুরোপুরি বিনয়ভাব বিদ্যমান রয়েছে। এদিক দিয়েই নামাযকে "ধর্মের স্তম্ভ" আখ্যা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে অহংকারের কারণসমূহ দূর করার মাধ্যমে অহংকারের প্রতিকার করা। প্রথমত বংশ মর্যাদার কারণে যে ব্যক্তি অহংকার করে, তার দুটি বিষয় জানা উচিত। এক, বংশ নিয়ে গর্ব করা নিছক মূর্খতা। কেননা, অন্যের গুণ-গরিমা দ্বারা নিজের সম্মান হওয়া অর্থহীন। সুতরাং যে বংশের গর্ব করে, সে যদি নীচ স্বভাবের হয়, তবে অন্যের গুণ-গরিমা তার নীচ স্বভাবকে ঢেকে রাখবে কিরূপে। বরং যে ব্যক্তির বংশ নিয়ে গর্ব করে, সে জীবিত থাকলে একথাই বলত যে, শ্রেষ্ঠত্ব আমার মধ্যে রয়েছে। তুই তো আমার প্রস্রাবের কীট। তোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কোত্থেকে এল? দ্বিতীয় বিষয় এই যে, সে তার সত্যিকার বংশ চেনার চেষ্টা করবে এবং বাপ-দাদার কথা চিন্তা করবে। তার বাপ তো এক ফোঁটা নাপাক বীর্য এবং দাদা নিকৃষ্ট মৃত্তিকা। অতএব, যার মূল হচ্ছে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা, যা পদতলে পিষ্ট হতে থাকে, সে অহংকার কিরূপে করতে পারে?

অহংকারের অপর কারণ রূপ-লাবণ্য। এর চিকিৎসা এই যে, মানুষ তার অভ্যন্তর ভাগকে বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখবে— জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় কেবল বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে না। অভ্যন্তর ভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে এমন ঘৃণ্য বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হবে, যা দ্বারা রূপের অহংকার নিমেষে বিলীন হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ মানুষের সর্বাঙ্গ নোংরামিতে পূর্ণ। তার পেটে রয়েছে মল, মূত্রাশয়ে মূত্র, নাকে শ্লেষ্মা, মুখে থুথু, কানে ময়লা, ধমনীতে রক্ত, ত্বকে পুঁজ এবং বগলে দুর্গন্ধ। এ ছাড়া সে দিনে একবার অথবা দু'বার নিজের হাতে পায়খানা ধৌত করে এবং প্রত্যহ একবার অথবা দু'বার পেটের জঞ্জাল দূর করার জন্যে পায়খানায় যায়। পায়খানা তো দেখলেও ঘৃণা লাগে, স্পর্শ করা অথবা নাকে ঘ্রাণ নেয়া তো দূরের কথা। এ সব বিষয় মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, যাতে সে সর্বদা আপন নাপাকী ও নীচতা ধ্যান করতে থাকে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমাদেরকে আমাদের নীচতা ও অপবিত্রতা স্মরণ করাতে যেয়ে বলতেন, মনে রেখ, তোমরা প্রস্রাবের পথ দিয়ে দু'বার নির্গত হয়েছ। সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করবে যে, সে নোংরা বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে, নোংরা বস্তুর মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে এবং মৃত্যুর পরও নোংরা বস্তুই হয়ে যাবে, তখন নিজের রূপ-লাবণ্যকে গর্বের বস্তু মনে করবে না।

অহংকারের আরও একটি কারণ হচ্ছে দৈহিক শক্তি ও বল। এর প্রতিকার এই যে, মানুষ সাধারণত যে সকল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেগুলোর কথা চিন্তা করবে। উদাহরণতঃ যদি একটি শিরায়ও ব্যথা দেখা দেয়, তবে মানুষ অক্ষমদের চেয়েও হীনতম হয়ে যায়। আরও চিন্তা করা উচিত যে, যদি কোন মশা নাকে ঢুকে যায় অথবা পিঁপড়া কানে প্রবেশ করে, তবে এটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পায়ে কাঁটা ফুটলেও মানুষ শক্তিহীন হয়ে যায়। একদিনের জ্বরে অনেক দিনের শক্তি-সামর্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি একটি কাঁটাও সহ্য করতে পারে না এবং মশা ও পিঁপড়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, শক্তি নিয়ে গর্ব করা তার পক্ষে শোভা পায় না।

আত্মপ্রসাদ

আত্মপ্রসাদের নিন্দা ঃ আত্মপ্রসাদের নিন্দা কোরআন পাক ও হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ, হুনায়ন যুদ্ধে তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হলে বটে, কিন্তু তা তোমাদের কোনই উপকার করেনি।

এখানে আত্মপ্রসাদ নিন্দার ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا -

অর্থাৎ, তারা ধারণা করল, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি এমন জায়গা থেকে তাদের কাছে আসল যার কল্পনাও তারা করেনি।

এ আয়াতে কাফেরদের দুর্গ নিয়ে আত্মপ্রসাদের নিন্দা 'করা হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনটি বিষয়কে বিনাশকারী বলে অভিহিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মপ্রসাদ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ দুটি বিষয় ধ্বংসাত্মক-একটি নৈরাশ্য, অপরটি আত্মপ্রসাদ। এরূপ বলার কারণ এই যে, সৌভাগ্য দুটি বিষয় দ্বারাই অর্জিত হয়– একটি চেষ্টা ও অধ্যবসায়, অপরটি কর্মতৎপরতা। নিরাশ ব্যক্তি চেষ্টা করে না, আর যে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত, সে নিজেকে সৌভাগ্যশালী বলে বিশ্বাস করে। তাই অর্জন করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

–ইবনে জুরায়জের মতে এর অর্থ কেউ যেন কোন সৎকাজ করে এ কথা না বলে যে, সে করেছে। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ নিজেকে

সৎকর্মপরায়ণ বলে বিশ্বাস করো না। এটা আত্মপ্রসাদ। উহুদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শত্রুর আঘাত থেকে মুক্ত রাখার জন্যে তাঁর উপর পড়ে গিয়েছিলেন, যাতে শত্রুর আঘাত তাঁর নিজের গায়েই লাগে। ফলে, তাঁর হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) অক্ষত ছিলেন। এটা একটা মহৎ প্রচেষ্টা ছিল বিধায় তাঁর দৃষ্টিতেও পরবর্তী সময়ে এর যথেষ্ট মাহাত্ম্য ছিল। হযরত উমর (রাঃ) নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁর এই আত্মপ্রসাদ জেনে নেন এবং বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে তালহার হাত ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে আত্মপ্রসাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন পুণ্যবান সাহাবীও যখন আত্মপ্রসাদ থেকে বাঁচতে পারলেন না, তখন দুর্বলচেতা মানুষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে তাদের কি দশা হবে! হযরত মুতরিফ (রহঃ) বলেন ঃ আমি যদি সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমাই এবং সকালে এই গাফলতির জন্যে অনুতাপ করি, তবে এটা সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ে সকাল বেলায় আত্মপ্রসাদ বা আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ঢের উত্তম। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ الْعُجُبُ الْعُجُبُ -

অর্থাৎ, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে আমি তোমাদের জন্যে এর চেয়েও মারাত্মক বিষয়ের আশংকা করি। সেটা হচ্ছে আত্মপ্রসাদ।

এখানে আত্মপ্রসাদকে সকল গোনাহের চেয়ে বড় বলা হয়েছে। বিশর ইবনে মনসুর (রহঃ) সদা এবাদতে মগ্ন থাকতেন। ফলে তাকে দেখলে আল্লাহ ও কিয়ামতের কথা স্মরণ হত। একদিন তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লেন। জনৈক ব্যক্তি পিছন থেকে তাকে দেখল। সালাম ফিরানোর পর তিনি লোকটিকে বললেন ঃ তুমি আমার যে অবস্থা দেখেছ, তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। অভিশপ্ত ইবলীসও ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এবাদত করেছিল। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে, তাতো তোমার অজানা নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মানুষ

কখন খারাপ হয়? তিনি বললেন ঃ যখন সে নিজেকে ভাল মনে করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

অর্থাৎ, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে আপন সৎকর্ম বাতিল করো না।

অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে দানকে বড় মনে করার ফল। বলা বাহুল্য, কোন আমলকে বড় মনে করাই আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রীতি। অতএব জানা গেল যে, আত্মপ্রীতি নিশ্চিতই মন্দ কাজ।

আত্মপ্রসাদের ক্ষতি ঃ আত্মপ্রসাদ অহংকারের অন্যতম কারণ বিধায় আত্মপ্রসাদ যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে এর কারণে মানুষ কোন কোন গোনাহকে স্মরণই করে না। যদি স্মরণ করে, তবে তাকে সাগীরা তথা ক্ষুদ্র গোনাহ জেনে তা পূরণে সচেষ্ট হয় না; বরং মনে করে নেয় যে, এতো মাফই হয়ে যাবে। এছাড়া মানুষ নিজের এবাদত ও আমলকে বড় মনে করে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং আল্লাহর নেয়ামত বিস্মৃত হয়। যখন কেউ নিজের আমলের কারণে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়, তখন সে সেই আমলের বিপদ সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আমলের বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার অধিকাংশ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, বাহ্যিক আমল পাক-সাফ ও সংমিশ্রণমুক্ত না হলে তা খুবই কম উপকারী হয়ে থাকে। যার উপর ভয় প্রবল থাকে, সেই আমলের বিপদ খোঁজ করে। যে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত, সে অহেতুক নির্ভীক হয়ে থাকে। সে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে। এ কারণেই সে নিজের প্রশংসা নিজেই করতে থাকে। যে ব্যক্তি আপন মতামত ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আত্মপ্রীত, সে পরামর্শ গ্রহণ ও জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। সে নিজের চেয়ে বড় পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাকে দূষণীয় জ্ঞান করে এবং কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করে না; বরং অপরকে মূর্খতুল্য মনে করে। তার নিজস্ব মতামতটি যদি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত হয়, তবে এর কারণে সে চিরতরে বরবাদ হয়ে যায়।

আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোন না কোন পূর্ণতার গুণের মধ্যেই আত্মপ্রসাদ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে কোন পূর্ণতার গুণ আছে বলে বিশ্বাস করে, তার অবস্থা ত্রিবিধ হতে পারে। এক, সেই পূর্ণতার গুণটি বিলুপ্ত হওয়ার অথবা বিকৃত হওয়ার ভয় লেগে থাকবে। এরূপ হলে তা আত্মপ্রসাদ হবে না। দুই, বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকবে না; কিন্তু সেটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বলে বিশ্বাস করবে। এরূপ হলেও তাকে আত্মপ্রসাদ বলা হবে না। তিন, বিলুপ্ত হওয়ারও ভয় থাকবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বলেও বিশ্বাস করবে না; বরং সেটিকে নিজস্ব কৃতিত্ব ও গুণ মনে করেই আনন্দিত হবে। একেই বলা হবে আত্মপ্রসাদ। অতএব, আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা এই দাঁড়াল যে, কোন পূর্ণতার গুণকে বড় মনে করে প্রসন্ন হওয়া এবং সেটি যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি দান, একথা বেমালুম ভুলে যাওয়া। এর সাথে যদি আল্লাহর উপর প্রতিদান দেয়া হক হয়ে গেছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তবে তাকে বলা হবে গর্ব, যা আত্মপ্রসাদের উপরের স্তর। দুনিয়াতেও এমনটি হয় যে, এক ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দিয়ে সেটাকে বড় কাজ মনে করে। এতটুকুতে কেবল আত্মপ্রসাদ হয়। কিন্তু যদি সে এই দেয়ার বদলে তার কাছে কোন খেদমত আশা করে, তবে একে বলা হয় গর্ব। আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ – কারও প্রতি বেশী পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ করো না।

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ আপন কর্ম দ্বারা গর্ব করো না। হাদীসে আছে—গর্বকারীর নামায তার মাথা অতিক্রম করে না; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। মোটকথা, যে গর্ব করে, সে আত্মপ্রদাসও অনুভব করে। কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, তার জন্যে গর্ব করা জরুরী নয়। কেননা, আত্মপ্রসাদ হয় কেবল নেয়ামতকে বড় জানা এবং নেয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া দ্বারা। এতে প্রতিদান আশা করার শর্ত নেই। অপরপক্ষে প্রতিদান আশা করা ছাড়া গর্ব হয় না। সুতরাং কেউ যদি কবুল হওয়ার আশায় দোয়া করে, অতঃপর কবুল না হওয়াকে মনে মনে খারাপ বিশ্বাস করে, তবে সে গর্বকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আত্মপ্রসাদের প্রতিকার ঃ জানা উচিত যে, প্রত্যেক রোগের প্রতিকার হবে তার কারণের বিপরীত কারণকে সম্মুখে আনা। আত্মপ্রসাদের কারণ যেহেতু অজ্ঞতা, তাই তার প্রতিকার হবে সেই জ্ঞান, যা অজ্ঞতার বিপরীত। অজ্ঞতাবশত যে সকল বিষয় নিয়ে মানুষ আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়, সেগুলো মোটামুটি আট প্রকার।

প্রথম, রূপ, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এর চিকিৎসা তাই, যা আমরা রূপলাবণ্য নিয়ে অহংকার করার বেলায় উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, নিজের আদি-অন্ত অপবিত্রতার কথা চিন্তা করবে এবং অনুধাবন করবে যে, এর আগে কত অপরূপ সৌন্দর্যশালীরা মাটিতে মিশে গেছে এবং কবরে তাদের দেহ কেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়, শক্তিসামর্থ্য নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা ; যেমন কোরআনে উল্লিখিত আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল ঃ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর আর কে?' এর চিকিৎসা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা যে, একদিনের জ্বরে শক্তিশালী মানুষ নিঃশক্তি হয়ে যায়।

তৃতীয়, আপন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এর ফলে মানুষ নিজের মতামতকে বহাল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং যে তার বিরুদ্ধে বলে, তাকে মূর্খ জ্ঞান করে। এর চিকিৎসা হল, স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে বুদ্ধিমত্তা দান করা হয়েছে, তজ্জন্যে তাঁর শোকর করবে এবং চিন্তা করবে যে, তার মস্তিষ্কে সামান্য রোগ দেখা দিলে এমন পাগল হয়ে যেতে পারে, যার পেছনে বালকেরা হাসি-তামাশা করবে। এছাড়া নিজের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমাকে কম মনে করবে। মনে রাখবে, যার বুদ্ধিমত্তায় ক্রুটি থাকে, সে নিজে কখনও সেই ক্রুটি জানতে পারে না।

চতুর্থ, বংশমর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। যেমন কতক সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তি আত্মপ্রসাদবশত মনে করে, বংশ-গরিমা এবং পূর্বপুরুষদের দৌলতে তাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ মনে করে, সকল মানুষ তাদের বাঁদী-গোলাম। এর চিকিৎসা একথা চিন্তা করা যে, আমি কর্ম ও চরিত্রে বংশের কৃতী পুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। এ সত্ত্বেও

ধারণা করি যে, তাদের স্তরে পৌঁছে গেছি। এটা নিছক মূর্খতা। আমার গুরুজনদের মধ্যে তো আত্মপ্রসাদ ছিল না; বরং তারা নিজেদেরকে তুচ্ছ এবং সকল মানুষকে বড় মনে করতেন। আল্লাহর আনুগত্য ও উত্তম অভ্যাস দ্বারাই তো তারা গৌরব অর্জন করেছিলেন— বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। অতএব, আমাকেও সেই গৌরব অর্জন করতে হবে। গৌরব খোদাভীতি দ্বারা অর্জিত হয়। বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী, যে অধিক খোদাভীরু।

এ আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলে হারেছ ইবনে হেশাম, সোহায়ল ইবনে উমর ও খালেদ ইবনে উসায়দ সবিস্ময়ে বলল ঃ এই কাফ্রী ক্রীতদাস আযান দেয়! কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নিকট-আত্মীয়দেরকে সতর্ক করার আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি একজন একজন করে সকলকে নাম ধরে ডাকলেন। এমনকি বললেন ঃ হে মোহাম্মদ তনয়া ফাতেমা এবং সফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, তোমরা নিজের জন্যে নিজেই আমল কর। এটা মনে করো না যে, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব। যে ব্যক্তি এসব বিষয় অনুধাবন করবে, সে কখনও বংশমর্যাদার অহমিকায় লিপ্ত হবে না।

পঞ্চম, যালেম রাজা-বাদশাহের বংশধর প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এটাও চরম মূর্খতা এবং এর চিকিৎসা এই যে, সেই রাজা-বাদশাহদের যুলুম ও অত্যাচারের কথা চিন্তা করবে এবং এর কারণে তারা যে আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে দোযখের ইন্ধন হয়ে গেছে একথাও চিন্তা করবে। কিয়ামতে তাদের দুরবস্থার একটি চিত্রও কল্পনা করবে যে, তারা যে সব লোকের উপর যুলুম করেছিল, তারা তাদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং মাথার চুল ধরে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এটা কল্পনা করলে নিজেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং বলবে—শূকর ও কুকুরের সাথে আত্মীয়তা ভাল— এদের সাথে নয়। মোটকথা, যালেম রাজা-বাদশাহদের বংশধরকে যদি আল্লাহ যুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে

তারা তজ্জন্যে শোকর করবে। তাদের পিতৃপুরুষ মুসলমান হলে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ষষ্ঠ, অধিক সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা; যেমন হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বলেছিল, আজ আমরা পরাজিত হব না। এর প্রতিকার এটা ধ্যান করা যে, সকলেই আল্লাহর অক্ষম বান্দা। কেউ নিজের লাভ-লোকসানের মালিক নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অনেক ক্ষুদ্র দল আল্লাহর আদেশে বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে।

সপ্তম, ধন-সম্পদ নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার দেখলেন, জনৈক ধনী ব্যক্তির কাছে এক ফকীর এসে বসতেই সে তার কাপড় টেনে সংকুচিত হয়ে বসল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধনী ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি আশংকা কর যে, তার দরিদ্রতা তোমার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে যাবে? বলা বাহুল্য, এটা ছিল ধনের আত্মপ্রসাদ। এর চিকিৎসা এই যে, ধন-সম্পদের বিপদাপদ, এতে অপরের হকের আধিক্য, ফকীরদের ফযীলত এবং জান্নাতে তাদের অগ্রগামিতার কথা চিন্তা করবে। আরও চিন্তা করবে যে, ধন-দৌলত সকালে আসে, বিকালে চলে যায়। এর কোন মৌলিকতা নেই। অনেক কাফেরও অগাধ ধন-সম্পদের মালিক।

অষ্টম, আপন ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا

অর্থাৎ, যার জন্যে তার কুকর্মকে সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর সে তাকে সৎকর্ম দেখে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ, 'তারা ধারণা করে যে, তারা খুব সৎকর্ম করছে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদ এ উম্মতের শেষ যুগে হবে। এ সর্বনাশা বদ অভ্যাসের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, এর কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে, সেই খুব জ্ঞানী। অতঃপর সে তার মত ও পথ নিয়েই খুশী থাকে। দুনিয়াতে অনেক বেদআতী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি আপন আপন বেদআত ও পথভ্রষ্টতাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে। এর কারণ এটাই যে, তারা আপন ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত।

বেদআত নিয়ে আত্মপ্রসাদ অর্থ এই, যে বিষয়ের প্রতি খাহেশ ও মন ধাবিত হয়, তাকে ভাল ও সত্য বলে ধারণা করা। এ প্রকার আত্মপ্রসাদের চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে কঠিন। কেননা, যার মতামত ভ্রান্ত, সে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। সুতরাং যাকে রোগই মনে করে না, তার চিকিৎসা কিরূপে করবে? কিন্তু যারা সাধক ও বিভুজ্ঞানী তারা মূর্খতা সম্পর্কে অবগত করতে পারে এবং তা দূর করতে পারে। যদি সে মূর্খতা নিয়েও আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকে, তবে সাধকের কথায়ও কর্ণপাত করবে না; বরং সাধককেও দোষী মনে করবে। এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা কিরূপে হবে? তবে একটি মোটামুটি চিকিৎসা আছে। তা এই যে, প্রত্যেকেই আপন মতকে অভ্রান্ত মনে করবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, তার মতও ভ্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া বিরোধপূর্ণ মাযহাবসমূহ নিয়ে মাথা ঘামাবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি দেখেন ও শুনেন। তাঁর রসূল সত্য। যা কিছু তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে যাবতীয় পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভ্রান্তি

প্রকাশ থাকে যে, সাবধানতা ও সতর্কতা মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি আর বিভ্রান্তি ও অসাবধানতা দুর্ভাগ্যের সেতুবন্ধ। মানুষের প্রতি ঈমান ও মাগফেরাতের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার বড় কোন নেয়ামত নেই এবং বক্ষের উন্মুক্ততা ছাড়া ঈমান ও মাগফেরাত লাভের কোন উপায় নেই। এমনিভাবে কুফর ও গোনাহের চেয়ে বড় কোন অনিষ্ট নেই এবং আন্তরিক অন্ধত্ব ও মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু এই অনিষ্টের কারণ হয় না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অন্তর দান করা হয়েছে, তার শানে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ - اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَاغَرْبِيَّةٍ - يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ -

অর্থাৎ, কুলঙ্গির মত, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রক্ষিত। কাঁচের আবরণটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, যা প্রজ্বলিত হয় পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল থেকে, যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিমমুখীও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তৈল আলো দিচ্ছে। নূরের উপর নূর।

পক্ষান্তরে গাফেলদের অন্তরের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور -

অর্থাৎ, অতল সমুদ্রের মত, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার উপরে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, যখন সে হাত বের করে, তখন তা দেখে না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা সাবধানী লোকদের অন্তর ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং গাফেল ও বিভ্রান্তদেরকে অন্তশ্চক্ষু দান করেন না। তারা খেয়াল-খুশীকেই নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করে। মোটকথা, বিভ্রান্তি সকল দুর্ভাগ্যের মূল এবং সমস্ত বিনাশের উৎস বিধায় এর সেসব পথ বর্ণনা করা অত্যন্ত জরুরী, যেগুলো দিয়ে এই বিভ্রান্তি অধিক পরিমাণে আগমন করে।

গাফেল ও বিভ্রান্তদের শ্রেণী যদিও অনেক। কিন্তু চারটি শ্রেণীতে সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রথম, আলেম, দ্বিতীয়, আবেদ, তৃতীয়, সূফী এবং চতুর্থ, ধনাঢ্য ব্যক্তি। এসব দলেরও অনেক উপদল রয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তির কারণসমূহও বিভিন্নরূপ। উদাহরণতঃ কোন কোন লোক শরীয়তের অস্বীকৃত কর্মকে সৎকর্ম বলে মনে করে। যেমন, অবৈধ ধন-সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে তাতে কারুকার্য করে এবং একে সওয়াবের কাজ মনে করে। কেউ এ ব্যাপারে পার্থক্য করে না যে, নিজের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করে, না আল্লাহর জন্যে করে। কেউ জরুরী কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার কেউ ফরয কাজ বর্জন করে নফল কাজে মশগুল থাকে।

নিম্নে আমরা বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ উদাহরণসহ বর্ণনা করার পর সর্বপ্রথম আলেম তথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ ঃ বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতই যথেষ্ট।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে এবং বিভ্রান্ত

না করে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্তকারী শয়তান।

وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করেছ। মোহ তোমাদেরকে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ মৃত্যু) আসা পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং বিভ্রান্তকারী শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্ত করেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সাবধানী ব্যক্তিদের নিদ্রা কতই না চমৎকার।

মোটকথা, শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মূর্খতার নিন্দায় কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বর্ণিত আছে, সবই বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে দলীল। কেননা, বিভ্রান্তিও এক প্রকার মূর্খতা।

বিভ্রান্তির স্বরূপ হল শয়তানের ধোকার কারণে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, যা মনের খেয়ালখুশী ও খাহেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন অসার ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোন কল্যাণে বিশ্বাসী হয়, সে বিভ্রান্ত। অধিকাংশ মানুষই আপন কল্যাণের ধারণা রাখে। অথচ তাদের এ ধারণা ভুল। এ থেকে জানা গেল যে, অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্ত। তবে কোন কোন মানুষের বিভ্রান্তি অপরের তুলনায় স্পষ্টতর ও কঠোরতর হয়ে থাকে। কঠোরতর বিভ্রান্তি দু'প্রকার—কাফেরদের বিভ্রান্তি ও গোনাহগারদের বিভ্রান্তি। কোন কোন কাফেরকে পার্থিব জীবন বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং কতককে শয়তান। যারা পার্থিব জীবন দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা বলে—নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। সুতরাং পার্থিব জীবনই উত্তম এবং একেই অবলম্বন করা উচিত। তারা আরও বলে—ইহকাল নিশ্চিত এবং পরকাল সংশয়িত। নিশ্চিত বিষয় সংশয়িত বিষয়ের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকে। সংশয়ের কারণে নিশ্চিতকে বর্জন করা

ঠিক নয়। এ ধরনের প্রমাণাদি সম্পূর্ণ অসার এবং শয়তানের প্রমাণাদির অনুরূপ। সে বলেছিল—

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

অর্থাৎ, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। কারণ, তুমি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটির দ্বারা।

এ ধরনের বিভ্রান্তির প্রতিকার দু'প্রকারে সম্ভব। সত্যিকার ঈমান দ্বারা চিকিৎসা হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তিসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা—

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা অক্ষয় থাকবে।

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

– এবং পরকাল উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

–পার্থিব জীবন তো বিভ্রান্তির সামগ্রী বৈ নয়।

فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

–পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) যখন এসব আয়াতের বিষয়বস্তু অনেক কাফের দলের গোচরীভূত করেন, তখন তারা কালবিলম্ব না করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায় এবং কোন দলীলের অপেক্ষা করেনি। কেউ কেউ এসে আরয করত—আমরা আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্যিই কি আল্লাহ্ আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ হাঁ। এরপরই তারা মুসলমান হয়ে যেত। সাধারণের এই ঈমান ছিল বিভ্রান্তির

গণ্ডির বাইরে। এটা এমন, যেমন কোন বালক তার পিতার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, যদিও কারণ জানা থাকে না।

যুক্তি, প্রমাণের মাধ্যমে চিকিৎসা হল যেসব যুক্তির ভিত্তিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে যুক্তির মাধ্যমেই খণ্ডন করা। উদাহরণতঃ উপরে কাফেরদের একটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি উল্লিখিত হয়েছে যে, পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। আর নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। সুতরাং পার্থিব জীবনই অবলম্বন করা উচিত। এই যুক্তিতে দুটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য হচ্ছে পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। এ বাক্যটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি (অর্থাৎ নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম) সর্বাবস্থায় সত্য নয়। এর মধ্যেই ধোকা নিহিত। কেননা, নগদ ও বাকীর পরিমাণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমান সমান হলে তো বাক্যটি সত্য; কিন্তু যদি নগদ বাকীর তুলনায় পরিমাণে কম হয়, তবে বাকীই উত্তম। দেখ, যে কাফেররা উপরোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করে, তারাই ব্যবসায়ে এক টাকা নগদ এজন্যে বিনিয়োগ করে, যাতে দশ টাকা বাকী অর্জন করতে পারে। তখন তারা বলে না যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। সুতরাং বাকীর আশায় নগদ এক টাকা বিনষ্ট করা উচিত নয়। এমনিভাবে চিকিৎসক যদি রোগীকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ফলমূল খেতে নিষেধ করে, তবে রোগের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে তা পরিত্যাগ করে। অথচ এসব খাদ্যের স্বাদ নগদ এবং রোগ-যন্ত্রণা ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যত সুখের আশায় জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে এবং কারও কল্পনায় একথা আসে না যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম।

সারকথা এই যে, পরবর্তী সময়ে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তবে তা এক টাকা নগদের চেয়ে উত্তম। এখন দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনকে তুলনা করলে দুনিয়ার জীবন 'কিছুই না' বলা যায়। উদাহরণতঃ মানুষ বেশীর চেয়ে বেশী একশ' বছর বাঁচে। এ বয়সকে আখেরাতের বয়সের সাথে তুলনা করলে তা তার এক কোটি ভাগের একের সমানও হয় না। সুতরাং দুনিয়াতে কেউ এক ছেড়ে দিলে আখেরাতে লাখ লাখ; বরং অগণিত পাবে। আর যদি প্রকারের দিকে লক্ষ্য করা যায়, তবে দুনিয়ার আনন্দে সর্বপ্রকার মালিন্য, কষ্ট ও বিপদ নিহিত থাকে। কিন্তু আখেরাতের আনন্দ, নির্ঝঞ্ঝাট, স্বচ্ছ ও পাক-পবিত্র। মোটকথা, নগদ বাকীর চেয়ে

উত্তম—একথাটিই ভ্রান্ত ও ধোকা। এ ভ্রান্তির কারণ হচ্ছে শুনা কথায় বিশ্বাস করে নেয়া এবং এটা চিন্তা না করা যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম তখন, যখন উভয়ের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য সমান হয়।

কাফেরদের আরও একটি যুক্তি হল নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ ইহকাল সন্দিগ্ধ বিষয় অর্থাৎ আখেরাতের চেয়ে উত্তম। এ যুক্তিটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর ঠুনকো। কেননা, এর উভয় বাক্যই ভিত্তিহীন। উদাহরণতঃ নিশ্চিত বিষয় সন্দেহযুক্ত বিষয়ের চেয়ে উত্তম—এটা তখন সত্য, যখন উভয়টি সমান হয়— অন্যথায় নয়। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ী ব্যক্তি কষ্ট নিশ্চিতরূপেই করে এবং তার লাভ সন্দেহযুক্ত থাকে। বিদ্যার্থী বিদ্যান্বেষণে নিশ্চিতই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করে এবং তার ইপ্সিত ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি সন্দিগ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে রোগী ঔষধের তিক্ততা অবশ্যই অনুভব করে। এতদসত্ত্বেও তার আরোগ্য লাভের বিষয়টি থাকে অনিশ্চিত। এসমস্ত ক্ষেত্রে সকলেই সন্দেহযুক্ত বিষয়ের জন্যে নিশ্চিত বিষয়কে বর্জন করে। ব্যবসায়ী বলে, যদি আমি ব্যবসা না করি, তবে কষ্ট করব এবং ভুখা থাকব। ব্যবসায়ে পরিশ্রম কম এবং মুনাফা বেশী। রোগী বলে, ঔষধের তিক্ততা রোগের পরিণাম অর্থাৎ মৃত্যু ভয়ের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহই করে, তার বলা উচিত— জীবনের গোণাগুণতি কয়েকটি দিন সবর করা আমার জন্যে সেসব বিষয়ের তুলনায় উত্তম, যা আখেরাত সম্পর্কে মানুষ বলে থাকে। কেননা, ধরে নেয়া যাক, যদি আখেরাত মিথ্যাই হয়, তবে তাতে আমার ক্ষতি কি? জীবনের কয়েক দিনের বিলাসই তো নষ্ট হবে। জীবন লাভের পূর্বেও তো কতকাল অতিবাহিত হয়েছে, তখন আমি বিলাস করিনি। সুতরাং ধরে নেব, আমি অস্তিত্বই লাভ করিনি। পক্ষান্তরে যদি আখেরাত সত্য হয়ে যায়, তবে অনন্তকাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, যা আমি সহ্য করতে পারব না।

হযরত আলী (রাঃ) জনৈক খোদাদ্রোহীকে বলেছিলেন ঃ তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে আমাদের উভয়ের কোন ক্ষতি নেই। আর যদি আমার কথা সত্য হয়ে যায়, তবে আমি মুক্তি পাব, আর তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ) এরূপ বলার কারণ এটা ছিল না যে, معاذ الله তিনি

আখেরাত সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; বরং খোদাদ্রোহীর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার আখেরাত অস্বীকার করা নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

কাফেরদের যুক্তির দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে আখেরাত সন্দিগ্ধতা। মূলত এটাও ভুল; বরং আখেরাত ঈমানদারদের মতে সুনিশ্চিত। এর দলীল দ্বিবিধ। এক, ঈমান, বিশ্বাস এবং পয়গম্বর ও সুধীজনের অনুকরণ। পয়গম্বর ও সুধীজনদের অনুসরণ করলে আখেরাত সম্পর্কিত সকল বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের। এটা এমন, যেমন কোন রোগী তার রোগের ঔষধ কি, জানে না। এরপর সকল চিকিৎসক ও কবিরাজ এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল যে, এ রোগের ঔষধ অমুক গাছের মূল। এখন রোগী চিকিৎসকদের মুখে একথা শুনামাত্রই নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেবে এবং তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ চাইবে না। আখেরাত নিশ্চিত হওয়ার দ্বিতীয় দলীল পয়গম্বরগণের জন্যে ওহী এবং ওলীগণের জন্য ইলহাম। এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, নবী করীম (সাঃ) কেবল জিবরাঈলের কাছ থেকে শুনে আখেরাতের বিশ্বাসী হয়েছিলেন। বরং পয়গম্বরগণের জন্যে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ হুবহু খুলে দেয়া হয় এবং তাঁরা সেই স্বরূপকে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা এমনভাবে দেখে নেন, যেমন আমরা চর্মচক্ষু দ্বারা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে দেখি। অতএব, তাঁরা যেসব সংবাদ দেন, স্বচক্ষে দেখে সংবাদ দেন— কেবল শুনে দেন না। সুতরাং আখেরাত সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর বিশ্বাস ও আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন নিজের কথাবার্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানাবলী অমান্য করে এবং কামনা-বাসনা ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে সৎকর্ম বর্জন করে, তখন তারাও আখেরাত সম্পর্কিত উপরোক্ত বিভ্রান্তিতে কাফেরদের সাথে শরীক হয়ে যায়। কেননা, তারাও পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়। অবশ্য মূল ঈমানের কারণে তারা চিরন্তন আযাব থেকে বেঁচে যাবে এবং কিছুকাল দোযখ ভোগ করার পর মুক্তি পাবে। তবে তারা যে বিভ্রান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ,

তারা স্বীকার করে যে, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক থাকা এবং দুনিয়াকে অবলম্বন করার কারণে কেবল ঈমান চিরন্তন সাফল্য লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোরআন শরীফ এর সাক্ষী। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির জন্যে, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, অতঃপর সৎপথে থাকে।

মোটকথা, যারা দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট, এর আনন্দ-উল্লাসে নিমজ্জিত এবং মৃত্যুকে খারাপ মনে করে, তারাই বিভ্রান্ত, কাফের হোক কিংবা মুসলমান। এ পর্যন্ত কাফেরদের বিভ্রান্তি ও তার প্রতিকার বর্ণিত হল।

এখন গোনাহগারদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বলে—আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। আমরা তাঁর ক্ষমা আশা করি। অতঃপর এই আশার উপর ভিত্তি করে তারা সৎকর্মও বর্জন করে। তারা এর নাম রাখে "রাজা" অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আশাবাদ। কারণ তারা জানে "রাজা" ধর্মের একটি প্রশংসনীয় বিষয়। মাঝে মাঝে তাদের এই আশাবাদের একটি দলীল হয়ে থাকে তাদের পিতৃপুরুষদের সৎকর্মপরায়ণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া; যেমন সৈয়দ হওয়া। খোদাভীতি ও পরহেযগারীতে পূর্বপুরুষদের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, আল্লাহর কাছে তারা বাপ-দাদার চেয়েও বুযুর্গ। কেননা, বাপ-দাদারা খোদাভীতি ও পরহেযগারী সত্ত্বেও ভয়ে কম্পমান থাকতেন; কিন্তু তারা সকল প্রকার পাপাচার সত্ত্বেও নির্ভীক হয়ে থাকে। এটা চরম বিভ্রান্তি। তাদের মনে শয়তান এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, যে কাউকে মহব্বত করে, সে তার বংশধরকেও মহব্বত করে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাদের বাপ-দাদাকে প্রিয় জানতেন, তাই তোমাদেরকেও প্রিয় জানবেন। অতএব, তোমাদের সৎকর্ম করার প্রয়োজন কি? অথচ তারা একথা স্মরণ করে না যে, হযরত নূহ (আঃ) নিজের পুত্রকে নৌকায় নিজের সঙ্গে তুলতে চেয়েছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন—

رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ

অর্থাৎ, 'পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত।'

কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর হল—

يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

অর্থাৎ, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের পিতার জন্যে দোয়া করেন; কিন্তু তা না-মনযুর হয়। আমাদের নবী করীম (সাঃ) আপন জননীর কবর যিয়ারত এবং তার জন্যে এস্তেগফারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়; কিন্তু মাগফেরাত চাওয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সেমতে তিনি জননীর কবরের কাছে পৌঁছে শুধু অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। মোটকথা, উপরোক্ত ধারণা ধোকা ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা কেবল অনুগতদেরকেই ভালবাসেন এবং গোনাহগারকে অপছন্দ করেন। যেমন, পিতা অনুগত হলে তার সন্তানরা গোনাহগার হলেও আল্লাহ পিতাকে অপছন্দ করেন না। তেমনি পিতাকে মহব্বত করার কারণে তার গোনাহগার পুত্রকেও মহব্বত করেন না। এ ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে—

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

অর্থাৎ, একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, পিতার তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে সেও মুক্তি পেয়ে যাবে, সে এমন, যেমন কেউ মনে করে যে, পিতা পেট ভরে খেলে তারও পেট ভরে যাবে এবং সে পানি পান করলে তারও তৃষ্ণা মিটে যাবে। অথচ এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অবান্তর। এ থেকে জানা গেল যে, তাকওয়া ফরযে আইন। এতে পিতার তাকওয়া পুত্রের জন্যে যথেষ্ট হবে না। কিয়ামতের দিন তাকওয়ার ভিত্তিতেই বিচার হবে। তবে যে ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ অধিক হবে না, তার জন্যে সুপারিশের অনুমতি হবে এবং সুপারিশ তার জন্যে লাভজনক হবে।

এখন প্রশ্ন হয়, গোনাহগার ব্যক্তি বলে থাকে, আল্লাহ ক্ষমাশীল। আমি তার ক্ষমা আশা করি। তার এ দুটি বাক্যই তো নির্ভুল এবং মনে লাগে।

এতে বিভ্রান্তি কিসের? জওয়াব এই যে, শয়তান মানুষকে এমনি ধরনের বাক্য দ্বারা বিভ্রান্ত করে, যা বাহ্যত গ্রহণযোগ্য এবং ভেতরে প্রত্যাখ্যাত। বলা বাহুল্য, বাহ্যিক কথা সুন্দর না হলে মন বিভ্রান্ত হবে কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই উক্তির রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে অনুগত করে, মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে আমল করে এবং নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয় এবং আল্লাহর কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। সুতরাং বাস্তবে এই হচ্ছে আমলহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, শয়তান যার নাম পাল্টে "রাজা" দিয়েছে। মূর্খরা এতেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। অথচ "রাজা" শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা এভাবে করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করে। অর্থাৎ তারাই আশা করার যোগ্য।

হযরত হাসান (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন কোন লোক বলে– আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি এবং আমল করি না। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের খামখেয়ালী। যে ব্যক্তি কোন বস্তু আশা করে, সে তার অন্বেষণ করে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভয় করে, সে তার কাছ থেকে দূরে পালায়। মুসলিম ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ আমি একদিন এত জোরেশোরে সেজদায়, গেলাম যে, আমার সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। এটা দেখে কেউ বলল ঃ আমরা তো আল্লাহর কাছে মাগফেরাত আশা করি। এজন্যে আমল করি না। মুসলিম জওয়াব দিলেন ঃ এটা কস্মিনকালেও "রাজা" তথা আশা নয়। মানুষ যে বিষয় আশা করে, তা তালাশ করে।

এর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি আশা করে যে, সে সন্তানের

পিতা হবে; অথচ সে এখনও বিবাহই করেনি কিংবা বিবাহ্ করে থাকলেও স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। এরূপ ব্যক্তির সন্তানের পিতা হওয়ার আশা খামখেয়ালী নয় তো কি? এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও রহমত আশা করে এবং তার ঈমানই নেই কিংবা ঈমান থাকলেও সৎকর্ম করেনি কিংবা সৎকর্মের সাথে সাথে অসৎকর্মও ছাড়েনি, সেও খামখেয়ালীতে লিপ্ত।

জানা উচিত যে, আশা দু'জায়গায় করা ভাল। এক, আপাদমস্তক গোনাহগার ব্যক্তি। তার মনে যখন তওবা করার কল্পনা জাগে, তখন শয়তান তাকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তোর তওবা কবুল হবে না। এতে শয়তানের উদ্দেশ্য থাকে, তাকে নিরাশ করে দেয়া। এমতাবস্থায় নৈরাশ্য দূর করে আশা করা ওয়াজিব। সে স্মরণ করবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী এবং তওবা একটি এবাদত, যা দ্বারা গোনাহ্ দূর হয়ে যায়। কোরআন শরীফে এর সমর্থন রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ -

অর্থাৎ, বলে দিন, হে আমার বান্দা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এস।

অতএব, মানুষ যখন তওবা সহকারে ক্ষমার আশা করবে, তখন তাকে আশাবাদী বলা উচিত হবে। নতুবা গোনাহ অব্যাহত রেখে মাগফেরাতের আশা করা খামখেয়ালী। দুই, যে ব্যক্তি নফল এবাদতে ত্রুটি করে এবং কেবল ফরয এবাদত করেই ক্ষান্ত থাকে, সে যদি নিজের জন্যে আল্লাহর সেই সমস্ত নেয়ামত ও ওয়াদা আশা করে, যা তিনি সৎকর্মপরায়ণদেরকে দিয়েছেন এবং এই আশার আনন্দে নফল এবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করে, তবে তার এই আশা উত্তম। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ○

অর্থাৎ, অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা আপন নামাযে বিনয় নম্র, যারা অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা আপন যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী ফেরদাউসের, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।

সুতরাং প্রথমোক্ত আশা দ্বারা তওবার প্রতিবন্ধক নৈরাশ্য খতম হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় আশা দ্বারা এবাদতে স্ফূর্তির অন্তরায় অলসতা দূর হয়ে যায়। সারকথা, যে আশা তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে বলা হয় "রাজা"। আর যে আশা এবাদতে অলসতার কারণ হয়, তাকে বলা হয় বিভ্রান্তি ও খামখেয়ালী। আজকাল অধিকাংশ লোক আমলে অলসতা করে। তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করে না। এর কারণ এটাই যে, তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে, যাকে "রাজা" মনে করে নিয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—এই উম্মতের শেষ যুগে বিভ্রান্তি প্রবল হবে। বাস্তবে তাই দেখা যায়। প্রথম যুগের লোকেরা অব্যাহতভাবে এবাদত করতেন। তারা যা-ই আমল

করতেন, তাদের অন্তর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকত; অথচ তারা সারারাত আল্লাহর এবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এতদসত্ত্বেও নির্জনে নিজের জন্য কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা এর বিপরীত। এখন মানুষ গোনাহে ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি বিমুখ থাকে। এরপরও তারা শংকাহীন ও প্রশান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তারা বলে— আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার উপর আস্থা রাখি এবং তাঁর রহমত ও মাগফেরাত আশা করি। তারা যেন দাবী করে আমরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ এতটুকু জানি, যতটুকু পয়গম্বর ও সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না।

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এক সময় আসবে, যখন পরনের বস্ত্রের ন্যায় কোরআন মানুষের অন্তরে পুরাতন হয়ে যাবে। মানুষের কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষাই থেকে যাবে এবং এর সাথে ভয় মোটেই থাকবে না। কোন সৎকাজ করলে তারা বলবে, এটা কবুল হবে এবং কোন অসৎকাজ করলে বলবে এটা ক্ষমা পেয়ে যাব। এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মানুষ ভয়ের জায়গায় লালসাকে ব্যবহার করবে এবং কোরআনে উল্লিখিত ভয়ের আয়াত সম্পর্কে মূর্খ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা খৃস্টানদের এ অবস্থাই বর্ণনা করে বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُلَنَا -

অর্থাৎ, তাদের পেছনে আগমন করল কিতাবের উত্তরাধিকারীগণ, যারা তুচ্ছ জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

বিভ্রান্তদের প্রকার চতুষ্টয়

(১) শিক্ষিতদের বিভ্রান্তি ঃ একদল শিক্ষিত লোক প্রচুর ধর্মীয় ও যৌক্তিক বিদ্যা শিক্ষা করে এবং তা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ থেকে বিরত রাখে না এবং এবাদত পালন করে না। তারা আরও ধারণা করে– আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মর্যাদাশীল। আল্লাহ্ আমাদের মত শিক্ষিতদেরকে আযাব দেবেন না; বরং সাধারণ লোকের পক্ষে আমাদের সুপারিশ কবুল করবেন। বাস্তবে এটা তাদের বিভ্রান্তি। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জানা যাবে, বিদ্যা দু' প্রকার। এক, মোকাশাফা; অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলীকে জানা, যাকে পরিভাষায় 'মারেফত' বলা হয়। দুই, মোয়ামালা; অর্থাৎ, হালাল-হারাম, ভাল ও মন্দ চরিত্র, তার প্রতিকার এবং মন্দ চরিত্র থেকে আত্মরক্ষার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। আমল তথা কর্ম করার উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যা অর্জন করা হয়। আমল উদ্দেশ্য না হলে বিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। যে বিদ্যার উদ্দেশ্য হয় আমল, সেই আমলই সেই বিদ্যার মূল্য হয়ে থাকে।

উদাহরণতঃ জনৈক রোগী একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক তাকে কতগুলো বনজ ঔষধ, সেগুলোর প্রাপ্তিস্থান, চূর্ণকরণ, মিশ্রিতকরণ, প্রস্তুত প্রণালী, সেবনবিধি ইত্যাদি বিস্তারিত বলে দিল। রোগী সেগুলো শুনে সুন্দর হস্তাক্ষরে একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে নিল। অতঃপর বাড়ী ফিরে সে প্রত্যেহ সে ব্যবস্থাপত্র পাঠ করতে শুরু করল। তা পাঠ করে শুনাল। কিন্তু ব্যবস্থা অনুযায়ী বাজার থেকে সেগুলো কিনে ঔষধ তৈরি করল না এবং সেবনও করল না। অথচ তার কাছ থেকে শুনে অনেকেই সেই ঔষধ তৈরি করে সেবন করল এবং রোগের হাত থেকে মুক্তি পেল। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির রোগমুক্তি আশা করা যায় কি? তার বিদ্যা তার কোন উপকারে আসবে কি? হাঁ, সে যদি পয়সা খরচ করে উপাদানগুলো বাজার থেকে কিনে ঔষধ তৈরি করে এবং যেভাবে সেবন করা দরকার, সেভাবে সেবন করে, সাথে সাথে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বস্তু আহার করা

থেকে বিরত থাকে, তবে তার রোগমুক্তি আশা করা যায়। এতেও আরোগ্য লাভ না করার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু মোটেই ঔষধ সেবন না করে আরোগ্য আশা করা খামখেয়ালী বৈ কিছু নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ফেকাহ, এবাদতের বিধিবিধান ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু নিজে আমল করে না, গোনাহসমূহ জেনেও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে না, মন্দ চরিত্র অধ্যয়ন করে এবং নিজেকে পরিশোধিত করে না এবং সচ্চরিত্রতার জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু নিজে তা দ্বারা ভূষিত হয় না, সে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত। আল্লাহ পাক বলেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

অর্থাৎ, যে নিজেকে পরিশোধিত করবে, সেই সফল হবে।

এখানে একথা বলা হয়নি যে, যে পরিশোধনের জ্ঞান অর্জন করবে, সে সফল হবে। এক্ষেত্রে শয়তান আরও একটি ধোকা উপস্থিত করে। তা এই যে, জ্ঞানার্জনের সাথে ঔষধের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, ঔষধের জ্ঞান রোগ দূর করে না ঠিক; কিন্তু জ্ঞানার্জন খোদায়ী নৈকট্য ও সওয়াব লাভের কারণ হয়ে থাকে। সেমতে বিদ্যার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীসে আমল ছাড়াই বিদ্যা অর্জনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শয়তানের এই ধোকায় পড়ে যায়। কেননা, এটা মানসিক প্রবণতার অনুকূল। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানকে এই জওয়াব দেয় যে, তুই আমাকে বিদ্যার ফযীলত মনে করিয়ে দিচ্ছিস এবং অসৎ আমলহীন বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেসব শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলো বেমালুম ভুলিয়ে দিচ্ছিস। দেখ, আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

অর্থাৎ, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত।

অন্য আয়াতে আছে—

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا -

অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা পালন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত গাধার মত, যে রাশি রাশি কিতাবের বোঝা বহন করে।

কুকুর ও গাধার সমতুল্য হওয়ার চেয়ে বড় অপমান আর কি হবে? হাদীসে আছে, যার বিদ্যা বেশী এবং সুপথপ্রাপ্তি কম, সে আল্লাহ থেকে দূরেই চলে যায়। আরও আছে, আমলহীন আলেমকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার অন্ত্রসমূহ বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন ঘানি ঘুরায়, তেমনি সে অগ্নিতে ঘুরবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মূর্খের দুর্ভোগ একবার। সে লেখাপড়া করেনি। আল্লাহর মরযী হলে সে লেখাপড়া করত। কিন্তু বিদ্বানের দুর্ভোগ সাতবার। অর্থাৎ তার বিদ্যা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে এবং তাকে বলা হবে— বিদ্যা অর্জন করে তুমি কি আমল করেছ? আল্লাহর নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করেছ? রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব সেই শিক্ষিত ব্যক্তির হবে, যার শিক্ষা তার কোন উপকারে আসেনি; অর্থাৎ, সে আমল করেনি। এ ধরনের আরও অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো অসৎ বিদ্বান ব্যক্তির মরযীর অনুকূল নয়। তাই শয়তান এগুলো স্মরণ করায় না।

আরও একদল শিক্ষিত লোক আমল করে; কিন্তু কেবল বাহ্যিক এবাদত পালন করে এবং গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে। তারা অন্তরের নিন্দনীয় দোষসমূহের প্রতি মোটেই নজর দেয় না। উদাহরণতঃ অহংকার, হিংসা, রিয়া, জাঁকজমকপ্রীতি, সুখ্যাতি অন্বেষণ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে না। কেউ কেউ তো এগুলোকে দোষ বলেও মনে করে না। তারা এসব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, সামান্যতম রিয়াও শিরক। যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না। হিংসা পুণ্য কাজকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে। এগুলো ছাড়াও মন্দ চরিত্রের অধ্যায়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ শ্রেণীর শিক্ষিত লোক নিজের বাহ্যিক আকৃতি খুব সুন্দর করে, কিন্তু অন্তরের আকৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। অথচ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাইরের আকৃতি ও অর্থ-সম্পদ দেখেন না; বরং অন্তর ও আমল দেখেন। অন্তরই মূল এবং মুক্তি এর নিরাপত্তার

উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থাৎ, কিন্তু যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ অন্তর নিয়ে।

এই প্রকার শিক্ষিতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃতদের কবর, যা বাহ্যত খুব সুসজ্জিত; কিন্তু অভ্যন্তরে গলিত লাশ অথবা অন্ধকার কক্ষ। গোনাহের মূল শিকড় হচ্ছে মন্দ স্বভাব, যা অন্তরের অভ্যন্তরে প্রোথিত। অন্তর থেকে এগুলো সাফ না করলে বাহ্যিক এবাদত দ্বারা কি ফল পাওয়া যাবে? উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির গায়ে খোস-পাঁচড়া দেখা দিল। চিকিৎসক তাকে মালিশ করার এবং পান করার ঔষধ বলে দিল, যাতে মালিশের ঔষধ দ্বারা ত্বকের উপকার হয় এবং সেবনের ঔষধ দ্বারা মূল শিকড় বিনষ্ট হয়। কিন্তু রোগী কেবল মালিশের ঔষধ লাগিয়েই ক্ষান্ত রইল এবং সেবনের ঔষধ ব্যবহার করল না; বরং এমন নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করল, যা দ্বারা খোস-পাঁচড়া আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় এই রোগীর খোস-পাঁচড়া কোনদিন দূর হবে না যদি হাজারো বারও গায়ে ঔষধ মালিশ করে। কেননা, শিকড় তো ভিতরে অবস্থিত। সেটা দূর হলে এটাও দূর হবে।

আরেক দল শিক্ষিত লোক এসব অভ্যন্তরীণ দোষ সম্পর্কে জানে এবং এগুলো যে শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্জনীয়, তাও জানে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে যেহেতু বড় মনে করে, তাই মনে করে যে, এসব দোষ তাদের মধ্যে নেই। তাদের স্তর আল্লাহর কাছে এমন নয় যে, এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা নেবেন। এগুলো হল সাধারণ মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়– তাদের মত শিক্ষিতদেরকে নয়। এরপর যখন তাদের কাছ থেকে অহংকার, জাঁকজমক, আস্ফালন ও গর্বের চিহ্ন ফুটে উঠে, তখন বলে— এটা অহংকার নয়; বরং ধর্মের ইযযত রক্ষার স্পৃহা এবং বিদ্যার মহিমা প্রকাশ। কারণ, আমরা যদি নিকৃষ্ট পোশাক পরি এবং মজলিসে নিচে বসি, তবে ধর্মের শত্রুরা উপহাস করবে, এতে আমাদের অপমান তথা ধর্মের অপমান হবে। এই বিভ্রান্তরা জানে না যে, তাদের শত্রু তো বাস্তবে শয়তান, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। শয়তান

তাদের কার্যকলাপ দেখে খুব হাস্য ও উপহাস করে। তারা একথাও জানে না যে, রসূলে করীম (সাঃ) ধর্মের মদদ কিভাবে করেছিলেন এবং কাফেরদেরকে কিভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন! তাঁর সাহাবীগণ কতটুকু বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন! দারিদ্র্য ও অসহায়তাকে কিভাবে অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিলেন। সিরিয়ায় হযরত উমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট পোশাক পরিধানের আপত্তি উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ইযযত দান করেছেন। অতএব, আমরা অন্য কোন বস্তুতে ইযযতের আকাঙ্ক্ষা করি না।

কখনও শিক্ষিত ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থ রচনা করে। সে মনে করে আমি আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা প্রচার করছি যাতে সাধারণ মানুষের উপকার হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য থাকে উৎকৃষ্ট রচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নাম-যশ ও সুখ্যাতি অর্জন করা। এটা লক্ষ্য না হলে অন্য কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থ থেকে আসল গ্রন্থকারের নাম মিটিয়ে তদস্থলে নিজের নাম লিখে দেয়, তবে আসল গ্রন্থকার এটা অপছন্দ করে কেন? সে তো জানে যে, এই গ্রন্থ দ্বারা মানুষের যে উপকার হবে, তার সওয়াব সে-ই পাবে। আল্লাহর কাছেও সে-ই গ্রন্থকার– দাবীদার ব্যক্তি নয়।

আরেক দল শিক্ষিত লোক বেদআতীদের সাথে ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকার জন্য কালাম শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তারা বিরোধী দলের আপত্তিসমূহ অন্বেষণ করার কাজে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজে সর্বপ্রযত্নে নিয়োজিত থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন উক্তি মুখস্থ করে নেয়। তাদের বিশ্বাস, মানুষের কোন আমল ঈমান ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ আমাদের বিতর্ক না শিখে এবং কালাম শাস্ত্রের দলীলসমূহ না জানে, সে পর্যন্ত ঈমান শুদ্ধ হয় না। তারা আরও মনে করে, আল্লাহকে কেউ আমাদের চেয়ে বেশী চিনে না। যে আমাদের মাযহাবে বিশ্বাসী নয় এবং আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে বেঈমান। এই প্রকার তর্কবিদ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত— এক শ্রেণী পথভ্রষ্ট এবং অপর শ্রেণী সত্যপন্থী। পথভ্রষ্ট তারা, যারা হাদীসের বিপরীত দিকে আহ্বান করে। আর সত্যপন্থী তারা, যারা হাদীস ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু বিভ্রান্তি উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান।

পথভ্রষ্ট দলের বিভ্রান্তি এই যে, তারা তাদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে গাফেল এবং এতেই নিজেদের মুক্তি মনে করে। এদের মধ্যেও অনেক দল আছে, যারা একে অপরকে কাফের বলে। সত্যপন্থী শ্রেণীর বিভ্রান্তি এই যে, তারা বিতর্ক ও মোনাযারাকে নেহায়েত জরুরী ও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ মনে করে। তারা এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, তাদের মত বিতর্ক ও তালাশ না করা পর্যন্ত কারও ধর্ম পূর্ণতা লাভ করবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলকে বাহাস ও প্রমাণ ব্যতিরেকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে পূর্ণ ঈমানদার নয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা সমগ্র জীবন বিতর্কানুষ্ঠান, চিত্তাকর্ষক বাক্যাবলী আয়ত্তকরণ এবং বেদআতীদের আপত্তি খণ্ডনে অতিবাহিত করে দেয় এবং নিজের অন্তরের কোন খোঁজ-খবর নেয় না। ফলে বাহ্যিক গোনাহ ও অভ্যন্তরীণ ক্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পায় না। তাদের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তবে অবশ্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা দেখতে পেত, যে যুগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা অনেক বেদআতী ও প্রবৃত্তির পূজারী দেখেছেন; কিন্তু আপন জীবন ও ধর্মকে বিতর্কবাণের লক্ষ্যস্থল করেননি; বরং কখনও এ সম্পর্কে আলোচনা পর্যন্ত করেননি। নেহায়েত প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ীই কথা বলেছেন, যাতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা জেনে যায়। তারা যখন কোন গোমরাহকে তার গোমরাহীতে পীড়াপীড়ি করতে দেখেছেন, তখন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তার সাথে শত্রুতা রেখেছেন— জীবনভর কথা কাটাকাটি করেননি।

পূর্ববর্তী মনীষীরা বলেছেন— সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়া সুন্নত এবং দাওয়াতের মধ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হওয়াও সুন্নত। আবূ ওসামা বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে জাতিকে হেদায়াত দান করা হয়, তারা পথভ্রষ্ট হয় না যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে এসে দেখলেন, তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ক্রোধের আতিশয্যে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ

ধারণ করল। তিনি বললেন ঃ

اَلِهٰذَا بُعِثْتُمْ اُمِرْتُمْ اَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَا اُمِرْتُمْ بِهٖ فَاعْمَلُوْا اَوْ مَانُهِيْتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

অর্থাৎ, তোমরা কি এ জন্যেই প্রেরিত হয়েছ? তোমরা আদিষ্ট হয়েছ যে, আল্লাহর কিতাবের কতক অংশকে কতক অংশের দ্বারা প্রহার কর? দেখ, তোমরা যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা কর আর যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত হও।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্ক সভায় বসেননি তাদেরকে অভিযুক্ত করার জন্যে অথবা নিশ্চুপ করার জন্যে অথবা কোন আপত্তির জওয়াব দেয়ার জন্যে অথবা নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করার জন্যে। তিনি কেবল কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। এর বেশী বাহাস করেননি। কেননা, বেশী কথাবার্তার কারণে তাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত হত এবং নানা রকমের আপত্তি ও সন্দেহ দেখা দিত, যা অন্তর থেকে মুছত না। আল্লাহ না করুন, তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করতে অক্ষম ছিলেন না। বরং বিজ্ঞ ও সাবধানী ব্যক্তিমাত্রই বিতর্ককে পছন্দ করে না। সুতরাং আমাদের ততটুকু বিতর্কই করা উচিত, যতটুকু সাহাবায়ে কেরাম ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে করেছেন। তাঁরা সমগ্র জীবন এসব বিতর্কে ব্যয় করে দেননি। এছাড়া যে বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাতে আমরা এতটুকু মনোনিবেশ করব কেন? কোন বেদআতীর সাথে বিতর্ক করলে দেখা যায় যে, সে বিতর্কের ফলস্বরূপ বেদআত পরিত্যাগ করে না; বরং বিদ্বেষবশত তার বেদআত আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় এসব বিরুদ্ধবাদীর সাথে বিতর্ক করার তুলনায় আত্মসংশোধনে জোর দেয়াই উত্তম। এটা তখন, যখন ধরে নেয়া যায় যে, আমাদেরকে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু যেখানে নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান আছে, সেখানে কাউকে বিতর্কের মাধ্যমে সুন্নতের দিকে দাওয়াত দেয়া যেন এক

সুন্নত বর্জন করে অন্য সুন্নত পালন করার নামান্তর।

আরেক দল শিক্ষিত লোক ওয়ায-নসীহতে ব্যস্ত থাকে। তাদের মধ্যে উচ্চমর্যাদাশীল তারা, যারা অন্তরের গুণাবলী অর্থাৎ, খোদাভীতি, আশা, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, বিশ্বাস, আন্তরিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়বস্তু মানুষকে শুনায়। তারা এই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, তারা যেহেতু এসব গুণ বর্ণনা করে, তাই তারা নিজেরা প্রথমে এসব গুণে গুণান্বিত। অথচ আল্লাহর কাছে তারা এসব গুণে গুণান্বিত নয়। যদি অল্প বিস্তর কিছু গুণ তাদের মধ্যে থাকেও, তবে প্রতিটি সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও কিছু না কিছু থাকে। সুতরাং তার ফযীলত কোথায়? তারা যখন এখলাসের গুণ বর্ণনা করে, তখন বর্ণনার মধ্যেও এখলাস করে না। যখন রিয়ার উল্লেখ করে, তখন তারাও রিয়ামুক্ত হয় না। সংসার অনাসক্তির বর্ণনাও এজন্যে করে যে, তারা নিজেরা সংসারের প্রতি গভীর আসক্ত। মোটকথা, তারা বাহ্যত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অপরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে; কিন্তু নিজেরা দূরে সরে যায়। এ অবস্থা হচ্ছে সেসব ওয়াযকারীর, যাদের ওয়ায নিষ্কলঙ্ক এবং বর্ণনা নির্ভুল অর্থাৎ, যারা কোরআন-হাদীস ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের তরীকা অনুযায়ী ওয়ায করে।

কিন্তু আরেক শ্রেণীর ওয়াযকারী ওয়াযের অপরিহার্য নিয়ম-পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত। আজকালকার সকল ওয়াযকারীই এমনি ধরনের। আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এমন বিরল কেউ থাকতে পারে। কিন্তু আমি এমন কাউকে জানি না। এ ধরনের ওয়ায়েয মানুষকে নতুন কথা শুনানোর জন্যে অনেক মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বিবেক ও আইন বহির্ভূত কথাবার্তা বর্ণনা করে। কেউ কেউ সাজানো-গুছানো ও ছন্দময় বাক্য ব্যবহার করে এবং প্রমাণস্বরূপ বিরহ ও মিলনের কবিতা আবৃত্তি করে, যাতে মানুষ ভাবাতিশয্যে চীৎকার করে উঠে। এরা মানুষরূপী শয়তান। নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ করে। আরেক দল ওয়ায়েয দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের উক্তি হুবহু মুখস্থ করে নেয় এবং এসব উক্তির সঠিক অর্থ না বুঝে মজলিসে বর্ণনা করে। আর মনে করে যে, আল্লাহ থেকে আত্মরক্ষা না করলেও আল্লাহর মাগফেরাত তাদের সাথে রয়েছে।

মোটকথা, এই শেষ যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি গণনার বাইরে। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি বিভ্রান্তি উল্লেখ করা হল।

(২) সংসারত্যাগী ও এবাদতকারীদের বিভ্রান্তি ঃ এরাও কয়েকটি দলে বিভক্ত । কারও নামাযে, কারও তেলাওয়াতে, কারও হজ্জে, কারও জেহাদে এবং কারও সংসার অনাসক্তিতে বিভ্রান্তি হয়। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও বিভ্রান্ত হয় না। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ফরয ছেড়ে নফল ও মোস্তাহাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। উদাহরণতঃ কেউ উযু করতে গেলে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয়বশত সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। এমনকি, যে পানি শরীয়তের দৃষ্টিতে পাক, তাতেও তাদের খটকা থাকে এবং নাপাকীর দূরবর্তী সম্ভাবনাকেও তারা নিকটবর্তী মনে করতে থাকে। অথচ হালাল ভক্ষণের ক্ষেত্রে তারাই নিকটবর্তী সম্ভাবনাকে দূরবর্তী জ্ঞান করে। বরং মাঝে মাঝে অকৃত্রিম হারামও খেয়ে ফেলে। যদি তারা পানির সাবধানতাকে খাওয়ার মধ্যে ব্যবহার করত, তবে এটা সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারার অনুরূপ হত। হযরত উমর (রাঃ) একবার জনৈক খৃস্টান মহিলার ঘটি থেকে পানি নিয়ে উযু করে নেন; অথচ নাপাকীর সম্ভাবনা প্রকট ছিল। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর এতদূর সাবধানতা ছিল যে, অনেক হালাল বস্তুও হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে বর্জন করতেন। এই বিভ্রান্তদের কেউ কেউ উযু-গোসলে পানির অপচয় করে; অথচ এব্যাপারে অকাট্য নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ এতই সন্দেহপ্রবণ যে, উযু করতে করতে জামাআত খতম হয়ে যায় অথবা নামাযের সময়ই চলে যায়। সময় থাকলেও তারা ভ্রান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আসলে শয়তান মানুষকে খুব উত্তম পন্থায় এবাদত থেকে বিরত রাখে। এধরনের ধারণা সৃষ্টি করে যে, মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোন কোন এবাদতকারীর উপর নামাযের নিয়ত করার সময় সন্দেহ প্রবল হয়ে যায়। শয়তান তাদেরকে নিয়ত ঠিক করে নেয়ার সময় দেয় না; বরং এত পেরেশান করে যে, হয় জামাআত খতম হয়ে যায়, না হয় নামাযের সময় চলে যায়। যদি তারা তাকবীর বলে তাহরীমা বেঁধে নেয়, তবে নামাযের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। কখনও "আল্লাহু

আকবার” বলার মধ্যে এত সন্দেহ করে যে, সাবধানতার আতিশয্যে তাকবীরের শব্দ বদলে যায়। নামাযের শুরুতে এ অবস্থা হয়, এরপর সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে এবং মনকে উপস্থিত করে না। তারা বিভ্রান্তির কারণে মনে করে যে, এসব কাণ্ড আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। কতক লোকের উপর "আলহামদু" ও অন্যান্য সকল ওযীফার মাখরাজসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সন্দেহ প্রবল থাকে। তারা সর্বদাই এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে এবং একেই অত্যাবশ্যক মনে করে অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাই করে না। তারা আয়াতের অর্থ, তার উপদেশ ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না। এটা বড় বিভ্রান্তি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার আদেশ দিয়েছেন, যেমন তারা দৈনন্দিন কথাবার্তা বলে। অতএব, এতে এহেন বানোয়াট কোত্থেকে এল? তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তিকে একটি বার্তা বাদশাহের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হল। সে বাদশাহের দরবারে পৌঁছে বার্তার শব্দসমূহের সঠিক উচ্চারণে সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট করল এবং এক এক শব্দকে ঠিক করতে গিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করল। কিন্তু বার্তার বিষয়বস্তু কি ছিল এবং বাদশাহের দরবারের শিষ্টাচার কি কি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। এরূপ ব্যক্তির শাস্তি পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক ঘাস কাটার ন্যায় কোরআন পাঠ করে। তারা মাঝে মাঝে একদিনে এক খতম করে। তারা মুখে কোরআন পাঠ করে; কিন্তু অন্তরে নানা প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচরণ করতে থাকে। অর্থের দিকে তো কোন মনোযোগই থাকে না যে শাস্তিবাণী ও উপদেশবাণী দ্বারা অন্তর কিছুটা প্রভাবিত হবে।

একদল লোক রোযা রাখার জন্যে পাগল থাকে। তারা সর্বদা অথবা পবিত্র দিনগুলোতে রোযা রাখে। কিন্তু নিজের জিহ্বাকে গীবত থেকে, অন্তরকে রিয়া থেকে, পেটকে হারাম থেকে এবং কথাবার্তাকে বাজে বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে রাখে না। সারাদিন অনর্থক বকবক করতে থাকে। এতদসত্ত্বেও নিজেকে উত্তম মনে করে। যা ফরয তা করে না এবং নফল

নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাও আবার যেমন করা উচিত, তেমন করে না। এটা প্রকাশ্য ধোকা।

কিছু লোক হজ্জকর্মে বিভ্রান্ত। তারা অপরের হক ও ঋণ আদায় না করে, পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই এবং হালাল পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই হজ্জ করতে বের হয়ে পড়ে। পথিমধ্যে নামায ও অন্যান্য ফরয কর্ম বিনষ্ট করে এবং অশ্লীলতা ও কলহ-বিবাদ থেকে বিরত থাকে না। এরপর যখন বাড়ী ফিরে আসে, তখন অন্তরে কুচরিত্রতা ও বদস্বভাবের ভাণ্ডার থাকে। এতদসত্ত্বেও তারা হজ্জ করাকে উত্তম মনে করে।

(৩) সূফীগণের বিভ্রান্তি ঃ সূফীগণের মধ্যেও অনেক শ্রেণী রয়েছে। তাদের উপর বিভ্রান্তি প্রবল থাকে। এক শ্রেণীর সূফীর রীতি এই যে, তারা সাচ্চা সূফীগণের ন্যায় পোশাক, আকার-আকৃতি, ভাষা, আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও পরিভাষা তৈরি করে এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে তাদের অনুরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ তারা রাগরাগিণী শ্রবণ করে, ভাবাতিশয্যে নর্তন-কুর্দন করে, জায়নামাযে মাথানত করে চিন্তাশীলদের ন্যায় বসে, দীর্ঘশ্বাস নেয় এবং ক্ষীণস্বরে কথা বলে। এতেই তারা বিভ্রান্তিবশত মনে করে যে, সূফী হয়ে গেছে। অথচ তারা নিজেদেরকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত করে না এবং অন্তরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গোনাহ থেকে পবিত্র করে না, যা সাচ্চা সূফীগণের মধ্যে মামুলী বিষয় বলে পরিগণিত হয়। কেউ এসব বিষয় আয়ত্ত করে নিলেও নিজেকে সূফী বলে গণ্য করতে পারে না এবং বড় বড় কথা বলতে পারে না। এমতাবস্থায় যারা হারাম ও সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের বাছ-বিচার করে না, টাকা-পয়সা দেখলেই লাফিয়ে পড়ে, সামান্য বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কেউ সামান্য বিপরীত কথা বললেই তার মানহানি করতে উদ্যত হয়, তারা কিরূপে সূফী হতে পারে? কিয়ামতের দিন যখন এই মেকী সূফীর দল আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, যিনি বাহ্যিক ছেড়াবাস নয়; বরং অন্তরের অবস্থা দেখেন, তখন তাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

আরেক শ্রেণীর সূফীর আবার যেনতেন পোশাক পরতে রুচিতে বাধে; কিন্তু সূফী হওয়ার বাসনাও প্রবল। সূফীগণের পোশাক ছাড়া যেহেতু সূফী

হওয়া যায় না, তাই তারা উৎকৃষ্ট বস্ত্রের খন্ড খন্ড জোড়া দিয়ে বিচিত্র ধরনের পোশাক তৈরি করে, যা রেশমী বস্ত্রের চেয়েও মূল্যবান বেশী। তারা মনে করে যে, পোশাকে তালি লাগিয়েই তারা সূফী হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সূফীগণ তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। তাই তারাও উৎকৃষ্ট বস্ত্রকে টুকরা টুকরা করে তালির মত করে নেয়। অথচ এটা বুঝা কঠিন যে, মূল্যবান বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেলাই করে নিয়েই তারা পূর্ববর্তী সূফীগণের অনুরূপ হয়ে গেল কিরূপে? বলা বাহুল্য, তাদের এই খামখেয়ালী সকল বিভ্রান্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, তারা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করে, সুস্বাদু খাবার খায়, যালেম ও পাপাসক্তদের অর্থ দু'হাতে গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে না; আন্তরিক গোনাহের কথা নাই বা বলা হল। এরপরও তারা সূফী বলে থাকে এবং নিজেদেরকে উত্তম মনে করতে থাকে। তাদের অনিষ্ট সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। কেননা, যারা তাদের অনুসরণ করে, তারা তাদের মতই বরবাদ হয়ে যায়। আর যারা অনুসরণ করে না, তাদের বিশ্বাস সূফী সম্প্রদায়ের প্রতিই শিথিল হয়ে যায়। সকলকেই তারা এরূপ মনে করে। ফলে, সত্যিকার সূফীগণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে তারা দ্বিধা করে না। বলা বাহুল্য, এটা এই তথাকথিত সূফীদের কুকর্মেরই ফল।

আরেক শ্রেণীর সূফী মারেফত জ্ঞানের দাবী করে। তারা বলে, আমরা সকল মকাম ও হাল অতিক্রম করেছি, সর্বদা হকের মোশাহাদা করি এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। অথচ তারা কেবল এসব বিষয়ের নাম ও শব্দই শুনেছে—এগুলোর স্বরূপ, শর্ত, আলামত ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা মারেফতওয়ালাদের কিছু বিপরীতধর্মী কথাবার্তা শিখে নেয় এবং সেগুলোই গেয়ে ফিরে। তাদের মতে এগুলো অত্যধিক উচ্চস্তরের কথা। ফলে, তারা আবেদ ও আলেমদেরকে মোটেই যোগ্য মনে করে না। আবেদদের সম্পর্কে বলে, এরা পরিশ্রমী শ্রমিক। আর আলেমদের সম্পর্কে বলে, এরা আল্লাহ থেকে আড়ালে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ধরনের সূফীরাই মুনাফিক, বদকার, নির্বোধ ও মূর্খ। এরা না শিক্ষা গ্রহণ করে, না চরিত্র সংশোধন করে এবং না অন্তরের হেফাযত করে।

কেউ কেউ বলে, বাহ্যিক আমল ধর্তব্য নয়। আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে দেখেন। আমাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বতে পাগলপারা। দুনিয়াতে আমরা দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ আর অন্তর অসীমের আস্তানা প্রদক্ষিণরত। আমরা সর্বসাধারণের স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি। সুতরাং দৈহিক আমল দ্বারা আত্মসংশোধনের প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমরা মারেফতে শক্তিশালী, তাই কামনা ও খায়েশ আমাদেরকে আধ্যাত্মপথে বাধা দিতে পারে না। তাদের এসব কথাবার্তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা পয়গম্বরগণের স্তরও অতিক্রম করে গেছে।

কতক সূফী দাবী করে যে, তারা আল্লাহর আশেক ও তাঁর মহব্বতের জালে আটকা পড়েছে। সম্ভবত তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করে, যেগুলো বেদআত অথবা কুফর হওয়া বিচিত্র নয়। তারা মারেফতের পূর্বেই মহব্বতের দাবী করে। অথচ কতক কাজ এমন করে, যা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। যেমন আল্লাহর কাজের উপর নিজের খাহেশকে অগ্রাধিকার দেয়া, লোকলজ্জার কারণে কোন কোন কাজ না করা ইত্যাদি। এগুলো যে মহব্বতের পরিপন্থী, সেকথা তারা জানেই না। কতক লোক আহার, পোশাক ও বাসস্থানের বেলায় হালাল তালাশ করে না, অন্যান্য ক্ষেত্রে হালালের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি না কেবল হালাল অন্নের জন্যে সন্তুষ্ট হবেন এবং না কেবল সকল আমল করে হালাল অন্ন না খাওয়ার জন্যে সন্তুষ্ট হবেন; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হালাল অন্ন খাওয়াসহ সকল এবাদত পালন করা জরুরী এবং সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যে মনে করে, সামান্য বিষয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হবে, সে বিভ্রান্ত।

আধ্যাত্ম পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যত প্রকার বিভ্রান্তি হতে পারে, সেগুলো পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্যে বিরাট পুস্তক দরকার। এলমে মোকাশাফার বিশদ বর্ণনা ছাড়া সবগুলো বিভ্রান্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ এলমে মোকাশাফা বর্ণনা করার অনুমতি নেই।

(৪) বিত্তশালীদের বিভ্রান্তি ঃ একদল বিত্তশালী লোক মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল ইত্যাদি দর্শনীয় কীর্তি নির্মাণে তৎপর থাকে। তারা এগুলোর মধ্যে নিজেদের নাম খোদাই করে লিখে দেয়, যাতে মৃত্যুর

পরও তাদের স্মৃতি অম্লান থাকে। এ কাজ করার পর তারা মনে করে এর মাধ্যমে তারা মাগফেরাতের উপযুক্ত হয়ে গেছে। অথচ দু'কারণে তারা বিভ্রান্ত। এক, তারা যুলুম, ঘুষ, সূদ ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা-পয়সা দ্বারা এসব তৈরি করে। সুতরাং হারাম ভক্ষণের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য। দুই, তারা রিয়া ও সুখ্যাতির জন্যে অর্থ ব্যয় করে। তাদের উচিত ছিল এই অর্থ উপার্জন না করা। উপার্জন করে যখন তারা গোনাহগার হল, তখন তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং যে অর্থ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া দরকার ছিল, মালিক পাওয়া না গেলে তার ওয়ারিসকে, ওয়ারিস না থাকলে মুসলমানদের জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় করা দরকার ছিল। এ ব্যাপারে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করাই অধিক জরুরী মনে হয়। কিন্তু তারা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে না; বরং সুখ্যাতি কুড়ানোর জন্যে দালান-কোঠা নির্মাণে তৎপর হয়ে যায়। সুতরাং জনকল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং রিয়া, সুখ্যাতি এবং প্রশংসা কুড়ানোই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, দালান-কোঠা তৈরি কর, কিন্তু তাতে নিজের নাম খোদাই করো না, তবে কখনও তা মেনে নেবে না এবং দালান-কোঠা নির্মাণে সম্মত হবে না। যদি মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হত এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই হত, তবে নাম খোদাই করার কি প্রয়োজন ছিল?

আরেক দল ধনী লোক হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করে মসজিদে ব্যয় করে দেয়। অথচ তার আশেপাশে কিংবা শহরে এমন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোক বাস করে, যাদেরকে দেয়া মসজিদে দেয়ার চেয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেক ভাল। কিন্তু তারা মসজিদেই দেয়। কারণ, এতে মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি হয়। এধরনের বিত্তশালী দাতা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। এছাড়া মসজিদে চিত্রাংকন ও কারুকার্য করা নিষিদ্ধ। নামাযীদের ধ্যান সেদিকে বিভক্ত হয়। দৃষ্টি সেদিকেই পড়ে। অথচ নামাযের উদ্দেশ্য অনুনয়-বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতি। অন্তর কারুকার্যে মশগুল থাকলে সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে এবং এর শাস্তি যে কারুকার্য করে, তার উপর বর্তাবে। অথচ সে ধারণা করে থাকে যে, সৎকাজ করেছে, যা ওসীলা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির। কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহর ক্রোধের যোগ্য হবে।

একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যগণ তাঁর খেদমতে আরয করল ঃ দেখুন, এই মসজিদটি কি চমৎকার! তিনি বললেন ঃ হে আমার উম্মত, আমি সত্য বলছি, আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদের ইটের উপর ইট কায়েম রাখবেন না। এই মসজিদ নির্মাণকারীদের গোনাহের কারণে সকলকে বরবাদ করে দেবেন। আল্লাহর কাছে না সোনা-রূপার মূল্য আছে, না এসব ইটের, যেগুলোকে তোমরা চমৎকার বলছ। বরং তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে সৎ অন্তর, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীকে আবাদ রাখেন। যখন সৎ অন্তর থাকবে না, তখন পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করে দেবেন।

হযরত আবু দারদার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা মসজিদকে চাকচিক্যময় করবে এবং কোরআনকে সোনা-রূপা পরিধান করাবে, তখন তোমাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল এসে বললেন ঃ সাত হাত উঁচু করবেন এবং কারুকার্য ও চিত্রাংকন করবেন না। মোটকথা, এই ধনীরা একটি মন্দ কাজকে ভাল মনে করে এবং তারই উপর ভরসা করে। এটা তাদের বিভ্রান্তি।

আরেক দল ধনী টাকা-পয়সা ব্যয় করে এবং ফকীর-মিসকীনকে দান করে। কিন্তু এই দানের জন্যে এমন জায়গা তালাশ করে, যেখানে অধিক পরিমাণে লোক উপস্থিত থাকে। এছাড়া এমন ফকীর খোঁজে, যে কৃতজ্ঞ হয় এবং জনসমক্ষে দাতার স্তুতি কীর্তন করে। তারা গোপনে দান করাকে ভাল মনে করে না। কোন ফকীর তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে গোপন করলে তাকে তারা অপরাধী ও অকৃতজ্ঞ মনে করে। তারা কখনও হজ্জের পর হজ্জ করে; কিন্তু দরিদ্র প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রাখে। একারণেই হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ শেষ যুগে এমন লোক হবে, যারা বিনা কারণেও হজ্জ করবে। ধনী হওয়ার কারণে তারা সফরকে কষ্টকর মনে করবে না। তারা বঞ্চিত অবস্থায় গৃহে ফিরবে। অর্থাৎ, সওয়াব কিছুই পাবে না। নিজেরা তো আরামদায়ক যানবাহনে বসে সফর করবে, প্রতিবেশীর খবরও নেবে না।

আবূ নছর (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত বিশর ইবনে হারেছের

কাছে বসে বলল ঃ আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের জন্যে তোমার কাছে কি পরিমাণ অর্থ আছে? সে জওয়াব দিল ঃ দু'হাজার দেরহাম। বিশর জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি— দেশভ্রমণ, কাবাগৃহের আগ্রহ, না আল্লাহর সন্তুষ্টি? লোকটি আরয করল ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি বললেন ঃ যদি গৃহে বসে এ দু'হাজার দেরহাম ব্যয় করে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে যাও এবং সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির ব্যাপারে তোমার দৃঢ় বিশ্বাসও অর্জিত হয়ে যায়, তবে তুমি কি করবে? লোকটি বলল ঃ তবে এভাবেই সন্তুষ্টি অর্জন করব। তিনি বললেন ঃ তাহলে যাও, এই দেরহামগুলো দশ প্রকার ব্যক্তিকে দিয়ে দাও— ঋণগ্রস্তকে দাও, যে তার ঋণ পরিশোধ করবে, অভাবগ্রস্তকে দাও, যে তার অভাব মোচন করবে, বাল-বাচ্চাদারকে দাও, যে তার বাল-বাচ্চাদেরকে পালন করবে, অনাথ শিশুদের দেখাশোনাকারীকে দাও, যে তাদেরকে খুশী করবে। যদি মনে চায়, তবে এসব প্রকারের এক এক ব্যক্তিকে দাও। আমার এরূপ বলার কারণ এই যে, কোন মুসলমানের মন খুশী করা, মযলুমের ডাকে সাড়া দেয়া এবং দুর্বলের সাহায্য করা ফরয হজ্জের পর একশ' হজ্জের চেয়েও উত্তম। কাজেই এখন যাও এবং আমি যা বললাম– তাই কর। নতুবা মনের কথা বলে দাও। লোকটি বলল ঃ আমার মন তো ভ্রমণ করতেই ইচ্ছুক। অগত্যা হযরত বিশর মুচকি হেসে বললেনঃ যখন টাকা-পয়সা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সন্দেহযুক্ত পথে সঞ্চিত হয়ে যায়, তখন মন চায় কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কসম করেছেন যে, তিনি মুত্তাকীদের আমল ছাড়া কারও আমল কবুল করবেন না।

আরেক দল লোক কৃপণতাবশত অর্থকড়ি সঞ্চয় করে এবং সৎকর্ম ও এবাদত এমন করে, যাতে মোটেই অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যেমন দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত্রিতে জাগরণ করে কিংবা কোরআন খতম করে, এরাও বিভ্রান্ত। কেননা, মারাত্মক কৃপণতা তাদের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থ ব্যয় করে প্রথমে এরই মূলোৎপাটন করা উচিত ছিল। এর পরিবর্তে যা তারা করে, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও পরনের কাপড়ে সাপ ঢুকে গেছে। ফলে, সে মৃত্যুর

মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সর্দির ঔষধ প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত। বল, যাকে সাপে দংশন করবে, সর্দির ঔষধ দ্বারা তার কি উপকার হবে? এ কারণেই হযরত বিশরের কাছে কেউ বলেন ঃ অমুক ধনী ব্যক্তি নামায, রোযা খুব করে। তিনি বললেন ঃ তার অবস্থার সাথে যে কাজের মিল ছিল, তা তো সে ছেড়ে দিয়েছে এবং যে কাজ অন্যের জন্যে উপযুক্ত ছিল, তা অবলম্বন করেছে। তার কর্তব্য ছিল নিরন্নকে অন্ন দেয়া এবং ফকীর-মিসকীনকে খয়রাত দেয়া। নিজে ক্ষুধার্ত থাকার চেয়ে দান-খয়রাত তার জন্যে উত্তম ছিল।

আরেক দল ধনী এত বেশী কৃপণ যে, ধন-সম্পদের মধ্য থেকে যাকাত ছাড়া অন্য কিছু দান করে না। যাকাতেও এমন নিকৃষ্ট মাল দেয়, যা নিজের কাছে রাখতে ঘৃণা করে। তারা যাকাত দিতে গিয়ে এমন ফকীর বেছে নেয়, যে তাদের খেদমত করে অথবা ভবিষ্যতে যার কাছ থেকে খেদমত আশা করে কিংবা যে কোন বড় লোকের সুপারিশ নিয়ে আসে। তাকে দান করার উদ্দেশ্য থাকে সেই বড় লোকের প্রিয়ভাজন হওয়া। এসব বিষয় নিঃসন্দেহে খারাপ নিয়তের পরিচায়ক। যারা এরূপ করে, তারা বিভ্রান্ত। কারণ, এরূপ করেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ফরমাবরদার বলে ধারণা করে; অথচ তারা বদকার, গোনাহগার। আল্লাহর এবাদত করে অপরের কাছে বিনিময় চায়।

এগুলো ছাড়া বিত্তশালীদের মধ্যে আরও অসংখ্য বিভ্রান্তি দেখা যায়। নমুনা স্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল। আরও একদল লোক আছে, যারা কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই নয়; বরং জনসাধারণের এমনকি ফকীরদের মধ্যেও বিস্তৃত। তারা ওয়াযের মজলিসে উপস্থিত থাকাকেই মুক্তির জন্যে যথেষ্ট মনে করে। ওয়াযের মজলিসে যাওয়াকে তারা একটি প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, ওয়ায শুনলেই সওয়াব পাওয়া যাবে এবং তদনুযায়ী আমল করা জরুরী নয়। এটা তাদের খামখেয়ালী। কেননা, ওয়ায মাহফিলের মাহাত্ম্য এ কারণেই যে, এর মাধ্যমে সৎকর্মের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ এ কারণেই ভাল যে, এতে মানুষ আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যদি ওয়ায দ্বারা দুর্বল আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা আমলে উদ্বুদ্ধ করে না, তবে এরূপ ওয়াযের কোন উপকারিতা নেই। এ

ধরনের শ্রোতা যখন ওয়ায়েযের মুখে ওয়ায মাহফিলের ফযীলত এবং কান্নাকাটি করার সওয়াব শুনে, তখন নারীদের ন্যায় কান্না শুরু করে দেয়। আবার কোন সময় কোন ভয়ংকর কথা শুনে হাতের উপর হাত মেরে হায় আল্লাহ! মায়াযাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ! ইত্যাদি বলা ছাড়া আর কিছুই করে না। তাদের ধারণা, তারা যা কিছু করে সবই ভাল। অথচ এটা প্রকাশ্য বিভ্রান্তি। তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন রোগী ব্যক্তি ঔষধালয়ে যাতায়াত করে এবং সেখানে ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা শোনে অথবা কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি এমন মজলিসে যায়— যেখানে সুস্বাদু খাদ্যের আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, এতে না রোগীর রোগ দূর হবে, না ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। এমনিভাবে ওয়ায-মাহফিলে এবাদত ও সৎকর্মের বর্ণনা শুনলে এবং আমল না করলে আল্লাহর কাছে কোন উপকার পাওয়া যাবে না।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরে যে সকল বিভ্রান্তি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো থেকে কেউই মুক্ত নয় এবং এ সকল বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব। সুতরাং বিভ্রান্তির এ বর্ণনা থেকে মানুষের মধ্যে এক প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সে আমল করতে উৎসাহ পায় না এবং হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এর জওয়াব এই যে, মানুষ যখন সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন সে নিরাশও হয় এবং সম্ভবপর কাজকেও অসম্ভব মনে করতে থাকে। কিন্তু যখন সে সত্যিকার সাহস ও ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়, তখন অভীষ্ট পর্যন্ত পৌঁছার জন্য স্বীয় সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে গোপন পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। উদাহরণতঃ উড়ন্ত পাখীকে ইচ্ছা করলে দূরত্ব সত্ত্বেও নিচে নামিয়ে আনা যায় অথবা সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থানকারী মৎস্যকে উপরে তুলে আনতে চাইলে আনা যায় অথবা পাহাড় ও পর্বতের ভিতর থেকে সোনা ও রূপা আহরণ করতে চাইলে খনন করে আহরণ করা যায় অথবা বনের স্বাধীন ও মুক্ত হাতীকে ধরে পোষ মানাতে চাইলে মানানো যায়, বিষধর সাপ ও অজগরকে ধরে খেলা দেখাতে চাইলে দেখানো যায়, যদি কেউ গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও দৈর্ঘ-প্রস্থ জানতে চায়, তবে জ্যামিতি শাস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা জানতে পারে। মোটকথা, মানুষ দুঃসাধ্য কর্মসমূহের উপায় বের করার ব্যাপারে ওস্তাদ। সে প্রত্যেক কাজের পদ্ধতি ও তার সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান

অর্জন করতে পারে। এসব উপায় ও পদ্ধতি মানুষ কেবল পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আবিষ্কার করে। সুতরাং সে যদি পারলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় এবং তার সামনে একটি মাত্র কাজ থাকে অর্থাৎ অন্তরকে সোজা করা, তবে এ কাজে সে অক্ষম হবে কেন এবং এটা অসম্ভব হবে কেন? না, মানুষের সাহস ও হিম্মতের সামনে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো এ কাজে অক্ষম হননি। যারা তাদের উত্তমরূপে অনুসরণ করেছে, তারাও এ কাজে হার মানেনি। এখনও যে ব্যক্তি সত্যিকার ইচ্ছা ও অটল সাহসের অধিকারী হবে, সে কখনও অপারগ হবে না; বরং পার্থিব উপায়সমূহ আবিষ্কার করার কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে হয়, তার এক-দশমাংশও এতে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি বিষয় মানুষের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়— বুদ্ধি, শিক্ষা ও মারেফত। বুদ্ধি এমন একটি জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মৌলিক নূর বা আলো— যা দ্বারা মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ উদঘাটন করতে সক্ষম। মানুষের মূল সৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তাও থাকে এবং নির্বুদ্ধিতাও থাকে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বিভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই মূল সৃষ্টিতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা থাকা জরুরী। জন্মগতভাবে এরূপ না হলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে মূল বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান থাকলে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা তাকে শানিত করা যায়। এ থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই হাদীসে বলা হয়েছে—

تَبَارَكَ الَّذِي قَسَمَ الْعَقْلَ بَيْنَ عِبَادِهِ اَشْتَاتًا - اِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَسْتَوِي عَمَلُهُمَا وَبِرُّهُمَا وَصَوْمُهُمَا وَصَلٰوتُهُمَا وَلٰكِنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْعَقْلِ كَالذَّرَّةِ فِي جَنْبِ اُحُدٍ مَا قَسَمَ اللّٰهُ بِخَلْقِهِ حَظًّا اَفْضَلَ -

অর্থাৎ, মহিমান্বিত সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে বুদ্ধিমত্তা বণ্টন করেছেন। নিশ্চয় দু'ব্যক্তির আমল তথা নামায, রোযা ইত্যাদি সমান সমান হয়। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তার একটি কণাতেও উহুদ পাহাড়সম ব্যবধান থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেননি।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করল— যদি কেউ দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, হজ্জ ও উমরা পালন করে এবং দান-খয়রাত, জেহাদ ইত্যাদি পুণ্য কাজ যথারীতি সম্পাদন করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কি মর্তবা হবে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ সে বুদ্ধিমত্তার মাপ অনুযায়ী সওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি শুধালেন ঃ তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত, চরিত্র ও গুণ-গরিমার কথা বলছি। তিনি বললেন ঃ আগে বল তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতার কারণে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য ভুল করে বসে। কিয়ামতের দিন মানুষ বুদ্ধি পরিমাণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় বিষয় মারেফতের অর্থ হচ্ছে চারটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। প্রথমত, নিজের সম্পর্কে জানতে হবে যে, সে এই পৃথিবীতে একজন অচেনা মুসাফির এবং আল্লাহর মারেফত ও দীদারই তার জন্যে উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তৃতীয়ত, দুনিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। চতুর্থত, আখেরাত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করতে হবে। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের কারণে বান্দার অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। আখেরাতের জ্ঞান অর্জিত হলে তৎপ্রতি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিমুখতা হাসিল হবে এবং তার কাছে সর্বাধিক জরুরী কাজ তাই হবে, যা আখেরাতে উপকারী। যখন আখেরাতের কাজ করার ইচ্ছা প্রবল হবে, তখন সকল বিষয়ে তার নিয়ত সঠিক হবে। ফলে, বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহর মারেফত ও নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ফলস্বরূপ যখন খোদায়ী মহব্বত প্রবল হবে, তখন তৃতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন হবে; অর্থাৎ আল্লাহর পথ কিভাবে অতিক্রম করা উচিত, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহর নিকটবর্তী করে, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এছাড়া পথের বিপদাপদ ও বিনাশকারী বাধাসমূহ জানা। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা এসব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করছি। যেমন প্রথম খণ্ডে এবাদতের শর্ত ও বাধাবিপত্তি লিপিবদ্ধ করেছি। এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বাধাবিপত্তিগুলো অতিক্রম করতে হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্পরিক আদান-প্রদানের রহস্য এবং যেসব আদান-প্রদান অপরিহার্য, সেগুলো বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী আমল করতে হবে। আলোচ্য খণ্ডে আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে অর্থাৎ, নিন্দনীয় স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিন্দনীয় স্বভাবগুলো জানতে হবে এবং প্রতিকারের পন্থাও আয়ত্ত করতে হবে। এসব বিষয় জেনে নিলে বর্ণিত সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

তওবা

প্রকাশ থাকে যে, গোনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আধ্যাত্ম পথের সূচনা এবং ওলীগণের অমূল্য সম্পদ। সাধকগণ প্রথমে এ পথেই পা বাড়ান। যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত, তাদের জন্যে এ প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে সৎপথে অটল থাকার চাবিকাঠি। নৈকট্যশীলদের জন্যে এটাই আল্লাহর মনোনয়ন লাভের দিকচক্রবাল। পরগম্বরগণের জন্যে বিশেষত আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর জন্যে এটাই সৌভাগ্য লাভের উৎস।

মানুষ আদম সন্তান বিধায় তার তরফ থেকে গোনাহ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যদি পিতা ক্ষতিপূরণ করে থাকে এবং দোষ সংশোধনে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তবে পুত্রেরও উচিত উভয় বিষয়ে পিতার অনুরূপ হওয়া।

এখন হযরত আদম (আঃ)-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায়, তিনি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর পর অনুশোচনার দাবানলে দগ্ধীভূত হয়েছেন এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত লজ্জাশ্রু প্রবাহিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কেবল নাফরমানী করার ব্যাপারে তাঁকে আপন পথপ্রদর্শক ও অনুসৃত মনে করে এবং তওবার ধারে-কাছেও না যায়, তবে সে নিতান্তই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। বরং মূল কথা হচ্ছে কেবল কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণের বৈশিষ্ট্য আর শুধু অকল্যাণের দাস হয়ে থাকা শয়তানের স্বভাব। বস্তুত অকল্যাণে জড়িয়ে পড়ার পর কল্যাণের দিকে ফিরে আসা মানুষের ধর্ম। কারণ, মানুষের মজ্জায় কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে ফিরে এসে অকল্যাণের ক্ষতিপূরণ করে নেয়, বাস্তবে সে-ই

মানুষ। যদি সে গোনাহ্ করার পর তওবা করে, তবে তার আদম সন্তান হওয়ার প্রমাণ শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে যদি সে গোনাহ্ ও নাফরমানীর উপর অটল থাকে, তবে সে শয়তানের সাথে আপন বংশগত সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। আর শুধু সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ফেরেশতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয়। কেননা, তার খমীর তথা মৌলিক উপাদানের মধ্যে পাপ-পুণ্য এমন শক্তভাবে মিশ্রিত রয়েছে যে, তার আলাদা হওয়া দু'উপায়েই সম্ভবপর— অনুতাপের উত্তাপ দ্বারা অথবা দোযখের আগুন দ্বারা। বলা বাহুল্য, দোযখের আগুন সহ্য করার তুলনায় দুনিয়াতে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হওয়া মানুষের জন্যে সহজতর। সুতরাং গোনাহ্ করার পর মানুষের উচিত দ্রুত তওবার দ্বারস্থ হওয়া। নতুবা মৃত্যুর পর এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শরীয়তে তওবার এই গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এর স্বরূপ, সময়কাল, শর্ত, কারণ, লক্ষণ, ফলাফল, বাধাবিপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা জরুরী। নিম্নে চারটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তওবার স্বরূপ

জানা উচিত যে, তিনটি ধারাবাহিক বিষয়ের সমন্বয়ে তওবা অস্তিত্ব লাভ করে। এক— জ্ঞান, দুই— অনুশোচনা এবং তিন— বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গোনাহ্ বর্জন করা এবং অতীত দিনসমূহের ক্ষতিপূরণ করে নেয়া। এই তিন বিষয়ের সমষ্টিকে পরিভাষায় তওবা বলা হয়। প্রায়শ কেবল অনুশোচনাকেই তওবা বলা হয়। আর জ্ঞানকে তার ভূমিকা এবং গোনাহ্ বর্জনকে ফলাফল আখ্যা দেয়া হয়। এদিক দিয়েই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন اَلنَّدَامَةُ تَوْبَةٌ — অনুশোচনা হচ্ছে তওবা। কেননা, অনুশোচনার অবশ্যই কোন কারণ থাকবে এবং পরবর্তীতে এর কিছু ফলাফলও প্রকাশ পাবে। সুতরাং অনুশোচনা যা মধ্যবর্তী বিষয় ছিল, তাই আপন কারণ ও ঘটনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। এদিক দিয়েই জনৈক বুযুর্গ তওবার সংজ্ঞায় বলেন ঃ তওবা হচ্ছে সাবেক গোনাহের জন্যে অনুশোচনার অনলে অন্তরের বিগলিত হওয়া। এ সংজ্ঞায় কেবল মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই মর্মবেদনার পরিষ্কার উল্লেখ করে বলেছেন যে, তওবা একটি অগ্নি, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয় এবং একটি বেদনা, যা অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কেউ কেউ গোনাহ্ বর্জনের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তওবা হচ্ছে অনাচারের পোশাক খুলে ফেলে সরলতা ও হৃদ্যতার শয্যা পাতা। সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে বদলে দেয়ার নাম তওবা। এটা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নয়। সম্ভবত এ সংজ্ঞায় তৃতীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তওবার প্রথম বিষয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানা যে, গোনাহের ক্ষতি অসামান্য এবং অনেক গোনাহ মানুষ ও তার প্রেমাস্পদ আল্লাহর মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের ফলস্বরূপ অন্তরে অনুশোচনার উৎপত্তি হয়।

তওবার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্যক জেনে নেয়ার পর এটা কঠিন হবে না যে, অন্যরা তওবার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছে, তার কোনটিতেই উপরোক্ত তিনটি বিষয় এক সাথে পাওয়া যায় না। অথচ তওবার বাস্তব স্বরূপ জানাই উদ্দেশ্য— শব্দ নয়।

তওবার ফযীলত ও আবশ্যকতা ঃ কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা তওবার আবশ্যকতা প্রমাণিত। যার অন্তশ্চক্ষু উন্মুক্ত এবং যার বক্ষ ঈমানের আলোকে আলোকিত, তার কাছেও এর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। এরূপ ব্যক্তি অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোকের সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকা তার জন্য জরুরী নয়। যারা আল্লাহর পথে চলে, তাদের কেউ কেউ অন্ধ হয়ে থাকে। কারও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মুখে পা বাড়াতে পারে না। আবার কেউ কেউ চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। একবার পথে পা রাখলে আপনা-আপনিই অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম প্রকার লোক ধর্মের পথে প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের আয়াত অথবা হাদীস শুনার মুখাপেক্ষী হয়। পরিষ্কার আয়াত অথবা হাদীস পাওয়া কঠিন হলে মাঝে মাঝে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কঠোর পরিশ্রম করা এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা সত্ত্বেও তাদের ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং পদক্ষেপও ছোট হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার লোকের বক্ষ আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের জন্য উন্মুক্ত করে দেন বিধায় তারা সামান্য ইঙ্গিত পেয়েই কঠিন কঠিন পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। তারা কোরআন পাকের এই আয়াতের অনুরূপ—

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

অর্থাৎ, আগুনের ছোঁয়া না পেয়েও তার তৈল যেন জ্বলতে থাকে।

অর্থাৎ, সামান্য ইঙ্গিতই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়। আর পূর্ণরূপে বলে দেয়ার পর তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায়—

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ, আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, তাঁর আলোর পথ দেখান।

এরূপ লোকদের জন্যে প্রতিক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের প্রয়োজন নেই। তারা তওবার আবশ্যকতা জানতে চাইলে প্রথমে অন্তশ্চক্ষুর আলোকে তওবা কি তা দেখে, অতঃপর আবশ্যকতার অর্থ বুঝে, এরপর উভয়টিকে মিলিয়ে জেনে নেয় যে, তওবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত। উদাহরণতঃ তারা প্রথমে জানে যে, ওয়াজিব ও জরুরী তাই, যা চিরন্তন সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছা এবং চিরন্তন ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জরুরী। এরপর তারা বুঝে যে, কিয়ামতে আল্লাহর দীদার ব্যতীত কোন সৌভাগ্য নেই। যে এ থেকে বঞ্চিত হয়, সে হতভাগ্য। এতটুকু জানার পর তাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্যে সেই পথ থেকে ফিরে আসতে হবে, যে পথ আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই পথ থেকে ফিরে আসা তিনটি বিষয় দ্বারা অর্জিত হবে— জ্ঞান, অনুশোচনা ও সংকল্প। কেননা, যে পর্যন্ত এ বিষয়ের জ্ঞান না হবে যে, গোনাহ আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণ, সে পর্যন্ত অনুশোচনা হবে না। আর অনুশোচনা না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসার প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি ঈমানের আলোকে আলোকিত, তার তওবা এভাবেই হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত নয়, তার জন্য তাকলীদ ও অনুসরণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সে অনুসরণের মাধ্যমে ধ্বংসের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এখন এই তওবা সম্পর্কে আল্লাহ পাক, রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর সামনে তওবা কর—যাতে সফলকাম হও।

এখানে সকল ঈমানদারকে তওবা করার ব্যাপক আদেশ করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

অর্থাৎ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো শুন, তোমরা আল্লাহর সামনে পরিষ্কার মনে তওবা কর।

এ আয়াতে "নাসূহ" শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে খাঁটি ও অবিমিশ্র তওবা কর।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ ভালবাসেন তওবাকারীকে এবং ভালবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে।

এ আয়াতটি তওবার ফযীলত জ্ঞাপন করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ অর্থাৎ, তওবাকারী আল্লাহর প্রিয়জন। اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّاذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ, যে গোনাহ থেকে তওবা করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই।

এক হাদীসে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে—এক ব্যক্তি সফর করতে করতে এক প্রতিকূল জায়গায় বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করল। সঙ্গে তার পাথেয় বহনকারী উট। লোকটি মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে দেখল তার উটটি নেই। সে ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে উটটিকে খুঁজতে লাগল। অবশেষে যখন রৌদ্রতাপ, পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল, তখন মনে মনে বলল ঃ আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই চলে যাব এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় শুয়ে থাকব। সেমতে সেখানে পৌঁছে মাথার উপর হাত রেখে শুয়ে পড়ল এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলতেই দেখল পাথেয় বহনকারী উটটি শিয়রের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। উটটি ফিরে পাওয়ার কারণে এই ব্যক্তির যে আনন্দ হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার তওবার কারণে আনন্দিত হন।

হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করলে পর ফেরেশতারা তাকে মোবারকবাদ দিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ হে আদম, আল্লাহ

তা'আলা আপনার তওবা কবুল করায় আপনার কলিজা ঠাণ্ডা হয়েছে নিশ্চয়? হযরত আদম (আঃ) জওয়াব দিলেন ঃ জিবরাঈল, যদি তওবা কবুল করার পরও আমাকে সওয়াল করা হয়, তবে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? তখনই তাঁর প্রতি ওহী আগমন করল— হে আদম, তুমি তোমার সন্তানদের জন্যে দুঃখকষ্টও রেখে গেলে এবং তওবাও। অতএব, তাদের মধ্যে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব, যেমন তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আর যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি কৃপণতা করব না। কেননা, আমার নাম "করীব" (নিকটবর্তী) এবং "মুজীব" (সাড়া দানকারী)। হে আদম, আমি তওবাকারীদেরকে কবর থেকে যখন উত্থিত করব, তখন তারা আসতে থাকবে এবং সুসংবাদ শুনতে থাকবে। তারা যে দোয়া করবে, তা কবুল হবে।

মোটকথা, তওবার সংজ্ঞা হচ্ছে বর্তমানে গোনাহ্ পরিত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে তা না করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, সাথে সাথে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণ করে নেয়া। এই তওবা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব। কেননা, গোনাহকে ক্ষতিকর মনে করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি গোনাহ্ পরিত্যাগ করে না, তার মধ্যে ঈমানের এই অংশটি অনুপস্থিত। নিম্নোক্ত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে—

لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ, যিনাকার ব্যক্তি যখন যিনা করতে থাকে, তখন সে ঈমানদার থাকে না।

অর্থাৎ যিনা যে আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী একটি গোনাহ্, এ বিষয়ের ঈমান যিনাকারের মধ্যে থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে মূল ঈমানই থাকে না; অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা। অতএব বুঝা গেল, আল্লাহকে জানা, তাঁর একত্ব স্বীকার করা, তাঁর গুণাবলী, ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যিনার পরিপন্থী নয়। তাই যিনার কারণে এই ঈমান বিনষ্ট হবে না। উদাহরণতঃ কোন চিকিৎসক রোগীকে বলল ঃ এটা বিষ। এটা খেয়ো না। যদি রোগী সেই বস্তু খেয়ে ফেলে, তবে

বলা হবে যে, সে চিকিৎসকের এ কথাটির সত্যতা স্বীকার করে না এবং এর অর্থ এই হবে না যে, সে চিকিৎসকের অস্তিত্ব এবং তার চিকিৎসক হওয়া বিশ্বাস করে না। এ থেকে জানা গেল যে, গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হয় না এবং ঈমান একই বস্তু বিশ্বাস করার নাম হয় না; বরং এর সত্তরের উপর শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দেয়া এবং নিম্নতম শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেয়া।

ঈমানের সঠিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে মানুষ। আত্মার অনুপস্থিতিতে যেমন মানুষ মানুষ হয় না, তেমনি একত্ববাদ স্বীকার না করলে ঈমান ঈমান হয় না। যে ব্যক্তি কেবল তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেয় এবং আমলে ত্রুটি করে, সে এমন মানুষের মত, যার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। এরূপ মানুষের মৃত্যু যেমন অতি নিকটে, তেমনি যে ব্যক্তি কেবল কালেমা তাইয়েবা ও রেসালতের সাক্ষ্য দেয়, সেও এই অবস্থার কাছাকাছি। সামান্য ঝড়ো হাওয়ায় তার ঈমানের বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুদূতের আগমনের সময় যে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার কারণে ঈমান উধাও হয়ে যায়। দুর্বল ঈমান এই পরিস্থিতি বরদাশত করতে পারে না। এরূপ মুমিনের "খাতেমা" তথা জীবনাবসান শুভ না হওয়ার আশংকা থাকে। খাতেমার সময় সেই ঈমানই বাকী থাকে, যার ভিত্তি সার্বক্ষণিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন কোন গোনাহগার ব্যক্তি আনুগত্যশীল ব্যক্তিকে বলে, আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে পার্থক্য কি? তুমিও ঈমানদার, আমিও ঈমানদার। যেমন লাউগাছ দেবদারু গাছকে বলেছিল, আমিও বৃক্ষ, তুমিও বৃক্ষ। কাজেই আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু জওয়াবে দেবদারু গাছ বলেছিল, নামের অভিন্নতার এই বিভ্রান্তি তোমার তখন দূর হবে, যখন কালবৈশাখীর ঝড় আসবে। তখন তোমার শিকড় উপড়ে যাবে এবং পাতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আমি পূর্ববৎ সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকব।

সুতরাং গোনাহগার ব্যক্তি যদি দোযখ বাসকে ভয় না করে এবং মৃত্যুর পরওয়া না করে, তবে তাকে বলা হবে দেখ, সুস্থ-সবল ব্যক্তি অসুখ-বিসুখের আশংকা করে এবং যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন মৃত্যুকে

ভয় করে। এমনিভাবে গোনাহগারেরও উচিত অশুভ খাতেমাকে ভয় করা। যদি খোদা না করুন, খাতেমা খারাপ হয়, তবে দোযখের অগ্নিতে থাকা জরুরী। কেননা, ঈমানের জন্যে গোনাহ তেমনি, যেমন দেহের জন্যে ক্ষতিকর খাদ্য। ক্ষতিকর খাদ্য পাকস্থলীতে একত্রিত হয়ে আস্তে আস্তে পিত্তাদির মেযাজ বিগড়াতে থাকে, যা মানুষ টের পায় না। এরপর হঠাৎ সে রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে। গোনাহ ঈমানের মধ্যে এমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং একদিন ঈমানকেই ডুবিয়ে দেয়। সুতরাং ধ্বংসশীল দুনিয়াতে মৃত্যুর ভয়ে যখন বিষাক্ত ও ক্ষতিকর খাদ্য না খাওয়া তাৎক্ষণিক ওয়াজিব, তখন চিরন্তন ধ্বংসের ভয়ে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম না করা আরও উত্তমরূপে তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হবে। বিষপানকারী স্বীয় ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে যেমন তৎক্ষণাৎ উদরকে বিষমুক্ত করার জন্যে বমি করতে অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়, তেমনিভাবে যে গোনাহ করে, তার জন্যে গোনাহ থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসা ওয়াজিব। এরপর যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন এই ক্ষতিপূরণ করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং গোনাহগারের উচিত দ্রুত তওবার প্রতি মনোনিবেশ করা। নতুবা গোনাহের বিষক্রিয়ার ফলে ঈমানের আত্মা প্রভাবিত হয়ে যাবে। এরপর ওয়ায-নসীহত কোন উপকারে আসবে না এবং গোনাহগার ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত হয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতীক হয়ে যাবে—

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

অর্থাৎ, আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। ফলে, তারা দেখতে পায় না। আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।

এ আয়াতগুলো কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— এরূপ মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। কেননা, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমানের শাখা সত্তরেরও বেশী এবং যিনাকার মুমিন অবস্থায় যিনা করে না। এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি শাখার অনুরূপ ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে, সে খাতেমার সময় মূল ঈমান থেকেও বঞ্চিত হবে, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা আত্মার শাখা, তা না থাকলে মানুষের মূল আত্মাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা, শাখা ব্যতীত মূল কায়েম থাকতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তওবা অপরিহার্য ঃ সকলের জন্যে তওবার অপরিহার্যতা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে সফলকাম হও।

এ আয়াতে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। বুদ্ধি-বিবেকের আলোকেও এই অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কেননা, তওবার অর্থ হচ্ছে, যে পথ আল্লাহ থেকে দূরে এবং শয়তানের কাছে, সে পথ থেকে ফিরে আসা উচিত। এই ফিরে আসার কাজটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভবপর। কাম, ক্রোধ ও অন্যান্য নিন্দনীয় স্বভাব হচ্ছে মানুষকে বিপথগামী করার জন্যে শয়তানের হাতিয়ার। এগুলো যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন মানুষের বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে। সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে এবং তার ভিত্তি যৌবনে পা রাখার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যায়। এ ভিত্তির সূচনা হয় সাত বছর বয়স থেকে। কিন্তু কাম ও ক্রোধ পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বাহিনী এবং বুদ্ধি ফেরেশতাদের বাহিনী। যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যই সংঘটিত হয়। কেননা, এরা পরস্পর বিরোধী শক্তি। একের উপস্থিতিতে অন্যের কায়েম থাকা সম্ভব নয়। যেমন রাত ও দিন এবং অন্ধকার ও আলো একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এ যুদ্ধে যে পক্ষ বিজয়ী হয়, সে অপর পক্ষের মূলোচ্ছেদ করে। কাম ও ক্রোধ শৈশবেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় বিধায় শয়তানের ব্যূহ বুদ্ধির পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাই স্বভাবতই কামনার দাবীর প্রতি মানুষের টান ও মোহ প্রবল হয়ে উঠে এবং এ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরপর যখন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তখন যদি তা শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ না হয়, তবে যুদ্ধের ময়দান শয়তানের হাতেই থাকে এবং সে কোরআনে উল্লিখিত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে নেয়ঃ

لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ, আমি আদম সন্তানদেরকে অল্পসংখ্যক বাদে অবশ্যই বিপথগামী করব।

পক্ষান্তরে যদি বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হয়, তবে প্রথমে সে শয়তান বাহিনীর মূলোচ্ছেদ করতে শুরু করে। এ জন্যে কামনাকে চূর্ণ করে, অভ্যাস ত্যাগ করে এবং মনকে বলপূর্বক এবাদতে ফিরিয়ে আনে। বলা বাহুল্য, তওবার উদ্দেশ্য তাই। অর্থাৎ, ফিরে আসার কাজটি এখানেও পাওয়া যায়। যেহেতু কাম বুদ্ধির পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করে, তাই যে কাজ বুদ্ধির পূর্বে করা হয়, তা থেকে ফিরে আসা অর্থাৎ তওবা করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যক— সে নবী-রসূল কিংবা সাধারণ মানুষ যেই হোক। কাজেই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তওবার প্রয়োজন বিশেষভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর জন্যেই ছিল; বরং এটা একটা আদি বিধান; যা মানুষ মাত্রের জন্যেই জরুরী। এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি বালেগ হয়, সে যদি কুফর ও মূর্খতার উপর থাকে, তবে এসব বিষয় থেকে তওবা করা তার উপর ওয়াজিব। যদি সে পিতামাতার অনুগামী হয়ে মুসলমান হয়, তবে ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবশ্যই গাফেল ও অজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে এই গাফলতি ও অজ্ঞতা থেকে তওবা করা ওয়াজিব। তাকে ইসলামের সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। কেননা, তার পিতামাতার ইসলাম তার জন্যে উপকারী হবে না যে পর্যন্ত নিজে মুসলমান না হবে। ইসলামকে বুঝার পর নিজের অভ্যাস ও কামনা চরিতার্থ করার জন্যে অহেতুক স্বেচ্ছাচারপ্রীতি থেকে ফিরে আসা অপরিহার্য অর্থাৎ, প্রত্যেক করণীয় ও বর্জনীয় কাজে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা মেনে চলতে হবে— সীমার বাইরে এক পাও রাখা যাবে না। এ প্রকার তওবা সর্বাধিক কঠিন। অধিকাংশ লোক এতে অক্ষম হয়ে বরবাদ হয়ে যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, তওবা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ফরযে আইন। এরূপ কোন ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না, যার তওবার প্রয়োজন নেই। হযরত আদম (আঃ) তওবা থেকে বেপরওয়া হতে পারেননি। তেমনি তাঁর সন্তানরাও এ থেকে বেপরওয়া নয়।

এখন জানা দরকার যে, তওবা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। কেননা, কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। পয়গম্বরগণও এ থেকে বাঁচতে পারেননি। কোরআন ও হাদীসে পয়গম্বরগণের ত্রুটি, তাঁদের তওবা ও কান্নাকাটি উল্লেখ রয়েছে। কদাচিৎ মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলেও মনে মনে গোনাহের কল্পনা থেকে বাঁচতে পারে না। যদি অন্তরেও গোনাহের কল্পনা না থাকে, তবে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় না। সে অন্তরে বিক্ষিপ্ত কল্পনা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে আল্লাহর এবাদতে গাফলতি দেখা দেয়। যদি কেউ কুমন্ত্রণা থেকেও মুক্ত থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকিফহাল হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি থেকেই যায়। মোটকথা, ত্রুটিমুক্ততা মানুষের জন্যে কল্পনা করা যায় না। তবে ত্রুটির পরিমাণে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হতে পারে। মূল ত্রুটি প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

إِنَّهُ لَيُرَانُ عَلَىٰ قَلْبِي حَتَّىٰ أَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

অর্থাৎ, আমার অন্তরে মরিচা ধরে যায়। এমনকি, আমি দিবা-রাত্রিতে সত্তর বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বলা বাহুল্য, এই ক্ষমা প্রার্থনার কারণেই আল্লাহ তাঁকে মাহাত্ম্য দান করেছেন। আল্লাহ বলেন—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ -

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যদের কি দশা হবে।

এই ত্রুটির কারণ পরিত্যাগ করা এবং তার বিপরীত কারণ অবলম্বন করাই তওবার সারকথা।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, অন্তরে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা আসা নিঃসন্দেহে ত্রুটি এবং অন্তর এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া পূর্ণতা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ত্রুটির কারণ থেকে পূর্ণতার দিকে উন্নতি করাকে তওবা বলা হবে। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তওবা ওয়াজিব। অথচ ত্রুটি থেকে পূর্ণতার উন্নতি করা ফযীলত তথা বাড়তি গুণের কাজ, ওয়াজিব নয়। কারণ, পূর্ণতা অর্জন করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় সর্বাবস্থায় তওবা ওয়াজিব হওয়ার মানে কি? এর জওয়াব এই যে, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, মানুষ জন্মলগ্ন থেকে কখনও কামনার অনুসরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না এবং কামনা থেকে তওবা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কামনার অনুসরণ কেবল ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করবে; বরং পূর্ণ তওবা হচ্ছে অতীতকালের ক্ষতিও পূরণ করা। মানুষ যখনই কামনার অনুসরণ করে, তখনই তার অন্তরে এক প্রকার অন্ধকার ছায়াপাত করে; যেমন আয়নায় মুখের বাষ্প লাগলে আয়না মলিন হয়ে যায়। যদি এই কামনার অনুসরণ একের পর এক অব্যাহত থাকে, তবে অন্তরের অন্ধকার মরিচায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন, মুখের বাষ্প অব্যাহতভাবে আয়নায় পড়তে থাকলে কালক্রমে আয়নায় মরিচা ধরে যায়। কামনার কারণে অন্তরে মরিচা ধরার কথা কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

মরিচা যদি অনেক বেশী হয়, তবে অন্তরে মোহর লেগে যায়। যেমন আয়নার মরিচা অনেকদিন পরিষ্কার না করলে তা আর পরিষ্কার করার যোগ্য থাকে না। তখন মনে হয় যেন আয়নাটি মরিচা দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। সুতরাং আয়না পরিষ্কার করার জন্যে যেমন ভবিষ্যতে বাষ্প ও ময়লা পড়তে না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং চেহারা দেখার জন্যে পূর্বের বাষ্প ও ময়লা দূর করা জরুরী; তেমনিভাবে অন্তর পরিষ্কার করার জন্যেও ভবিষ্যতে কামনার অনুসরণ ত্যাগ করা যথেষ্ট নয়; বরং অতীত গোনাহের

কারণে অন্তরে যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে, তাও দূর করা জরুরী। গোনাহের কারণে যেমন অন্তরে অন্ধকার নেমে আসে, তেমনি এবাদত ও কামনা বর্জনের কারণে নূর সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এক হাদীসে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

اتبع السيئة بالحسنة تمحها

অর্থাৎ, অসৎ কর্মের পেছনে সৎকর্ম কর। সৎকর্ম অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়।

এ থেকে জানা গেল যে, সর্বাবস্থায় অন্তর থেকে গোনাহের চিহ্ন মিটিয়ে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে। এখন সর্বাবস্থায় তওবা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি, তা জানা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, ওয়াজিবের অর্থ দ্বিবিধ। এক ওয়াজিব শরীয়তের বিধিবিধানে সুবিদিত। এতে সকলেই শরীক। যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। পূর্ণতার স্তর এই ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয় ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার জন্যে জরুরী। আমরা এতক্ষণ যে সব বিষয় থেকে তওবা করার কথা লিখেছি, সেগুলো সমস্তই এই নৈকট্যের স্তরে পৌঁছার জন্যে জরুরী। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা দরকার। আমরা বলি, নফল নামাযের জন্যে উযু ওয়াজিব। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি নফল নামায পড়তে চায়, তার জন্যে উযু জরুরী। কিন্তু যে ব্যক্তি নফলই পড়তে চায় না, তার জন্যে নফলের কারণে উযু ওয়াজিব নয়। অথবা আমরা বলি, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা মানুষের অস্তিত্বের জন্যে শর্ত ও জরুরী। অর্থাৎ, যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চায়, তবে তার জন্যে এসব অঙ্গ থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল মাংসপিণ্ডের জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে এরূপ জীবনের এসব অঙ্গ থাকা জরুরী নয়। সুতরাং শরীয়তের যেসব মূল ওয়াজিব সকলের উপর ওয়াজিব, তা দ্বারা কেবল নাজাত তথা মুক্তি পাওয়া যায়। নিরেট মুক্তিকে কেবল মাংসপিন্ডের জীবন মনে করা উচিত। এটি ছাড়া অন্য আরও যেসকল সৌভাগ্য রয়েছে, সেগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ জ্ঞান করা দরকার। মুক্তির অলংকার ও সাজসজ্জা সেগুলোই। এগুলোর জন্যেই পয়গম্বর, ওলী

ও আলেমগণ আজীবন সাধনা করেছেন এবং পার্থিব সুখ-শান্তি ও আনন্দ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছেন।

সেমতে হযরত ঈসা (আঃ) একবার মাথার নিচে পাথর রেখে শয়ন করেছিলেন। শয়তান হাযির হয়ে আরয করল ঃ আপনি তো দুনিয়া বর্জন করেছিলেন। এখন এ কি করলেন? তিনি বললেন ঃ তুই দুনিয়া বর্জনের খেলাফ কি দেখলি? শয়তান বলল ঃ পাথরকে বালিশ করা দুনিয়ার সুখ। মাটিতে মাথা রাখেন না কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ মাথার নিচ থেকে পাথরটি বের করে ফেলে দিলেন এবং মাটিতে মাথা রেখে শয়ন করলেন। হযরত ঈসা (আঃ) -এর এ কাজটি ছিল দুনিয়ার এ সুখ থেকে তওবা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কি জানতেন না যে, মাটিতে মাথা রাখা শরীয়তের সাধারণ বিধানে ওয়াজিব নয়? এমনিভাবে রসূলে করীম (সাঃ) নকশাযুক্ত চাদরকে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টিকরী পেয়ে খুলে ফেলেছিলেন এবং জুতার নতুন ফিতাকে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে দেখে তার স্থলে পুরাতন ফিতা লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তার কি জানা ছিল না যে, এসব বিষয় শরীয়তে ওয়াজিব নয়? জানা থাকলে এগুলো বর্জন করলেন কেন? এ থেকে বুঝা গেল যে, তিনি এসব বিষয়কে অন্তরে প্রতিশ্রুত "মকামে মাহমুদ" (প্রশংসিত মর্তবা) পর্যন্ত পৌঁছার পথে কার্যকর অন্তরায় অনুভব করার কারণে বর্জন করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দুধ পান করার পর যখন জানতে পারলেন, তা অবৈধ উপায়ে অর্জিত ছিল, তখন কণ্ঠনালীতে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে খুব বমি করলেন। ফলে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি কি ফেকাহ্ শাস্ত্রের এই বিধান জানতেন না যে, ভুলক্রমে পান করার মধ্যে গোনাহ নেই এবং পান করা বস্তু পেট থেকে বের করা ওয়াজিব নয়? তা হলে তিনি এই পান করা থেকে রুজু করলেন কেন এবং পেটকে যথাসম্ভব খালি করতে চাইলেন কেন? এর কারণ এটাই ছিল যে, তিনি জানতেন জনসাধারণের বিধান এবং আখেরাত পথের বিপদ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব, এ সকল মহাপুরুষের অবস্থা চিন্তা করা দরকার। তাঁরা আল্লাহ্, তাঁর পথ, তাঁর শাস্তি এবং গোপন বিভ্রান্তি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন।

মোটকথা, এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানে, আধ্যাত্ম পথে

চলার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রতি মুহূর্তে নির্ভেজাল তওবা করা ওয়াজিব। নূহ (আঃ)-এর মত দীর্ঘজীবী হলেও তৎক্ষণাৎ ও অবিলম্বে তওবা করবে। আবূ সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশিষ্ট জীবন কেবল এজন্যে দুঃখ করে যে, তার অতীত জীবন এবাদত ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে গেছে, তবে আমৃত্যু এ দুঃখ তার জন্যে সমীচীন হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অবশিষ্ট জীবনও অতীত জীবনের ন্যায় কুকর্মে অতিবাহিত করে, তবে তার কি অবস্থা হবে? বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি কোন সুবর্ণ সুযোগ পায়, এরপর তা অহেতুক বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এজন্যে সে অবশ্যই দুঃখ করে। আর যদি সেই সুযোগ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ং ব্যক্তিরও ধ্বংস অনিবার্য হয়, তবে দুঃখ আরও বেশী হবে।

মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ, যার কোন বিকল্প নেই। কারণ, এতে মানুষ নিজের চিরন্তন সৌভাগ্য গড়ে নিতে পারে এবং সার্বক্ষণিক দুর্ভাগ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এরপর মানুষ যদি এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করে দেয়, তবে সেটা খুবই ক্ষতির বিষয় হবে। আর যদি এই সুযোগকে আল্লাহর নাফরমানীতে বিনষ্ট করে, তবে সরাসরি নিজের ধ্বংসই ডেকে আনে। এরপরও যদি মানুষ এই বিপদের জন্যে দুঃখ না করে, তবে এটা হবে মূর্খতা, যা সকল বিপদের মধ্যে বৃহত্তম বিপদ। কিন্তু মূর্খতার বিপদ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানতে পারে না। কেননা, গাফলতির স্বপ্ন তার মধ্যে ও তার জ্ঞানের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয়, সকল মানুষই এই গাফলতির স্বপ্নে বিভোর। যখন মৃত্যু আসবে, তখন স্বপ্নভঙ্গ হবে। তখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপদ টের পাবে। কিন্তু তখন ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। বেদনা ও নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।

জনৈক সাধক বলেন ঃ মালাকুল মওত যখন কোন মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলে দেয়, তোমার জীবন আর মাত্র এক মুহূর্ত বাকী, এতে এক নিমেষেরও বিলম্ব হবে না, তখন সে এত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয় যে, এক মুহূর্ত সময় পাওয়ার জন্যে যদি সে সমগ্র পৃথিবীর মালিক হত, তবে তাও অকাতরে দিয়ে দিত, যাতে সে সেই বাড়তি মুহূর্তের মধ্যে নিজের দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে নেয়। কিন্তু তখন অবকাশ কোথায়। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا -

অর্থাৎ, তোমাদের কারও কাছে মৃত্যু আসার পূর্বে সে বলে, পরওয়ারদেগার! আমাকে সামান্য সময় অবকাশ দিলে না কেন, যাতে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মীদের একজন হতাম। আল্লাহ কখনও অবকাশ দিবেন না কাউকে যখন তার মৃত্যু এসে পড়বে।

সামান্য সময়ের অর্থ হল মানুষের সামনে মালাকুল মওতের আবির্ভাব। তখন মানুষ বলে ঃ হে মালাকুল মওত, আমাকে একদিনের সময় দাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। মালাকুল মওত জওয়াব দেয়, তুই এতগুলো দিন অকারণে বরবাদ করেছিস, এখন একদিন কোথায় পাবে? এরপর মানুষ বলে, এক মুহূর্তেরই অবকাশ দাও। মালাকুল মওত বলে ঃ তুই অনেক মুহূর্ত বিনষ্ট করেছিস। এখন এক মুহূর্তও দেয়া হবে না। এরপর মানুষের সামনে তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং প্রাণবায়ু কণ্ঠনালীতে এসে পড়ে। বুকে গড়গড় শব্দ হয়। এসব আতঙ্কের কারণে আসল ঈমান টলমল করতে থাকে। এরপর তাকদীর ভাল হলে আত্মা তাওহীদের উপর নির্গত হয়। একেই বলে "শুভ খাতেমা"। পক্ষান্তরে তাকদীর মন্দ হলে সন্দেহ ও অস্থিরতার উপর আত্মা নির্গত হয়। এটা হচ্ছে "অশুভ খাতেমা"। এই অশুভ খাতেমা সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন —

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তওবা নেই, যারা আমৃত্যু মন্দ কাজ করে যায়। এমনকি, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তাদের তওবা কবুল হবে, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর অনতিবিলম্বে তওবা করে।

এর অর্থ এই যে, তওবার সময় ও গোনাহের সময় লাগালাগি হতে হবে। অর্থাৎ, গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তজ্জন্যে অনুতাপ করবে এবং সাথে সাথে সৎকর্ম করবে। বেশী দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ধরে যেতে পারে, যা মিটানো সম্ভব না-ও হতে পারে। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا

অর্থাৎ, মন্দকাজের পশ্চাতেই সৎকাজ কর। সৎকাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ প্রিয় বৎস, তওবায় বিলম্ব করো না। কেননা, মৃত্যু হঠাৎ এসে যায়। যে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে তওবা করে না, সে দুটি বিপদে জড়িত থাকে। এক, গোনাহের কাল দাগ যদি একের পর এক অন্তরে পড়তে থাকে, তবে মরিচা ও মোহর লেগে যাবে এবং তা মিটানোর যোগ্য থাকবে না। দুই, যদি এ সময়ের মধ্যে রোগ অথবা মৃত্যুর কবলে পড়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণের অবকাশ থাকবে না। এছাড়া অন্তর মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার আমানত। এমনিভাবে জীবনও তাঁরই আমানত। অতএব, যে ব্যক্তি আমানতে খেয়ানত করবে, তার পরিণাম ভয়াবহ।

জনৈক দরবেশ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুটি রহস্যের কথা এলহামের মাধ্যমে শুনিয়ে দেন। এক, যখন মানুষ জননীর গর্ভ থেকে নির্গত হয়, তখন তাকে বলা হয় ঃ হে বান্দা! আমি তোমাকে পাকসাফ অবস্থায় দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। তোমার আয়ুষ্কাল তোমার কাছে আমানত। এখন আমি দেখব তুমি কিভাবে এই আমানতের হেফাযত কর এবং আমার সাথে কি অবস্থায় সাক্ষাৎ কর। দুই, যখন মানুষের আত্মা নির্গত হয়, তখন বলা হয়, হে বান্দা! আমি যে আমানত তোমার কাছে

রেখেছিলাম, তুমি এ সময় পর্যন্ত তার হেফাযত করেছ কি? তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করে থাকলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকলে আমি শাস্তি দেব। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে— أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ। অর্থাৎ, তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।

শর্তসহ তওবা কবুল হয় ঃ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিশুদ্ধ তওবা কবুল হয়। যারা অন্তশ্চক্ষুর আলোকে দেখে, তারা জানে যে, সুস্থ ও নীরোগ অন্তর আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে থাকে এবং প্রকৃতিগতভাবে অন্তর নীরোগ সৃজিত হয়। এর সুস্থতা কেবল গোনাহের অন্ধকার ও মালিন্য আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়। অনুশোচনার অনল এ মালিন্যকে ভস্মীভূত করে দেয় এবং সৎকর্মের নূর অন্তরের চেহারা থেকে গোনাহের তিমির দূর করে দেয়। গরম পানি ও সাবান ব্যবহার করলে যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি তওবা ও অনুতাপের ফলে অন্তরের নাপাকী দূর হয়ে অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব মানুষের উচিত, কেবল অন্তরকে পাক ও সাফ রাখা, যাতে আল্লাহর কাছে মকবুল হয়। কোরআনের ভাষায় এই কবুল হওয়ার নাম সাফল্য। বলা হয়েছে—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

অর্থাৎ, যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রেখেছে, সে সফলতা অর্জন করেছে।

কারও কারও ধারণা, তওবা বিশুদ্ধ হলেও তা কবুল হয় না। তাদের এই ধারণা এরূপ ধারণার অনুরূপ যে, সূর্য উদিত হলেও অন্ধকার দূর হয় না অথবা সাবান দিয়ে ধৌত করলেও কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয় না। হাঁ, যদি ময়লার স্তর কাপড়ের কলিজার মধ্যে প্রবেশ করে যায়, তবে সাবান দিয়ে তা দূর করা যাবে না। এমনিভাবে উপর্যুপরি গোনাহের কারণে যে অন্তরে মরিচা ও মোহর লেগে যায়, তার তওবা নিষ্ফল। কেউ কেউ মাঝে মাঝে কেবল "তওবা তওবা" বলে থাকে। এরূপ তওবার কোন মূল্য নেই। এটা এমন, যেমন ধোপা মুখে বলে, আমি কাপড় ধোলাই করেছি। তার এই মৌখিক কথায়ই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে কি, যে পর্যন্ত কাপড়ের ময়লা ছাড়ানোর কৌশল ব্যবহার না করবে? প্রকৃত তওবা থেকে যারা গা

বাঁচাতে চায়, এটা তাদেরই অবস্থা। দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ব্যক্তিদের উপর এ অবস্থাই প্রবল।

এখন তওবা কবুল হওয়ার পক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ্, যিনি আপন বান্দাদের তরফ থেকে তওবা কবুল করেন এবং গোনাহসমূহ মার্জনা করেন।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ গোনাহ্ মার্জনাকারী এবং তওবা কবুলকারী।

তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবার কারণে অধিক সন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য, সন্তুষ্ট হওয়ার মর্তবা কবুল করার উর্ধ্বে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সকাল পর্যন্ত এবং দিনের বেলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত গোনাহ্ করে, তার তওবা কবুল করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বাহু প্রসারিত করেন। এটা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এখানে বাহু প্রসারিত করার অর্থ তওবা তলব বা কামনা করা বুঝা যায়। যে তলব করে, সে কবুলকারীর উর্ধ্বে। কেননা, কোন কোন কবুলকারী তলব করে না; কিন্তু তলবকারীর জন্য কবুলকারী হওয়া অপরিহার্য। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

لَوْ عَمِلْتُمُ الْخَطَايَا حَتَّى تَبْلُغَ السَّمَاءَ ثُمَّ نَدِمْتُمْ لَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত গোনাহ্ কর, এরপর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করবেন।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে—মানুষ কোন গোনাহ্ করে, এরপর এর কারণে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন— এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ গোনাহ্ থেকে তওবা করে তাকেই দৃষ্টিতে

রাখে এবং সেই গোনাহ্ থেকে বিরত থাকে। অবশেষে এর দৌলতে জান্নাতে দাখিল হয়। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّذَنْبَ لَهُ

অর্থাৎ, যে গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ্ নেই।

বর্ণিত আছে, জনৈক হাবশী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি গোনাহ্ করতাম। বলুন, আমার তওবা কবুল হবে কি না? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তওবা কবুল হবে। লোকটি চলে গেল, এরপর আবার ফিরে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি যখন গোনাহ্ করতাম, তখন আল্লাহ্ আমাকে দেখতেন কি না? তিনি বললেন ঃ হাঁ, দেখতেন। একথা শুনেই হাবশী এমন সজোরে চীৎকার করে উঠল যে, সাথে সাথে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে নিজের দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন শয়তান অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ্ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। শয়তান বলল ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। এরশাদ হল ঃ আমিও আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম খেয়ে বলছি- যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে, সে পর্যন্ত তাদের তওবা প্রত্যাখ্যান করব না। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الْوَسَخَ

অর্থাৎ, পুণ্যকাজ মন্দকাজকে বিদূরিত করে। যেমন পানি ময়লাকে বিদূরিত করে।

তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে এমনি ধরনের আরও অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তিও কম নয়। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) বলেন ঃ

فَاِنَّهُ كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন।

আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কেউ গোনাহ করার পর তওবা করে এবং এরপরও গোনাহ করে এবং এরপর তওবা করে, তবে আমি তার তওবা কবুল করব। তালেক ইবনে হাবীব বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু সে সকালে তওবা করে এবং সন্ধ্যায় তওবা করে, তাই ক্ষমার আশা করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, সে যদি সেই অপরাধ স্মরণ করে মনে মনে ভীত হয়, তবে সে অপরাধ তার আমলনামা থেকে মিটে যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মানুষ মাঝে মাঝে গোনাহ করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনুতাপ করতে থাকে। অবশেষে সে এর দৌলতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়। তখন শয়তান বলে, চমৎকার হত যদি আমি তাকে গোনাহে লিপ্ত না করতাম। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আমি একটি গোনাহ করেছি, আমার তওবা কবুল হবে কি না? তিনি প্রথমে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তাকিয়ে লোকটিকে অশ্রুসজল দেখতে পেয়ে বললেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা আছে, সবগুলো খুলে এবং বন্ধ হয়; কিন্তু তওবার দরজা কখনও বন্ধ হয় না। সেখানে একজন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। তুমি নিরাশ না হয়ে আমল করে যাও।

আবদুর রহমান ইবনে আবুল কাসেমের দরবারে একবার কাফেরের তওবা এবং এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল ঃ

إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ, যদি তারা বিরত হয়, তবে অতীতে যা হয়েছে, ক্ষমা করা হবে।

আবদুর রহমান বললেন ঃ আমি আশা করি আল্লাহর কাছে মুসলমানের অবস্থা কাফেরের তুলনায় ভাল হবে। আমি এই রেওয়ায়েতপ্রাপ্ত হয়েছি যে, মুসলমানের তওবা করা যেন ইসলাম গ্রহণের পর আবার ইসলাম গ্রহণ করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করি, তা নবী (সাঃ) থেকে শুনে অথবা ঐশীগ্রন্থ থেকে দেখে বর্ণনা করি। বান্দা গোনাহ করার পর যদি এক মুহূর্ত অনুতাপ করে, তবে পলক মারারও পূর্বে সেই গোনাহ দূর হয়ে

যায়। হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ তওবাকারীদের কাছে বস। কারণ, তাদের অন্তর অধিক নম্র থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি আমি তওবা থেকে বঞ্চিত থাকি, তবে এটা আমার জন্যে মাগফেরাত থেকে বঞ্চিত থাকার তুলনায় অধিক ভয়ের কারণ। এরূপ বলার কারণ এই যে, তওবার জন্যে মাগফেরাত অপরিহার্য। তওবা কবুল হলে মাগফেরাত হয়েই যাবে।

তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে এতটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট। এখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এটা তো মুতাযেলা সম্প্রদায়ের কথা– যারা বলে যে, তওবা কবুল করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এর জওয়াব এই যে, আমরা যে "ওয়াজিব" বলি, তার অর্থ "জরুরী"। যেমন কেউ বলে—সাবান দিয়ে কাপড় ধৌত করলে ময়লা দূর হওয়া ওয়াজিব অথবা পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পান করলে পিপাসা দূর হওয়া ওয়াজিব অথবা কাউকে দীর্ঘ সময় পানি পান করতে না দিলে পিপাসা লাগা ওয়াজিব অথবা কেউ সদাসর্বদা পিপাসার্ত থাকলে তার মরে যাওয়া ওয়াজিব। মুতাযেলা সম্প্রদায় যে অর্থে ওয়াজিব বলে, সে অর্থে এসব বিষয়ের মধ্যে কোনটিই ওয়াজিব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এতটুকু যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবাদতকে গোনাহের কাফফারা করেছেন এবং পাপকে মিটানোর জন্যে পুণ্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন পানিকে পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কুদরতে এর বিপরীত হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। সারকথা, আল্লাহর উপর কোনকিছুই ওয়াজিব নয়। কিন্তু তিনি যে বিষয়ের ইচ্ছা করেছেন, তা হওয়া অবশ্যই ওয়াজিব।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তওবাকারীদের প্রত্যেকেই তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে; অথচ যে পানি পান করে, সে পিপাসা নিবৃত্তির ব্যাপারে সন্দেহ করে না। অতএব, তওবাকারী সন্দেহ করবে কেন? জওয়াব এই যে, তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে সকল জরুরী শর্ত রয়েছে, সেগুলো পাওয়া গেল কি না, সন্দেহ সে বিষয়েই হয়ে থাকে। পানি পান করার ক্ষেত্রে এরূপ কোন শর্ত নেই। তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ইনশাআল্লাহ্ পরে বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করা হয়

উল্লেখ্য, তওবার অর্থ হল গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। কোন কিছু পরিত্যাগ করা তখনই সম্ভব, যখন তাকে জেনে নেয়া যায়। তওবা ওয়াজিব বিধায় গোনাহসমূহ চেনাও ওয়াজিব। যে কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই গোনাহ্। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে খোদায়ী বিধি-বিধানাবলী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করতে হবে। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। তাই নিম্নে সংক্ষেপে গোনাহসমূহের প্রকারভেদ তিনটি শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

বান্দার দোষ ও গুণের দিক দিয়ে গোনাহের প্রকারভেদ ঃ মানুষের স্বভাব ও চরিত্র অনেক। কিন্তু যেগুলো দ্বারা গোনাহ্ অস্তিত্ব লাভ করে, সেগুলো চার প্রকারে সীমিত— প্রতিপালকসুলভ স্বভাব, শয়তানসুলভ স্বভাব, পশুসুলভ স্বভাব এবং হিংস্র স্বভাব। প্রতিপালকসুলভ স্বভাব অহংকার, গর্ব, স্বৈরাচার, প্রশংসাপ্রীতি, সম্মান ও বিত্তপ্রীতি ইত্যাদি জন্ম দেয়। এ স্বভাব থেকে এমন সব কবীরা গোনাহ্ উৎপন্ন হয়, যেগুলোকে মানুষ গোনাহ্ গণ্য করে না। অথচ সেগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ও অধিকাংশ গোনাহের মূল হয়ে থাকে। শয়তানসুলভ স্বভাব থেকে হিংসা, অবাধ্যতা, কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি বিষয় গজিয়ে উঠে। নিফাক, বেদআত ও পথভ্রষ্টতাও এর অন্তর্ভুক্ত। পশুসুলভ স্বভাব থেকে যেসব বিষয় অংকুরিত হয়, সেগুলো হচ্ছে তীব্র লোভ ও লালসা, উদর ও যৌনাঙ্গের স্পৃহা, ব্যভিচার ও সমকামিতা, চুরি, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, হারাম অর্থ সঞ্চয় ইত্যাদি। হিংস্র স্বভাবের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে ক্রোধ, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মারপিট, গালিগালাজ, হত্যা ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে এ চারটি স্বভাব জন্মগতভাবে একের পর এক আগমন করে। সর্বপ্রথম পশুসুলভ স্বভাব প্রবল হয়। এরপর হিংস্রস্বভাব প্রকাশ পায়। এ স্বভাবদ্বয় একত্রিত হয়ে বুদ্ধি-বিবেককে প্রতারিত করে এবং এ

থেকেই শয়তানী স্বভাব জোরদার হয়। সবশেষে প্রতিপালকসুলভ স্বভাব অর্থাৎ, গর্ব, অহংকার, ইযযত ও বড়ত্বের স্পৃহা এবং সকলের উপর সরদারী করার ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মোটকথা, এই স্বভাব চতুষ্টয়ই হচ্ছে গোনাহ ও নাফরমানীর উৎস। এরপর এগুলো থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গোনাহ ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে কিছু গোনাহ বিশেষভাবে অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন কুফর, নিফাক, বেদআত ইত্যাদি। কিছু গোনাহ চক্ষু ও কর্ণের সাথে, কিছু উদর ও যৌনাঙ্গের সাথে এবং কিছু হাত ও পায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সব সুস্পষ্ট বিধায় বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত গোনাহ দু'প্রকার। এক, যা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে; যেমন নামায, রোযা ও অন্যান্য বিশেষ ফরযসমূহ পালন না করা। দুই, যা মানুষের পারস্পরিক হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন যাকাত না দেয়া, কাউকে হত্যা করা, কারও ধন-সম্পদ ছিনতাই করা, গালি দেয়া ইত্যাদি। যে সকল গোনাহ মানুষের পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই কঠিন। পক্ষান্তরে যে সকল গোনাহ আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে ক্ষমা পাওয়ার আশা প্রবল— যদি তা শিরক না হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

الدواوين ثلثة ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك

অর্থাৎ, আমলনামা তিন প্রকার। এক প্রকার ক্ষমা করা হবে, এক প্রকার ক্ষমা করা হবে না এবং এক প্রকার ছেড়ে দেয়া হবে না।

প্রথম প্রকার আমলনামা যা ক্ষমা করা হবে, সেসব গোনাহ, যা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার আমলনামার অর্থ শিরক। এটা ক্ষমা করা হবে না। তৃতীয় প্রকার আমলনামার মানে মানুষের পারস্পরিক গোনাহ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা না করা পর্যন্ত এসব গোনাহের চুলচেরা হিসাব হবে।

গোনাহের তৃতীয় বিভাজন এই যে, গোনাহ হয় সগীরা হবে, না হয় কবীরা। এগুলোর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে।

কেউ কেউ বলেন ঃ সগীরা বলতে কোন গোনাহ নেই; বরং যে বিষয়ে খোদায়ী আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হবে, তা কবীরাই হবে। এই উক্তি অগ্রাহ্য। কেননা, সগীরা গোনাহের অস্তিত্ব কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়, তার মধ্য থেকে যদি কবীরাগুলো থেকে বেঁচে থাক, তবে আমি তোমাদের মন্দ কাজসমূহকে সরিয়ে দেব এবং তোমাদের সম্মানের স্থানে দাখিল করব।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

تَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ

অর্থাৎ, তোমরা বেঁচে থাক কবীরা তথা বড় গোনাহ থেকে এবং নির্লজ্জতা থেকে– ছোট ছোট মলিনতা বাদে।

হাদীস শরীফে আছে—

اَلصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ اِنِ اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ -

অর্থাৎ, পাঞ্জেগানা নামায এবং এক জুমআ অন্য জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গোনাহ্ দূর করে দেয়— যদি বড় গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ -

অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

কবীরা গোনাহের সংখ্যা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এর সংখ্যা চার এবং হযরত উমর (রাঃ) সাত বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতে নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) কবীরা গোনাহের সংখ্যা সাত বলেন, তখন তিনি বললেন ঃ সাত বলার চেয়ে সত্তর বলাই অধিক সঙ্গত। হযরত ইবনে আব্বাস একথাও বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তাই কবীরা। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে গোনাহের কারণে দোযখের ওয়াদা করেছেন, তা কবীরা। কারও মতে যে গোনাহের কারণে দুনিয়াতে "হদ" অর্থাৎ, শাস্তি ওয়াজিব হয়, তা কবীরা। কেউ কেউ বলেন ঃ কবীরা গোনাহের সংখ্যা অজানা, যেমন শবে কদরের বিশেষ মুহূর্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে এর সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সূরা নেসার শুরু থেকে إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ পর্যন্ত যতগুলো গোনাহ আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, সে সবগুলোই কবীরা। আবূ তালেব মক্কী বলেন ঃ কবীরা গোনাহ্ সত্তরটি। হাদীস থেকে এবং হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মসউদ ও ইবনে উমর প্রমুখের উক্তি থেকে এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে চারটি অন্তরে অর্থাৎ শিরক, গোনাহ উপর্যুপরি করে যাওয়া, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় না করা। আর চারটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সৎপুরুষকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, অসত্যকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং জাদু করা। তিনটি উদর সম্পর্কিত— মদ্য পান করা, এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা এবং জেনেশুনে সুদ খাওয়া। দুটি যৌনাঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ব্যভিচার ও সমকামিতা। দু'টি হাতের সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ হত্যা ও চুরি। একটি পায়ের সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা। একটি সমস্ত দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পিতামাতার

নাফরমানী করা। এই উক্তি যদিও কাছাকাছি; কিন্তু এতেও পূর্ণতা হয় না। কেননা, বাস্তবে কমবেশী হতে পারে। উদাহরণতঃ এ উক্তি অনুযায়ী সুদ খাওয়া ও এতীমের অর্থ আত্মসাৎ করা কবীরা গোনাহ। এটা ধন সম্পর্কিত গোনাহ। প্রাণ সম্পর্কিত গোনাহ হত্যা লেখা হয়েছে। চক্ষু উৎপাটিত করা, হাত কাটা ইত্যাদি লেখা হয়নি। এমনিভাবে এতীমকে মারা ও তার অঙ্গ কর্তন করা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ। এ ছাড়া হাদীসে একটি গালির পরিবর্তে দু'গালি দেয়া এবং মুসলমানের মানহানি করাকেও কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের মতে চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম; কিন্তু আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে এসব আমলকে কবীরা গোনাহ মনে করতাম।

কিন্তু এতগুলো উক্তি সত্ত্বেও কেউ যদি চুরি সম্পর্কে জানতে চায় যে, এটা কবীরা কি না, তবে কবীরার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত এটা যথাযথরূপে জানা সম্ভবপর নয়। কেননা, কবীরা শব্দটি শাব্দিক দিক দিয়ে অস্পষ্ট। অভিধানে অথবা শরীয়তে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। কবীরা ও সগীরা আপেক্ষিক বিষয়াদির অন্যতম। যা গোনাহ তা কতক গোনাহের তুলনায় বড় এবং কতক গোনাহের তুলনায় ছোট হতে পারে। অর্থাৎ, উপরের দিকে দেখলে ছোট এবং নিচের দিকে দেখলে বড় মনে হবে। উদাহরণতঃ পর-নারীর সাথে শয়ন করা যিনার তুলনায় কম এবং কেবল চোখে দেখার তুলনায় বেশী গোনাহ।

কিন্তু যেহেতু কোরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার আদেশ রয়েছে, তাই কবীরা অর্থ জানা একান্ত জরুরী। নতুবা আদেশ পালিত হবে কিরূপে?

অতএব, এ সম্পর্কে সুচিন্তিত বিষয় এই যে, শরীয়তে গোনাহ তিন প্রকার। এক, যার বড় হওয়া সকলেরই জানা। দুই, যা ছোট গোনাহ বলে গণ্য। তিন, যার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কিছুই জানা নেই। এরূপ সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট গোনাহ জানার জন্যে কোন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাওয়ার আশা করা বৃথা। কেননা, এটা তখনই সম্ভব হত, যখন রসূলে করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে

বলে দিতেন যে, দশটি অথবা পাঁচটি গোনাহ কবীরা। এরপর স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিতেন যে, এই এই দশটি অথবা এই এই পাঁচটি। কিন্তু বাস্তবে এরূপ হয়নি; বরং কতক রেওয়ায়েতে কবীরার সংখ্যা তিন এবং কতক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে সাত। এরপর আরও বর্ণিত আছে যে, এক গালির বিনিময়ে দু'গালি দেয়া অন্যতম কবীরা। অথচ এটা পূর্বোক্ত তিনের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাতের মধ্যেও নয়। এ থেকে জানা গেল যে, কবীরাকে কোন বিশেষ সংখ্যায় সীমিত করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব, শরীয়ত প্রবর্তক নিজেই যখন কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি, তখন অন্যারা তা গণনা করার আশা কিরূপে করতে পারে? সংখ্যা নির্দিষ্ট না করার কারণ সম্ভবত এই ছিল, যাতে মানুষ কবীরা গোনাহকে ভয় করতে থাকে এবং এই ভয়ের কারণে সগীরা গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে; যেমন শবে বরাতকে এ জন্যে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ এর জন্যে মেহনত অব্যাহত রাখে।

অবশ্য আমাদের দ্বারা কবীরার প্রকারভেদ সঠিকভাবে বলে দেয়া এবং এর খুঁটিনাটি বিষয়াদি প্রবল ধারণা ও অনুমানের উপর ছেড়ে দেয়া সম্ভব। এছাড়া, যে গোনাহটি সর্ববৃহৎ কবীরা, তারও সংজ্ঞা বলে দিতে পারি; কিন্তু যেটি সর্বকনিষ্ঠ সগীরা গোনাহ, তার সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়।

শরীয়তের প্রমাণাদি ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আমরা জানি সকল শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করুক এবং দীদারে ইলাহীর সৌভাগ্য অর্জন করুক। কিন্তু যে পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, ঐশীগ্রন্থ ও রসূলগণকে না চিনবে এ সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। এ আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ, মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা আমার বান্দা হয়ে যায়।

বান্দা তখন বান্দা হয়, যখন নিজের মালিকের প্রতিপালকত্ব ও নিজের দাসত্বকে চিনে। এটাই রসূল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থিব জীবন ছাড়া এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। তাই দুনিয়াকে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র বলা

হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, আখেরাতের খাতিরে দুনিয়ার হেফাযতও জরুরী। আখেরাতের খাতিরে দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয় দুটি। একটি প্রাণ, অপরটি ধন-সম্পদ। অতএব, যে গোনাহ্ দ্বারা খোদায়ী মারেফতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তা সর্ববৃহৎ কবীরা। এরপর সেই কবীরার পালা আসে, যা দ্বারা জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়। কেননা, জীবিকা দ্বারাই প্রাণীর জীবন।

সুতরাং আসল উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্যে যথাক্রমে তিনটি বিষয়ের হেফাযত জরুরী হল। প্রথম, অন্তরে খোদায়ী মারেফতের হেফাযত। দ্বিতীয়, দেহে প্রাণের হেফাযত। তৃতীয়, ধন-সম্পদের হেফাযত। এ বিষয়ত্রয়ের উপর ভিত্তি করেই গোনাহের বিভক্তি হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্ববৃহৎ গোনাহ সেটি, যা খোদায়ী মারেফতের অন্তরায় হয়। এর নিচে সে গোনাহ্, যা মানুষের প্রাণরক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরপর সেই গোনাহ— যা দ্বারা জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়। এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে কোন ধর্মেই মতভেদ হতে পারে না।

অতএব, কবীরা গোনাহের তিনটি স্তর রয়েছে। এক, যা আল্লাহ্ ও রসূলের মারেফতের পরিপন্থী। একে বলা হয় কুফর। এর উর্ধ্বে কোন কবীরা নেই। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আযাবকে ভয় না করা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার বেদআতও এর কাছাকাছি। দুই, প্রাণ সম্পর্কিত কবীরা। সুতরাং কাউকে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। তবে কুফরের তুলনায় কম। কেননা, কুফরের কারণে মূল উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায়। আর হত্যার কারণে উদ্দেশ্যের উপায় বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, পার্থিব জীবন খোদায়ী মারেফতের ওসীলা। হত্যা করলে এই ওসীলা লোপ পায়। হাত-পা কর্তন করা এবং মারপিট করা, যা মৃত্যুর কারণ হয়, তাও কবীরা গোনাহের মধ্যে গণ্য। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যা অধিক কঠোর কবীরা। যিনা ও সমকামিতাও এই স্তরের মধ্যে দাখিল। সমকামিতা এ জন্যে দাখিল যে, যখন ধরে নেয়ার পর্যায়ে সকলেই পুরুষদের সাথে যৌনকর্ম সম্পাদন করতে শুরু করবে, তখন মানুষের বংশ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং হত্যার মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা যেমন কবীরা গুনাই, তেমনি যিনা ও ব্যভিচারও কবীরা গুনাহ। কেননা, তার দ্বারা যদিও বংশ বিস্তার বন্ধ হয় না;

কিন্তু বংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক উত্তরাধিকার খতম হয়ে যায়। ফলে, জীবনের শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে যিনা হত্যার তুলনায় কম কবীরা।

তিন, ধন-সম্পদ সম্পর্কিত কবীরা। সুতরাং একে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে, ছিনতাই করে অথবা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে হস্তগত করা জায়েয নয়। তবে একের ধন-সম্পদ অন্যে নিয়ে নিলে তা ফেরত দেয়া সম্ভব। খেয়ে ফেললে বা ব্যয় করে ফেললে মূল্য অথবা বিনিময় দিতে পারে। এ দিক দিয়ে ধন-সম্পদ নেয়া তেমন গুরুতর নয়। হাঁ, যদি এভাবে নেয় যে, ক্ষতিপূরণ অসম্ভব হয়ে যায়, তখন এটা কবীরা গোনাহ হওয়া উচিত। এভাবে নেয়ার সম্ভাব্য পন্থা চারটি। এক, গোপনে নেয়া, যাকে চুরি বলা হয়। এতে কেন নিল, তা অজানা থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। দুই, এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। বয়সের স্বল্পতা হেতু এতীম নালিশ করতে অক্ষম বিধায় এটাও গোপন পন্থার অন্তর্ভুক্ত। তিন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে কারও আর্থিক ক্ষতি করা। চার, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গচ্ছিত সামগ্রীর মালিক হয়ে যাওয়া।

এ চারটি পন্থা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তসমূহের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। যদিও এগুলোর কোন কোনটিতে শরীয়ত কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি। কিন্তু পর্যাপ্ত নিন্দাবাণী উচ্চারণ করেছে এবং পার্থিব শৃঙ্খলা বিধানে এগুলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাই এগুলো কবীরা হওয়াই সঙ্গত। সূদ খাওয়ার মধ্যে কেবল এতটুকুই রয়েছে যে, অপরের ধন-সম্পদ তার সন্তুষ্টিক্রমে খাওয়া হয়। কিন্তু এতে শরীয়তের সন্তুষ্টি নেই। আর ধন ছিনতাইয়ের মধ্যে কারও সন্তুষ্টি থাকে না। এতদসত্ত্বেও ছিনতাই কবীরা গোনাহ নয়। কাজেই সূদ খাওয়া কবীরা না হওয়া দরকার। কারণ, এতে ধনের মালিকের সম্মতি থাকে এবং কেবল শরীয়তের সম্মতি অনুপস্থিত থাকে। যদি বলা হয় যে, শরীয়তে সূদ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এতে কবীরা হওয়াই বুঝা যায়, তবে ছিনতাই ইত্যাদি যুলুমের ব্যাপারেও তো এরূপই বলা হয়েছে। এগুলোরও কবীরা হওয়া উচিত। অথচ এগুলো কবীরার তালিকায় দাখিল না হওয়াই প্রবল ধারণা।

এখন আবু তালেব মক্কী বর্ণিত কবীরাসমূহের মধ্যে গালি দেয়া, মদ্যপান করা, জাদু করা, জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। এগুলোর মধ্যে মদ্যপান কবীরা গোনাহ হওয়া উপযুক্ত। প্রথমত, এ কারণে যে, শরীয়ত এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছে। দ্বিতীয়ত, যুক্তির নিরিখেও এরূপ হওয়া উচিত। যুক্তি এই যে, প্রাণের হেফাযত করা যেমন জরুরী, বুদ্ধির হেফাযত করাও তেমনি জরুরী। কারণ, বুদ্ধি ছাড়া প্রাণ বেকার। এতে বুঝা গেল যে, মদ্যপান করে বুদ্ধি লুপ্ত করাও কবীরা গোনাহ। কিন্তু এই যুক্তি এক ফোঁটা মদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, এতে বুদ্ধি লোপ পায় না। সুতরাং এক ফোঁটা মদমিশ্রিত পানি পান করলে তা কবীরা না হওয়া উচিত; বরং একে নাপাক পানি বলা উচিত। কিন্তু শরীয়ত মদের জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে বিধায় একে কবীরা গণ্য করা হয়। শরীয়তের সকল রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া মানুষের সাধ্যে নেই। সুতরাং এর কবীরা হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রমাণিত হলে তা মেনে নেয়া ওয়াজিব।

অপবাদ আরোপের অবস্থা এই যে, এতে কেবল মানহানি হয়। মানের মর্যাদা ধন-সম্পদের তুলনায় কম। অপবাদের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। সর্ববৃহৎ স্তর হচ্ছে যিনার অপবাদ আরোপ করা। শরীয়তে এটা খুব গুরুতর ব্যাপার। তাই এর জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার প্রবল ধারণা, শরীয়তে যেসব গোনাহের কারণে "হদ" তথা শাস্তি ওয়াজিব হয়, সাহাবায়ে কেরাম সেগুলোকে কবীরা গণ্য করতেন। এদিক দিয়ে অপবাদ আরোপও কবীরা।

জাদুর অবস্থা এই যে, যদি তাতে কুফরী কথাবার্তা না থাকে, তবে কবীরা গোনাহ। নতুবা এর গুরুত্ব ততটুকুই হবে, যতটুকু ক্ষতি এর দ্বারা হবে; যেমন জীবন নাশ করা, রুগ্ন হওয়া ইত্যাদি। যুদ্ধের সারি থেকে পলায়ন করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানীও কিয়াস অনুযায়ী এমন যে, এ সম্পর্কে মত প্রকাশে বিরত থাকাই উপযুক্ত। এ ছাড়া এটা অকাট্যরূপে জানা আছে যে, যিনা ছাড়া মানুষকে অন্য কোন গালি দেয়া, মারা, যুলুম করা অর্থাৎ ধন ছিনিয়ে নেয়া, গৃহ থেকে উৎখাত করে দেয়া কবীরার

অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, কবীরা গোনাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা সতের বর্ণিত আছে। এগুলো সেই সতেরোর মধ্যে উল্লিখিত নেই। এমতাবস্থায় যদি পলায়ন করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করাকেও কবীরা বলা থেকে বিরত থাকা যায়, তবে তা অবান্তর হবে না। কিন্তু হাদীসে পলায়ন ও পিতামাতার নাফরমানীকে কবীরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে এগুলোকে কবীরার তালিকায় দাখিল করা উচিত।

পূর্বোল্লিখিত এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেব। এ থেকে জানা যায়, কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকলে তা সগীরা গোনাহের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এটা সর্বাবস্থায় নয়; বরং তখন কাফ্ফারা হবে, যখন সামর্থ ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যিনা করতে সক্ষম হয় এবং মনে আগ্রহও থাকে, এরপর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং শুধু দেখে ও স্পর্শ করেই ক্ষান্ত থাকে, তবে যে অন্ধকার দেখা অথবা স্পর্শ করার কারণে তার অন্তরে সৃষ্টি হবে, তার তুলনায় নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে রাখার কারণে নূর বেশী হবে। কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ এটাই। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়, অথবা কোন কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তবে তার বিরত থাকা কাফ্ফারা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মদ্যপানে মোটেই আগ্রহী নয়, এমনকি তা হালাল হলেও পান করত না, তার মদ্যপান থেকে বিরত থাকা সেসব ছোট গোনাহের জন্যে কাফফারা হবে, যা মদ্যপানের সূচনাতে হয়ে থাকে।

কবীরা যেহেতু আখেরাত সম্পর্কিত বিধানাবলীর অন্যতম, তাই শরীয়তে এর সঠিক সংখ্যা ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। উদ্দেশ্য, মানুষ যাতে নির্ভীক ও শংকামুক্ত হয়ে সগীরা গোনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এক নামায অন্য নামাযের সময় পর্যন্ত কাফফারা হয় এবং এক রমযান অন্য রমযান পর্যন্ত কাফফারা হয় তিনটি গোনাহ ছাড়া— শিরক, সুন্নত বর্জন ও চুক্তি ভঙ্গকরণ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ সুন্নত বর্জন ও চুক্তি ভঙ্গ

বলতে উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন ঃ দল থেকে বের হয়ে যাওয়া সুন্নত বর্জন এবং কারও সাথে চুক্তি করার পর তলোয়ার নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বের হয়ে পড়া চুক্তি ভঙ্গকরণ।

জান্নাত ও দোযখের স্তর পাপ ও পুণ্যের স্তরের উপর নির্ভরশীল ঃ

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের মোকাবিলায় জাগরণের মোকাবিলায় স্বপ্নের মত। হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত । বলা হয়েছে—

اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا

অর্থাৎ, মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, জাগ্রত হবে।

জাগরণের বিষয় যখন স্বপ্নে আসে, তখন তা দৃষ্টান্তের মত মনে হয়। ফলে, তা'বীর তথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এমনিভাবে আখেরাতের জাগরণে যে অবস্থা হবে, তা দুনিয়ার স্বপ্নে দৃষ্টান্তস্বরূপই প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ, স্বপ্নের মত এ অবস্থাও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে। এখানে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তিনটি কাহিনী নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করছি।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সীরীনের খেদমতে এসে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে একটি নামাঙ্কিত মোহর রয়েছে। তা দ্বারা আমি মানুষের মুখে এবং যৌনাঙ্গে মোহর করছি। তিনি বললেন ঃ মনে হয় তুমি মুয়াযযিন, রমযানে সোবহে সাদেক হওয়ার পূর্বে আযান দাও। লোকটি বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি তৈলকে তৈলবীজের মধ্যে ঢালছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কোন বাঁদী ক্রয় করে থাকলে তার অবস্থা তদন্ত করে দেখ। মনে হয় সে তোমার জননী। কেননা, তৈলের মূল হচ্ছে তৈলবীজ। এ থেকে বুঝা যায় যে, লোকটি তার মূল অর্থাৎ জননীর কাছে যায়। এরপর লোকটি তদন্ত করে জানতে পারল যে, তার বাঁদী বাস্তবিকই তার জননী ছিল। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মোতির হার শূকরের গলায় পরিধান করাচ্ছি। হযরত ইবনে সীরীন বললেন ঃ মনে হয় তুমি জ্ঞানের বিষয়াদি অযোগ্য লোকদেরকে শিখিয়ে যাচ্ছ। বাস্তবে তাই ছিল। এসব ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল রূপক বিষয়বস্তুকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়। রূপক বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যাকে

প্রতীক হিসেবে দেখলে শুদ্ধ ও সঠিক মনে হয়, আর বাহ্যিক আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে মিথ্যা মনে হয়।

উদাহরণতঃ প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যদি মুয়াযযিন কেবল বাহ্যিক আংটির প্রতি দেখত এবং তা দ্বারা মোহর করা বুঝত, তবে এ স্বপ্নকে মিথ্যা মনে করতে বাধ্য হত। কেননা, এ কাজ সে কখনও করেনি। কিন্তু মর্ম ও প্রতীকের প্রতি লক্ষ্য করার ফলে স্বপ্নটি সত্য হয়ে গেল। কারণ, মোহর করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধা দেয়া। মুয়াযযিন রমযান মাসে সোবহে সাদেকের পূর্বে আযান দিয়ে মানুষকে পানাহারে বাধা দিত। পয়গম্বরগণকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী কথাবার্তা বলেন। মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ এই যে, তারা নিদ্রিত। নিদ্রিত ব্যক্তির কাছে বস্তুর স্বরূপ রূপক আকারেই উদঘাটিত হয়। তাই পয়গম্বরগণও মানুষের সাথে রূপক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেন, যাতে তারা মূল উদ্দেশ্য বুঝে নেয়, যদিও বাহ্যিক শব্দ দ্বারা অন্য কিছু অর্থ হয়। মৃত্যুর পর মানুষ যখন জাগ্রত হবে, তখন বুঝবে, পয়গম্বরগণের কথা ঠিকই ছিল। উদাহরণতঃ হাদীসে বলা হয়েছে—

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ

অর্থাৎ, মুমিনের অন্তর আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত

আলেমগণ ব্যতীত কেউ এ হাদীসের মর্ম বুঝে না। মূর্খদের দৃষ্টি কেবল এর শাব্দিক অর্থের উপর থাকে। কেননা, তারা "তাড়ীল" নামক তাফসীর সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে, তারা শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার হাত ও অঙ্গুলি সপ্রমাণ করে। (নাউযুবিল্লাহ)

এমনিভাবে অপর এক হাদীসে আছে اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ (আল্লাহ আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।)

এতে মূর্খরা কেবল বাহ্যিক আকৃতি ও রং বুঝে নিয়ে আল্লাহ তা'আলাকেও এমনি মনে করে। অথচ তিনি এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র। এসব কারণেই কতক লোক আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপারে দারুণ

হোঁচট খেয়েছে। এমনকি, তারা আল্লাহর কালামকে অক্ষর ও শব্দভুক্ত মনে করে নিয়েছে। আখেরাতের বিষয় সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে কেউ কেউ সেগুলোকে অস্বীকার করে একারণে যে, তাদের কাছে বাহ্যিক শব্দই উদ্দেশ্য। আর বাহ্যিক শব্দের মাঝে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ হাদীসে আছে—

يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى صُوْرَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُذْبَحُ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা ভেড়ার আকারে উপস্থিত করে যবাহ করা হবে।

ধর্মদ্রোহী বোকারা এটা মানে না এবং পয়গম্বরণের প্রতি মিথ্যারোপ করে। প্রমাণ এই যে, মৃত্যু একটি অশরীরী বস্তু, আর ভেড়া শরীরী। অতএব, অশরীরী বস্তুর শরীরী হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব নির্বোধকে আপন রহস্যাবলীর মারেফত থেকে অনেক ক্রোশ দূরে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

অর্থাৎ, কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসব রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

মূর্খরা একথাও জানে না যে, কেউ যদি কাউকে বলে ঃ আমি স্বপ্নে একটি ভেড়া দেখেছি, যাকে মানুষ মহামারী বলে। ভেড়াটি পরে যবাহ হয়ে গেছে। একথা শুনে শ্রোতা জওয়াব দিল ঃ তুমি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছ। মনে হয়, মহামারী খতম হয়ে যাবে। কেননা, যবাহ করা জন্তুর ফিরে আসা কল্পনাতীত। এখানে ব্যাখ্যাতাও সত্যবাদী এবং যে স্বপ্ন দেখেছে, সে-ও সত্যবাদী। আসলে স্বপ্ন দেখানো যে ফেরেশতার কাজ, সে নিদ্রিত ব্যক্তিকে "লওহে মাহফুযের" বিষয়টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ বুঝিয়ে দিয়েছে। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝা সম্ভব ছিল না। এখন আমরা আসল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে আসছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতে জান্নাত ও দোযখের স্তরসমূহের বিভাজন দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝা অসম্ভব। সুতরাং আমরা যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব, তা দ্বারা অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে নিতে হবে, আকার ও শব্দের পেছনে পড়া যাবে না।

আখেরাতে মানুষের অনেক প্রকার হবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যে তাদের স্তর ও উপলব্ধির সীমাহীন তফাৎ হবে। যেমন, দুনিয়ার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে তাদের তফাতের অন্ত নেই। এ ব্যাপারে দুনিয়া ও আখেরাতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, উভয় জগতের পরিচালক একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ। তার চিরন্তন তরীকা ও পদ্ধতিও একই রকম। যেহেতু আমরা স্তরসমূহ গণনা করতে অক্ষম, তাই এগুলোর শ্রেণী সীমিত করে বর্ণনা করছি।

কিয়ামতের দিন মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় শাস্তিপ্রাপ্ত, তৃতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত এবং চতুর্থ সফলকাম। দুনিয়াতে এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন বাদশাহ যুদ্ধ করে কোন দেশ জয় করলে তার অধিবাসীদের কতককে হত্যা করে— এরা প্রথম শ্রেণী, কতককে দীর্ঘকাল জেলে আটকে রাখে— এরা দ্বিতীয় শ্রেণী, কতককে ছেড়ে দেয়—এরা তৃতীয় শ্রেণী এবং কতককে পুরস্কৃত করে—এরা চতুর্থ শ্রেণী। বাদশাহ ন্যায়পরায়ণ হলে এসব আচরণ বিনা কারণে হবে না। হত্যা তাদেরকেই করবে, যারা তার অধিকারকে অস্বীকার করবে এবং তার বন্ধুর শত্রু হবে। জেলে তাদেরকে পাঠাবে— যারা তার আধিপত্য স্বীকার করবে; কিন্তু আনুগত্য ও খেদমতে ত্রুটি করবে। মুক্তি তাদেরকে দেবে, যারা কেবল তার বশ্যতা মেনে নেবে। পুরস্কৃত তাদেরকে করবে, যারা আজীবন তার খেদমত ও সহযোগিতায় দিনাতিপাত করবে। এরপর এটাও জরুরী যে, যে যেরূপ খেদমত করবে, সে অনুপাতেই সে পুরস্কার পাবে। হত্যাও বিভিন্ন প্রকার বের হবে। কারও শুধু গর্দান নেয়া হবে এবং কাউকে নাক, কান ও হাত-পা কেটে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ অস্বীকারের স্তর অনুযায়ী হত্যাও বিভিন্ন স্তর হবে। অনুরূপভাবে যাদেরকে জেল দেয়া হবে, তাদেরও বিভিন্ন স্তর হবে— কাউকে কম সময়ের এবং কাউকে বেশী সময়ের। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর অসংখ্যা ও অগণিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে কিয়ামতে এই চার শ্রেণীর স্তর অসংখ্য হবে। উদাহরণতঃ চতুর্থ শ্রেণী যারা সফলকাম হবে, তাদের কেউ জান্নাতে আদনে, কেউ জান্নাতে মাওয়ায় এবং কেউ জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত

শ্রেণীর মধ্যে কেউ অল্পদিন, কেউ হাজার বছর এবং কেউ সাত হাজার বছর শাস্তি ভোগ করবে। এরা সকলের পেছনে দোযখ থেকে বের হবে।

এখন আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর বিভাজন বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। প্রথম শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্তদের। তারা সে লোক, যারা আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে না। কেননা, উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বাদশাহর কাছে তারাই হত্যাযোগ্য ছিল, যারা বাদশাহের সন্তুষ্টি, সম্মান ও পুরস্কার প্রার্থনা করত না। বলা বাহুল্য, এটা হচ্ছে কাফেরদের শ্রেণী। তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল দুনিয়ার পূজারী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও ঐশী গ্রন্থসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা, আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়া এবং তাঁর দীদারের গৌরব অর্জন করাই হচ্ছে পারলৌকিক সৌভাগ্য। ঈমান ব্যতীত এই নেয়ামত অর্জন করা সম্ভব নয়। কাফেররা এটা অস্বীকার করে। তাই তারা এই নেয়ামত থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী শাস্তিপ্রাপ্তদের। তারা সেই লোক, যারা মূলত ঈমানদার; কিন্তু ঈমান অনুযায়ী আমলে ত্রুটি করে। উদাহরণতঃ তারা ঈমান রাখে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করা যাবে না। এখন যদি কেউ আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তবে তার উপাস্য সেই প্রবৃত্তিই হবে। সে কেবল মুখে মুখে তাওহীদ বলে। সত্যিকার তাওহীদ তার মধ্যে নেই। সত্যিকার তাওহীদ তখন হবে, যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার পর আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু পরিত্যাগ করে এবং সরল পথে কায়েম থাকে, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, এরপর সুদৃঢ় থাকে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সরলপথ থেকে কিছু না কিছু বিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেই প্রবৃত্তির অনুসরণ অবশ্যই করে— যদিও তা সামান্য ব্যাপারে হয়। ফলে, নৈকট্যের স্তরেও ত্রুটি দেখা দেয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই শাস্তি হবে। কিন্তু এই শাস্তির তীব্রতা ও স্বল্পতা ঈমানের শক্তি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কমবেশী হওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই সেটা অতিক্রম করবে। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। এরপর আমি খোদাভীরুদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

এ কারণেই আগেকার দিনের বুযুর্গগণ ভয় করতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী দোযখভোগ নিশ্চিত এবং রক্ষা পাওয়া সন্দেহযুক্ত। এটাই আমাদের ভয়ের কারণ। হাদীসদৃষ্টে জানা যায়, সকলের শেষে যে ব্যক্তি দোযখ থেকে বের হবে, সে সাত হাজার বছর পরে বের হবে। কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে দোযখের ওপারে চলে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে চলে যাবে। তাদের এক দণ্ডও দোযখে অবস্থান করতে হবে না। এক দণ্ড এবং সাত হাজার বছরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক স্তর রয়েছে।

এখন আমরা বলছি, যে ব্যক্তি মূল ঈমানকে শক্তিশালী করে সকল কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সকল ফরয কর্ম অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামায উত্তমরূপে আদায় করবে এবং মাত্র কয়েকটি সগীরা গোনাহই তার যিম্মায় থাকবে, যা সে উপর্যুপরি করেনি, মনে হয় তার কেবল হিসাবই নেয়া হবে— কোন প্রকার আযাব হবে না। হিসাবের সময় তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আছে, পাঞ্জেগানা নামায, জুমআ এবং রমযানের রোযা মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যে সগীরা গোনাহের জন্যে কাফফারা হয়ে যায়, একথা কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। কাফফারা হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে হিসাব রোধ করতে না পারলেও আযাব রোধ করা। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি হিসাব শেষ হওয়ার পর সুখে থাকবে।

যে ব্যক্তি একটি অথবা বেশী কবীরা গোনাহ করে এবং ফরয কর্মও কতক বর্জন করে, সে মৃত্যুর পূর্বে খাঁটি তওবা করলে এমন হয়ে যাবে, যেমন সে কোন গোনাহই করেনি। আর যদি তওবার পূর্বে মারা যায়, তবে

মৃত্যুর সময় তার অবস্থা আশংকাজনক হবে। উপর্যুপরি গোনাহ্ করা অবস্থায় মারা গেলে তার ঈমান না থাকা বিচিত্র নয়।

তৃতীয় শ্রেণী মুক্তিপ্রাপ্তদের। তারা সেই লোক, যারা কেবল আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তারা কোন খেদমত করেনি তাই পুরস্কার পাবে না এবং কোন দোষও করেনি তাই আযাবও হবে না। এ অবস্থা কাফেরদের মধ্য থেকে উন্মাদ, বালক ও অজ্ঞানদের হবে এবং সেসব লোকের হবে, যাদের কাছে জনপদ থেকে আলাদা থাকার কারণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। এরূপ লোকেরা না আল্লাহকে জানে, না তাঁকে অস্বীকার করে। ফলে, এবাদত ও গোনাহ্ কিছুই করে না। একারণেই তারা জান্নাতেও থাকবে না এবং দোযখেও যাবে না; বরং জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক জায়গায় অবস্থান করবে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় "আ'রাফ" বলা হয়। এটা কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত। তবে বিশেষ কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় যে, তারাও অকাট্যরূপে আ'রাফে থাকবে—এটা অনিশ্চিত; যেমন কাফেরদের বালকদের আ'রাফে থাকা অকাট্য নয়। কারণ বালকদের ব্যাপারে হাদীসও বিভিন্নরূপ বর্ণিত রয়েছে। একবার জনৈক বালক মারা গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সে জান্নাতের পাখীদের অন্যতম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে জানলে? এতে ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ শ্রেণী সফলকামদের। তারা সে লোক, যারা অনুকরণ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলাকে চিনে নেয়। তারাই নৈকট্যশীল ও অগ্রগামী। তারা বর্ণনাতীত নেয়ামত ও সম্ভোগপ্রাপ্ত হবে। এ সম্পর্কে কোরআনে যা উল্লিখিত হয়েছে, তাই বর্ণনা করা যায়। আল্লাহর বর্ণনার অধিক কে কি বলবে? যেহেতু এ জগতে এর বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব, তাই আল্লাহ তা'আলা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, তাদের চক্ষু শীতল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাদের জন্যে যা যা গোপন রেখেছেন, তা কেউ জানে না।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

اعددت لعبادى الصالحين مالاعين رات ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر -

অর্থাৎ, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্যে এমন বস্তু প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায় উদয় হয়নি।

খোদাপ্রেমিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে অবস্থাই হয়, যা এ জগতে কোন মানুষের কল্পনায় আসতে পারে না। জান্নাতের হুর, প্রাসাদ, ফলমূল, দুধ, মধু, পানীয়, কংকন ও অলংকারের প্রতি তাদের আদৌ কোন মোহ থাকে না। তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া হলে তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকবে না; বরং দীদার তথা আল্লাহকে দেখার আনন্দ লাভ করার জন্যে তারা উদগ্রীব থাকবে, যা হবে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও অপার আনন্দ। একারণেই হযরত রাবেয়া বসরীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাতে আপনার ঔৎসুক্য কি হবে? তখন তিনি বললেন ঃ প্রথমে গৃহকর্তা, এরপর গৃহ। মোটকথা, খোদাপ্রেমিকদের অন্তর গৃহকর্তা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহব্বতেই ডুবে থাকে। গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের সাজ-সজ্জার প্রতি তাদের মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি, এই মহব্বতের কারণে তারা নিজেদের সম্পর্কেও বেখবর থাকে। ফলে, দৈহিক কষ্ট অনুভব করে না। এ অবস্থাকে বলা হয় "ফানা ফিল মাহবুব" (প্রেমাস্পদে লীন)।

সগীরা গোনাহ্ কিরূপে কবীরা হয়ে যায় ঃ জানা উচিত যে, সগীরা গোনাহ্ কয়েকটি কারণে কবীরা হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অব্যাহতভাবে করে যাওয়া। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, কোন গোনাহ অব্যাহতভাবে করা হলে তা সগীরা নয় এবং যে কোন গোনাহ্ এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) সহকারে করা হলে তা কবীরা নয়। এর সারমর্ম এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি কবীরা গোনাহ্ করে বিরত থাকে এবং অন্য কবীরা গোনাহ না করে, তবে এতে ক্ষমা পাওয়ার আশা অধিক সেই সগীরা গোনাহের তুলনায়— যা অব্যাহতভাবে করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি শক্ত

পাথরের উপর এক এক ফোঁটা পানি অব্যাহতভাবে পতিত হতে থাকে, তবে এক সময়ে পাথরে চিহ্ন দেখা দেবে। পক্ষান্তরে যদি সকল ফোঁটার পানি একত্রিত করে এক সাথে সেই পাথরের উপর ঢেলে দেয়া হয়, তবে কোন চিহ্ন দেখা দেবে না। অব্যাহতভাবে করার এই প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন।

خَيْرُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ

অর্থাৎ, সর্বোত্তম আমল তাই, যা অব্যাহতভাবে করা হয়— যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, স্থায়ী আমল কম হলেও উপকারী। এর বিপরীতে আরও জানা গেল যে, অনেক আমল যা মানুষ একবারে করে নেয়, তা অন্তরের পবিত্রতায় কম উপকারী হয়ে থাকে। এমনিভাবে সগীরা গোনাহ যদি অব্যাহতভাবে করা হয়, তবে তা অন্তরকে মলিন ও তমসাচ্ছন্ন করার ব্যাপারে অধিক প্রভাবশালী হবে। তবে একথা ঠিক যে, অগ্রে ও পশ্চাতে সগীরা গোনাহ না করে সহসাই কবীরা গোনাহ করার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। উদাহরণতঃ হত্যাকারী সহসাই কাউকে হত্যা করে না যে পর্যন্ত পূর্ব থেকে শত্রুতা না হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক কবীরা গোনাহ করার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে শুরুতে ও শেষে সগীরাও করা হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে সগীরা ব্যতিরেকেই সহসা কবীরা গোনাহ হয়ে যায় এবং পুনর্বার তা না করা হয়, তবে সম্ভবত এই কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার আশা সেই সগীরার তুলনায় বেশী, যা আজীবন করা হয়।

সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে গোনাহকে ছোট মনে করা। কেননা, এটাই নিয়ম যে, মানুষ নিজের গোনাহকে যত বড় মনে করবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা ততই ছোট হবে এবং গোনাহকে যত সগীরা মনে করবে, তা ততই কবীরা হবে। কারণ, গোনাহকে বড় মনে করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, অন্তরে গোনাহের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে, অন্তরে এর প্রভাব বেশী হয় না। পক্ষান্তরে গোনাহকে ছোট মনে করলে বুঝা যায়, অন্তরে এর প্রতি টান রয়েছে। এ কারণেই অন্তরে এর প্রভাব বেশী হয়। আর এ কারণেই

মানুষ অসাবধানতায় কোন পাপ করে ফেললে তজ্জন্য পাকড়াও করা হয় না। কেননা, এ অবস্থায় অন্তর প্রভাবিত হয় না।

হাদীস শরীফে আছে, ঈমানদার ব্যক্তি তার গোনাহকে এমন মনে করে— যেন মাথার উপর একটি পাহাড় এসে গেছে এবং এক্ষণি তা মাথার উপর পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুনাফিক তার গোনাহকে এমন মনে করে— যেন নাকের ডগায় মাছি বসেছে এবং তাকে উড়িয়ে দিয়েছে। ঈমানদারের অন্তরে গোনাহের এই গুরুত্বের কারণ এই যে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন সে চিন্তা করে যে, এই গোনাহের মাধ্যমে সে কার অবাধ্যতা করেছে, তখন সগীরা গোনাহও তার দৃষ্টিতে কবীরা প্রতিভাত হয়। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন এক নবীকে এই ওহী প্রেরণ করেন যে, উপঢৌকন কম—এদিকে লক্ষ্য করো না, বরং দেখ, যে প্রেরণ করেছে, সে কতটুকু মহান। তোমার পাপ ছোট—এদিকে দেখো না, বরং ভেবে দেখ, এ পাপ করে তুমি কার মোকাবিলা করেছ? এদিক দিয়েই জনৈক সাধক বলেন ঃ সগীরা গোনাহের কোন অস্তিত্বই নেই। যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা হয়, তা কবীরা-ই বটে।

সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গোনাহ করে উল্লসিত হওয়া এবং গর্ব করা। অতএব, মানুষ সগীরা গোনাহের যত বেশী স্বাদ পাবে, ততই তা কবীরা হবে। অন্তরকে তমসাচ্ছন্ন করার ব্যাপারে তার প্রভাবও বেশী হবে। এমনকি, কতক গোনাহগার তাদের গোনাহের জন্যে বাহবা পেতে চায় এবং গোনাহ করে খুব আস্ফালন করে। উদাহরণতঃ কোন কোন ব্যবসায়ী বলে— দেখ, আমি খারাপ মাল কিভাবে চালিয়ে দিলাম এবং ক্রেতাকে ধোকা দিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, এসব কারণে সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সময় দেয়া ও সহ্য করাকে তাঁর অনুগ্রহ মনে করে নিলেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। এই অনুগ্রহ মনে করার কারণে গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ বর্জন করতে অলসতা করে। সে জানে না যে, এই সময় দেয়ার পেছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও বেশী গোনাহ করে নিক। সুতরাং বাস্তবে যা ক্রোধের কারণ, তাকেই অনুগ্রহের কারণ মনে করে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

অর্থাৎ, তারা মনে মনে বলে ঃ আমাদের কথার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্যে জাহান্নাম যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। এটা অত্যন্ত মন্দ জায়গা।

গোনাহ্ করে তা বলে বেড়ানো অথবা অপরের সামনে গোনাহ করার কারণেও সগীরা গোনাহ্ কবীরা হয়ে যায়। কেননা, এতে প্রথমত, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে গোপন রাখা হয়, তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, অপরকে এ গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। ফলে, এক গোনাহের মধ্যে যেন দু'গোনাহ হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে, সকল মানুষের দোষ মার্জনা করা হবে; কিন্তু যারা গোনাহ্ করে ফাঁস করে দেয়, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। অর্থাৎ কেউ রাতের বেলায় দোষ করল, যা আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে গাত্রোত্থান করে সে আল্লাহর পর্দাকে ছিন্ন করল এবং আপন গোনাহ্ প্রকাশ করে দিল। এরূপ ব্যক্তির দোষ মার্জনা করা হবে না। গুণ প্রকাশ করা, দোষ গোপন করা এবং গোপন বিষয় ফাঁস না করা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নেয়ামত। যে ব্যক্তি নিজের দোষ প্রকাশ করে দেয়, সে এই নেয়ামতের নাশোকরী করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ প্রথমত, মানুষের কোন গোনাহ্ না করা উচিত। যদি করেও, তবে অপরকে উৎসাহিত না করা উচিত।

গোনাহগার ব্যক্তি আলেম ও অনুসৃত হলেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। আলেম ব্যক্তি যখন কোন সগীরা গোনাহ্ করে এবং তার অনুসরণে অন্যরাও তা করতে থাকে, তখন এ গোনাহ্ আলেম ব্যক্তির জন্যে কবীরা হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা, সন্দেহযুক্ত ধনসম্পদ গ্রহণ করা, শাসকবর্গের কাছে আসা-যাওয়া করা, তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এবং মুসলমানের মর্যাদাহানি করা ইত্যাদি। মানুষ আলেমের এ ধরনের দোষের সনদ পেশ করে থাকে। আলেম মরে যায়। কিন্তু তার অনিষ্ট অব্যাহত থাকে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সাথে সাথে তার পাপও

মরে যায়, সে চমৎকার ব্যক্তি। হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি কুপ্রথা চালু করে, সে নিজে সেই কাজ করার জন্যে গোনাহগার হবে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের পাপও তার উপর বর্তাবে এমতাবস্থায় যে, তাদের পাপ হ্রাস করা হবে না। অর্থাৎ যারা করবে তাদের পাপ আলাদা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

অর্থাৎ, আমি সেই আমল লিখি, যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং সেই আমল, যার চিহ্ন তাদের পেছনে থাকে।

এখানে "পেছনের চিহ্ন" বলে সেই আমলকে বুঝানো হয়েছে, যা আমলকারীর মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আলেমের দুর্ভোগ অপরের অনুসরণের কারণে হয়ে থাকে। সে ভুল করলে তওবা করে নেয়; কিন্তু মানুষ এরপরও তার অনুসরণ করতে থাকে এবং কাজটিকে ছড়াতে থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেমের দোষ নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ার মত। এতে নৌকা নিজেও নিমজ্জিত হয় এবং যাত্রীদেরকেও ডুবিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেম মানুষকে বেদআত শিক্ষা দিয়ে গোমরাহ্ করত। পরবর্তীতে তার তওবা নসীব হয় এবং সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের সংস্কারে নিয়োজিত থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা সমসাময়িক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তাকে বলে দাও, যদি তুমি কেবল আমারই দোষ করতে, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দিতাম। কিন্তু তুমি তো বহু মানুষকে গোমরাহ করেছ, যে কারণে আমি তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করেছি।

এ থেকে বুঝা গেল, আলেমদের দুটি বিষয় করা উচিত। প্রথমত, তারা মূলতই গোনাহ্ বর্জন করবে। দ্বিতীয়ত, যদি গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে তা প্রকাশ করবে না। আলেমদের গোনাহের শাস্তি যেমন বেশী হয়, তেমনি তাদের পুণ্যকর্মের সওয়াবও অন্যদের অনুসরণের কারণে বেশী হয়। উদাহরণতঃ যদি আলেম বাহ্যিক সাজসজ্জা ও দুনিয়ার মোহ বর্জন করে এবং অল্প দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তার এই রীতি অন্যরাও অবলম্বন করে, তবে অন্যরা যে পরিমাণ সওয়াব পাবে, তার সমস্তই সে-ও পাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণাঙ্গ তওবা ও তার শর্তাবলী

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তওবা সেই অনুশোচনাকে বলা হয়, যার ফলস্বরূপ সংকল্প অস্তিত্ব লাভ করে। নিজের এবং প্রেমাস্পদের মাঝে গোনাহের প্রাচীর খাড়া হওয়ার জ্ঞান হচ্ছে এই অনুশোচনার কারণ। সুতরাং তওবার অংশ হচ্ছে জ্ঞান, অনুশোচনা ও সংকল্প। এই অংশত্রয়ের প্রত্যেকটির জন্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গতার পরিচয় ও স্থায়িত্বের শর্তাবলী। এগুলো বর্ণনা করা জরুরী। জ্ঞানের বর্ণনা হচ্ছে তওবার কারণ বর্ণনার নামান্তর, যা পরে উল্লিখিত হবে। এখানে প্রথমে অনুশোচনা বলা হয় অন্তরের ব্যথাকে, যা প্রেমাস্পদকে হারানোর সংবাদ শুনে সৃষ্টি হয়। এর পরিচয় হচ্ছে অত্যধিক দুঃখ ও বেদনা হওয়া, অশ্রু বিসর্জন করা এবং প্রচুর কান্নাকাটি করা; যেমন কেউ আপন সন্তান অথবা কোন প্রিয়জনের বিপদ সম্পর্কে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে এবং প্রচুর কান্নাকাটি করে।

এখন প্রশ্ন হল নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কি, জাহান্নামের অগ্নির চেয়ে বড় বিপদ আর কি এবং গোনাহের চেয়ে বেশী আযাব নাযিল হওয়ার প্রমাণ কোন্‌টি? বরং একজন মানুষ যাকে চিকিৎসক বলা হয়, সে যদি কোন ব্যক্তিকে বলে দেয়, তোমার পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে অতিসত্বর মারা যাবে, তবে তৎক্ষণাৎ সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পরে এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অথচ পুত্র প্রাণাধিক প্রিয় নয় এবং ডাক্তারও আল্লাহ ও রসূলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও সত্যবাদী নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের উচিত নিজের দুরবস্থার জন্যে অধিক দুশ্চিন্তা ও দুঃখ করা। দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অনুতাপ যত বেশী হবে, সে পরিমাণে গোনাহ দূর হওয়ার আশা করা যাবে। মোটকথা, অন্তরের বিনম্রতা এবং অশ্রুপাত হল বিশুদ্ধ অনুশোচনার লক্ষণ। হাদীসে বর্ণিত আছে, তওবাকারীদের সংসর্গ অবলম্বন কর। তাদের অন্তর খুব নরম থাকে।

অন্তরে গোনাহের স্বাদের পরিবর্তে তিক্ততা প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অনুশোচনার একটি লক্ষণ। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি

গোনাহ্‌ করার পর অনেক বছর পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকে। কিন্তু তওবা কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। অগত্যা সে সমসাময়িক পয়গম্বরের কাছে সুপারিশ প্রার্থী হল। পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করলেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যদি ভূ-পৃষ্ঠের সকলেই তার জন্যে সুপারিশ করে, ত . আমি তার তওবা কবুল করব না— যতক্ষণ পর্যন্ত যে নাহ্‌ থেকে সে তওবা করেছে, তার স্বাদ তার অন্তরে থাকবে।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, গোনাহ্‌ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কাছে সুস্বাদু হয়ে থাকে। সুতরাং এর তিক্ততা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে কিরূপে? জওয়াব এই যে, মনে কর কেউ বিষ মিশ্রিত মধু পান করল। অধিক মিষ্ট হওয়ার কারণে সে পান করার সময় বিষ টের পেল না। এরপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে গেল। এখন যদি কেউ তার সামনে পূর্ববৎ বিষ মিশ্রিত মধু পেশ করে এবং সেও চরম ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়, তবে সে এই মধুকে ঘৃণা করবে কি না? যদি বল করবে না তবে এটা অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। নিয়ম এই যে, এহেন কষ্ট ভোগ করার পর যদি কেউ খাঁটি মধুও পেশ করে, তবে একরূপ রঙ দেখে তা-ও প্রত্যাখ্যান করবে। কথায় বলে চুন খেয়ে মুখ পুড়লে দৈ দেখলেও ভয় লাগে। অতএব, তওবাকারী ব্যক্তি অন্তরে গোনাহের যে তিক্ততা অনুভব করে, তাও এমনিভাবে বুঝা দরকার। প্রথমে সে জানে, প্রত্যেক গোনাহের স্বাদ মধুর মত মিষ্ট। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বিষের অনুরূপ। এরূপ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তওবা খাঁটি ও সাচ্চা হয় না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস খুব বিরল। তাই তওবা এবং তওবাকারীও বিরল। সকলেরই এক অবস্থা। তারা আল্লাহর প্রতি বিমুখ এবং গোনাহে অবিচল।

এখন সংকল্প সম্পর্কে বলা যাক। এটা অনুশোচনা থেকে উৎপন্ন হয় এবং তিনটি কালের সাথেই এর সম্পর্ক। বর্তমানকালে সংকল্পের অর্থ এই যে, যে নিষিদ্ধ কাজ করে যাচ্ছে, তা বর্জন করবে এবং যে ফরয কর্ম করার উদ্যোগ নিয়েছে, তা তখনই আদায় করে নেবে। অতীতকালে সংকল্পের মানে এই যে, পূর্বে যে ত্রুটি হয়ে গেছে, তা পূরণ করবে। ভবিষ্যতকালে সংকল্পের উদ্দেশ্য হল মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত-বন্দেগী অব্যাহত রাখবে এবং গোনাহ্‌ বর্জন করবে।

অতীতকালের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত এই যে, চিন্তা করে বের করবে কোন্ দিন সে বালেগ হয়েছিল। এটা জানা হয়ে গেলে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যতুটুকু বয়স হয়েছে, তার এক এক বছর, মাস ও দিনের মধ্যে খোঁজ করে দেখবে কোন্ এবাদতে সে ক্রটি করেছে অথবা কি পরিমাণ গোনাহ করেছে। যদি জানা যায় যে, কতক নামায সে পড়েনি, তবে সেই নামাযের কাযা পড়বে। এরূপ নামাযের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলে বালেগ হওয়ার দিন থেকে হিসাব করে যে পরিমাণ নামায নিশ্চিতরূপে আদায় করা হয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নামাযের কাযা পড়বে। এরূপ নামাযের সংখ্যা আন্দাজ করে নেয়াও জায়েয। রোযার ক্ষেত্রেও এভাবে আন্দাজ করে নেবে, কয়টি রোযা রাখা হয়নি। এরপর সেগুলোর কাযা করে নেবে। যাকাত না দিয়ে থাকলে নিজের সমস্ত ধন -সম্পদকে দেখবে, কবে থেকে তার মালিকানায় এসেছে। তবে এতে বালেগ হওয়ার শর্ত নেই। কেননা, নাবালেগের মালেও যাকাত ফরয হয়। অতঃপর হিসাব করে প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে, তা আদায় করে দেবে। এ হচ্ছে এবাদতে খোঁজাখুঁজি করে ক্রটি জানা ও তা পূরণ করার পদ্ধতি।

গোনাহের ক্ষেত্রে উপায় এই যে, বালেগ হওয়ার শুরু থেকে তওবার দিন পর্যন্ত নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ দিন ও ঘন্টায় চিন্তা করবে এবং পৃথক পৃথক গোনাহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে। এরপর দেখবে এসব গোনাহের কোন্ কোন্টি আল্লাহর হক সম্পর্কিত এবং কোন্ কোন্টি বান্দার হক সম্পর্কিত। যে সকল গোনাহ্ আল্লাহর হক সম্পর্কিত, সেগুলো থেকে তওবার উপায় হচ্ছে দুঃখ ও অনুতাপ করা এবং প্রত্যেক গোনাহের বিনিময়ে সৎকর্ম করা। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ গোনাহ হবে, সে পরিমাণে সৎকর্ম করতে হবে। কারণ, হাদীসে আছে—তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং গোনাহের পশ্চাতে সৎকর্ম সম্পাদন কর; বরং কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ, সৎকর্ম পাপকে মিটিয়ে দেয়।

এই বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেউ বাদ্যযন্ত্র শুনে থাকে, তবে তার বিনিময়ে ততক্ষণ কোরআন, ওয়ায অথবা যিকর শুনবে। মসজিদে নাপাক অবস্থায় বসে থাকলে, ততক্ষণ এতেকাফের নিয়তে বসে এবাদতে মশগুল হবে। উযু ছাড়া কোরআন মজীদ স্পর্শ করে থাকলে তার সম্মান করবে, অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করবে এবং চুম্বন করবে। মদ্যপান করে থাকলে হালাল উপার্জনের শরবত সদকা করবে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক গোনাহের বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা সেই গোনাহের বিপরীত সৎকর্মের আলো ছাড়া দূর হবে না। উদাহরণতঃ কাল রঙ দূর করতে হলে সাদা রঙ প্রয়োগ করতে হবে। উত্তাপ ও শৈত্য দ্বারা তা দূর হবে না। গোনাহ দূর করার জন্যে এ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ ও সহজ– যদিও এক প্রকার এবাদত অব্যাহতভাবে করতে থাকলেও কিছুটা ফল লাভের আশা আছে। বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা গোনাহ দূর হওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল শিকড়। দুনিয়ার অনুগামী হওয়ার প্রভাবে অন্তর দুনিয়ার প্রতি তুষ্ট থাকে এবং তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হয়। অতএব, মুসলমান ব্যক্তির উপর এমন বিপদ আসা জরুরী, যা দ্বারা তার অন্তর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, দুঃখ ও বেদনার কারণে অন্তর দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। এটাও তার জন্যে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

হাদীসে আছে, কতক গোনাহের জন্য কেবল দুঃখ ও বেদনাই হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে—যখন বান্দার গোনাহ বেশী হয়ে যায় এবং কাফফারার জন্যে আমল থাকে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দুঃখ ও কষ্টে ফেলে দেন এবং এ দুঃখ-কষ্টই তার গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট অধিকাংশ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জাঁকজমকের কারণে হয়ে থাকে। এটা গোনাহ। সুতরাং গোনাহের কাফফারা গোনাহ কিরূপে হবে? এর জওয়াব এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত গোনাহ এবং এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকা এ গোনাহের বিনিময়। মহব্বতের চাহিদা অনুযায়ী ভোগ করলে পূর্ণ দোষী হত। বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল বন্দীশালায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে গমন করলে তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই

দরদী বৃদ্ধ অর্থাৎ হযরত এয়াকুব (আঃ)-কে কি অবস্থায় রেখে এসেছেন? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ তিনি আপনার জন্যে যে দুঃখ সয়েছেন, তা এমন একশ' জন মহিলার দুঃখের সমান, যাদের সন্তান মারা গেছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি আল্লাহর কাছে এই দুঃখ-কষ্টের সওয়াব কি পরিমাণে পাবেন? উত্তর হল ঃ তিনি শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবেন। এ থেকে বুঝা গেল, দুঃখ-কষ্টও আল্লাহর হকের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যে সকল গোনাহ বান্দার হক সম্পর্কিত, সেগুলোতেও আল্লাহ তা'আলার হক থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যুলুম তথা অন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি অপরের প্রতি যুলুম করে, সে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করে। এ ধরনের গোনাহে আল্লাহর হক পূরণ করার উপায় হচ্ছে অনুতাপ ও দুঃখ করা এবং ভবিষ্যতে এরূপ গোনাহ না করা। এ ছাড়া, এ ধরনের গোনাহের বিপরীত পুণ্যকাজ করা। উদাহরণতঃ কারও মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার প্রতি অনুগ্রহ করা। কারও ধন-সম্পদ ছিনিয়ে থাকলে তার কাফফারা স্বরূপ নিজের হালাল ধন-সম্পদ খয়রাত করা। কারও গীবত ও তিরস্কার করে থাকলে তার প্রশংসা কীর্তন করা। কোন মানুষকে হত্যা করে থাকলে ক্রীতদাস মুক্ত করা। কেননা, এটাও এক ধরনের জীবন দান।

তবে বান্দার হক সম্পর্কিত গোনাহসমূহে কেবল অনুতাপ করা এবং বিপরীত সৎকর্ম করাই যথেষ্ট নয়; বরং এ ক্ষেত্রে বান্দার হক আদায় করাও জরুরী। যদি বান্দার হক প্রাণনাশের সাথে সম্পর্ক হয়, যেমন কাউকে ভুলক্রমে খুন করে থাকলে তার তওবা হচ্ছে রক্ত বিনিময় আদায় করা। প্রাপক ব্যক্তিবর্গকে রক্তবিনিময় না দেয়া পর্যন্ত খুনী ব্যক্তি অপরাধমুক্ত হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে থাকে, তবে এর তওবা "কেসাস" তথা খুনের বদলে খুন দ্বারাই গ্রহণীয় হবে। যদি হত্যার ব্যাপারটি অজানা থাকে, তবে হত্যাকারীর জন্যে ওয়াজিব নিহত ব্যক্তির ওলীর কাছে হত্যার কথা স্বীকার করা এবং আত্মসমর্পণ করা। এরপর সে ক্ষমা করুক অথবা হত্যার বদলে হত্যা করুক। এ ছাড়া, হত্যাকারী কিছুতেই পাপমুক্ত হবে না। এখানে হত্যার বিষয় গোপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কিন্তু যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি আল্লাহর হক সম্পর্কিত গোনাহের ক্ষেত্রে তওবার জন্যে

গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং শাস্তির জন্যে ওলীর কাছে আত্মসমর্পণ করা জরুরী নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহ যেমন গোপন রেখেছেন, তেমনি গোপন থাকতে দেয়া এবং নিজের শাস্তি নিজেই সাব্যস্ত করা। যেমন, পাপমোচনের জন্যে নানা রকম সাধনায় রত হওয়া। কেননা, আল্লাহর হক কেবল তওবা ও অনুতাপ দ্বারা মাফ হতে পরে। যদি এসব ক্ষেত্রে তওবাকারী আপন গোনাহ আদালতে পেশ করে শাস্তি গ্রহণ করে, তবে তওবা সঠিক ও যথার্থ হবে এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মায়েয ইবনে মালেক (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আমি নিজের উপর ভয়ানক যুলুম করেছি। আমি যিনা করেছি। হুযুর, আমাকে পাপমুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। দ্বিতীয় দিন তিনি এসে আবারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবারও তার কথা কানে তুললেন না। যখন তৃতীয় দিন এসে একই কথা আরয করলেন, তখন রসূলে করীম (সাঃ) তার জন্যে গর্ত খনন করালেন এবং পাথর মেরে মেরে তার জীবনের অবসান ঘটালেন। তার সম্পর্কে মুসলমানরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল বলছিল ঃ মায়েযের মৃত্যু পাপে পরিবেষ্টিত অবস্থায় হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর দলের অভিমত ছিল মায়েযের তওবার মত খাঁটি কোন তওবা নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় দলের সমর্থন করে বললেন ঃ মায়েয এমন তওবা করেছে, যা সমগ্র উম্মতের মধ্যে বিভাজ্য হতে পারে।

অনুরূপভাবে খামেদিয়া মহিলার ঘটনাও সুবিদিত। সে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ আমি যিনা করেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তার কথা শুনেও শুনলেন না। পরদিন সে আবার আরয করল ঃ আপনি আমাকে পবিত্র করেন না কেন? আপনি কি আমাকে মায়েযের মত মনে করেন? আল্লাহর কসম, আমার তো গর্ভও হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে "হদ" তথা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দেয়া যাবে না। এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে উপস্থিত করল এবং আরয করল ঃ হুযুর! আমার সন্তান হয়ে গেছে। এবার

আমাকে শাস্তি দিয়ে পবিত্র করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যাও, তোমার সন্তান যখন দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে, তখন দেখা যাবে। অতঃপর শিশুটি যখন দুধ খাওয়া ছেড়ে খাদ্য খেতে শুরু করল, তখন খামেদিয়া তাকে নিয়ে আবার উপস্থিত হল। শিশুর হাতে তখন একখণ্ড রুটি ছিল। খামেদিয়া আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং রুটি খেতে শুরু করেছে। রসূলে করীম (সাঃ) শিশুটিকে একজন মুসলমানের হাতে সমর্পণ করলেন এবং খামেদিয়ার জন্য গর্ত খনন করালেন। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন। খালেদ ইবনে ওলীদ এসে যখন তার মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, তখন রক্তের ছিটা এসে তার মুখমণ্ডলে পতিত হল। তিনি উত্তেজিত হয়ে খামেদিয়াকে গালি দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার গালি শুনে বললেন ঃ খালেদ গালি দিয়ো না। সেই আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, জরিমানা আদায়কারীর মত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এরূপ তওবা করলে তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। (হাদীসে "মক্‌স" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সেই জরিমানা, যা উশর আদায়কারী মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করত। এরূপ জরিমানা আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতী হবে না।)

বান্দার হকসমূহের মধ্যে যদি কারও ধনসম্পদ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, আত্মসাৎ, ঠকানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে, তবে এ থেকে তওবা করার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। এতে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলেই সমান। অর্থাৎ সকলকেই তওবা করতে হবে। সুতরাং জীবনের শুরু থেকে তওবার দিন পর্যন্ত পাই পাই করে হিসাব করবে এবং দেখবে তার যিম্মায় কার কত পাওনা হয়েছে। এরপর এসব পাওনা নামে নামে লিপিবদ্ধ করবে এবং পাওনাদারদের খোঁজে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেবে। অথবা যার যা পাওনা, তা শোধ করে দেবে। যদি যথাসাধ্য চেষ্টার পর সকল পাওনাদার অথবা তাদের ওয়ারিসদেরকে তালাশ করা সম্ভব না হয়, তবে বিপুল পরিমাণে সৎকর্ম করবে, যাতে কিয়ামতের দিন এসব সৎকর্মের সওয়াব দিয়ে পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা যায়। সুতরাং মানুষের পাওনার পরিমাণ অনুযায়ী সৎকর্ম করা চাই। যদি সৎকর্ম দ্বারা সকল পাওনা শোধ না হয়, তবে

পাওনাদারদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে, সে অপরের গোনাহের বদলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। যদি কারও ধনসম্পদে হালাল ও হারাম মিশে যায়, তবে আন্দাজ করে হারাম মাল বের করে খয়রাত করে দেবে।

কুৎসা রটনা, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের মনে কষ্ট দিলে তার তওবা হল যাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকবে, তাদের প্রত্যেককে তালাশ করে মাফ করিয়ে নেয়া। যদি তাদের কেউ মারা গিয়ে থাকে অথবা নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার তওবা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, পুণ্যকর্ম অনেক করবে, যাতে কিয়ামতে বিনিময়ে দিতে পারে; যাকে তালাশ করে পাওয়া যায়, সে যদি মনের খুশীতে মাফ করে দেয়, তবে এটা তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যাবে। কিন্তু যে অপরাধ করেছে এবং মুখে যা যা বলেছে, তা মাফ চাওয়ার সময় বর্ণনা করা ওয়াজিব। অস্পষ্ট মাফ করানো যথেষ্ট হবে না। কেননা, এমনও হয় যে, নিজের উপর অপরের বাড়াবাড়ির কথা জানার পর মাফ করতে মন চায় না এবং কিয়ামতেই বিনিময় নেয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তবে যদি এমন কোন অপরাধ করে থাকে, যা বর্ণনা করলে প্রতিপক্ষ মনে ব্যথা পাবে, তবে বুঝতে হবে মাফ করানোর পথ রুদ্ধ। তবে এটা সম্ভব যে, অস্পষ্ট মাফ করিয়ে নিবে এবং পরে যে ত্রুটি থেকে যাবে,তা পুণ্য কর্মের দ্বারা পূরণ করে নেবে। অপরাধ উল্লেখ করার পর প্রতিপক্ষ যদি মাফ করতে সম্মত না হয়, তবে শাস্তি অপরাধীর ঘাড়ে থেকে যাবে। কেননা, প্রতিপক্ষের হক এখনও বহাল রয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধীর উচিত তার সাথে নম্র ব্যবহার করা, তার খেদমত করা এবং তার প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ প্রকাশ করা। এতে প্রতিপক্ষের মন তার প্রতি নরম হবে। কেননা, কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। ফলে, শেষ পর্যন্ত সে মাফ করতে সম্মত হয়ে যাবে। যদি এরপরও মাফ না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, তবে তার নম্রতা ও সদ্ব্যবহার মাঠে মারা যাবে না; বরং এগুলো পুণ্যকর্ম হয়ে যাবে, যা দ্বারা কিয়ামতে বিনিময় দেয়া যাবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তি

৯৯টি খুন করেছিল। অতঃপর সে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ বর্তমান যুগে সর্ববৃহৎ আলেম কে? লোকেরা বলল ঃ অমুক সন্ন্যাসী। সে তার কাছে গেল এবং বলল ঃ আমি ৯৯টি খুন করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি? সন্ন্যাসী জওয়াব দিল ঃ না। সে সন্ন্যাসীকেও হত্যা করে খুনের সংখ্যা একশতে উন্নীত করে নিল। সে পুনরায় লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ এখন সেরা আলেম কে? লোকেরা জনৈক আলেমের নাম বললে সে তার কাছে গেল এবং বলল ঃ আমি একশ' জনকে হত্যা করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি না? আলেম বলল ঃ তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। যখনই তওবা করবে, কবুল হবে। তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত রয়েছে। তুমিও তাদের সাথে এবাদতে মগ্ন থাক এবং কখনও দেশে ফিরে যেয়ো না। লোকটি অর্ধেক পথ অতিক্রম করতেই মৃত্যু এসে তার সামনে উপস্থিত হল। তখন রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা আগমন করল! তাদের মধ্যে বিতর্ক হল। রহমতের ফেরেশতারা বলল ঃ এ ব্যক্তি তওবা করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে এসেছে। সুতরাং তার রূহ কবয করার অধিকার আমাদের। আযাবের ফেরেশতারা বলল ঃ সে কোন দিন কোন ভাল কাজ করেনি। তাই আমরাই তার রূহের হকদার। ইতিমধ্যে জনৈক ফেরেশতা মানুষের বেশে সেখানে উপস্থিত হল। ফেরেশতাদের উভয় পক্ষ তাকে তাদের ব্যাপারে সালিস করে নিল। সে বলল ঃ এই ব্যক্তির উভয় দিকের দূরত্ব মেপে নেয়া উচিত। যেদিকের দূরত্ব কম হবে, তাকে সেই দিকের গণ্য করতে হবে। দূরত্ব মেপে দেখা গেল, যেদিকে সে যেতে চেয়েছিল, সেদিকের দূরত্ব অর্ধ হাত কম। ফলে, রহমতের ফেরেশতারাই তার রূহ কবয করে নিল। এ থেকে জানা গেল, মুক্তি তখনই পাওয়া যাবে, যখন সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে যদিও তা সামান্যই হয়। এ কারণেই তওবাকারীর জন্যে অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করা জরুরী।

ভবিষ্যতকালের জন্যে তওবাকারীর উচিত আল্লাহ তা'আলার সাথে সেই গোনাহ না করার পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করা। উদাহরণতঃ রোগী রুগ্নাবস্থায় জানতে পারল যে, অমুক ফল তার জন্যে ক্ষতিকর। অতঃপর সে

দৃঢ় সংকল্প করল যে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কখনও সেই ফল খাবে না। তার এই সংকল্প তখন তো পাকাপোক্তই হয়ে থাকে– যদিও অন্য সময় খাহেশ প্রবল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, তওবা করার সময় তওবাকারী পাকাপোক্ত সংকল্প করবে। নতুবা তাকে তওবাকারী বলা হবে না। তার এই সংকল্প শুরুতে তখন পূর্ণ হবে, যখন সে নির্জনবাস, নীরবতা, স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও হালাল খাদ্য অবলম্বন করবে। যদি তার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে হালাল উপার্জন বিদ্যমান থাকে অথবা সে জীবন যাপন উপযোগী কোন পেশা করে, তবে এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কেননা, হারাম খাদ্য সকল গোনাহের মূল। হারাম ভক্ষণে অবিচল থাকলে তওবাকারী হবে কিরূপে? যদি তওবাকারী নির্জনবাস অবলম্বন না করে, তবে তওবায় "ইস্তেকামাত" তথা দৃঢ়তা পূর্ণাঙ্গ হবে। কেবল কিছুসংখ্যক গোনাহ যথা মদ, যিনা ও ছিনতাই থেকে তওবা করবে। এটা সর্বাবস্থায় তওবা নয়; বরং কারও কারও মতে এরূপ তওবা জায়েযই নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কতক গোনাহ পরিত্যাগ করা মোটেই উপকারী নয়। কেননা, আমরা জানি, গোনাহ বেশী হলে আযাব বেশী এবং কম হলে আযাব কম হবে। পক্ষান্তরে একদল উপরোক্ত তওবাকে জায়েয বলে থাকে। এর অর্থ এরূপ যে, কতক গোনাহ থেকে তওবা করেই মুক্তি ও সাফল্য অর্জন করা যায়। কেননা, মুক্তি ও সাফল্য বাহ্যত দু'-তিনটি গোনাহ ত্যাগ করলেই অর্জিত হয় না। তবে আল্লাহ তা'আলার গোপন ক্ষমা-রহস্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

কতক গোনাহ থেকে তওবা করার তিনটি সম্ভাব্য প্রকার রয়েছে। প্রথম প্রকার হল শুধু কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা এবং সগীরা গোনাহ থেকে না করা। এটা সম্ভব। কেননা, তওবাকারী জানে, কবীরা গোনাহ আল্লাহর কাছে গুরুতর। এ কারণে তিনি দ্রুত ক্রুদ্ধ হন। পক্ষান্তরে সগীরা গোনাহে ক্ষমা পাওয়ার আশা প্রবল। এই জানার কারণে এটা সম্ভব যে, সে কেবল বড় গোনাহ থেকে তওবা করবে এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। পূর্ববর্তী যুগে অনেক তওবাকারী অতিক্রান্ত হয়েছে; অথচ তাদের মধ্যে কেউ নিষ্পাপ ছিল না। এ থেকে বুঝা যায়, তওবার জন্যে নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়।

দ্বিতীয় প্রকার হল কতক কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা এবং কতক থেকে না করা। এটাও বাস্তবসম্মত। কেননা, মানুষ বিশ্বাস করে, কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। কিছু কবীরা গোনাহ তীব্র এবং কিছু অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। উদাহরণতঃ কেউ হত্যা, লুণ্ঠন, যুলুম ও অপরের অধিকার হরণ থেকে এই মনে করে তওবা করে যে, এগুলো বান্দার হক, যা কখনও মাফ হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর হক থেকে তওবা করে না এই বিশ্বাসের কারণে যে, এটা ক্ষমাযোগ্য।

তৃতীয় প্রকার হল, একাধিক সগীরা গোনাহ থেকে তওবা করা। কিন্তু কবীরা গোনাহ থেকে জানা সত্ত্বেও তওবা না করা এবং অবিচল থাকা। যেমন, কেউ মাহরাম নয়— এমন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত অথবা গীবত থেকে তওবা করে, কিন্তু মদ্যপান থেকে তওবা করে না। এটাও সম্ভবপর। কেননা, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহকে ভয় করে এবং স্বীয় কার্যকলাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়। কেউ কম, কেউ বেশী। গোনাহে যে পরিমাণে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই পরিমাণে ভয় কম হয়। ফলে, অধিক আনন্দদায়ক গোনাহে আনন্দ প্রবল এবং ভয় দুর্বল হয়ে থাকে। পাপাচারী ব্যক্তি কখনও এমন মাদকাসক্ত হয় যে, সবর করতে পারে না; কিন্তু গীবত, পরনিন্দা ও পরনারীর প্রতি তাকানোর খাহেশ তার মধ্যে মোটেই থাকে না। তার মধ্যে খোদাভীতি এমন থাকে, যা দ্বারা দুর্বল আগ্রহের মূলোৎপাটন করতে পারে কিন্তু প্রবল আগ্রহে পারে না। এই ভয়ের কারণে সে এমন কাজকর্ম বর্জন করে, যার প্রতি আগ্রহ কম। সে মনে মনে বলে, যদি শয়তান কতক গোনাহে আমাকে কাবু করে ফেলে, তবে তারই কাবুতে থাকা আমার জন্যে উচিত হবে না; বরং কতক গোনাহে তার সাথে জেহাদ করে আমাকে বিজয়ী হতে হবে। হয়তো এই বিজয় আমার অন্য গোনাহের জন্যে কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। পাপাচারীর মনে এই ধারণা না থাকলে তার নামায পড়া ও রোযা রাখার কারণ বোধগম্য হয় না। যদি তাকে বলা হয় ঃ তুমি যে নামায পড়, তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হলে নাজায়েয, আর আল্লাহর জন্যে হলে পাপাচারকে আল্লাহর জন্যে বর্জন কর, তবে সে এর জবাবে একথাই বলবে যে, আল্লাহ আমাকে দুটি আদেশ দিয়েছেন। যদি আমি উভয়টি অমান্য করি, তবে দুটি আযাব ভোগ করতে

হবে। আমি একটি আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শয়তানকে পরাভূত করার শক্তি রাখি এবং অপরটি পালনে শয়তানকে পরাস্ত করতে অক্ষম। তাই যে বিষয়ে শক্তি আছে, সে জেহাদ করে আমি শয়তানকে ব্যর্থ করে দেই। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা এই জেহাদকে সে গোনাহের কাফফারা করে দেবেন, যাতে আমি অক্ষম। মোটকথা, এটা নিঃসন্দেহে সম্ভবপর; বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবস্থা তাই। এমন মুসলমান কে, যার মধ্যে এবাদত ও গোনাহের সহ-অবস্থান নেই? এর কারণ উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে প্রশ্ন হয়, যদি কোন ব্যক্তি যিনা করে, এরপর সে পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে এবং তদবস্থায় যিনা থেকে তওবা করে, তবে তার তওবা দুরস্ত হবে কি না? এর জওয়াব এই যে, তওবা দুরস্ত হবে না। কেননা, তওবা এমন অনুতাপকে বলা হয়, যা থেকে এমন কাজ বর্জন করার সংকল্প উৎপন্ন হয়, যা করার ক্ষমতা তওবাকারীর রয়েছে। আর যে কাজ করার ক্ষমতাই নেই, তা তো আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হয়ে যায়, বর্জন করার কারণে অন্তর্হিত হয় না। হ্যাঁ, পুরুষত্ব হারানোর পর যদি সে যিনার ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে এবং তজ্জন্যে তার মধ্যে এমন দুঃখ ও অনুতাপ উথলে উঠে যে, তার মধ্যে পুরুষত্ব থাকলেও তা এই অনুতাপের সামনে পরাভূত হয়ে যেত, তবে এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং এই অনুতাপ তার কাফফারা হয়ে যাবে। সারকথা এই যে, অন্তর থেকে গোনাহের অন্ধকার দূর হওয়ার জন্যে দুটি বিষয় দরকার— এক, অনুতাপের জ্বালা এবং দুই, গোনাহ বর্জনের জন্যে ভবিষ্যতে কঠোর সাধনা। বর্ণিত ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতার কারণে সাধনা হতে পারে না। কিন্তু যদি অনুতাপই এমন শক্তিশালী হয় যে, সাধনা ছাড়াই গোনাহের অন্ধকার দূর করে দেয়, তবে এটা অসম্ভব নয়। অন্যথায় বলতে হবে, তওবাকারীর তওবা তখন কবুল হয়, যখন সে তওবার পর কিছুদিন জীবিত থাকে এবং এই দিনগুলোতে কয়েকবার সেই গোনাহের ব্যাপারে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে নেয়। কিন্তু শরীয়তের কোথাও এরূপ শর্ত বুঝা যায় না।

তওবার ব্যাপারে মানুষের স্তরভেদ ঃ জানা উচিত যে, তওবার ব্যাপারে তওবাকারীদের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। পূর্বে যে সকল ত্রুটি করেছিল, সেগুলো পূরণ করবে এবং পুনরায় সেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া গোনাহ করার কথা কল্পনাও করবে না, যেগুলো থেকে মানুষ নবী না হলে অভ্যাসগত ভাবে মুক্ত হয় না। একেই বলা হয় তওবায় অবিচল থাকা এবং এরই নাম "তাওবাতুন্নাসূহ" (খাঁটি তওবা)। এরূপ মনকেই কোরআন পাকে "নাফসে মুতমায়িন্নাহ" (প্রশান্ত মন) বলা হয়েছে, যে তার পরওয়ারদেগারের সামনে সন্তুষ্টচিত্তে উপস্থিত হবে এবং পরওয়ারদেগারও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। নিম্নোক্ত হাদীসে এরূপ তওবাকারীদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ الْمُسْتَهْتِرُوْنَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَوْزَارَهُمْ فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِفَافًا

অর্থাৎ., আল্লাহর যিকিরের প্রতি লোভী ব্যক্তিরা অগ্রগামী হয়েছে। যিকির তাদের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। ফলে, তারা কিয়ামতের ময়দানে হালকা-পাতলা হয়ে পৌছেছে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের উপর বোঝা ছিল; কিন্তু যিকিরের ফলে তাদের বোঝা নেমে গেছে।

দ্বিতীয় স্তর এমন তওবাকারীর, যে মৌলিক এবাদত পালনে এবং সকল কবীরা গোনাহ বর্জনে সুদৃঢ় থাকে। এতদসত্ত্বেও এমন গোনাহ্ থেকে মুক্ত নয়, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপন কাজকর্মে এরূপ গোনাহ্ করে ফেলে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপন কাজকর্মে এরূপ গোনাহ্ করে ফেলে, পূর্ব থেকে যায় ইচ্ছা থাকে না। যখন সে এ ধরনের গোনাহ্ করে ফেলে, তখন নিজেকে তিরস্কার করে, লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে এরূপ গোনাহের ধারে-কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। এরূপ মনকে 'নাফসে লাওয়ামা' (তিরস্কারকারী মন) বলা সমীচীন।

কেননা, অনিচ্ছাকৃত কুকর্মের কারণে এই মন নিজেকে ধিক্কার দেয়। যদিও প্রথম স্তরটি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই স্তরও যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অধিকাংশ তওবাকারীর অবস্থা এমনি হয়ে থাকে। কেননা, কুপ্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত একটি উপাদান। এ থেকে মুক্ত থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে পাপের তুলনায় পুণ্য বেশী করতে পারে, যাতে তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়।

এরূপ তওবাকারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন—

الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ۔

অর্থাৎ, যারা ছোটখাটো বিষয় ছাড়া বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকে, তারা ক্ষমা পাবে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার ক্ষমা বিস্তৃত।

মানুষ ইচ্ছা ছাড়াই যে সব সগীরা গোনাহ করে ফেলে, সেগুলো "লামাম" তথা ছোটখাটো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ۔

অর্থাৎ, আর তারা, যারা কোন অশ্লীল কর্ম করলে অথবা নিজেদের প্রতি অন্যায় করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এখানে নিজেদের প্রতি অন্যায় করা সত্ত্বেও যে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তা এজন্যেই যে, তারা পরবর্তী সময়ে অনুতাপ করেছে এবং নিজেদের তিরস্কৃত করেছে। এরই অনুরূপ স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই হাদীসে—

خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি, যে গোনাহে লিপ্ত হলে তওবা করে।

অন্য হাদীসে আছে—

الْمُؤْمِنُ كَالسُّنْبُلَةِ يَعْنِي أَحْيَانًا وَيَمِيلُ أَحْيَانًا

অর্থাৎ, মুমিন গমের শীষের মত— কখনও গোনাহ থেকে ফিরে আসে আবার কখনও তৎপ্রতি ঝুঁকে পড়ে।

এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ কখনও কখনও গোনাহ করা ঈমানদারের জন্যে জরুরী। এসব রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই পরিমাণ অপরাধের কারণে তওবা ভঙ্গ হয় না এবং এরূপ অপরাধ গোনাহে অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এরূপ তওবাকারীদেরকে নিরাশ করা ফেকাহ্‌বিদদের উচিত নয়। ফেকাহবিদ তো তাকেই বলা হয়, যে মানুষকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহ করার কারণে সৌভাগ্যের স্তরে পৌঁছার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত করে না। হাদীসে বর্ণিত আছে—

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاؤُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ -

অর্থাৎ, সকল আদম সন্তান গোনাহগার। তবে উত্তম গোনাহ্‌গার তারা, যারা তওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ -

অর্থাৎ, এসব লোকেরা তাদের পুরস্কার দ্বিগুণ পাবে। কারণ, তারা সবর করে এবং পাপকর্মকে সৎকর্মের দ্বারা প্রতিহত করে।

এখানে বলা হয়েছে যে, তারা পাপের পরে পুণ্য করে। এরূপ বলা হয়নি যে, তারা পাপ মোটেই করে না।

তৃতীয় স্তর হল তাদের, যারা তওবা করে কিছুকাল তাতে অটল থাকে।

এরপর কোন গোনাহের খাহেশ প্রবল হয়ে যায় এবং তা ইচ্ছাকৃতভাবে করে ফেলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যথারীতি এবাদত পালনে সর্বদা তৎপর থাকে এবং খায়েশ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য গোনাহ বর্জন করে। কেবল এক অথবা দু' গোনাহের ব্যাপারে তারা অক্ষম থাকে এবং এগুলো থেকেও তওবা করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে। কিন্তু আজ-কাল করে তা পিছিয়ে দেয়। এরূপ লোকদের শানে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ـ

অর্থাৎ, কিছু লোক তাদের গোনাহ স্বীকার করে। তারা একটি পুণ্যকাজ করে এবং অপরটি পাপকাজ।

আশা করা যায়, এরূপ লোকদের তওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। কিন্তু যেহেতু তারা টালবাহানা করে তওবাকে পিছিয়ে দেয়, এ কারণে তাদের পরিণতি বিপজ্জনকও হতে পারে। কে জানে, তওবার আগেই তাদের মৃত্যু এসে যায় কিনা! এরপর আল্লাহর যা ইচ্ছা, তাই প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপায় তাদের ক্ষতিপূরণ করে নেবেন অথবা তাদের দুর্ভাগ্যই প্রবল হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

অর্থাৎ, কসম মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।

সুতরাং বান্দা যখন কোন গোনাহে লিপ্ত হয় এবং গোনাহ থাকে নগদ আর তওবা থাকে বাকীর খাতায়, তখন এটা তার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে— বান্দা সত্তর বছর পর্যন্ত জান্নাতীদের অনুরূপ আমল করে। ফলে, মানুষ তাকে জান্নাতী বলতে শুরু করে এবং তার মধ্যে ও

জান্নাতের মধ্যে মাত্র অর্ধ হাত ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু ভাগ্যলিপি প্রবল হয় এবং সে দোযখীদের মত আমল করতে থাকে এবং অবশেষে দোযখে পতিত হয়।

চতুর্থ স্তর এমন তওবাকারীর, যারা তওবার পর কিছুদিন তাতে অটল থাকে, এরপর এক গোনাহ অথবা অনেক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অন্তরে তওবা করার ইচ্ছা থাকে না অথবা গোনাহের জন্যে আফসোস করে না। এরূপ ব্যক্তি গোনাহে অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ নফসকে বলা হয় "নাফসে আম্মারা বিসসু" (কুকর্মের আদেশদাতা নফস)। তার পরিণাম মন্দ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। খোদা না করুন, পাপকর্মেই তার জীবনের অবসান ঘটলে সে হবে চরম হতভাগা। পক্ষান্তরে অন্তিম অবস্থা ভাল হলে দোযখ থেকে মুক্তির আশা করা যাবে— যদিও তা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর হয়।

তওবাকারীর গোনাহ হয়ে গেলে কি করবে?

যদি তওবাকারী কোন গোনাহ্ করে ফেলে, তবে তার উপর দুটি বিষয় ওয়াজিব। প্রথমত, সে তওবা ও অনুতাপ করবে। দ্বিতীয়ত, এ গোনাহকে মিটিয়ে ফেলার জন্যে তার বিপরীত কোন পুণ্যকাজ করবে। উপরে এর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যদি খাহেশের প্রাবল্যের কারণে মন ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করার সংকল্প না করে, তবে সে যেন প্রথম ওয়াজিবটি পালনে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ওয়াজিবটিও বর্জন করা সমীচীন হবে না। বরং পুণ্যকাজ সম্পন্ন করে পাপমোচন করার উপায় করতে হবে। এতে কমপক্ষে এটা তো হবে যে, সে পাককাজের সাথে পুণ্যকাজেরও সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হবে। যে সকল পুণ্যকাজ দ্বারা পাপমোচন হয়ে থাকে, সেগুলো অন্তর অথবা জিহ্বা অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং যা দ্বারা পাপ কাজ করা হয়, পুণ্যকাজও তা দ্বারাই সম্পাদন করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি পাপকাজ অন্তর থেকে প্রকাশ পায়, তবে তা মোচন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং পলাতক গোলামের ন্যায় নিজেকে লাঞ্ছিত করতে হবে, যাতে সকলের কাছে স্বীয় লাঞ্ছনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া, অন্তরে এবাদত ও মুসলমানদের শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করতে হবে।

জিহ্বা দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারার উপায় এই যে, স্বীয় অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করবে এবং বলবে—

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَعَمِلْتُ سُوْءً فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ -

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি এবং কুকর্ম করেছি। অতএব আমার পাপকর্মসমূহ মার্জনা কর।

এছাড়া সওয়াব অধ্যায়ে লিখিত সকল প্রকার এস্তেগফার বলতে থাকবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি এই যে, এগুলো দ্বারা সদকাসহ অন্যান্য সকল প্রকার এবাদত পালন করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে— মানুষ যখন পাপ কাজের পশ্চাতে আটটি কাজ করে, তখন আশা করা যায়, তার সেই পাপ মাফ হয়ে যাবে। এগুলোর মধ্যে চারটি কাজ অন্তর দ্বারা সম্পাদিত হয়। (১) তওবা করা অথবা তওবার সংকল্প করা, (২) গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ভাল মনে হওয়া, (৩) গোনাহের শাস্তিকে ভয় করতে থাকা এবং (৪) গোনাহ মার্জিত হওয়ার আশা করা। অবশিষ্ট চারটি কাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়— (১) গোনাহের পর দু'রাকআত নামায পড়া, (২) এই নামাযের পর সত্তর বার এস্তেগফার এবং একশ' বার "সোবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করা, (৩) কিছু দান-খয়রাত করা এবং (৪) একটি রোযা রাখা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে। পূর্ণাঙ্গ উযু করে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায পড়বে। কতক রেওয়ায়েতে চার রাকআতের উল্লেখ আছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে— যখন কেউ পাপ কাজ করে, তখন তার উচিত এরূপ পুণ্যকাজ করা, যাতে কাটাকাটি হয়ে যায়। গোপন পাপের বিনিময়ে গোপন পুণ্যকাজ করবে এবং প্রকাশ্য পাপের বদলে প্রকাশ্য পুণ্য কাজ করবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, গোপনে দান-খয়রাত করলে রাতের গোনাহ মাফ হয় এবং প্রকাশ্য দান-খয়রাত দ্বারা দিনের গোনাহ মিটে যায়। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি একজন মহিলার সাথে কিছু করেছি— তবে যিনা করিনি। এখন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যা

বিধান, তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমার সাথে ফজরের নামায পড়নি? সে বলল ঃ হাঁ পড়েছি। তিনি বললেন ঃ পুণ্য কাজ পাপ কাজকে খেয়ে ফেলে। এ থেকে জানা গেল যে, মহিলাদের সাথে যিনার নিচে যা কিছু করা হয়, তা সগীরা গোনাহ। কারণ, এটা নামায দ্বারা মিটে যায়। কবীরা গোনাহ নামায দ্বারা মিটে না।

মোট কথা, মানুষের উচিত প্রত্যহ আপন ত্রুটিসমূহ একত্রিত করে নফসের কাছ থেকে হিসাব নেয়া এবং এগুলোকে মিটানোর জন্যে পরিশ্রম সহকারে সমপরিমাণ পুণ্য কাজ করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অব্যাহতভাবে গোনাহ করে যায়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে রং-তামাশা করে। সুতরাং অব্যাহত গোনাহ সত্ত্বেও এস্তেগফার কিরূপে উপকারী হবে? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি আমার মৌখিক এস্তেগফার থেকেও এস্তেগফার করি। কেউ কেউ বলেন ঃ শুধু মুখে এস্তেগফার পড়া মিথ্যুকদের তওবা। হযরত রাবেয়া বলেন ঃ আমাদের এস্তেগফারের জন্যে অনেক এস্তেগফার দরকার। এখন প্রশ্ন হল, এসব রেওয়ায়েতে কোন্ এস্তেগফার বুঝানো হয়েছে? এর জওয়াব এই যে, এস্তেগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আল্লাহ পাক রসূলে করীম (সাঃ)-এর শারীরিক উপস্থিতির যে প্রভাব বর্ণনা করেছেন, এস্তেগফারের প্রভাবও তাই ব্যক্ত করেছেন। এস্তেগফারের এর চেয়ে বড় মাহাত্ম্য আর কি হবে? এরশাদ হয়েছে—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۔

অর্থাৎ, আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না এবং আল্লাহ তাদের শাস্তিদাতা নন যে পর্যন্ত তারা এস্তেগফার করে।

এ কারণেই কোন কোন সাহাবী বলতেন ঃ আমাদের জন্যে দুটি আশ্রয় ছিল। তন্মধ্যে একটি আশ্রয় উঠে গেছে; অর্থাৎ জনাব সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ)-এর উপস্থিতি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। আর দ্বিতীয় আশ্রয়

অর্থাৎ, এস্তেগফার এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যদি এটাও বিদায় নেয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এখন শুনুন, যে এস্তেগফার মিথ্যুকদের তওবা, তা কেবল মৌখিক এস্তেগফার; অর্থাৎ যার মধ্যে অন্তরের সংযোগ মোটেই নেই। যেমন, মানুষ অভ্যাসগতভাবে অনবধানতার ছলে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলে দেয় অথবা দোযখের বর্ণনা শুনে "নাউযুবিল্লাহ" উচ্চারণ করে, অথচ অন্তরে এর কোন প্রভাব থাকে না। এই এস্তেগফারে কেবল জিহ্বা নড়াচড়া করে। এতে কোন উপকার নেই। হাঁ, যদি এর সাথে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ভাব যোগ হয় এবং সত্যিকার ইচ্ছা, খাঁটি নিয়ত ও পূর্ণ আগ্রহ সহকারে মাগফেরাত কামনা করা হয়, তবে এটা নিঃসন্দেহে একটি পুণ্য কাজ। এস্তেগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে এই এস্তেগফারই উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে—

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করে, সে অব্যাহতভাবে গোনাহকারী নয়— যদি দিনে সত্তর বারও গোনাহ করে।

এ হাদীসে এস্তেগফারের অর্থ আন্তরিক এস্তেগফার। তওবা ও এস্তেগফারের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। প্রাথমিক স্তরগুলোও উপকার থেকে খালি নয়— যদিও শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছা নসীব না হয়। এ কারণেই হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ বান্দার সর্বাবস্থায় তার প্রভুর প্রয়োজন। তাই সকল বিষয়ে প্রভুর দিকে রুজু করা তার জন্যে উত্তম। উদাহরণতঃ সে যদি গোনাহে লিপ্ত হয়, তবে এরূপ প্রার্থনা করবে ঃ ইলাহী, আমার রহস্য ফাঁস করো না। গোনাহ সমাপ্ত হওয়ার পর এরূপ দোয়া করবে ঃ প্রভু, আমার তওবা কবুল কর এবং তওবার পর আরয করবে ঃ ইলাহী, আমাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রভূত শক্তি দান কর। এমনিভাবে বান্দা যখন কোন উত্তম কাজ করবে, তখন অনুনয় করে বলবে, আল্লাহ, আমার এ আমলটি কবুল কর। জনৈক ব্যক্তি হযরত সহলকে জিজ্ঞেস করল ঃ যে এস্তেগফার গোনাহকে বিলীন করে দেয়, সেটি কোনটি? তিনি বললেন ঃ প্রথমে এস্তেজাবত; এরপর এনাবত, এরপর তওবা। এস্তেজাবতের অর্থ হচ্ছে

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহ; যেমন দু'রাকআত নামায ও দোয়া। এনাবতের মানে হচ্ছে অন্তরের আমলসমূহ; যেমন সত্যিকার ইচ্ছা, খাঁটি নিয়ত ইত্যাদি। আর তওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা।

তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু— এই হাদীস সম্পর্কে হযরত সহলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ বন্ধু তখন হয়, যখন এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ তার মধ্যে পাওয়া যায়—

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ, তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরকারী ....।

তিনি আরও বললেন ঃ বন্ধু তাকে বলা হয়, যে বন্ধুর অপ্রিয় বিষয়সমূহের ধারে-কাছেও যায় না। সারকথা এই যে, তওবার ফলাফল দুটি— এক, গোনাহকে এমনভাবে বিলুপ্ত করা যেন সে গোনাহ করেইনি এবং দুই, বন্ধু হয়ে যাওয়ার জন্যে মর্তবা লাভ করা। অন্তর দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুণ্যকাজ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যদিও প্রাথমিক স্তরে অব্যাহত গোনাহের সমস্যার সমাধান করে না, তথাপি উপকার থেকে খালি নয়। সুতরাং এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এরূপ এস্তেগফার ও পুণ্যকাজ করা-না করা উভয় সমান। বরং অধ্যাত্মবিদগণ নিশ্চিতরূপে জানেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি যথার্থ—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

অর্থাৎ, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।

সৎকর্মের প্রত্যেক অণুতে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই থাকে, যেমন নিক্তির একদিকে একটি চাউল রেখে দিলে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়বে। একটি চাউলের কোন প্রভাব না থাকলে দ্বিতীয় চাউল রেখে দিলেও কোন

প্রভাব না হওয়া উচিত। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, বেশী পরিমাণ চাউল রাখলেও পাল্লা ঝুঁকবে না। অথচ এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অণু পরিমাণ সৎকর্মের অবস্থাও তদ্রূপ। এর দ্বারাও আমলের দাঁড়িপাল্লা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। অতএব, সামান্য পরিমাণ সৎকর্ম ও অণু পরিমাণ এবাদতকে হেয় মনে করে বর্জন করা উচিত নয় এবং কোন সামান্য গোনাহকে সামান্য মনে করে তা করে ফেলা সমীচীন নয়। কেননা, বলা হয়, "কণা কণা বালুকায় সাহারা সৃজন।" আমাদের মতে মুখে এস্তেগফার বলাও পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কোন মুসলমানের গীবত অথবা অনর্থক কথা বলার জন্যে জিহ্বাকে নাড়াচাড়া করার তুলনায় সে সময় অনবধানতার সাথে এস্তেগফার উচ্চারণ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। আর চুপ থাকার তুলনায়ও উত্তম।

জনৈক মুরীদ তার মুরশিদ আবু উসমান মাগরেবীর খেদমতে আরয করল ঃ আমার জিহ্বা মাঝে মাঝে যিকির ও কোরআন পাঠ করতে শুরু করে; অথচ আমার অন্তর গাফেল থাকে। মুরশিদ বললেন ঃ আল্লাহর শোকর কর। তিনি তোমার একটি অঙ্গকে পুণ্য কাজে নিয়োজিত করে দেন— কুকর্ম ও অনর্থক কাজে অভ্যস্ত করেন না। নিঃসন্দেহে এই বুযুর্গের উক্তি সত্য। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি স্বাভাবিক বিষয়াদির মত পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে এটা অনেক গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার কারণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ এস্তেগফারে অভ্যস্ত ব্যক্তি যখন কারও মুখে মিথ্যা কথা শুনবে, তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে— 'আস্তাগফিরুল্লাহ।" আর অনর্থক কথায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মিথ্যা শুনে মন্তব্য করবে— তুমি বড় মিথ্যাবাদী। অথবা এক ব্যক্তি "নাউযুবিল্লাহ" বলায় অভ্যস্ত। সে কোন দুষ্টের দুষ্টামি শুনে অভ্যাসবশত বলে উঠবে— "নাউযুবিল্লাহ"। যদি সে অনর্থক ভাষণে অভ্যস্ত হত, তবে বলত— তোমার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। এখানে একটি কথা বলার কারণে সে গোনাহগার হবে এবং অপর কথাটি বলার কারণে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকা জিহ্বার পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হওয়ারই প্রভাব।

"আমাদের এস্তেগফারের জন্য অনেক এস্তেগফার দরকার"— হযরত

রাবেয়ার এ উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের এস্তেগফারে অন্তর গাফেল থাকে এবং শুধু জিহ্বা নড়াচড়া করে। অন্তরের এই গাফলতির কারণে এ ধরনের এস্তেগফার দরকার। জিহ্বার নড়াচড়ার নিন্দা করা এ উক্তির উদ্দেশ্য নয়; বরং আন্তরিক গাফলতিকে তিরস্কার করা লক্ষ্য। এর কারণেই এস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, কণা পরিমাণ পুণ্যকাজ এবং সামান্যতম গোনাহকেও হেয় ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের ভিতর লুক্কায়িত রেখেছেন। (১) তিনি নিজের সন্তুষ্টিকে এবাদতের ভেতর গোপন রেখেছেন। সুতরাং কোন এবাদতকে তুচ্ছ মনে করো না। তুমি যাকে তুচ্ছ মনে করবে, হয়তো তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লুক্কায়িত রয়েছে। (২) তিনি আপন গযবকে গোনাহের ভেতরে গোপন রেখেছেন। সুতরাং কোন গোনাহকে ক্ষুদ্র মনে করো না। হয়তো এর মধ্যেই আল্লাহর গযব লুক্কায়িত রয়েছে। (৩) তিনি আপন বন্ধুত্বকে বান্দাদের ভেতরে গোপন রখেছেন। অতএব, কোন বান্দাকে অবজ্ঞা করো না। হয়তো আল্লাহর বন্ধু সে-ই।

হযরত জাফর সাদেক অতঃপর আরও বলেন ঃ "এজাবত" তথা সাড়াদানকেও আল্লাহ তা'আলা দোয়ার ভেতরে গুপ্ত রেখেছেন। সুতরাং কোন দোয়া বর্জন করো না। হয়তো সাড়াদান তার মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ দুই প্রকার। (১) এমন মানুষ, যাদের মন্দ কাজ-কর্মের প্রতি প্রবণতা নেই এবং যারা অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যের উপরই লালিত-পালিত হয়। এরূপ মানুষ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে—

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَ لَهُ صَبْوَةٌ اِلَى الْجَهْلِ وَاللَّهْوِ

অর্থাৎ, তোমার পরওয়ারদেগার এমন যুবককে পছন্দ করেন, যার মূর্খতা ও হাস্য-কৌতুকের প্রবণতা নেই।

কিন্তু এ ধরনের মানুষ বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। (২) দ্বিতীয় প্রকার এমন মানুষ, যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। এদের এক প্রকার অব্যাহতভাবে গোনাহকারী এবং দ্বিতীয় প্রকার তওবাকারী। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার ও চিকিৎসার বর্ণনা করা।

বলা বাহুল্য, চিকিৎসা ছাড়া আরোগ্যলাভ সম্ভব হয় না। যেহেতু রোগের কারণসমূহের বিপরীত কাজ করার নাম চিকিৎসা, তাই যে ব্যক্তি রোগের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে না, সে চিকিৎসার ব্যাপারেও অজ্ঞাত থাকবে। কারণজনিত রোগের চিকিৎসা হচ্ছে সেই কারণকে নির্মূল ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়। এখন অব্যাহত গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যাবে. এর কারণ হচ্ছে গাফলতি তথা অনবধানতা ও খাহেশ। তন্মধ্যে গাফলতি সকল অনিষ্টের মূল। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

অর্থাৎ, এরাই গাফেল। বস্তুত আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব গাফলতি ও খাহেশের বিপরীত বিষয় দ্বারাই অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার করতে হবে। গাফলতির বিপরীত বিষয় হচ্ছে সচেতনতা এবং খাহেশের বিপরীত বিষয় খাহেশ-উদ্দীপক বিষয়াদি বর্জনে সবর করা। সুতরাং অব্যাহত গোনাহের চিকিৎসা এমন ঔষধ দ্বারা করতে হবে, যার মধ্যে সচেতনতার মিষ্টতা ও সবরের তিক্ততা উভয়টি বিদ্যমান। জানা উচিত যে, সকল জ্ঞান ও সচেতনতাই আন্তরিক রোগের চিকিৎসা। কিন্তু প্রত্যেক রোগের জন্যে এক বিশেষ জ্ঞান নির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা এখানে অব্যাহত গোনাহের সেই বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করব, যা এ রোগে ফলপ্রদ। তবে সহজে বুঝার জন্যে দৈহিক রোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব।

প্রথমেই জানা দরকার যে, রোগীকে কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বাসী হতে হয়। প্রথমত, মানতে হবে যে, রোগ ও সুস্থতা উভয়টির জন্যে কিছু কিছু কারণ রয়েছে, যা আল্লাহ পাক আমাদের এখতিয়ারে রেখে দিয়েছেন। এতে মূল চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস জন্মে। যার এই বিশ্বাস নেই, সে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাও করায় না এবং মৃত্যুর উপযুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অব্যাহত গোনাহ রোগে প্রথমে মূল শরীয়তের প্রতি ঈমান থাকা চাই। অর্থাৎ, বিশ্বাস থাকতে হবে যে, পারলৌকিক সৌভাগ্যেরও একটি কারণ আছে, যাকে এবাদত বলা হয় আর পারলৌকিক দুর্ভাগ্যেরও একটি কারণ আছে, যাকে পাপ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ চিকিৎসকের প্রতি রোগীর এরূপ আস্থা থাকা দরকার যে, সে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিচক্ষণ। তার দেয়া ঔষধ সঠিক কাজ করে। সে কখনও ভুল চিকিৎসা করে না। এমনিভাবে যারা অব্যাহত গোনাহে লিপ্ত, তাদের ঈমান থাকতে হবে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সত্যবাদী। তিনি যা বলেছেন, বাস্তবে তাই হবে। চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হবে না।

তৃতীয়ত, রোগীর উচিত চিকিৎসক যেসব ফল খেতে নিষেধ করে, সেগুলো না খাওয়া এবং যেসব ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকা, যাতে পরহেয না করার ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে যায়। এমনিভাবে অব্যাহত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সে সমস্ত আয়াত ও হাদীস শ্রবণ ও মান্য করা উচিত, যেগুলোতে "তাকওয়া" তথা পরহেযগারীর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এতে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে এবং সবর শক্তিশালী হবে, যা এই চিকিৎসার পরবর্তী স্তম্ভ।

চতুর্থত, রোগীর উচিত চিকিৎসক তার বিশেষ রোগের জন্য যা বলে দেয় এবং যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ করে দেয়, সেগুলোর প্রতি খুব মনোযোগী হওয়া। অর্থাৎ, প্রথমে সে নিজের অবস্থা, ক্রিয়াকর্ম ও পানাহারের বিবরণ চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেবে যে, কোন্ বস্তু তার বিশেষ রোগের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, প্রত্যেক রোগীর প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ করা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক বিশেষ রোগের জন্যে বিশেষ চিকিৎসা রয়েছে। এমনিভাবে প্রত্যেক মানুষ সকল খাহেশ ও সকল গোনাহে লিপ্ত হয় না। প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি বিশেষ এক গোনাহ্ অথবা বিশেষ কিছু গোনাহে লিপ্ত থাকে। তার প্রথমে জানতে হবে এর দ্বারা ধর্মের কতটুকু ক্ষতি হয়। এরপর জানা দরকার এ থেকে সবর কিভাবে করা যায় এবং যে গোনাহ হয়েছে, তা কিভাবে মিটানো যায়!

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিশেষভাবে আলেমদের কাছ থেকেই লাভ করা যায়, যারা পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। সুতরাং গোনাহগার ব্যক্তি যখন নিজের গোনাহ জেনে নেয়, তখন তার এই রোগের চিকিৎসা কোন চিকিৎসক অর্থাৎ আলেমে দ্বীন দ্বারা শুরু করা উচিত। রোগী যদি নিজের রোগ জানতে না পারে, তবে আলেমের উচিত তাকে তার রোগের কথা বলে দেয়া। এর উপায় এই যে, প্রত্যেক আলেম এক একটি মহল্লা অথবা গ্রামের দায়িত্ব নেবে এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করবে। তাদের জন্যে যেসব বিষয় উপকারী এবং যেসব বিষয় ক্ষতিকর, তা পৃথক পৃথক ভাবে বলে দেবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে। সে এই অপেক্ষায় থাকবে না যে, কেউ এসে নিজের রোগের কথা তাকে বলবে; বরং স্বয়ং মানুষকে ডেকে এনে উপদেশ দেবে। কেননা, আলেম সমাজ পয়গম্বরগণের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। পয়গম্বরগণ মানুষকে মূর্খতার উপর ছেড়ে দেননি; বরং

তাদেরকে সমাবেশে একত্রিত করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন। শুরুতে তাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়েছেন এবং এক একজনকে তালাশ করে হেদায়াত করেছেন। কেননা, যারা অন্তরের রোগী, তারা তাদের রোগের অবস্থা জানে না। যেমন, কারও মুখমন্ডলে যদি ধবলকুষ্ঠের দাগ থাকে এবং তার কাছে আয়না না থাকে, তবে সে তার রোগের অবস্থা জানতে পারবে না যে পর্যন্ত অন্য কেউ তাকে বলে না দেয়। এটা সকল আলেমের উপর ফরযে আইন। শাসকবর্গের কর্তব্য প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় একজন করে দ্বীনদার ফেকাহবিদ আলেম নিযুক্ত করা। যদি কোন ব্যক্তি আলেমের বর্ণিত চিকিৎসা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে শাসকদের হাতে সোপর্দ করা উচিত, যাতে তারা তার অনিষ্ট থেকে জনগণকে রক্ষা করে। যেমন কেউ বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে তার উৎপাত থেকে জনসাধারণ রক্ষা পায়।

আন্তরিক রোগ দৈহিক রোগের তুলনায় অনেক বেশী। এর কারণ তিনটি। প্রথমত, অন্তরের রোগী জানে না যে, সে রোগী। দ্বিতীয়ত, এ রোগের পরিণতি দুনিয়াতে প্রত্যক্ষ হয় না। দৈহিক রোগের পরিণতি মৃত্যু তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে। গোনাহের পরিণতি অন্তরের মৃত্যু, যা দুনিয়াতে জানা যায় না। তাই গোনাহের প্রতি ঘৃণা কম হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এ রোগের চিকিৎসক দুর্লভ। কারণ, এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে আলেম সম্প্রদায়। বর্তমান যুগে তারা নিজেরাই কঠিন রোগে আক্রান্ত। যেহেতু প্রায় সকলেই রোগাক্রান্ত, তাই তাদের রোগের ক্ষতি ও কুফল প্রকাশমান নয়। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং এমন কথা বলে, যা দ্বারা তাদের রোগ আরও বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, সর্বনাশা রোগ হচ্ছে দুনিয়ার মোহ। আর এ রোগটিই চিকিৎসক তথা আলেমদের ভেতরে প্রবল। তারা মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে সতর্ক করে না এই ভয়ে যে, কেউ যদি বলে দেয় অপরকে উপদেশ না দিয়ে নিজে আত্মরক্ষা করুন! এ কারণেই রোগটি ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। না আছে ঔষধ, না আছে চিকিৎসকের নাম-নিশানা। তারা যখন ওয়ায করে, তখন বেশীর ভাগ উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, কোনরূপে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হোক। এটা মানুষকে মাগফেরাতের আশায় আশান্বিত করা ছাড়া

হতে পারে না। তাই ওয়াযের মধ্যে আশার কারণসমূহ ও রহমতের প্রমাণসমূহ অধিক বর্ণনা করা হয়। এরূপ ওয়ায শুনে যখন মানুষ ঘরে ফিরে, তখন গোনাহের সাহস আরও বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অনুকম্পার উপর ভরসা বেড়ে যায়। যদিও আশা ও ভয় উভয়টিই প্রতিকার; কিন্তু দু'ব্যক্তির জন্যে, যারা পৃথক পৃথক রোগে আক্রান্ত। যে ব্যক্তির মধ্যে ভয় এত প্রবল যে, সংসারধর্ম বিসর্জন দিতে চায় এবং যে কাজ করতে অক্ষম, তার সাথে নিজেকে জড়িত করে ফেলে, এরূপ ব্যক্তির অধিক ভয়কে আশার কারণসমূহ বর্ণনা করে হ্রাস করা উচিত, যাতে তার ভয় ভারসাম্যের পর্যায়ে চলে আসে। কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কৃপার উপর গর্বিত, তার চিকিৎসা ভয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মোটকথা, চিকিৎসকদের নষ্টামির কারণে রোগ দুরারোগ্য হয়ে গেছে।

এখন আমরা ওয়াযের উপকারী পদ্ধতি বর্ণনা করব। যদিও এটা নাতিদীর্ঘ, কিন্তু আমরা কয়েক প্রকার বিষয়বস্তু উল্লেখ করব, যাতে মানুষ অব্যাহত গোনাহ বর্জন করতে সক্ষম হবে। ওয়াযে চার প্রকার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা জরুরী। প্রথমত, কোরআন মজীদে গোনাহগারদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যে যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করবে। এমনিভাবে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ উল্লেখ করবে। উদাহরণতঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন— প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় দু'জন ফেরেশতা একে অপরের কথার জওয়াব দেয়। এক ফেরেশতা বলে ঃ মানবকুল সৃজিত না হলেই ভাল হত! অন্য ফেরেশতা বলে ঃ চমৎকার হত যদি মানবকুল তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে পারত! প্রথম ফেরেশতা বলে ঃ তারা যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানল না, তখন যদি নিজেদের জ্ঞান দ্বারাই আমল করে নিত! এক রেওয়ায়েতে আছে, ভাল হত যদি তারা পরস্পর বসে জানা বিষয়গুলোর চর্চা করত! অন্য ফেরেশতা বলে ঃ তারা যদি আপন কুকর্ম থেকে তওবা করে নিত!

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ ছয় ঘন্টা পর্যন্ত এই গোনাহটি লিপিবদ্ধ করো না। যদি এ সময়ের মধ্যে সে তওবা ও এস্তেগফার করে

নেয়, তবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। নতুবা আমলনামায় লিখে নেয়া হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ করার সময় বান্দা যে জায়গায় থাকে, সেই জায়গার মাটি আল্লাহর দরবারে আরয করে– আদেশ হলে আমি তাকে গিলে ফেলি। তার মাথার উপরের আকাশ আল্লাহর কাছে বলে- আদেশ হলে আমি তার উপর ভেঙ্গে পড়ি! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে বলেন, আমার বান্দা থেকে বিরত থাক। তোমরা তাকে সৃষ্টি করনি। তোমরা সৃষ্টি করলে তার প্রতি তোমাদের দয়া হত। হয়তো সে তওবা করবে এবং আমি ক্ষমা করে দেব, অথবা এই গোনাহের বিনিময়ে কোন সৎকর্ম করবে এবং আমি এ গোনাহকেও পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেব। নিম্নোক্ত আয়াতে এটাই বুঝানো হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اَنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ধারণ করে রাখেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কেউ এগুলোকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— মোহরকারী ফেরেশতা আরশের সন্নিকটে অপেক্ষমাণ রয়েছে। যখন কোন বড় ধরনের দুষ্কর্ম সংঘটিত হয় এবং হারাম বস্তুসমূহকে হালাল মনে করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। সে মানুষের অন্তরে মোহর লাগিয়ে যায়। ফলে, অন্তরের অভ্যন্তরস্থ বিষয়সমূহ সেখানেই থেকে যায়— প্রকাশের পথ পায় না। হযরত মুজাহিদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— অন্তর হাতের খোলা তালুর মত। যখন মানুষ গোনাহ করে, তখন একটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে একে একে সবগুলো আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এটা অন্তরের তালা। গোনাহের নিন্দা ও তওবাকারীদের প্রশংসায় এমনি ধরনের রেওয়ায়েত বহুল পরিমাণে বর্ণনা করা উচিত।

দ্বিতীয় বর্ণনাযোগ্য বিষয় হচ্ছে পয়গম্বর ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কাহিনী যে, ভুলভ্রান্তির কারণেই তাদের উপর কেমন বিপদাপদ এসেছে! এ ধরনের কাহিনী অন্তরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং উপকার অনুভূত হয়।

উদাহরণতঃ হযরত আদম (আঃ) ভুলের কারণে কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন! জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বর্ণিত আছে, তিনি যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন, তখন দেহ থেকে জান্নাতী পোশাক উড়ে গেল এবং তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আরশের উপর থেকে আওয়াজ এল ঃ তোমরা উভয়ে আমার কাছ থেকে নেমে যাও। যে আমার অবাধ্য, তার ঠিকানা আমার কাছে হতে পারে না। হযরত আদম (আঃ) কেঁদে বিবি হাওয়াকে বললেন ঃ একটি মাত্র ভ্রান্তির প্রথম পরিণতিতে আমরা প্রেমাস্পদের কাছ থেকে বিতাড়িত হলাম। বর্ণিত আছে, সোলায়মান ইবনে দাঊদ (আঃ)-ও আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছিলেন। এর কারণ ছিল সেই চিত্র, যার পূজা তাঁর গৃহে চল্লিশ দিন পর্যন্ত করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তার একটি ছিল এই যে, জনৈকা মহিলা তার পিতার অনুকূলে মোকদ্দমায় রায় দেয়ার জন্যে তাঁকে বলেছিল এবং তিনি তাই করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু পরে সেরূপ করেননি। কারও মতে অপরাধ ছিল এই যে, সেই মহিলার খাতিরে তার পিতাকে মামলায় জিতিয়ে দেয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল।

মোটকথা, এরূপ একটি ভ্রান্তির বিনিময়ে চল্লিশ দিনের জন্যে তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। খাওয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করলে খাদ্যবস্তু উধাও হয়ে যেত। তিনি মানুষকে বলতেন ঃ আমাকে খাবার দাও। আমি সোলায়মান ইবনে দাঊদ। জওয়াবে মানুষ তাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিত। রেওয়ায়েতে আছে, এক বৃদ্ধার কাছে খাদ্য চাইলে সে তাকে শাসিয়ে দিল এবং মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে,এক বৃদ্ধা নোংরা পানির একটি পাত্র তাঁর মাথায় ঢেলে দিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আংটি মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এল এবং চল্লিশ দিন পর তিনি আংটি পরিধান করলেন। তখন পক্ষীকুল পুনরায় তাঁর মাথার উপর ছায়া করে দাঁড়িয়ে গেল এবং জিন, শয়তান বন্য জন্তুরা কাছে এসে গেল। তাদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি বললেন ঃ অতীত কৃতকর্মের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এটা ছিল একটি অবশ্যম্ভাবী ঐশী বিষয়।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলতে পার, আমি তোমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে তোমার কাছ থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করেছি? তিনি আরয করলেন ঃ জানি না। এরশাদ হল ঃ কারণ, তুমি তার ভাইদেরকে বলেছিলে-

اخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون

অর্থাৎ, আমার ভয় হয় বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে অথচ তোমরা থাকবে অসতর্ক।

তুমি বাঘের ভয় করেছ, আমার আশা করনি। তুমি ভাইদের গাফলতির কথা চিন্তা করেছ, আমার হেফাযতের প্রতি লক্ষ্য করনি। আল্লাহ পাক আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি জান, আমি ইউসুফকে কেন ফেরত দিয়েছি? তিনি আরয করলেন ঃ না, জানি না। এরশাদ হল ঃ তুমি বলেছিলে—

عسى الله ان ياتينى بهم جميعا

অর্থাৎ, হয়তো আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

তুমি আরও বলেছিলে—

اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولاتيأسوا من روح الله

অর্থাৎ, যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর। তোমরা আল্লাহর কৃপা থেকে নিরাশ হয়ো না।

এতে করে তুমি আমার আশা করেছিলে। তাই আমি তোমাদের মিলন ঘটিয়েছি। অনুরূপভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় শাহী মুসাহিবকে বলেছিলেন ঃ তোমার প্রভুকে আমার আটকে থাকার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তিনি হয়তো আমাকে মুক্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন—

فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين

অর্থাৎ, অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে উল্লেখ করার বিষয়টি বিস্মৃত করে দিল। ফলে, ইউসুফকে আরও কয়েক বছর জেলে থাকতে হল।

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত এ ধরনের অসংখ্য গল্প কেবল কিসসা-কাহিনীর জন্যে নয়; বরং এগুলোতে সচেতন ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। তারা এগুলো দেখে অনুধাবন করতে পারবে যে, পয়গম্বরগণের ছোট ছোট পদস্খলন যখন মার্জিত হয়নি, তখন অন্যদের কবীরা গোনাহ কিরূপে মাফ হবে? তবে পয়গম্বরগণের সাজা দুনিয়াতে হয়ে গেছে— আখেরাতে কোন পাকড়াও হবে না। এটা তাঁদের বৈশিষ্ট্য। যারা হতভাগ্য, দুনিয়াতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়, যাতে পুরামাত্রায় গোনাহ করে নেয়। দুনিয়ার শাস্তি হাল্কা এবং আখেরাতের শাস্তি কঠোরতর। হতভাগাদের কুকর্ম এমনি কঠোর আযাবের যোগ্য। এ কারণেও তাদেরকে দুনিয়াতে অবকাশ দেয়া হয়।

এ ধরনের কথাবার্তা অব্যাহত গোনাহকারীদের সামনে অধিক পরিমাণে বলা উচিত। তওবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এটা প্রায়শ উপকারী হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রকার বিষয়বস্তু একথা বর্ণনা করা যে, দুনিয়াতে বান্দা যে সকল বিপদাপদে পতিত হয়, সেগুলো গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। মানুষ প্রায়ই আখেরাতের ব্যাপারে অলসতা করে; কিন্তু মূর্খতাবশত পার্থিব শাস্তিকে অধিক ভয় করে। অতএব, এ ধরনের মানুষকে এ ধরনের বিষয়বস্তুর দ্বারা হেদায়াতের পথে আনা জরুরী। কেননা, অধিকাংশ সময় গোনাহের অমঙ্গল দুনিয়াতেই মানুষের উপর আপতিত হয়; যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। এমনকি, মাঝে মাঝে গোনাহের দরুন মানুষের রূযী-রোযগার সংকীর্ণ হয়ে যায়। কখনও মানুষের মনে সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ফলে শত্রু প্রবল হয়ে যায়। হাদীসে আছে, গোনাহ করার কারণে বান্দা রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার জানা মতে গোনাহের কারণে মানুষ বিদ্যাশিক্ষা ভুলে যায়। এক হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—যে ব্যক্তি গোনাহ করে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনও ফিরে আসে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মুখমণ্ডল বিশ্রী হওয়া এবং ধনসম্পদ হ্রাস পাওয়ার নাম লা'নত তথা অভিসম্পাত নয়; বরং অভিসম্পাত হল এক গোনাহ থেকে বের হয়ে তারই অনুরূপ অথবা তদপেক্ষা বড় গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়া। বাস্তবে তিনি ঠিকই

বলেছেন। কারণ, লা'নতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বঞ্চিত করা এবং রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া। মানুষ যখন সৎকাজের তাওফীক পায় না, তখন রহমত থেকে দূরেই সরে পড়ে। এছাড়া প্রত্যেক গোনাহ অন্য গোনাহের দিকে আহ্বান করে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মানুষ তার আত্মিক খাদ্যরূপী রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ, আলেমদের কাছে বসা এবং সৎকর্মীদের সাথে চলাফেরা করা। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যাতে সৎকর্মীগণও তার প্রতি নারাজ থাকে।

জনৈক অধ্যাত্মবিদের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি পরনের কাপড় উপরে তুলে কর্দমাক্ত পথে চলে যাচ্ছিলেন এবং পদযুগল শক্ত করে মাটিতে রাখছিলেন, যাতে পিছলে না যান। কিন্তু তার পা পিছলে গেল এবং তিনি কাদায় পড়ে গেলেন। এরপর তিনি উঠে কাদার মধ্যেই কেঁদে কেঁদে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ বান্দার অবস্থা হুবহু তাই। সে সর্বদা গোনাহ থেকে বেঁচে চলে। অবশেষে একাধিক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর গোনাহের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, এক গোনাহ থেকে অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়াও গোনাহের অন্যতম শাস্তি।

মোটকথা, আল্লাহওয়ালাদের মতে দুনিয়ার বিপদাপদ গোনাহের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সেমতে হযরত ফুযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন দুনিয়ার দুর্বিপাকে পড়ে, তখন তার জানা উচিত যে, এটা তার গোনাহেরই কারণে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি আমার গাধার অভ্যাসও বিগড়ে যায়, তবে আমি এটাই মনে করব যে, এটা আমারই ত্রুটি-বিচ্যুতির ফল। জনৈক আল্লাহ-ওয়ালা বলেন ঃ আমি আমার গোনাহের শাস্তি গৃহের ইঁদুরের মধ্যেও আছে বলে জানি।

জনৈক সূফী বর্ণনা করেন— আমি সিরিয়ায় একজন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী খৃস্টান বালককে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং অপলক দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য সুধা পান করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমার কাছে ইবনে জালা দামেশকী আগমন করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমি এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় ভীষণ লজ্জিত হলাম। অতঃপর কথা বানিয়ে বললাম ঃ এই বালকের মুখাবয়ব দেখে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, এমন অনিন্দ্য সুন্দর মুখও জাহান্নামের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে? জানি না, এর পেছনে আল্লাহর

কি হেকমত। একথা শুনে ইবনে জালা আমার হাতে চিমটি কেটে বললেন ঃ কয়েক দিন পর তুমি এর শাস্তি পেয়ে যাবে। সূফী বলেন ঃ ত্রিশ বছর পর আমি এর শাস্তি পেয়েছি। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ স্বপ্নদোষ হওয়াও গোনাহের একটি শাস্তি। তিনি আরও বলেন ঃ নামাযে জামাত না পাওয়ার বিষয়টিও কোন গোনাহ্ করার কারণে প্রকাশ পায়। এক হাদীসে আছে—

مَا اَنْكَرْتُمْ مِنْ زَمَانِكُمْ فَبِمَا غَيَّرْتُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ, যামানার যে বিষয় তোমাদের খারাপ লাগে, তাকে তোমাদের আমল বিকৃত করারই ফল মনে কর।

আবু আমর ইবনে হুলওয়ান তার কাহিনীতে লিখেনঃ একদিন আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময় আমার অন্তরে কামভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমি এ সম্পর্কে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত তা সমকামিতার খাহেশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমার সমস্ত শরীর কাল হয়ে গেল। লোকলজ্জার ভয়ে আমি তিনদিন পর্যন্ত ভেতরে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম এবং হাম্মামে গিয়ে সাবান দিয়ে শরীর ধৌত করলাম। কিন্তু কালো রঙ বাড়তেই থাকল। তিনদিন পর রঙ পরিষ্কার হল এবং আমি তলব পেয়ে রিক্কা থেকে হযরত জুনায়দ বাগদাদীর খেদমতে বাগদাদ গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন ঃ ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা হল না। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কামভাবে মত্ত হলে, যা তোমাকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। যদি আমি দোয়া না করতাম এবং তোমার পক্ষ থেকে তওবা না করতাম, তবে এই কালো রঙ নিয়েই তুমি আল্লাহর কাছে যেতে। আমি বিস্মিত হলাম যে, হযরত জুনায়দ আমার অবস্থা কিরূপে জানলেন! আমি তো রিক্কায় ছিলাম আর তিনি ছিলেন বাগদাদে।

এখানে জানা দরকার যে, মানুষ যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরের চেহারা কালো হয়ে যায়। যদি সে ভাগ্যবান হয়, তবে কালো রঙ বাইরের দেহেও ফুটে উঠে, যাতে সে গোনাহ্ থেকে বিরত হতে পারে। পক্ষান্তরে হতভাগ্য হলে কালো রঙ ভেতরেই থেকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র অন্তর্ভাগ কালো হয়ে সে দোযখের উপযুক্ত হয়ে যায়।

গোনাহের ফলস্বরূপ দুনিয়াতে যে দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যাধি আসে, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগত বান্দার অবস্থা ভিন্ন। তার উপর কোন বিপদাপদ এলে, তা তার গোনাহের কাফফারা হয় এবং এ জন্যে সবর করলে তার মর্তবা বেড়ে যায়।

চতুর্থ বর্ণনাযোগ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাদা আলাদা গোনাহের জন্যে শরীয়তে যে শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, ওয়াযে তা বর্ণনা করা। উদাহরণতঃ মদ্যপানের অনিষ্ট, যিনা, চুরি, হত্যা, গীবত, অহমিকা এবং হিংসার কুফল আলাদা আলাদা বর্ণনা করবে। এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ের উপযুক্ত, তার কাছে সেই বিষয়ই বর্ণনা করতে হবে। বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন প্রথমে নাড়ী, বর্ণ, গতিবিধি ইত্যাদি পরীক্ষা করে রোগের অভ্যন্তরীণ কারণ জেনে নেয়, এরপর চিকিৎসা করে, আলেমকেও তেমনি অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা মানুষের গোপন দোষগুণ জেনে তাই বর্ণনা করতে হবে, যাতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ হয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْيَاسِ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْغَنِيُّ وَاِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَاِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ وَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَاِيَّاكَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ -

অর্থাৎ, তোমার কর্তব্য অপরের ধনসম্পদ থেকে নিরাশ হওয়া। এটাই ধনাঢ্যতা। তুমি লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, এটা উপস্থিত দারিদ্র্য। বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়। আর এমন কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাক, যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হয়।

অন্য এক ব্যক্তি উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ মিথ্যা কথা বলো না। আরও এক ব্যক্তি উপদেশ চাইলে তিনি বললেন ঃ ক্রুদ্ধ হয়ো না।

জনৈক ব্যক্তি মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমার উপদেশ হল, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে বাদশাহ হয়ে থেকো। লোকটি বলল ঃ এটা আমার জন্যে কিরূপ সম্ভবপর হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসার অনাসক্তিকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও।

এখানে রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম ব্যক্তির মধ্যে অপরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার আলামত প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাকে তেমনি আদেশ করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি কথাবার্তার হেরফের লক্ষ্য করেছেন। তাই তাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি ক্রোধের আলামত জানতে পেরেছেন। তাই তাকে ক্রোধ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'ও তার উপদেশপ্রার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে লালসার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন এবং তদনুযায়ী উপদেশ দিয়েছেন। মোটকথা, প্রার্থীর অবস্থা অনুযায়ী কথাবার্তা হওয়া উচিত—বক্তার যোগ্যতা অনুযায়ী নয়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লিখলেন ঃ আমার জন্যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিপিবদ্ধ করুন। হযরত আয়েশা পত্রে লিখলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির পরওয়া না করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের কোপানল থেকে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরওয়া না করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছেই সঁপে দেন। এ পত্রে হযরত আয়েশার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষণীয় যে, তিনি কিভাবে সে বিপদটিই উল্লেখ করেছেন, যাতে শাসকবর্গ ও আমীর-উমারা লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ, মানুষের পক্ষপাতিত্ব করা ও তাদের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়া। একবার তিনি আমীর মোয়াবিয়াকে লিখেছিলেন— আল্লাহকে ভয় করতে থাক। কেননা, আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু মানুষকে ভয় করলে আল্লাহর সামনে তোমার কোন জারিজুরি চলবে না। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে গোপন দোষ-গুণ জেনে নেয়া ওয়ায়েযের জন্যে অত্যাবশ্যক, যাতে উপযুক্ত অবস্থা ও সময়ের

চাহিদা অনুযায়ী জরুরী বিষয়টি বর্ণনা করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাবতীয় উপদেশ বলে দেয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া যে বিষয় বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, তাতে মশগুল হওয়ার অর্থ সময় নষ্ট করা।

এখানে প্রশ্ন হল, যে ব্যক্তি জনসমাবেশে ওয়ায করে, তার কি করা উচিত? জওয়াব এই যে, এমতাবস্থায় এমন বিষয়বস্তু বর্ণনা করবে যাতে সকল মানুষ শরীক; অর্থাৎ, এমন প্রয়োজনীয় বিষয়, যা জানা সবারই জন্যে উপকারী। শরীয়তের বিষয়াদিতে এটা সম্ভব। কেননা, শরীয়তের বিষয়সমূহ একদিকে যেমন খাদ্য, অপরদিকে তেমনি ঔষধি। খাদ্য সকলের জন্যে এবং ঔষধি রোগগ্রস্তদের জন্যে। এরূপ ওয়াযের দৃষ্টান্ত এই— এক ব্যক্তি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ভয়কে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। সকল কল্যাণের মূল এটাই। জেহাদকে নিজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। ইসলামে একেই বৈরাগ্য বলা হয়। সদাসর্বদা কোরআন মজীদ পাঠ কর। এটা তোমার জন্যে পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা হবে এবং ঊর্ধ্বজগতের স্মারক হবে। ভাল কথা না হলে চুপ করে থাক। এর মাধ্যমে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হবে।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ আলেমদের সামনে বিনয়াবনত হয়ে বস, তাদের সাথে তর্ক করো না। করলে তারা তোমাকে খারাপ মনে করবে। দুনিয়াতে জীবন ধারণ করা যায় এই পরিমাণ সম্পদ রেখে অবশিষ্ট উপার্জন আখেরাতের জন্যে ব্যয় কর। সংসার-ধর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করো না। তাহলে নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে হবে এবং অপরের গলগ্রহ হতে হবে। রোযা এমনভাবে রাখ, যা দ্বারা কামশক্তি দমিত হয়— এমন ভাবে রেখো না, যা দ্বারা নামাযে বিঘ্ন দেখা দেয়। কেননা, নামায রোযা অপেক্ষা উত্তম। নির্বোধের কাছে বসো না এবং দ্বিমুখী মানুষের সাথে মেলামেশা করো না। নিজের ধন হারিয়ে অপরের ধনের হেফাযত করো না। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর পূর্বে যে ধন দান করা হয়, তা নিজের ধন এবং মৃত্যুর সময় যে ধন রেখে যাওয়া হয়, তা অপরের ধন। প্রিয় বৎস, যে দয়া করে, তার প্রতি দয়া করা হয়। যে চুপ থাকে, সে নিরাপদ থাকে। যে ভাল কথা বলে, সে সওয়াব পায়। যে মন্দ কথা বলে,

সে গোনাহগার হয়। যে রসনা সংযত করে না, সে অনুতাপ করে।

অব্যাহত গোনাহের চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সবর। এর প্রয়োজন এ কারণে হয় যে, রোগীর রোগ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হচ্ছে ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবহার। এই ব্যবহার দু'কারণে হয়ে থাকে—(১) ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং (২) খাহেশের আতিশয্যে ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও গাফলতির প্রতিকার উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন শুধু খাহেশের প্রতিকার বাকী।

রোগী যখন কোন ক্ষতিকর বস্তুর প্রতি অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়, তখন প্রথমে সে সেই বস্তুর ক্ষতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। এরপর সেই বস্তুটিকে তার দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিতে হবে। এর পরিবর্তে রোগী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কোন বস্তু ব্যবহার করবে, যা আকারে প্রথম বস্তুর অনুরূপ হবে। এরপর দ্বিতীয় বস্তুটিও বর্জন করবে এবং এ বর্জনে সবর করবে। মোটকথা, সবরের তিক্ততা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। গোনাহের প্রতি খাহেশের চিকিৎসাও এমনি ভাবে হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ যদি কোন যুবকের কামোত্তেজনা থাকে এবং সে তার চক্ষু, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম না হয়, তবে প্রথমে তার এই গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে যে শাস্তিবাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো জেনে নেবে। যখন ভয় বেড়ে যাবে, তখন যে সব কারণে কামভাব উত্তেজিত হয়, সেগুলো থেকে সরে যাবে। যদি কোন কিছু দেখা অথবা সম্মুখে পাওয়ার কারণে কামভাব উত্তেজিত হয়, তবে তার চিকিৎসা সেই বস্তু থেকে পালিয়ে একান্তবাস অবলম্বন করা। আর যদি কামোত্তেজনা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যের কারণে হয়, তবে তার চিকিৎসা ক্ষুধার্ত থাকা ও সর্বদা রোযা রাখা।

বলা বাহুল্য, উভয় চিকিৎসা সবরের মুখাপেক্ষী। সবর ভয় ছাড়া, ভয় জ্ঞান ছাড়া এবং জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং প্রথমে ওয়াযের মজলিসে হাযির হয়ে একাগ্রচিত্তে ওয়ায শ্রবণ করা উচিত। এরপর যা শুনবে, তা বুঝার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে নিঃসন্দেহে ভয় সৃষ্টি হবে। ভয় প্রবল হলে তার সাহায্যে সবর অর্জিত হবে। ফলে, চিকিৎসার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে সংযুক্ত হবে আল্লাহর তাওফীক।

অতএব, যে ব্যক্তি মনোযোগসহ শ্রবণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার কাজ সহজ করে দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনোনিবেশ করবে না এবং ভাল কথাকে মিথ্যা মনে করবে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার কাজ কঠিন করে দেবেন।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম ঈমানে গিয়ে ঠেকে। কেননা, সবর ব্যতীত গোনাহ বর্জন করা সম্ভব নয়। সবর ভয় ছাড়া এবং ভয় জ্ঞান ছাড়া অর্জিত হয় না। জ্ঞান তখন অর্জিত হয়, যখন গোনাহের ক্ষতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। গোনাহের ক্ষতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হুবহু আল্লাহ ও রসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এরই নাম ঈমান। অতএব সারকথা হল, যে ব্যক্তি অব্যাহত গোনাহ করে, সে এজন্যে করে যে, তার ঈমান নেই। এর জওয়াব এই যে, অব্যাহতভাবে গোনাহ করার ফলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায় না; বরং ঈমানের দুর্বলতার কারণে এ গোনাহ হয়ে থাকে। কারণ, ঈমানদার মাত্রই একথা স্বীকার করে যে, গোনাহ আল্লাহ থেকে দূরত্বের এবং পারলৌকিক শাস্তির কারণ। এরপরেও একাধিক কারণে মানুষ গোনাহ করে থাকে। প্রথম কারণ, যে শাস্তির কথা বলা হয়, তা অনুপস্থিত এবং অদৃশ্য। মানুষ মজ্জাগতভাবে উপস্থিত বস্তু দ্বারা যতটুকু প্রভাবিত হয়, ততটুকু অনুপস্থিত বস্তু দ্বারা হয় না। তাই প্রতিশ্রুত বিষয়ের প্রভাব মানুষের উপর উপস্থিত বিষয়ের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ, যে খাহেশ তথা কামভাব গোনাহের কারণ, তার আনন্দ ও স্বাদ নগদ হয়ে থাকে। নগদ আনন্দ অনাগত ভয়ের কারণে ত্যাগ করা স্বভাবতই কঠিন হয়ে থাকে। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

অর্থাৎ, তোমরা আসলে পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।

এ বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। বলা হয়েছে—

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

অর্থাৎ, অপ্রিয় বিষয়সমূহ দ্বারা জান্নাতকে এবং কামনা-বাসনা দ্বারা জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে ফেরেশতা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন, গিয়ে দেখে আস। জিবরাঈল জাহান্নাম পরিদর্শন করে আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে কখনও এতে প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা আবৃত করে দিলেন এবং জিবরাঈলকে আদেশ করলেন ঃ এবার গিয়ে দেখে আস। তিনি দেখার পর আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, এখন আমার আশংকা হয়, কেউ এতে প্রবেশ না করে ক্ষান্ত হবে না। এরপর জান্নাত সৃষ্টি করে জিবরাঈলকে তা দেখতে বলা হল। তিনি দেখার পর আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে অপ্রিয় বিষয়াদির দ্বারা আবৃত করে জিবরাঈলকে দেখতে বললেন। তিনি দেখে আরয করলেন ঃ এখন আমি আশংকা করি, কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ থেকে বুঝা গেল, কামনা-বাসনার উপস্থিতি এবং আযাব বিলম্বিত হওয়া এ দুটিই অব্যাহত গোনাহের উন্মুক্ত কারণ; যদিও মূল ঈমান বিদ্যমান থাকে। যে রোগী তীব্র পিপাসার কারণে বরফের পানি পান করে, সে মূল চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না এবং পানি তার জন্যে ক্ষতিকর—এ বিষয়টিও অস্বীকার করে না। কিন্তু কামনা-বাসনা প্রবল থাকার কারণে ভবিষ্যত কষ্ট ও ক্ষতি মেনে নেয়া সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় কারণ, গোনাহগার মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তওবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং নিজের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা মিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মনে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশা প্রবল থাকার কারণে সে সর্বক্ষণ তওবা বিলম্বিত করে।

চতুর্থ কারণ, মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করে যে, গোনাহ এমন শাস্তির কারণ হয় না, যা মাফ হওয়া অসম্ভব। তাই সে গোনাহ করে এবং আল্লাহর কৃপার উপর ভরসা করে তা মাফ হওয়ার প্রত্যাশা রাখে।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ই মূল ঈমান থাকা সত্ত্বেও গোনাহের কারণ হয়ে

থাকে। হাঁ, মাঝে মাঝে পঞ্চম একটি কারণেও মানুষ গোনাহ করে থাকে, যদ্দরুন মূল ঈমানেই ত্রুটি দেখা দেয়। তা এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি মূলত রসূল (সাঃ)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ পোষণ করে। এরই নাম কুফর।

এখন বর্ণিত পাঁচটি কারণের প্রতিকার জানা দরকার। প্রথম কারণ অর্থাৎ শাস্তি অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে চিন্তা করবে যে, যা হওয়ার তা অবশ্যই হবে। যা ভবিষ্যত তা অতীত হয়ে যায়। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী। আরও চিন্তা করবে যে, আমরা দুনিয়াতে অনাগত আশংকার কারণে বর্তমানে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করি। উদাহরণতঃ কখনও দরিদ্র হয়ে যাব— এই ভয়ে জল ও স্থলে সফর করি এবং অর্থ উপার্জন করি। যদি কোন বিধর্মী চিকিৎসক কোন রোগীকে বলে দেয় ঠাণ্ডা পানি তোমার জন্যে ক্ষতিকর— এতে তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে, তবে রোগীর কাছে ঠাণ্ডা পানি সর্বাধিক সুস্বাদু হলেও মৃত্যুর ভয়ে সে তা পরিত্যাগ করবে। অথচ মৃত্যুকষ্ট এক মুহূর্তের বেশী নয়। এখন চিন্তার বিষয় একজন বিধর্মীর কথায় কিভাবে রোগী সুস্বাদু বস্তু ত্যাগ করে অথচ তার চিকিৎসা যে সত্য ও অব্যর্থ, তার উপর কোন মো'জেযা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং সে মনে মনে বলবে—পয়গম্বরগণের উক্তি, যা মো'জেযা দ্বারা সমর্থিত, একজন বিধর্মীর উক্তির চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য হবে—এটা আমার বিবেকের কাছে গ্রহণীয় নয় অথবা আমার কাছে দোযখের আযাব মৃত্যুযন্ত্রণার তুলনায় হালকা হবে—এটাও মেনে নেয়া যায় না। কিয়ামতের প্রতিটি দিন দুনিয়ার দিনসমূহের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

এমনি ধরনের চিন্তাভাবনা দ্বারা দ্বিতীয় কারণেরও চিকিৎসা হতে পারে। অর্থাৎ, গোনাহ করার কারণ যদি আনন্দ উপভোগের প্রাবল্য হয়, তবে জোরপূর্বক তা পরিত্যাগ করবে এবং মনে মনে বলবে—ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দকে যখন আমি ত্যাগ করতে পারি না, তখন অনন্তকালীন আনন্দ কিরূপে বিসর্জন দেব? যদি সবরের সামান্য কষ্ট সহ্য করতে না পারি, তবে দোযখের অচিন্তনীয় কষ্ট কিরূপে সহ্য করব?

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ তওবায় গড়িমসি করার চিকিৎসা হচ্ছে একথা

চিন্তা করা যে, দোযখীরা বেশীর ভাগ এ ফরিয়াদই করবে যে, তারা তওবার সময়কে কেন বিলম্বিত করেছে? এ ছাড়া যে ব্যক্তি গড়িমসি করে, সে তার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এটা করে যাবে। অর্থাৎ, সে মনে করে নেয় যে, আরও অনেক দিন বাঁচবে। তখন তওবা করে নেবে। প্রশ্ন এই যে, সে জীবিত থাকবে—এটা কিরূপে জানল? তার মরে যাওয়ারও তো সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি জীবিতও থাকে, তবে গোনাহ্ ত্যাগ না করারও তো সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন এ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেনি। কারণ, কামনা-বাসনার প্রাবল্য তখনও থেকে যেতে পারে; বরং বেশী দিন অভ্যাসের কারণে তা আরও মযবুত হয়ে যাবে। এসব কারণে যারা গড়িমসি করে, তারা পরিণামে ধ্বংস হয়ে যায়।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে গিয়ে দেখল যে, বৃক্ষটি বেশ মযবুত। কঠিন পরিশ্রম ছাড়া উৎপাটিত করা যাবে না। সে মনে মনে বলল, একে আরও বছর খানেক এমনিতেই রেখে দেই। এরপর উপড়ে ফেলব। সে ভাবেনি যে, যতই দিন যাবে, বৃক্ষের মূল ততই মযবুত হবে এবং সে নিজে যতই বড় হবে, ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। দুনিয়াতে এরূপ ব্যক্তির সমান নির্বোধ কেউ হবে না। যখন তার দেহে শক্তি ছিল এবং বৃক্ষ দুর্বল ছিল, তখন সে বৃক্ষটি উপড়ায়নি; বরং এমন সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে, যখন বৃক্ষ হবে ইস্পাতকঠিন এবং সে হবে দুর্বল।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতের ভরসায় গোনাহ করা— এর চিকিৎসা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়েরই অনুরূপ যে, কেউ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে নিঃস্ব করে দেয় এবং আশা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন কৃপায় কোন নির্জন জায়গায় ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলে দেবেন। এরূপ ধনভান্ডার পাওয়া যদিও সম্ভব, মাঝে মাঝে এরূপ হয়ও, কিন্তু এর উপর ভরসা করে যে নিজের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে, সে নিরেট বোকা। এমনিভাবে গোনাহ্ মাফ হওয়াও সম্ভব। কিন্তু এর উপর ভরসা করা মূর্খতা।

পঞ্চম কারণ অর্থাৎ রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করে গোনাহ করা, এর চিকিৎসা সম্ভব। উদাহরণতঃ সন্দেহকারীকে বলা হবে—আখেরাত সম্পর্কিত যেসব বিষয়কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য

আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলো তোমার মতে সম্ভবপর না, অসম্ভব? যদি সে উত্তরে সন্দেহের কথা জানায়, তবে তাকে বলা উচিত— যদি তুমি আপন গৃহে খাদ্যবস্তু রেখে যাও এবং কোন অচেনা ব্যক্তি এসে তোমাকে বলে ঃ তোমার চলে যাওয়ার পর এ খাদ্যে বিষধর সর্প বিষ ছেড়ে দিয়েছে, তবে তুমি তার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করে সেই খাদ্য খাবে, না সুস্বাদু হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগ করবে? সে এ জবাবই দিবে যে, আমি এই খাদ্য খাব না। কারণ, আমি চিন্তা করব যদি সে মিথ্যা বলে থাকে, তবে ক্ষতি এতটুকুই হবে যে, খাদ্য খাওয়া হল না। এ ব্যাপারে সবর করা কঠিন হলেও সম্ভবপর। পক্ষান্তরে যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে নির্ঘাত আমার মৃত্যু হবে, যা না খেয়ে সবর করার তুলনায় অত্যন্ত কঠিন।

এরপর সন্দেহকারীকে বলা হবে— সোবহানাল্লাহ, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কথা তুমি মেনে নিতে পার, যা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে বলারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মো'জেযা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও পয়গম্বরের উক্তি এবং ওলী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সকল সুধী ব্যক্তির বাণী মেনে নিতে তোমার আপত্তি। মূর্খদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই। যারা বুদ্ধিমান, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং সওয়াব ও আযাবকে সঠিক মনে করে না— যদিও এগুলোর অবস্থা ও প্রকারভেদে মতানৈক্য রয়েছে। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে তুমি অনন্তকাল আযাব ভোগ করবে। আর যদি তাদের কথা মিথ্যা হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; কেবল কতিপয় কামনা-বাসনা থেকে তুমি এ দুনিয়াতে বঞ্চিত থাকবে।

আমাদের এই আলোচনা হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তির অনুরূপ। তিনি আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহকারী জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন ঃ যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তবে আমরা ও তুমি সকলেই বেঁচে যাব। পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বাস সঠিক হলে আমরা রক্ষা পাব এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সবর ও শোকর

হাদীস ও মনীষীদের বাণীর দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ঈমানের দুটি অংশ— একটি সবর, অপরটি শোকর। আল্লাহ্ তা'আলার "আসমায়ে হুসনা" তথা সুন্দর নামসমূহের মধ্যে সাবূর ও শাকূর উভয়টি রয়েছে। তাই সবর ও শোকর যে খোদায়ী গুণাবলী ও আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত, তা প্রমাণিত। অতএব, এ দুটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা যেন ঈমানের দুটি অংশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অথবা আল্লাহ্ তা'আলার দুটি গুণ সম্পর্কে গাফেল থাকার নামান্তর।

ঈমান ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন্ বিষয়ের প্রতি এবং কোন্ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনতে হবে, তা জানা ছাড়া ঈমানের পথে চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি এটা জানার ব্যাপারে শৈথিল্য করবে, সে সবর ও শোকরের সম্যক পরিচয় লাভেও ব্যর্থ হবে। এ থেকে বুঝা গেল, ঈমানের উভয় অংশের যথাযথ বর্ণনা একান্ত জরুরী। তাই আমরা এ অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সবর ও শোকর একত্রে বর্ণনা করেছি। কারণ, উভয়ের মধ্যে মিল ও যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবর

আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদেরকে অনেক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং কোরআন পাকে সত্তরেরও বেশী জায়গায় সবরের উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক মর্যাদা ও পুণ্যকর্মকে সবরের ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

অর্থাৎ, তারা যখন সবর করল, তখন আমি তাদের মধ্য থেকে পথ প্রদর্শক করলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তার কল্যাণের ওয়াদা বনী ইসরাঈলের প্রতি পূর্ণতা লাভ করল এ কারণে যে, তারা সবর করেছিল।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম কর্মের বিনিময়ে।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

অর্থাৎ, তারা তাদের পুরস্কার দু'বার পাবে। কারণ, তারা সবর করেছে।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার বে-হিসাব প্রদান করা হবে।

শেষোক্ত এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, সবর ব্যতীত অন্যান্য পুণ্যকর্মের সওয়াব বিশেষ পরিমাণ ও হিসাব অনুযায়ী প্রদান করা হবে এবং সবরের সওয়াব বেহিসাব দেয়া হবে। রোযা অর্ধেক সবর হওয়ার কারণে এটি সবরেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

অর্থাৎ, রোযা হল আমার জন্যে এবং আমি এর প্রতিদান দেব।

সবরের সওয়াব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

অন্যত্র তিনি স্বীয় সাহায্যকে সবরের সাথে শর্তযুক্ত করে বলেছেন ঃ

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ـ

অর্থাৎ, হাঁ, যদি তোমরা সবর কর, সংযমী হও এবং শত্রু এ মুহূর্তে অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের মদদ করবেন।

আরও এক জায়গায় সবরকারীদের জন্যে এমন সব নেয়ামতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যেগুলো অন্যদের জন্যে নয়। এরশাদ হয়েছে—

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, এই লোকদের প্রতিই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অনুকম্পা এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

এ আয়াতে সৎপথ, অনুকম্পা ও ধন্যবাদ সবরকারীদের জন্যে একত্রিত

আছে। মোটকথা, সবরের ফযীলত সম্পর্কে আরও অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের সংখ্যাও অনেক। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ, সবর ঈমানের অর্ধেক।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যেসব বিষয় তোমাদেরকে কম দেয়া হয়েছে, একীন ও সবর সেগুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাপ্ত হয়, সে তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা না করলেও পরওয়া করবে না। তোমরা যদি বর্তমান অবস্থার উপর সবর কর, তবে এটা আমার কাছে এক এক ব্যক্তির সকলের সমপরিমাণ আমল নিয়ে আসার তুলনায় অধিক প্রিয়। কিন্তু আমি আশংকা করি আমার পর তোমাদের সামনে দুনিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তোমরা একে অপরকে খারাপ মনে করবে। তখন আকাশের অধিবাসীরা তোমাদেরকে খারাপ মনে করবে। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে সবর করবে, সে তার সওয়াব পুরাপুরি পাবে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ, যা তোমাদের কাছে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহর কাছে আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম আমলের বিনিময়ে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সবর করা ও দান করা। এক হাদীসে আছে—

اَلصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ, সবর জান্নাতের অন্যতম ভাণ্ডার।

একবার এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ঈমান হচ্ছে সবর করা। এর অর্থ, ঈমানের বড় রোকন হচ্ছে সবর করা। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ওহী প্রেরণ করেন যে, আমার চরিত্রের মত তুমিও তোমার চরিত্র গঠন কর। আমার চরিত্র এই যে, আমি সাবূর (অধিক সবরকারী)। আতা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন—রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি ঈমানদার? সকলেই চুপ করে রইল। হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমরা ঈমানদার। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ঈমানের পরিচয় কি? আনসারগণ আরয করলেন ঃ আমরা সুখে শোকর করি, কষ্টে সবর করি এবং আল্লাহর আদেশের উপর সন্তুষ্ট থাকি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। এক হাদীসে আছে—

اَلصَّبْرُ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ অর্থাৎ, অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—অপ্রিয় বস্তুর ব্যাপারে সবর করলেই তুমি তোমার প্রিয় বস্তু লাভ করতে পারবে।

বহু মনীষীগণের উক্তি দ্বারাও সবরের ফযীলত প্রমাণিত হয়। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) আবু মূসা আশআরীকে যে পত্র লিখেন, তাতে একথাও লিখিত ছিল— সবরকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। মনে রেখ, সবর দু'প্রকার এবং একটি অপরটির চেয়ে উত্তম। বিপদে সবর করা ভাল কিন্তু তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ তা'আলার বণ্টনে সবর করা। মনে রেখ, সবর ঈমানের মূল। কেননা, সর্বোত্তম নেকী হচ্ছে তাকওয়া, যা সবর দ্বারা অর্জিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চারটি স্তম্ভের উপর ঈমানের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল—একীন, সবর, জেহাদ ও ইনসাফ। তিনি আরও বলেন ঃ ঈমানের সাথে সবরের সম্পর্ক দেহের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্কের অনুরূপ। সুতরাং মস্তিষ্ক ছাড়া যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, তেমনি যার সবর নেই, তার ঈমান আছে বলা যায় না।

সবরের স্বরূপ ঃ উপরে কোরআন-হাদীসের আলোকে সবরের ফযীলত

বর্ণিত হয়েছে। এখন যুক্তির নিরিখে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে হলে তার স্বরূপ ও মর্ম জানা একান্ত আবশ্যক। তাই এক্ষণে সবরের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, ধর্মের একটি মকাম (অবস্থান) এবং অধ্যাত্ম পথের একটি মনযিলের নাম সবর। ধর্মের সমস্ত মকাম তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়— (১) মারেফত তথা তত্ত্বজ্ঞান, (২) হাল এবং (৩) আমল। মারেফত সবকিছুর মূল এবং এ থেকেই হালের উদ্ভব হয়। হাল থেকে আমলের বিকাশ ঘটে। সুতরাং মারেফত যেন বৃক্ষসদৃশ, হাল শাখা-প্রশাখা এবং আমল যেন ফলের অনুরূপ। এ বিষয়টি সাধকদের সকল মনযিলেই বিদ্যমান। ঈমান শব্দটি কখনও মারেফতের অর্থে এবং কখনও এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টির অর্থে প্রয়োগ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ সবর তখনই হয়, যখন প্রথমে মারেফত অর্জিত হয়, এরপর একটি হাল কায়েম হয়। বাস্তবে এ দুটির নামই সবর। আমল হল ফলসদৃশ, যা এ দুটি বিষয় থেকে প্রকাশ পায়। ফেরেশতা, মানুষ ও পশুর পারস্পরিক ক্রম জানা ছাড়া এটা জানা যায় না। কেননা, সবর মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা ফেরেশতা ও পশুর হতে পারে না— ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের পূর্ণতার কারণে এবং পশুর মধ্যে অপূর্ণতার কারণে। পশুদের উপর কামনা-বাসনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে, তারা কামনা-বাসনারই অধীন। তাদের চলা-ফেরা ও গতিবিধির কারণ কামনা-বাসনা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই, যা কামনা-বাসনার প্রতিবন্ধক হয় এবং তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখে। কামনা-বাসনার মোকাবিলায় এরূপ শক্তিকে বলা হবে সবর। পক্ষান্তরে ফেরেশতা সৃজিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে নিয়োজিত থাকার জন্য এবং তাঁর নৈকট্যলাভে সন্তুষ্ট থাকার জন্য। তাদের মধ্যে কামনা-বাসনা রাখা হয়নি, যা তাদেরকে এবাদতের আগ্রহ ও নৈকট্য অর্জনে বাধা দেবে। অপরদিকে মানুষের অবস্থা এই যে, সে শৈশবের শুরুতে পশুর ন্যায় অপূর্ণ সৃজিত হয়েছে। তখন খাদ্যস্পৃহা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনা তার মধ্যে থাকে না। কিছুদিন পর তার মধ্যে খেলাধুলা ও সাজসজ্জার কামনা-বাসনা জেগে উঠে। এরপর বিবাহের কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়। এসব কামনা তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় এবং শুরুতে

সবর থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় মানুষকে সৃষ্টির সেরারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মর্যাদা পশুর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। তাই যখন তার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং সে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন তার মধ্যে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন তাকে সৎপথ প্রদর্শন করে এবং অপরজন এ কাজে তাকে সাহায্য করতে থাকে। এ ফেরেশতাদ্বয়ের সাহায্যে মানুষ পশু থেকে স্বতন্ত্র হয়।

এ ছাড়া এই ফেরেশতাদ্বয়ের কারণেই মানুষের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণের বিকাশ ঘটে—(১) আল্লাহ ও রসূলের মারেফত এবং (২) শুভ-অশুভ পরিণামের জ্ঞান। পশুরা না আল্লাহ ও রসূলকে চিনে, না শুভ পরিণামের চিন্তা করতে পারে। বরং তারা শুধু তাই দেখে, যা কার্যত তাদের কামনা-বাসনার অনুকূলে। এ কারণে সুস্বাদু খাদ্য ছাড়া অন্য কোন বস্তু তারা অন্বেষণ করে না। পক্ষান্তরে মানুষ হেদায়াতের নূরের মাধ্যমে জানে যে, কামনা-বাসনার অনুসরণ করার পরিণতি তার জন্যে অশুভ। কিন্তু কেবল এ হেদায়াতই যথেষ্ট নয়, বরং ক্ষতিকর বস্তু পরিত্যাগ করার ক্ষমতাও তার থাকতে হবে। কারণ, অনেক ক্ষতিকর বস্তু মানুষের জানা আছে, কিন্তু সে সেগুলোকে প্রতিহত করতে পারে না। এমতাবস্থায় কামনা-বাসনাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আরও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সে মানুষকে কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং অদৃশ্য বাহিনীর মাধ্যমে তাকে শক্তি ও সমর্থন যোগায়। এ বাহিনীকে কামনা-বাসনার বাহিনীর সাথে সদা লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধে কখনও সে দুর্বল এবং কখনও প্রবল হয়। এ দুর্বলতা ও প্রবলতা ততটুকুই হয়ে থাকে, যতটুকু সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অদৃশ্য সমর্থনপ্রাপ্ত হয়।

এখন যে বাহিনীর দ্বারা মানুষ কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে পশুর স্তর থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, আমরা তার নাম রাখব ধর্মীয় প্রেরণা। আর কামনার বাহিনীকে বলব শয়তানী প্রেরণা। কল্পনা করা উচিত যে, উভয় প্রেরণার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কখনও ধর্মীয় প্রেরণা প্রবল হয় এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা শক্তিশালী হয়। এ যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের অন্তর। ধর্মীয় প্রেরণা ফেরেশতাদের কাছ থেকে এবং শয়তানী প্রেরণা

শয়তানদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। এ যুদ্ধে শয়তানী প্রেরণার মোকাবিলায় ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড় থাকাই হচ্ছে সবরের স্বরূপ। অটল থাকার পর যদি সে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে এবং কামনার বিরোধিতায় সদা প্রস্তুত থাকে, তবে সে সবরকারীদের তালিকায় স্থান পাবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল হয় এবং কামনার কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে শয়তানের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, কামনাজনিত ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করা এমন একটি আমল, যা সবর থেকে উৎপন্ন হয়।

কামনা-বাসনা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের দুশমন—এ বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড় থাকার মূল উৎপত্তি স্থল। বলা বাহুল্য, এ জ্ঞানকেই বলা হয় ঈমান। যখন এ জ্ঞান শক্তিশালী হয়, তখন ধর্মীয় প্রেরণাও শক্তিশালী হয়। ফলে মানুষের কাজকর্ম কামনা-বাসনার বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা উপরে বর্ণিত দু'জন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা মানুষের ধর্মীয় প্রেরণা ও শয়তানী প্রেরণার প্রতি নযর রাখে। তাদেরকে বলা হয় "কেরামান কাতেবীন"। যে ফেরেশতা হেদায়াত করে, সে ডানদিকে এবং যে ফেরেশতা শক্তি যোগায়, সে বামদিকে থাকে। মানুষ যখন গাফেল ও অমনোযোগী হয়, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাথে অসদাচরণ করে। তাই এ অসদাচরণকে সে গোনাহ হিসাবে লিখে নেয়। আর যখন মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে এবং সৎকাজে তৎপরতা প্রদর্শন করে, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতার সাথে সদাচরণ করে। তাই এ মনোযোগকে পুণ্য হিসাবে লিখে নেয়া হয়। এমনিভাবে মানুষ যখন অকাতরে গোনাহ করতে থাকে, তখন যেন সে বামদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যাশা করে না। এ কারণে সে গোনাহ লিখে নেয়। আর যখন মানুষ নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে, তখন যেন সে এ ফেরেশতার কাছে সাহায্য ও শক্তি প্রত্যাশা করে। ফলে, সে এ কাজকে পুণ্য হিসাবে লিখে নেয়।

কেরামান কাতেবীন রচিত মানুষের গোপন আমলনামা দু'বার খোলা হবে। একবার ক্ষুদ্র কিয়ামতে এবং একবার বৃহৎ কিয়ামতে। ক্ষুদ্র কিয়ামত

বলে আমাদের উদ্দেশ্য মৃত্যু। হাদীসে বলা হয়েছে—

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

অর্থাৎ, যে মৃত্যুবরণ করে, তার কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়।

এই কিয়ামতে মানুষ একা থাকে এবং তাকে বলা হয়—

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ, তোমরা একজন একজন করে আমার কাছে আগমন করেছ, যেমন আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।

আল্লাহ আরও বলবেন ঃ

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

অর্থাৎ, আজ নিজের জন্যে তুমিই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী।

কিন্তু বৃহৎ কিয়ামতে মানুষ একা থাকবে না; বরং জনসমাবেশের সামনে হিসাব গ্রহণ করা হবে। এ কিয়ামতে সৎলোক জান্নাতে এবং অপরাধী দোযখে দলে দলে প্রবেশ করবে। একজন একজন করে নয়।

সবরের বিভিন্ন নাম ঃ সবর দু'প্রকার— (১) দৈহিক সবর; যেমন দৈহিক কষ্ট সহ্য করা এবং তাতে সুদৃঢ় থাকা এবং (২) মানসিক সবর; যেমন মনকে কুপ্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা। প্রথম প্রকার সবর আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম যেমন নিজে কোন কঠিন কাজ কিংবা এবাদত পালন করা এবং দ্বিতীয়, যেমন অপরের কঠিন প্রহার অথবা মারাত্মক যখম বরদাশত করা। এ ধরনের সবর শরীয়ত অনুযায়ী হলে উত্তম —নতুবা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবর সর্বাবস্থায় উত্তম। এ সবর যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ ও যৌনাঙ্গের বাসনা থেকে করা হয়, তবে এর নাম হয় "ইফফত" (সাধুতা)। যদি কোন বিপদাপদে এ সবর করা হয়, তবে একে সবরই বলা হয় এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় হা-হুতাশ করা। যদি বিত্ত-বৈভবের তাড়না সহ্য করার ক্ষেত্রে এ সবর করা হয়, তবে একে বলা হয়, "যবতে নফস" (আত্মসংযম)। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা

হয় আস্ফালন । যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে একে বলা হয় বীরত্ব ও শৌর্য। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় কাপুরুষতা। যদি ক্রোধ হযম ব্যাপারে সবর হয়, তবে এর নাম সহনশীলতা, যার বিপরীত হচ্ছে ক্রোধান্ধতা। যদি যামানার কোন আপদে সবর করা হয়, তবে এর নাম অসম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হচ্ছে স্বল্প সাহসিকতা। প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনোপকরণের বেলায় সবর করা হলে তার নাম সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত সংসারাসক্তি। সারকথা, ঈমানের অধিকাংশ গুণাবলীই সবরের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই একবার জনৈক ব্যক্তি ঈমান কি প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সবর। এরূপ বলার কারণ এই যে, ঈমানের কর্মসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও ভারী কর্ম হচ্ছে সবর। আল্লাহ তা'আলা সবরের প্রকারসমূহকে একত্রে উল্লেখ করে সবগুলোর নাম রেখেছেন সবর। এরশাদ হয়েছে—

وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা কষ্টে, দুর্ভিক্ষে এবং যুদ্ধের সময় সবর করে, তারাই সাচ্চা এবং তারাই খোদাভীরু।

সবরের প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, শয়তানী প্রেরণার সাথে সংঘর্ষের দিক দিয়ে ধর্মীয় প্রেরণার তিন প্রকার অবস্থা হয়ে থাকে। (১) শয়তানী প্রেরণাকে এমনভাবে পরাভূত করে দেয়া যাতে তার মধ্যে মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা অবশিষ্ট না থাকে। সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা এই অবস্থা অর্জিত হয়। এরূপ অবস্থায়ই বলা হয় مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ যে সবর করে, সে সফলকাম হয়। খুব কম লোকই এ অবস্থায় পৌঁছতে পারে। যারা পৌঁছতে সক্ষম হয়, তারা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল। তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে নিজের পালনকর্তা জেনে তাঁর উপরই সদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং কখনও সরল পথ বর্জন করেন না। (২) শয়তানী প্রেরণায় বিজয়ী হওয়া এবং ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে মোকাবিলা করার শক্তি অবশিষ্ট না থাকা। এ অবস্থায়ই মানুষ নৈরাশ্যের শিকার হয়ে সর্বপ্রকার মোজাহাদা ও চেষ্টা-চরিত্র

থেকে বিরত থাকে এবং গাফেলদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। বাস্তবে এরূপ লোকদের সংখ্যাই অধিক। এরাই রিপু ও খেয়াল-খুশীর পূজারী। এদের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَلَوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সরল পথের দিশা দিতে পারতাম; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছে যে, আমি মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করে দেব।

এরূপ লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে এবং চরমভাবে মার খায়। কেউ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাইলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয় ঃ

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰي عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ـ

অর্থাৎ, তুমি সে ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যে আমার উপদেশের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে না। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।

এ অবস্থার পরিচয় হচ্ছে চেষ্টা-চরিত্র থেকে নিরাশ হওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। এটা চরম নির্বুদ্ধিতা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهَا وَتَمَنّٰي عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, বিজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার জন্যে আমল করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে বাসনা করে।

অর্থাৎ, কেউ তাকে উপদেশ দিলে সে বলে, আমি তওবা করার খুব ইচ্ছা রাখি; কিন্তু তা হয়ে উঠে না। তাই এর আশাও করি না। আর তওবার প্রতি আগ্রহ না থাকলে বলে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু। অতএব, তওবার প্রয়োজন কি?

(৩) তৃতীয় অবস্থা হল, মোকাবিলা সমান সমান হওয়া। কখনও ধর্মীয় প্রেরণা বিজয়ী হবে এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা। এরূপ ব্যক্তি জেহাদকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য নয়। তার অবস্থা নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে—

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

অর্থাৎ, তারা একটি সৎকাজ ও অপরটি অসৎকাজ মিশ্রিত করেছে।

আর যারা কামনা-বাসনার সাথে জেহাদ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধম। কেননা, চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে মারেফত ও ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি যা দ্বারা তারা জেহাদ করবে। কিন্তু মানুষকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে, যা সে কাজে লাগায় না।

সহজ ও কঠিন হওয়ার দিক দিয়েও সবর দু'প্রকার। এক, এমন সবর, যা সহজলভ্য নয়, কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ। এর নাম জোরপূর্বক সবর। দুই, যা পরিশ্রম ছাড়াই অর্জিত হয়ে যায়। মানুষ যখন সদাসর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং শুভ পরিণামের দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন সবর সহজলভ্য হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

অর্থাৎ, অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং পুণ্যকর্মকে সত্য জ্ঞান করে, আমি তাকে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।

মোটকথা, দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে যখন সবর সহজ হয়ে যায়, তখন "রেযা" অর্থাৎ সন্তুষ্টির মকাম হাসিল হয়। কারণ রেযার মর্তবা সবরের উর্ধ্বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

أُعْبُدُوا اللّٰهَ عَلَى الرِّضَاءِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَفِى الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

জনৈক সাধক বলেন ঃ সবরকারীদের তিনটি স্তর রয়েছে। এক, খাহেশ বর্জন করা। এটা তওবাকারীদের স্তর। দুই, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা। এটা সংসারত্যাগীদের স্তর। বলা বাহুল্য, মহব্বতের মর্তবা রেযার মর্তবারও উর্ধ্বে। এসব মর্তবা বিশেষ এক প্রকার সবরে সম্ভবপর আর তা হচ্ছে বালা-মুসীবতে সবর করা।

এখন জানা দরকার যে, কতক সবর ফরয, কতক নফল, কতক মাকরূহ এবং কতক হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ কর্মসমূহে সবর করা ফরয। মাকরূহ বিষয়াদিতে সবর করা নফল। যে পীড়ন শরীয়তে নিষিদ্ধ তাতে সবর করা হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার সংকল্প করল। এতে তার আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে সবর করল এবং চুপচাপ দেখে গেল। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। যে পীড়ন শরীয়তে মাকরূহ—হারাম নয়, তাতে সবর করা মাকরূহ। মোটকথা, সবরের কষ্টিপাথর জানা দরকার। সবর ঈমানের অর্ধেক কেবল একথা জেনে মনে করা উচিত নয় যে, সকল সবরই উত্তম।

সর্বাবস্থায় সবরের প্রয়োজনীয়তা ঃ মানুষ জীবনে যেসকল অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলো হয় তার ইচ্ছা ও বাসনার অনুকূলে, না হয় প্রতিকূলে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতে সবরের প্রয়োজন রয়েছে। যে সকল অবস্থা মানুষের খাহেশের অনুকূল হয়ে থাকে, সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, ধন-সম্পদ, জাঁকজমক, জনবল, ধনবল, বেশী সংখ্যক চাকর-নওকর ও বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী মওজুদ থাকা। এ সকল অবস্থায় সবর করার প্রয়োজন অত্যধিক। কেননা, মানুষ যদি পার্থিব আনন্দ-উল্লাসে মেতে নিজেকে সংযত না করে এবং এগুলোতে আকণ্ঠ

নিমজ্জিত থাকে, তবে সে আনন্দ-উল্লাস বৈধ হলেও অবশেষে সে নাফরমানী ও ধৃষ্টতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কারণ, সাধারণ রীতি অনুযায়ী মানুষ যখন ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তখনই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

অর্থাৎ, মানুষ সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী মনে করে।

জনৈক সাধক বলেন ঃ বালা-মুসীবতে ঈমানদার সবর করে; কিন্তু নিরাপত্তায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ বালা-মুসীবতে সবর করার তুলনায় সচ্ছলতায় সবর করা অত্যন্ত কঠিন। যখন দুনিয়ার ধনসম্পদ সাহাবায়ে কেরামের হাতে আসতে থাকে, তখন তারা বললেন ঃ বিপদাপদ ও দারিদ্র্যে আমাদের পরীক্ষা নেয়া হলে আমরা সবর করলাম, কিন্তু যখন আমরা সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম, তখন আমরা সবর করতে পারলাম না। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফেতনা সম্পর্কে আমাদেরকে হুশিয়ার করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ـ

অর্থাৎ,হে মুমিনগণ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে।

আরও বলা হয়েছে—

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের কিছু কিছু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

الولد مبخلة مجبنة محزنة

অর্থাৎ, সন্তান মানুষকে কৃপণতা, ভীরুতা ও দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত করে দেয়।

একবার তিনি নিজের কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হাসানকে যখন জামায় জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যেতে দেখলেন, তখন মিম্বর থেকে নেমে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ ঠিকই বলেছেন ঃ

إنما اموالكم واولادكم فتنة

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেতনা স্বরূপ।

আমি আমার সন্তানকে টলমল করতে দেখে স্থির থাকতে পারলাম না এবং তাকে তুলে নিলাম। হে বুদ্ধিমানগণ! এর ফলাফল চিন্তা করুন। অতএব, জানা গেল, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা সত্যিকার সাহসিকতার কাজ। সচ্ছলতায় সবর করার অর্থ হচ্ছে তৎপ্রতি আগ্রহ না করা এবং মনে করা যে, এটা ক্ষণস্থায়ী আমানত মাত্র, যা অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ধনৈশ্বর্যে তুষ্ট হওয়া এবং বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের দ্বারা আল্লাহ্র হক আদায় করা দরকার। উদাহরণতঃ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অপরের দৈহিক সাহায্য করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তাঁর হক আদায় করতে হবে। এ ধরনের সবর শোকরের সাথে সংলগ্ন। শোকরে সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত এই সবর পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা যে অধিক কঠিন, তার অন্যতম কারণ এই যে, এতে ক্ষমতা থাকে। নতুবা যার ক্ষমতাই নেই, সে সবর না করে কি করবে? উদাহরণত ঃ যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে খাদ্য না থাকে, তবে সে সহজেই সবর করতে পারে। কিন্তু যদি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আহার্য উপস্থিত থাকে, তবে সবর করা নিঃসন্দেহে কঠিন।

পক্ষান্তরে যে সব অবস্থা মানুষের খাহেশের প্রতিকূল হয়ে থাকে, সেগুলো তিন প্রকার। প্রথম, যে সব অবস্থা মানুষের এখতিয়ারাধীন; যেমন এবাদত ও নাফরমানী। দ্বিতীয়, যা এখতিয়ারাধীন নয়; যেমন বিপদাপদ ও

দুর্ঘটনা। তৃতীয়, শুরুতে এখতিয়ারাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা এখতিয়ারাধীন; যেমন পীড়নকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। বলা বাহুল্য, এই তিন অবস্থাতেই সবর করা প্রয়োজন।

এবাদতে সবর করা কঠিন। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করে এবং প্রভুত্বের অভিলাষ পোষণ করে। জনৈক সাধু ব্যক্তি বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সে অভিলাষ আত্মগোপন করে আছে, যা ফেরাউন أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى অর্থাৎ, 'আমি তোমাদের সুমহান প্রভু' বলে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ফেরাউন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। কারণ,তার সম্প্রদায় তার কথা মেনে নিয়েছিল। অন্যরা এই অভিলাষ প্রকাশ করার সুযোগ না পেলেও অন্তরে গোপন রাখে। তাই চাকর-বাকর ও অনুগতরা কাজে ক্রুটি করলে মানুষ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং তাদের ক্রুটিকে অসম্ভব মনে করে। এর কারণ অভ্যন্তরীণ অহংকার এবং প্রভুত্বের দাবী ছাড়া আর কি হতে পারে? এ থেকে জানা যায়, দাসত্ব সর্বাবস্থায় কঠিন। এছাড়া কতক এবাদত অলসতার কারণে অপ্রিয় মনে হয়. যেমন নামায। কতক কৃপণতার কারণে দুঃসাধ্য মনে হয়, যেমন যাকাত। কতক এবাদত অলসতা ও কৃপণতা উভয়ের কারণে দুরূহ ঠেকে; যেমন হজ্জ ও জেহাদ। সুতরাং এবাদতে সবর করার মানে অনেকগুলো কঠিন কাজে সবর করা।

এবাদত দু'প্রকার ঃ ফরয ও নফল। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উভয়টি একত্রে উল্লেখ করেছেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ, আল্লাহ ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়কে দান করার আদেশ করেন। এখানে ইনসাফ ফরয, অনুগ্রহ নফল এবং আত্মীয়কে দান করা মানবতা। এদের প্রত্যেকটিতেই সবর করার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, গোনাহেও সবর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সকল প্রকার গোনাহ একত্রিত করেছেন—

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

অর্থাৎ, নির্লজ্জতা, মন্দকাজ ও অবাধ্যতার কাজ করতে নিষেধ করে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ

অর্থাৎ, মোহাজির সে ব্যক্তি, যে মন্দকাজ পরিহার করে এবং মোজাহিদ তাকে বলা হয়, যে আপন খেয়াল-খুশীর সাথে জেহাদ করে।

যে সব গোনাহে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেগুলোতে সবর করা অধিক কঠিন হয়ে থাকে। কেননা, মনের খাহেশের সাথে যখন অভ্যাস যোগ হয়, তখন শয়তানের দুটি বাহিনী পরস্পরে মিলেমিশে একে অপরকে সাহায্য করে এবং ধর্মীয় প্রেরণার মোকাবিলা করে। এরপর যদি সে গোনাহ সহজসাধ্য হয়, তবে তাতে সবর করা মুশকিল। উদাহরণতঃ গীবত, মিথ্যা, কলহ-বিবাদ, আত্মপ্রশংসা ইত্যাদিতে সবর করা খুবই কঠিন।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, যে সকল অবস্থা শুরুতে এখতিয়ারাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা এখতিয়ারাধীন; যেমন কেউ কাউকে কথা অথবা কাজের মাধ্যমে পীড়ন করল। এতে সবর করা এবং প্রতিশোধ না নেয়া কখনও ওয়াজিব এবং কখনও মোস্তাহাব। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ পীড়নে সবর না করা পর্যন্ত আমরা কারও ঈমান সম্পর্কে জানতাম না। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের জওয়াবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন কর, তাতে আমরা সবর করব। ভরসাকারীদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কিছু অর্থ বণ্টন করলে কিছু সংখ্যক বেদুইন মুসলমান বলাবলি করল ঃ এ বণ্টনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ

হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমার ভাই মূসা (আঃ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে রসূলে করীম (সাঃ)-কে সবর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَدَعْ اَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ, প্রত্যাখ্যান করুন তাদের পীড়ন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

অর্থাৎ, তাদের বলাবলিতে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করুন।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ

অর্থাৎ, আমি জানি তাদের কথাবার্তায় আপনার মন সংকুচিত হয়। অতএব, আপনি নিজের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁকে সেজদা করুন।

لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

অর্থাৎ, আপনি পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক মন্দকথা শুনবেন। অতঃপর যদি আপনি সবর করেন ও তাকওয়া অবলম্বন করেন, তবে এটা হবে সাহসিকতার কাজ।

এখানে বদলা নেয়ার ব্যাপারে সবর করাই উদ্দেশ্য। এ কারণে এ সবরের মর্যাদা অনেক। আল্লাহ তা'আলা কেসাস ইত্যাদি ব্যাপারে ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই নাও, যতটুকু কষ্ট তোমরা পেয়েছ। আর যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

অর্থাৎ, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যে তোমার উপর যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।

ইনজীলে হযরত ঈসা (আঃ) -এর এই উক্তি বর্ণিত রয়েছে— পূর্ব থেকে তোমাদের প্রতি নির্দেশ আছে যে, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক অর্থাৎ, যতটুকু অনিষ্ট তোমার করা হয়, তুমি প্রতিপক্ষের ততটুকু অনিষ্টই কর। কিন্তু আমি বলি অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট করো না। কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তুমি তার সামনে বাম গাল পেতে দাও। কেউ তোমার চাদর নিয়ে গেলে তুমি তাকে লুঙ্গিও দিয়ে দাও। কেউ তোমাকে এক মাইল অনর্থক নিয়ে গেলে তুমি তার সাথে দু'মাইল যাও। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পীড়নে সবর করা সবরের সর্বোচ্চ স্তর।

এ ছাড়া আরও কতিপয় বিষয়ে সবর করা দরকার, সেগুলোর আদি-অন্ত কোনটিই বান্দার এখতিয়ারাধীন নয়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, স্বাস্থ্যহানি হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া ইত্যাদি। এগুলোতে সবর করাও উচ্চস্তরের সবর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন মজীদে তিন বিষয়ে সবরের কথা আছে। (১) ফরয আদায়ে সবর করা। এর সওয়াব তিনশ' মাত্রা পর্যন্ত। (২) আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বস্তুসমূহে এর মাত্রা ছয়শ'। (৩) বিপদাপদে সবর করা। এর জন্য সওয়াব রয়েছে নয়শ'। এই ধরনের সবর যদিও

মোস্তাহাব, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবরের চেয়ে উত্তম যদিও তা ফরয। কেননা, হারাম বিষয়ে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি সবর করতে পারে। কিন্তু বিপদে সবর সেই করবে, যার সিদ্দীকগণের মর্তবা অর্জিত হবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন ঃ

اَسْئَلُكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَاتَهُوْنُ عَلَىَّ بِهٖ مَصَائِبُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এমন বিশ্বাস চাই, যা দ্বারা দুনিয়ার বিপদাপদ আমার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

হযরত সোলায়মান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা প্রিয় বস্তুতে সবর করতে না পারলে অপ্রিয় বস্তুতে কিরূপে সবর করতে পারব? এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ যখন আমি বান্দার দেহ, ধন-সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত প্রেরণ করি এবং সে তা উত্তম সবর দ্বারা বরদাশত করে নেয়, তখন কিয়ামতে তার জন্যে দাঁড়িপাল্লা নিযুক্ত করতে অথবা আমলনামা খুলে দিতে আমি লজ্জাবোধ করি। হাদীসে আছে—

اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ

অর্থাৎ, সবর সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা এবাদত।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—বান্দার উপর যখন মুসীবত আসে এবং সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" বলে এরপর বলে—

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ মুসীবতে আমাকে পুরস্কৃত কর এবং এর পেছনে উত্তম বস্তু দান কর,

তখন আল্লাহ তা'আলা তাই করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে বললেন, হে জিবরাঈল, আমি যার উভয় চক্ষু নিয়ে নেই, তার প্রতিদান কি? জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি আমাদেরকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তা ছাড়া আমরা

কিছুই জানি না। এরশাদ হল, তার প্রতিদান এই যে, সে সর্বদা আমার গৃহে থাকবে এবং আমার দীদার লাভ করে ধন্য হবে।

এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে—আল্লাহ্ বলেন ঃ যখন আমি কোন বান্দাকে বিপদে ফেলি এবং সে সবর করে এবং যারা তার খবর নিতে আসে, তাদের কাছে কোন অভিযোগ করে না, আমি তার মাংসের চেয়ে প্রতিদানে উত্তম মাংস দেই এবং তাকে তার রক্তের চেয়ে উত্তম রক্ত দান করি। যখন তাকে রোগমুক্তি দান করি, তখন তার কোন গোনাহ্ থাকে না, আর যখন মৃত্যু দেই, তখন আমার রহমতের ছায়াতলে নিয়ে আসি।

হযরত দাঊদ (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! যে দুঃখী ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টির আশায় বিপদে সবর করে, তার প্রতিদান কি? এরশাদ হল ঃ তার প্রতিদান এই যে, তাকে ঈমানের পোশাক পরিয়ে কখনও তা খুলব না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন এবং পরে তা নিয়ে যান, তখন যদি সে সবর করে, তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ এমন নেয়ামত দান করেন, যা পূর্বের নেয়ামতের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীরাই তাদের পুরস্কার বেহিসাব পায়।

বর্ণিত আছে, হযরত শিবলী (রহঃ) জেলে আবদ্ধ হলে কিছু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কারা? লোকেরা বলল ঃ আমরা আপনার সুহৃদ। আপনাকে দেখতে এসেছি। তিনি তাদের প্রতি ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। ফলে, তারা সকলেই পালিয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা আমার সুহৃদ হতে, তবে আমার বিপদে সবর করতে। জনৈক সাধু ব্যক্তির পকেটে একটি কাগজের টকুরা ছিল। তিনি কিছুক্ষণ পরপর সেটি বের করে দেখে নিতেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

অর্থাৎ, তুমি তোমার পালনকর্তার নির্দেশের জন্যে সবর কর। তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই রয়েছ।

বর্ণিত আছে, ফাতাহ মুসেলীর পত্নী একবার পা পিছলে পড়ে যান। এতে তার নখ উঠে যায়। তিনি হেসে উঠলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার কষ্ট হচ্ছে না? তিনি বললেন ঃ এর সওয়াবের আনন্দে ব্যথার তিক্ততা অনুভব করতে পারছি না।

হযরত দাঊদ (আঃ) তাঁর পুত্র সোলায়মান (আঃ)-কে বললেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা মুমিনের তাকওয়া প্রমাণিত হয়—(১) সে যা পায় না, তাতে উত্তম তাওয়াক্কুল করা, (২) যা পায়, তাতে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট থাকা এবং (৩) যে বস্তু পাওয়ার পর হাতছাড়া হয়ে যায়, তাতে উত্তম সবর করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ اَنْ لَّا تَشْكُوْا وَجْعَكَ وَلَا تَذْكُرَ مُصِيْبَتَكَ

অর্থাৎ,তুমি তোমার ব্যথার অভিযোগ করবে না এবং বিপদাপদের আলোচনা করবে না—এটাই আল্লাহর সম্মান ও তাঁর হকের পরিচয়।

উপরে যা বর্ণিত হল, তা হচ্ছে আল্লাহর পথের পথিকগণের সবর।

এখন প্রশ্ন হয় যে, বিপদাপদে মানুষ সবরের মর্তবা কিরূপে লাভ করবে? কারণ, এটা এখতিয়ারাধীন ব্যাপার নয়। অন্তরে বিপদাপদের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকার নাম যদি সবর হয়, তবে এটা মানুষের এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত নয়। জওয়াব এই যে, সবরকারীর তালিকা থেকে মানুষ তখনই বাদ পড়বে, যখন সে বিপদে হা-হুতাশ করবে, মুখমন্ডলে আঘাত করবে এবং পরিধানের জামা ছিঁড়ে ফেলবে। এছাড়া উঠতে-বসতে অভিযোগ করবে, দুঃখ প্রকাশ করবে এবং খাওয়া-পরার অভ্যাস পাল্টে দেবে। এসব কাজ মানুষের এখতিয়ারাধীন। সবর করার জন্যে এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব। এছাড়া আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি ছাড়া মুখে অন্য কিছু প্রকাশ করবে না এবং খাওয়া-পরার অভ্যাসে কোন পরিবর্তন করবে

না। মনে করতে হবে, হারানো বস্তুটি তার কাছে আমানত ছিল, যা মালিক ফেরত নিয়ে গেছেন।

রমিছা উম্মে সুলায়মান বর্ণনা করেন ঃ আমার অসুস্থ শিশুপুত্র যখন মারা গেল, তখন আমার স্বামী হযরত আবু তালহা (রাঃ) বাড়ী ছিলেন না। আমি ঘরের এক কোণে মৃতদেহ রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম। এরপর আবু তালহা বাড়ী ফিরলে আমি যথারীতি তার সামনে খাবার পেশ করলাম। তিনি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছেলের অবস্থা কেমন? আমি বললাম ঃ আলহামদু লিল্লাহ্, ভাল। এরূপ বলার কারণ এই যে, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কোন রাত্রি এত শান্তিতে কাটেনি, যেমন সেই রাত্রিটি কেটেছিল। এরপর আমি অন্য দিনের তুলনায় অধিক সাজসজ্জা করলাম এবং আমার স্বামী আমার সাথে সহবাস করলেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম ঃ আমাদের প্রতিবেশীর কাণ্ড দেখ, সে একটি বস্তু চেয়ে এনেছিল। এখন মালিক সেটি ফেরত নিয়ে গেলে সে হৈচৈ শুরু করে দিল। আবু তালহা বললেন ঃ প্রতিবেশী এরূপ করে থাকলে খুবই খারাপ করেছে। আমি বললাম ঃ তোমার পুত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার ছিল। আল্লাহ এখন তা নিয়ে গেছেন। একথা শুনে আবু তালহা আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করলেন। পরের দিন সকালে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী! এই রাত্রির ব্যাপারে বরকত দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই দোয়ার পর আমি মসজিদে আবু তালহার সাতটি পুত্র সন্তানকে কোরআন পাঠ করতে দেখেছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে বেহেশতে প্রবেশ করেছি এবং আবু তালহার পত্নী রমিছাকে সেখানে দেখেছি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ "সবরে জমীল" (সুন্দর সবর) হচ্ছে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে না পারা। মৃতের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করলে কেউ সবরকারীদের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যায় না। কেননা, এটা মানবতার অন্যতম দাবী। মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ এ থেকে বাঁচতে পারে না। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে

থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আপনি তো আমাদেরকে এরূপ করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

অর্থাৎ, এটা করুণা। যারা করুণা করে, তারাই আল্লাহ তা'আলার করুণা পায়।

হাঁ, পূর্ণাঙ্গ সবর হচ্ছে রোগ, দারিদ্র্য ও সকল বিপদাপদকে গোপন রাখা।

সবর লাভ করার উপায় ঃ প্রকাশ থাকে যে, যিনি রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করেছেন, তিনি এর ঔষধও নাযিল করেছেন এবং আরোগ্য দানের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং সবর যদিও অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু এলম ও আমলের মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। সবরের প্রকার বিভিন্ন বিধায় তার প্রতিবন্ধকও বিভিন্ন এবং চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্নরূপ। বিষয়টি দীর্ঘ বর্ণনার দাবী রাখে। কিন্তু নিম্নে আমরা কতিপয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর চিকিৎসা পদ্ধতি বলে দিচ্ছি।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যিনার কামভাব থেকে সবর অর্জন করতে চায়। এই কামভাব তার উপর এত প্রবল যে, সে যৌন অঙ্গকে বিরত রাখতে সক্ষম হলেও দৃষ্টিকে বিরত রাখতে সক্ষম নয়। কিংবা এতে সক্ষম হলেও মনকে বশ করতে পারে না। মন সব সময় তাকে কামভাবে জড়িয়ে রাখে। এ জন্যে অব্যাহতভাবে যিকর, এবাদত ও সৎকর্ম সম্পাদন তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এখন এর প্রতিকার শুনুন ঃ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধর্মীয় প্রেরণা এবং শয়তানী প্রেরণার মধ্যে সংঘর্ষ হতে থাকে। আমরা যদি এদের এক পক্ষের বিজয় এবং অপরপক্ষের পরাজয় কামনা করি, তবে যাকে বিজয়ী করা উদ্দেশ্য হয়, তাকে শক্তি যোগানো এবং অপরের উপর চাঁপ সৃষ্টি করা উচিত। সেমতে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে ধার্মিক প্রেরণাকে শক্তি যোগানো এবং তার প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা জরুরী। কামপ্রেরণাকে দুর্বল করার উপায় তিনটি। প্রথমত, কামপ্রেরণার আসল উৎসকে দেখতে হবে, সে কোথা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। এতে জানা যাবে, তার শক্তির আসল উৎস হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও পর্যাপ্ত

খাদ্য গ্রহণ। সুতরাং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বদা রোযা রাখতে হবে। সে কেবল ইফতারের সময় সামান্য লঘু খাদ্য গ্রহণ করবে। মাংস ইত্যাদি কামোত্তেজক খাদ্য সামগ্রী বর্জন করবে।

দ্বিতীয়ত, কামভাবের সামগ্রী মওজুদ থাকলে তা দূর করতে হবে। কামোত্তেজনার মূল কারণ হচ্ছে দৃষ্টি। এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করা জরুরী। হাদীসে আছে –

اَلنَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

অর্থাৎ, দৃষ্টি ইবলীসের অন্যতম তীর।

সে এই তীর এমনভাবে নিক্ষেপ করে যে, চক্ষু বন্ধ রাখা ছাড়া একে প্রতিহত করার অন্য কোন ঢাল নেই। সুতরাং মানুষ যখন রূপসীদের আনাগোনার স্থান থেকে অন্যত্র সরে যাবে, তখন ইবলীসের এই তীর তার গায়ে লাগবে না।

তৃতীয়ত মানুষ যে বস্তুর খাহেশ করে, সে জাতীয় বৈধ বস্তুর দ্বারাই মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে। উদাহরণতঃ বর্ণিত দৃষ্টান্তে বিবাহ দ্বারা মনকে সান্ত্বনা দেবে। কেননা, তার মন যা চায়, বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে তা বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, নিষিদ্ধ পাত্রে যাওয়ার প্রয়োজন কি? অধিকাংশ লোকের জন্যে এই চিকিৎসা উপকারী। তবে কিছু সংখ্যক মানুষের কামভাব এতে প্রশমিত হয় না।

এখানে প্রথমোক্ত চিকিৎসাটি (খাদ্য মওকুফ করা) হচ্ছে, যেমন অবাধ্য জন্তু অথবা পাগলা কুকুরকে খাদ্য না দেয়া, যাতে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুকুরের সম্মুখ থেকে মাংস লুকিয়ে ফেলা, যাতে না দেখে এবং খাহেশ না করে। তৃতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, কুকুরের পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্য থেকে সামান্য তাকে দেয়া, যাতে শাসনে সবর করার মত শক্তি তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে।

অপরপক্ষে ধর্মীয় প্রেরণাকে দু'ভাবে শক্তি যোগানো যায়। প্রথমত মনকে সাধনার উপকারিতা এবং দ্বীন ও দুনিয়াতে তার শুভ ফলাফলেরও লোভ দেখানো। এ উদ্দেশ্যে সবরের ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার শুভ পরিণতি সম্পর্কে যে সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে,

সেগুলোতে অধিক পরিমাণে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এর ফলে ধর্মীয় প্রেরণা শক্তিশালী হয় এবং তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে শয়তানী প্রেরণাকে ভূলুণ্ঠিত করার অভ্যাস ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা। কেননা, অভ্যাস ও দক্ষতা আমলের শক্তিকে মযবুত করে দেয়। এ কারণেই যারা পরিশ্রমের কাজ করে, যেমন কৃষক ও সিপাহী, তারা আতর বিক্রেতা, ফেকাহবিদ ও সাধু ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক শক্তিধর হয়ে থাকে। কারণ, শেষোক্ত ব্যক্তিদের শক্তি অভ্যাস ও দক্ষতা দ্বারা মযবুত হয় না।

এ দুটি চিকিৎসার মধ্যে প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুস্তিগীরকে ওয়াদা দেয়া যে, যদি প্রতিপক্ষকে ভূমিসাৎ করে দাও, তবে অনেক পুরস্কার পাবে। উদাহরণতঃ ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবিলায় জাদুকরদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা জয়ী হলে আমি তোমাদেরকে নৈকট্যশালী করে নেব। দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কোন বালককে কুস্তি শেখানোর উদ্দেশ্য হলে শৈশব থেকেই তাকে এ শাস্ত্রের জরুরী বিষয়াদিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, যাতে কুস্তির প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে এবং শক্তি ও সাহসিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি সবর সহকারে সাধনাই পরিত্যাগ করবে, তার মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সে কামভাবে প্রবল হতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে খাহেশের খেলাফ কাজে অভ্যস্ত করবে, সে যখন ইচ্ছা কামভাবের উপর জয়ী হতে পারবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সবরের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোকর

জানা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে শোকরকে যিকরের সাথে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি একথাও বলেছেন যে,

ولذكر الله اكبر অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর অত্যন্ত মহান।

এরশাদ হয়েছে—

فَاذْكُرُونِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার কর— নাশোকরী করো না।

এমন মহান বস্তুর সাথে শোকরের উল্লেখ এর পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَايَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যদি অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং ঈমান রাখ, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কি করবেন?

এক আয়াতে আছে–

وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِيْنَ অর্থাৎ, আমি শোকরকারীদেরকে প্রতিদান দেব।

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তোমার সরল পথে বসে থাকব।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এখানে সরল পথের অর্থ শোকরকারীদের পথ।

শোকর উচ্চ মর্তবার অধিকারী বিধায় অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের শোকর না করার দোষটিই উল্লেখ করে বলেছে—

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ অর্থাৎ, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকরকারী পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ অর্থাৎ, আমার কম বান্দাই শোকরকারী।

তিনি শোকরের সাথে নেয়ামত বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এতে কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করেননি। যেমন এরশাদ হয়েছে—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা শোকর করলে আমি অবশ্যই নেয়ামত বৃদ্ধি করব।

অথচ অন্য পাঁচটি নেয়ামত অর্থাৎ, ধনাঢ্য করা, দোয়া কবুল করা, রুযী দেয়া, ক্ষমা করা এবং তওবা কবুল করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে নিজ কৃপায় তোমাদেরকে ধনাঢ্য করবেন।

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ অর্থাৎ, অতঃপর যদি ইচ্ছা করেন, তিনি উন্মুক্ত করে দেন যার জন্যে তোমরা দোয়া কর।

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা

বেহিসাব রিযক দান করেন। وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি শিরক ব্যতীত অন্য গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা তওবা দেন।

এ থেকে জানা যায় যে, শোকর একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়। আল্লাহ্ এতে নিজের ইচ্ছার শর্ত আরোপ করেননি। বরং নেয়ামত বৃদ্ধির অকাট্য ওয়াদা করেছেন।

এছাড়া জান্নাতবাসীদের প্রথম বাক্যও শোকরই হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ অর্থাৎ, জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, তাদের শেষ দোয়া হবে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বের পালনকর্তা।

হাদীসেও শোকরের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ অর্থাৎ, যে খায় ও শোকর করে, সে সবরকারী রোযাদারের অনুরূপ।

হযরত আতা (রঃ) বর্ণনা করেন— আমি একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বাধিক আশ্চর্যজনক যে অবস্থাটি স্বচক্ষে দেখেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ তাঁর কোন্ অবস্থাটি আশ্চর্যজনক ছিল না? এক রাতে তিনি আমার কাছে এলেন এবং বিছানায় অথবা লেপের নিচে আমার সাথে শয়ন করলেন। এক সময় তাঁর দেহ

আমার দেহকে স্পর্শ করল। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আবু বকর-তনয়া! পরওয়ারদেগারের এবাদতের জন্যে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আরয করলাম ঃ আমি তো আপনার সাথেই থাকতে চাই। তবে আমি আপনার মরযীর অনুগামী। আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম। তিনি গাত্রোত্থান করলেন এবং পানির জালার কাছে চলে গেলেন। সেখানে অল্প পানিতে উযু করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং অনবরত অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। অশ্রু তাঁর বুকে প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর রুকুতে, সেজদায় এবং উভয় সেজদার মাঝখানে অশ্রু বিসর্জন করলেন। তিনি এমনিভাবে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের কথা জানালেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি কি আল্লাহর শোকরগোযার বান্দা হব না? আমি কাঁদব না কেন যেখানে আল্লাহ আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الآية

অর্থাৎ, এ থেকে জানা যায়, ক্রন্দন কখনও সমাপ্ত না হওয়া উচিত। এ রহস্যের প্রতিই নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ একবার জনৈক পয়গম্বর পথ চলার সময় পথিমধ্যে একটি ছোট পাথর দেখতে পান। পাথরটি থেকে অনেক পানি বের হতে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা পাথরকে বাকশক্তি দান করলেন। সে আরয করল— যেদিন থেকে আমি আল্লাহর উক্তি শুনেছি যে, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেদিন থেকেই আমি ভয়ে কাঁদছি। পয়গম্বর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন— ইলাহী! এই পাথরকে তুমি আগুন থেকে রক্ষা কর। তাঁর দোয়া কবুল হল। তিনি পাথরকে একথা জানিয়ে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পর তিনি সে পথে এসে পাথরকে পূর্ববৎ কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবার কাঁদছ কেন? সে আরয করল ঃ পূর্বের কান্নার কারণ ছিল ভয়। আর এখন কাঁদছি শোকর ও আনন্দে।

বলা বাহুল্য, মানুষের অন্তরও পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত। তাই এর কঠোরতা ভয় ও শোকর অবস্থায় কান্না ছাড়া দূর হবে না। এক হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—যারা আল্লাহ তা'আলার অধিক হামদ করে, তারা উঠ। এরপর একটি দল উঠে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ অধিক হামদকারী কারা? উত্তর হল—যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, যারা সুখে ও কষ্টে আল্লাহর শোকর করে।

শোকরের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ যে আল্লাহর পথে চলে, তার মনযিলসমূহের মধ্যে একটির নাম শোকর। এই শোকর তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত- এলম, হাল ও আমল। এলম থেকে হাল এবং হাল থেকে আমল সৃষ্টি হয়। এলম হচ্ছে সকল নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। হাল হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আমলের অর্থ যা আল্লাহর উদ্দেশ্য ও প্রিয়, তাতে কায়েম থাকা। আমল অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জিহ্বার সাথেও সম্পৃক্ত। শোকরের স্বরূপ পূর্ণরূপে জানার জন্যে সবগুলো বর্ণনা করা জরুরী।

শোকরের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তার কোনটির মধ্যে শোকরের পূর্ণ অর্থ নেই। এলম সম্পর্কে বলতে গেলে তিনটি বিষয় জানা দরকার। এক, স্বয়ং নেয়ামতকে জানতে হবে। দুই, এই নেয়ামত যে তার জন্যে নেয়ামত, তা জানতে হবে। তিন, নেয়ামতদাতার সত্তা ও সিফাতসমূহ জানা দরকার। এটা আল্লাহ ছাড়া শুধু অন্যের বেলায়। আল্লাহর বেলায় এই এলম দরকার যে, সকল নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনিই প্রকৃত নেয়ামতদাতা। মধ্যবর্তী সকলেই তাঁর পক্ষ থেকে কর্মী মাত্র, যারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। এখন জানা উচিত যে, এই এলম তখন পূর্ণ হবে, যখন ক্রিয়াকর্মে শিরক না থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে কোন বাদশাহ কোন নেয়ামত দান করল। এই নেয়ামত পাওয়া অথবা তার হাতে পৌঁছার ব্যাপারে সে যদি বাদশাহের উকিল অথবা উযীরেরও দখল আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সে এই নেয়ামতে বাদশাহের সাথে অপরকেও শরীক করল এবং এই নেয়ামত যে সর্বতোভাবে বাদশাহের তরফ থেকে প্রদত্ত, তা মানল না; বরং কিছু বাদশাহের পক্ষ থেকে এবং কিছু উযীরের পক্ষ থেকে মনে করল। ফলে,

তার খুশীও উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সে বিশ্বাস করে, যে নেয়ামত সে পেয়েছে, তা বাদশাহের ফরমানের কারণে, যা তিনি নিজের কলম দ্বারা কাগজে লিখেছেন, তবে এতে শিরক হবে না এবং পূর্ণ শোকরে ক্রটি থাকবে না। কেননা, সে কলম ও কাগজের তো শোকর করে না। এমনিভাবে যদি সে বাদশাহের উযীরকেও মনে করে যে, সে বাদশাহের চাপ ও আদেশের কারণে দেয়— নিজের ক্ষমতা থাকলে কিছুই দিত না, তবে এতে শিরক হবে না। এখানে উযীর কাগজ ও কলমের মতই গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে জানবে এবং তাঁর কর্মকে চিনবে, সে জানতে পারবে, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সবই তাঁর আদেশের অনুসারী। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত যদি কারও কাছে অন্যের হাতে পৌঁছে, তবে বুঝতে হবে, সে তা পৌঁছাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যে, এই নেয়ামতটি অমুকের কাছে পৌঁছানোর মধ্যেই তার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত। এরপর তার এ কাজটি না করার কোন কারণ থাকে না।

জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত নেয়ামতদাতা। এ বিষয়টি জেনে নেয়ার পর নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই শোকর করতে সক্ষম হবে! বরং শুধু এই জানার কারণেই সে শোকরকারী হয়ে যাবে। সেমতে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মোনাজাতে আল্লাহ্র দরবারে আরয করেন—ইলাহী! তুমি আদমকে স্বহস্তে সৃষ্টি করে কত নেয়ামত দান করেছ। সে তোমার শোকর কিভাবে আদায় করল? এরশাদ হল ঃ আদম এ সকল নেয়ামতকে আমারই পক্ষ থেকে বিশ্বাস করেছে। এ বিশ্বাসই ছিল তার শোকরগোযারী। অতএব বাহ্যিক নেয়ামতদাতাকে নিয়ে মেতে থাকা মানুষের উচিত নয়; বরং প্রকৃত নেয়ামতদাতারও ধ্যান করা উচিত। নতুবা এলমের ক্রটির কারণে হালও ক্রটিযুক্ত হবে এবং হাল ক্রটিযুক্ত হওয়ার কারণে আমলও ক্রটিযুক্ত থেকে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যা এলম থেকে অর্জিত হয়। এর অর্থ নেয়ামতদাতার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা। এলমের ন্যায় এটাও স্বতন্ত্র শোকর। এই শোকর তখনই হয়, যখন

তার শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয়। শর্ত এই যে, সন্তুষ্ট কেবল নেয়ামতদাতার প্রতি হতে হবে— নেয়ামত ও নেয়ামত দানের প্রতি নয়। সম্ভবত এ বিষয়টি কারও হৃদয়ঙ্গম হবে না। তাই একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছি।

উদাহরণতঃ জনৈক বাদশাহ্ সফরে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করল। সে ব্যক্তি এই ঘোড়া পাওয়ায় তিন প্রকারে সন্তুষ্ট হতে পারে। প্রথমত, কেবল ঘোড়ার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যে, এটা উপকারী সম্পদ, সওয়ারীর যোগ্য, উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক এবং উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত। এ ধরনের সন্তুষ্ট সেই হবে, যার বাদশাহের প্রতি কোন কৌতূহল নেই— কেবল ঘোড়ার প্রতিই কৌতূহল। এমনকি, যদি সে এই ঘোড়া জঙ্গলেও পেত, তবু এতটুকুই সন্তুষ্ট হত। দ্বিতীয়ত, কেবল বাদশাহের দানের কারণে সন্তুষ্ট হওয়া। কারণ, এতে বুঝা যায়, এই ব্যক্তির প্রতি বাদশাহের সুদৃষ্টি ও অনুগ্রহের মনোভাব রয়েছে। সে যদি এই ঘোড়াটি জঙ্গলে ঘুরাফেরা অবস্থায় পেয়ে যেত, তবে কখনও সন্তুষ্ট হত না। কারণ, এতে বাদশাহের অন্তরে আসন পাওয়ার উদ্দেশ্যটি হাসিল হত না। তৃতীয়ত, সন্তুষ্টির কারণ এই যে, সে সওয়ার হয়ে সফরের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে এবং বাদশাহের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমত করবে। এমনকি, বাদশাহের মন্ত্রী হয়ে যা য়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরোক্ত তিন প্রকারের প্রথমটিতে শোকরের অর্থ পাওয়াই যায় না। কারণ, এতে দৃষ্টি কেবল ঘোড়ার প্রতি এবং সন্তুষ্টিও ঘোড়া পর্যন্তই সীমিত। দাতার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা সেসব লোকের অবস্থা, যারা কেবল নেয়ামতটি সুস্বাদু ও উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হওয়ার কারণে সন্তুষ্ট হয়। তারা শোকরের স্তর থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। দ্বিতীয় প্রকার শোকরের অর্থে অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এতে নেয়ামতদাতার সত্তার দিক দিয়ে সন্তুষ্টি নেই; বরং একারণে যে, শাহী কৃপাদৃষ্টি নিশ্চিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও নেয়ামত লাভের কারণ হবে। এটা সেই সৎকর্মীদের অবস্থা, যারা শাস্তির ভয়ে ও সওয়াবের আশায় আল্লাহ তা'আলার শোকর ও এবাদত করে। তৃতীয় প্রকারে পূর্ণাঙ্গ শোকরের অর্থ পাওয়া যায়। এতে নেয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও দীদার

লাভ করে ধন্য হওয়া। এটা অত্যন্ত উচ্চ মর্তবা। এর পরিচয় এই যে, মানুষ আখেরাত অর্জনে সহায়ক বিষয়াদি ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না এবং যে বিষয় আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এবং তাঁর পথে অন্তরায় হয়, তাতে দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ শোকরের উদ্দেশ্য হচ্ছে নেয়ামতদাতা, আল্লাহর দীদার নয়। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রাঃ) বলেন ঃ সাধারণ মানুষ পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে শোকর আদায় করে; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের হালে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। এই মর্তবা এমন লোকদের বোধগম্য নয়, যারা আনন্দ ও খুশীকে কেবল উদরপূর্তি, যৌনতৃপ্তি, রঙ-তামাশা, সুর ইত্যাদিতে সীমিত মনে করে। কেউ এই মর্তবা লাভে অক্ষম হলে তার উচিত দ্বিতীয় মর্তবা লাভে সচেষ্ট হওয়া। প্রথম মর্তবা তো গণনার মধ্যেই পড়ে না।

তৃতীয় বিষয় আমল। অর্থাৎ, নেয়ামতদাতাকে জানার কারণে যে খুশী অর্জিত হয়, তদনুসারে কাজ করা। এই আমল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। অন্তরের আমল হচ্ছে কল্যাণকামিতা এবং সকল মানুষের জন্যে সৎ কামনা ও সদাচারের মনোভাব পোষণ করা। জিহ্বার আমল হচ্ছে শোকর জ্ঞাপন করে উৎকৃষ্ট প্রশংসাসূচক ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং এগুলোকে তাঁর নাফরমানীর কাজে সহায়ক না করা। উদাহরণতঃ চোখের আমল হল কোন মুসলমানের কোন দোষ দেখলে তা গোপন করা। কানের আমল কোন মুসলমানের কোন দোষ শ্রবণ করলে তা ফাঁস না করা। মুখের আমল, মুখে এমন ভাষা উচ্চারণ করা, যা দ্বারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন করলে আল্লাহ তা'আলার এসব নেয়ামতের শোকর আদায় হয়। এরূপ করার নির্দেশও রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ কেমন আছ? সে আরয করল ঃ ভাল। আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস শোকর করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কাছে আমি একথাই আশা করছিলাম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ পরস্পর যে কুশল বিনিময় করতেন, তার উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে, কোনরূপে মুখ দিয়ে আল্লাহর শোকর উচ্চারিত হোক।

মোটকথা, মুখে শোকর বলাও শোকরগোযারীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, কিছু লোক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের একজন যুবক কিছু আরয করার জন্যে দণ্ডায়মান হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক প্রথমে সে কথা বলবে। এরপর তার চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তি বক্তব্য রাখবে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কথা বলা উচিত। যুবক আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন! যদি সবকিছু বয়সের উপরই নির্ভরশীল হত, তবে মুসলমানদের শাসক এমন কোন ব্যক্তি হত, যে আপনার চেয়ে অধিক বয়স্ক। খলীফা বললেন ঃ আচ্ছা, যা বলতে চাও, বল। যুবক বলল ঃ আমরা আপনার কাছে চাইতে অথবা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে এখানে আসিনি। কেননা, আপনার দানশীলতা আমরা ঘরে বসেই পেয়ে গেছি। সুতরাং চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আপনার ন্যায়পরায়ণতাকে ভয় করারও কোন হেতু নেই। আমরা কেবল আপনার শোকর আদায় করতে এসেছি। মৌখিক শোকর আদায় করেই আমরা চলে যাব।

সারকথা, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই শোকরের মূল। এগুলোর মাধ্যমে শোকরের স্বরূপ উদঘাটিত হয়। শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন ঃ

নেয়ামতদাতার নেয়ামত বিনীতভাবে স্বীকার করার নাম শোকর। এ সংজ্ঞায় মৌখিক উক্তি এবং অন্তরের কতক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ শোকর হচ্ছে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ উল্লেখ করে তার প্রশংসা করা। এতে কেবল মৌখিক আমলের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারও কারও মতে শোকর হচ্ছে তত্ত্বে মগ্ন হওয়া এবং সদাসর্বদা নেয়ামতদাতার মহত্ত্ব স্মরণ রাখা। এই সংজ্ঞা শোকরের অধিকাংশ বিষয়কে শামিল করে; কিন্তু জিহ্বার আমল শোকরের বাইরে থেকে যায়।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোকরকারী নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য মনে করবে না। এতে কেবল অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থা পাওয়া যায়। মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেকের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল বিধায়

উক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে একই বুযুর্গের উক্তি দু'অবস্থার মধ্যে দু'রকম হয়েছে। কেননা, তাদের মধ্যে যখন যে হাল প্রবল হত, সে হাল অনুযায়ীই তারা বক্তব্য রাখতেন। তারা যতটুকু বলা প্রশ্নকারীর জন্যে উপযোগী মনে করতেন, ততটুকুই বলতেন, অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। এখানে পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে, আমরা এসব কথা তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলছি অথবা আমাদের সুচিন্তিত বক্তব্য তাদের মনঃপূত নয়। বরং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমাদের বক্তব্য অস্বীকার করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে শোকরের অর্থ ঃ কেউ মনে করতে পারে যে, শোকর এমন ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়, যেখানে নেয়ামতদাতা থাকে এবং শোকর দ্বারা তার কিছু না কিছু উপকার হয়। উদাহরণতঃ আমরা বাদশাহ্দের শোকর কয়েক প্রকারের করতে পারি এবং প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে বাদশাহ্দের কিছু না কিছু স্বার্থ হাসিল হয়। প্রথমত, প্রশংসার মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতে বাদশাহ্দের উপকার এই যে, জনগণের মনে তাদের আসন মযবুত হয় এবং তাদের দানশীলতা সুখ্যাত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সেবা ও খেদমতের মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতেও তাদের কোন কোন উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা হয়। তৃতীয়ত, চাকর-বাকরের আকৃতিতে বাদশাহদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে শোকর করতে পারি। এতে তাদের দল ও নামযশ বৃদ্ধি পায়।

মোটকথা, শোকরের কারণে নেয়ামতদাতার এ ধরনের কোন না কোন উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া দু'কারণে অসম্ভব। প্রথম কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সেবাযত্ন, সাহায্য, জাঁকজমক বৃদ্ধি এবং নওকর-চাকরের আধিক্যের প্রয়োজন নেই।

আমরা তাঁর সামনে রুকু-সেজদা করলে তাঁর কোন উপকার হয় না। সুতরাং তাঁর জন্যে শোকরও না থাকা উচিত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা আপন এখতিয়ার দ্বারা যত কাজ করি, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নেয়ামত। কেননা, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ, ইচ্ছা-প্রয়াস এবং নড়াচড়ার উপকরণাদি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

সুতরাং তাঁর নেয়ামতের শোকর তাঁরই নেয়ামত দ্বারা কেমন করে হতে পারে? অতএব বুঝা গেল, উপরোক্ত দু'কারণে আল্লাহ তা'আলার জন্যে শোকর অসম্ভব। এখন এমন উপায় দরকার, যাতে এই অসম্ভাব্যতা না থাকে এবং শোকরও আদায় হয়।

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, হযরত দাঊদ (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-ও এমনি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেন ঃ ইলাহী! আমরা তোমার নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করব? কেননা, যখন শোকর করব, তখন তোমার কোন নেয়ামত দ্বারাই করব; অর্থাৎ, আমাদের শোকর তোমার অপর একটি নেয়ামত হবে, যার শোকর করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলা জওয়াবে এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তোমরা যখন এটা জেনে নিয়েছ, তখন আমিও ধরে নিলাম, আমার শোকর করেছ। এই ওহীর বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা এলমে মোকাশাফার উপর নির্ভরশীল। তাই আমরা এ পর্যন্তই কলম গুটিয়ে নিচ্ছি এবং এলমে মোয়াসালায় বোধগম্য একটি বিষয় উল্লেখ করছি।

পয়গম্বরগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্য মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা। এই তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছার পথে রয়েছে অনেক দুরতিক্রম্য বাধা। শরীয়ত পুরাপুরিভাবে এসব বাধা অতিক্রম করার পন্থা বর্ণনা করে। এতে শোকর, শাকের ও যার শোকর করা হয়—পৃথক পৃথক মনে হয়। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝা যাক। মনে কর, জনৈক বাদশাহ তাঁর কাছ থেকে দূরে অবস্থানকারী এক গোলামের কাছে সওয়ারী, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পাথেয় হিসেবে নগদ টাকা-পয়সা প্রেরণ করল, যাতে সে পথের দূরত্ব অতিক্রম করে শাহী দরবারের নিকটে চলে আসে। এ নৈকট্যের সম্ভাব্য কারণ দুটি। (১) বাদশাহের উদ্দেশ্য দরবারে এসে গেলে কিছু কিছু শাহী দায়িত্ব পালন করবে। ফলে, রাজকার্যে সুবিধা হবে। (২) তার নিকটে আসার মধ্যে বাদশাহের কোন ফায়দা নেই এবং তাতে সাম্রাজ্যের কোন শ্রীবৃদ্ধিও হবে না। বরং এতে স্বয়ং গোলামের উপকার রয়েছে। সে বাদশাহের নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও তাঁর নৈকট্য লাভের ব্যাপারটিকেও এই দ্বিতীয় পর্যায়ে মনে করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে গোলাম কেবল সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে

বাদশাহের কাছে চলে আসলেই শোকরকারী হবে না, যে পর্যন্ত বাদশাহের উদ্দিষ্ট রাজকার্যের দায়-দায়িত্ব পালন না করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যদিও কোন উপকার বাদশাহের কাম্য নয়, তবু গোলাম শাকের (শোকরকারী) ও কাফের (অস্বীকারকারী) হতে পারে। যদি সে বাদশাহের প্রদত্ত সামগ্রী যথাযথ খাতে ব্যয় করে, তবে সে শাকের হবে; অন্যথায় কাফের। সুতরাং সে যদি বাদশাহের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, তবে সে প্রভুর শোকরকারী হবে। কেননা, প্রভুর নেয়ামতকে সে তারই অভীষ্ট কাজে ব্যয় করেছে। পক্ষান্তরে যদি গোলাম বাদশাহের সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে বাদশাহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বিপরীত দিকে চলে এবং দূরে চলে যায়, তবে সে নেয়ামত অস্বীকারকারী হবে। আর যদি সওয়ার না হয় এবং নিকটে অথবা দূরে না যায়, তবু সে নেয়ামতের কাফের বলে গণ্য হবে। কেননা, সে প্রভুর নেয়ামতকে অকার্যকর করে রেখেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর নিকটে থাকার মধ্যেই তার সৌভাগ্য নিহিত রেখেছেন। এরপর নৈকট্যের স্তর লাভের জন্যে এমন সব নেয়ামত সরবরাহ করেছেন, যেগুলো ব্যবহার করতে সে সক্ষম। কিন্তু মানুষ কামনা-বাসনার কারণে মহান দরবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের এই দূরত্ব ও নৈকট্যকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ۔

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে হীনতম করে দেই; কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মাধ্যমে মানুষ হীনতম স্তর থেকে উন্নতি করে নৈকট্যের তথা সৌভাগ্যের স্তরে পৌঁছতে পারে। এতে উপকার মানুষেরই হবে। মানুষ নৈকট্যশীল হোক কিংবা দূরবর্তী, তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন ফায়দা নেই।

এখন মানুষের ইচ্ছা। সে যদি নেয়ামতকে আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করে, তবে শোকরকারী হবে। কারণ, সে প্রভুর মরযী অনুযায়ী কাজ করেছে। আর যদি নাফরমানীতে ব্যবহার করে, তবে নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে প্রভুর মরযীর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর যদি নেয়ামতকে অকার্যকর করে রাখে এবং আনুগত্য ও নাফরমানী কোন কিছুতে ব্যবহার না করে, তবে এতেও সে নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে নেয়ামতকে বিনষ্ট করে।

আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানা ব্যতীত শোকর অর্জন ও নাশোকরী বর্জন পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, শোকরের অর্থ হচ্ছে খোদায়ী নেয়ামতসমূহকে তাঁর পছন্দনীয় বিষয়ে ব্যবহার করা এবং নাশোকরীর মানে হচ্ছে নেয়ামতসমুহকে মোটেই ব্যবহার না করা অথবা অপছন্দনীয় বিষয়ে ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানার উপায় দুটি। এক, কোরআনী আয়াত ও হাদীস শ্রবণ করা এবং দুই, অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা। শেষোক্ত উপায়টি কঠিন বিধায় বিরল। আল্লাহ তাআলা রসূলগণকে প্রেরণ করে মানুষের জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন। মানুষের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত শরীয়তের বিধি-বিধান জানার উপর এই পথের পরিচয় নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সকল ক্রিয়াকর্মে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হবে না, সে কখনও শোকরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

দ্বিতীয় উপায় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যে সকল সৃষ্টবস্তু দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য জানা। কেননা, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে কোন রহস্য নেই এবং সেই রহস্যের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নেই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তু দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তাই আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়। রহস্য দু'প্রকার—প্রকাশ্য ও গোপন। প্রকাশ্য ও বোধগম্য রহস্যসমূহ আল্লাহ তা'আলাও কোরআন মজীদে বর্ণনা করে দিয়েছেন, গোপন ও দুর্বোধ্য রহস্যসমূহ বর্ণনা করেননি। উদাহরণতঃ সূর্য সৃষ্টির মধ্যে এই রহস্য নিহিত যে, এর মাধ্যমে দিন ও রাত অস্তিত্ব লাভ করে। দিনের উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জন এবং রাত্রির

উদ্দেশ্য বিশ্রাম ও স্বস্তি অর্জন। এ হচ্ছে সূর্য সৃষ্টির প্রকাশ্য রহস্য। এ ছাড়া এর অনেক গোপন রহস্যও রয়েছে, যা বর্ণিত হয়নি। এমনিভাবে মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের রহস্যও কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

অর্থাৎ, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি ভূমি বিদারিত করি এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। এটা তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তুদের ভোগের জন্যে।

নক্ষত্র ও তারকারাজির অন্তর্নিহিত রহস্য গোপন এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তারা যতটুকু জানে, তা এই যে, এগুলো আকাশের সাজসজ্জা, যা দেখে মানুষের চক্ষু পুলকিত হয়। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলাও এদিকে ইশারা করেছেন—

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

অর্থাৎ, আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি।

মোটকথা, আকাশ, নক্ষত্ররাজি, বায়ু, সমুদ্র, পাহাড়, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের প্রতিটি কণায় অসংখ্য রহস্য নিহিত। এক থেকে হাজার, দশ হাজার পর্যন্ত রহস্য প্রতিটি কণার ভেতরে পাওয়া যায়। প্রাণীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু কিছু রহস্য সুবিদিত, যেমন সকলেই জানে যে, চক্ষু দেখার জন্যে—ধরার জন্যে নয়। হাত ধরার জন্যে —চলার জন্যে নয়। পা চলার জন্যে—ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে নয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ত্র, পিত্ত, যকৃৎ, মূত্রাশয়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদির রহস্য সবাই জানে না।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি কোন নেয়ামতকে এমন কাজে ব্যবহার না করে, যার জন্যে সে নেয়ামত সৃজিত হয়েছে, সে সে নেয়ামতে আল্লাহ তা'আলার নাশোকরী করবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হাত দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে প্রহার করল। এখানে প্রহারকারী হাতের নেয়ামতে নাশোকর হবে। কেননা, হাত সৃষ্টি হয়েছে ক্ষতিকর বস্তুকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে এবং উপকারী বস্তুকে গ্রহণ করার জন্যে। অপরকে প্রহার করার জন্যে নয়।

এখন আমরা গোপন রহস্যসমূহের একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করছি, যাতে মানুষ এর সাহায্যে অন্যান্য বিষয়েও শোকর ও নাশোকরী সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। এ দুটি বস্তুর উপরই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। যদিও এগুলো পাথর মাত্র—পানাহার ও পরিধানের উপকারে আসে না, তথাপি এগুলোর প্রতি মানুষ চরম মাত্রায় মুখাপেক্ষী। কেননা, প্রত্যেক মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে অনেক বস্তুর প্রয়োজন থাকে। এগুলো বিনিময় ছাড়া লাভ করার উপায় নেই। এই বিনিময়ের জন্যে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান হওয়া জরুরী। কেননা, এটা জানা কথা যে, কেউ বস্ত্রের বিনিময়ে গৃহ অথবা ঘোড়ার বিনিময়ে আটা অথবা মোজার বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করতে চাইলে তা পারবে না। কেননা, এখানে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান নয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সৃষ্টি করেছেন, যাতে এগুলোর দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণতঃ বলা যায় যে, এই উট একশ' স্বর্ণমুদ্রার এবং এই পরিমাণ জাফরান একশ' স্বর্ণমুদ্রার। কাজেই উভয়টি সমান। অতএব বিনিময়যোগ্য। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা সমকক্ষতা সম্ভব হওয়ার কারণ এই যে, এগুলোর সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই এবং এগুলোকে খাওয়াও হয় না, পানও করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়ার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং এতে এই রহস্যও নিহিত রেখেছেন যে, এগুলো দ্বারা সকল বস্তু লাভ করা যায়। সুতরাং এগুলোর মালিক হওয়া যাবতীয় বস্তুর মালিক হওয়ার নামান্তর। এছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আরও অনেক রহস্য রয়েছে।

এখন যদি কেউ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যা এই রহস্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিংবা উদ্দেশ্যের বিপরীতে ব্যবহার করে, তবে সে এই নেয়ামতদ্বয়ে আল্লাহর নাশোকর হবে। উদাহরণতঃ কেউ এগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখলে সে এ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে। সেমতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ, যারা সোনা ও রূপা মাটিতে পুঁতে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা শুনিয়ে দিন।

আর যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র নির্মাণ করায়, সে-ও নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে এবং তার এ কাজ পুঁতে রাখার চেয়েও অধিক নিন্দনীয়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَكَاَنَّمَا يَتَجَرَّعُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রূপার গ্লাসে পানি পান করে, সে যেন তার পেটে গটগট করে জাহান্নামের আগুন ঢালে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার মাধ্যমে সুদের কারবার করবে, সেও নেয়ামতের অস্বীকারকারী ও যালেম হবে। কেননা, এ দুটি বস্তু অন্য বস্তু হাসিল করার উপায় হিসাবে সৃজিত হয়েছে—নিজের বিশেষ সত্তার দ্বারা উপকার দেয়ার জন্যে সৃজিত হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং এগুলোর মধ্যেই ব্যবসা করবে, সে রহস্যের বিপরীত কাজ করবে।

নেয়ামতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ গণনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ নিজেই বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

আমরা এখানে প্রথমে কয়েকটি সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করব, যা নেয়ামতসমূহ চেনার মূলনীতি হিসাবে কাজ করবে। এরপর পৃথক পৃথক নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করব।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক কল্যাণ, আনন্দ, সৌভাগ্য বরং প্রত্যেক প্রার্থিত বিষয়কে নেয়ামত বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে পারলৌকিক সৌভাগ্যের নামই নেয়ামত। এ ছাড়া অন্যগুলোকে নেয়ামত বলা হয় ভ্রান্ত, না হয় রূপক। উদাহরণতঃ যে পার্থিব সৌভাগ্যের দ্বারা আখেরাতে সহায়তা হয় না, তাকে নেয়ামত বলা নিতান্ত ভুল। অতএব, যে বিষয় পারলৌকিক সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কিংবা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাতে সহায়ক হয়, তার নাম নেয়ামত রাখা সঠিক। কেননা, এর কারণে সত্যিকার নেয়ামত লাভ করা যায়। আমরা এসব বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে উপকারী; যেমন, এলম ও সচ্চরিত্রতা। (২) যা উভয় জগতে অপকারী; যেমন, মূর্খতা ও অসচ্চরিত্রতা। (৩) যা দুনিয়াতে উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর; যেমন কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আনন্দ পাওয়া। (৪) যা দুনিয়াতে ক্ষতিকর এবং আখেরাতে উপকারী; যেমন কামপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন ও তার বিরুদ্ধাচরণ।

এগুলোর মধ্যে প্রথম প্রকারই হচ্ছে সত্যিকার নেয়ামত। কারণ, এটা ইহকাল ও পরকালে উপকারী। আর দ্বিতীয় প্রকার, যা উভয়কালে অপকারী, তা সত্যিকার বিপদ। যা দুনিয়াতে উপকারী ও পরকালে অপকারী, তা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের মতে একান্ত বিপদ। কিন্তু মূর্খরা একে নেয়ামত মনে করে। এটা এমন, যেমন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি বিষ বিশ্রিত মধু পেল। সে বিষ সম্পর্কে অজ্ঞ হলে এই মধুকে নেয়ামত মনে করবে। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর জানতে পারবে, এটা ছিল তার জন্যে বিপদ। যে বিষয় দুনিয়াতে অপকারী এবং আখেরাতে উপকারী, তা বুদ্ধিমানদের মতে নেয়ামত এবং মূর্খদের মতে বিপদ। এটা তিক্ত ঔষধের মত, যা বর্তমানে বিস্বাদ; কিন্তু পরিণামে উপকারী। অবুঝ বালককে এই

ঔষধ পান করানো হলে সে একে আপদ মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি একে নেয়ামত মনে করে এবং যে এই ঔষধ দেয়, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকে।

এছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর ভেতরে ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। এমন ভাল বিষয় খুব কম, যা সর্বতোভাবে পূত-পবিত্র। উদাহরণতঃ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় -স্বজন। এমন কিছু বিষয়ও আছে, যার ক্ষতি অধিকাংশ লোকের জন্যে উপকারের তুলনায় বেশী; যেমন ধনাঢ্যতা। আবার কিছু বিষয়ের উপকার ও ক্ষতি সমান সমান। এগুলো বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অনেক সৎলোক ধন-সম্পদ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় ও খয়রাত করে। এরূপ তাওফীকসহ কেউ এরূপ ধন প্রাপ্ত হলে তা তার জন্যে নেয়ামত বটে। অনেক লোক অল্প ধনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অর্থাৎ সর্বদা তাকে কম মনে করে, আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে এবং অধিক ধন অনুসন্ধান করে। এ ধরনের ধন তার জন্যে মুসীবত ছাড়া কিছু নয়।

উত্তম বিষয়সমূহের কোন কোনটি সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও পছন্দনীয় হয়ে থাকে; যেমন খোদায়ী দীদারের আনন্দ ও সৌভাগ্য। এরূপ পারলৌকিক সৌভাগ্য কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। এ সৌভাগ্যকে অন্য কোন সৌভাগ্য লাভের উপায় হিসেবে অনুসন্ধান করা হয় না; বরং এটাই সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি প্রার্থিত হয়ে থাকে। কোন কোন উত্তম বিষয় অন্য বিষয় সৃষ্টি করার জন্যে উদ্দিষ্ট হয়, যেমন সোনা-রূপা। সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে সোনা-রূপা ও কংকরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেহেতু এগুলো অনেক আনন্দ লাভের উপায়, তাই মানুষের কাছে এগুলো প্রিয়। তারা এগুলো সঞ্চয় করে পুঁতে রাখে এবং রিয়া সহকারে ব্যয় করে। তারা ক্রমান্বয়ে এগুলোর বেড়াজালে আটকে পড়ে আসল নেয়ামতদাতাকেই ভুলে যায় এবং এগুলোকে মূল উদ্দেশ্য মনে করতে থাকে। এটা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।

কোন কোন উত্তম বিষয় সত্তা এবং অপরের উপায় উভয় দিক দিয়ে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে; যেমন সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। মানুষ আল্লাহর যিকর ও

ফিকরে মশগুল হওয়ার জন্যে এগুলো কামনা করে অথবা পার্থিব আনন্দ পুরাপুরি হাসিল করার উপায় হিসেবে কামনা করে। আবার মাঝে মাঝে সুস্বাস্থ্য সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি কাম্য হয়ে থাকে; যেমন কোন ব্যক্তির পদব্রজে চলার প্রয়োজন না থাকলেও সে পদযুগলের নিরাপত্তা কামনা করে। বর্ণিত তিন প্রকার উত্তম বিষয়ের মধ্যে সত্যিকার নেয়ামত হচ্ছে প্রথম প্রকার; অর্থাৎ, যা সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও প্রিয়। তৃতীয় প্রকারও নেয়ামত কিন্তু প্রথম প্রকারের তুলনায় কম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার যা কেবল অন্য বিষয়ের উপায় হিসেবেই প্রার্থিত হয়; যেমন সোনা-রূপা, একে খনিজ পদার্থ হওয়ার দিক দিয়ে নেয়ামত বলা যায় না; উপায় ও মাধ্যম হওয়ার দিক দিয়ে বলা যায়। এমতাবস্থায় সোনা-রূপা এমন ব্যক্তির জন্যেই নেয়ামত হবে, যে এগুলো ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। যদি তার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও এবাদত হয় এবং জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তার কাছে থাকে, তবে তার নিকট সোনা ও মাটির ঢেলার মধ্যে পার্থক্য নেই। সোনা-রূপা থাকার কারণে যদি এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে এবাদতকারীর জন্যে এগুলো নেয়ামত নয়— আপদ।

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত যেমন অসংখ্য ও অগণিত, তেমনি বিরামহীন। তন্মধ্যে সুস্থতা দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি নেয়ামত। কিন্তু যেসমস্ত বিষয় দ্বারা এই নেয়ামত পূর্ণ হয়, সেগুলো এখানে পুরাপুরি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে এর পরিপূরক বিষয়সমূহের মধ্যে আহারও একটি। আহারের নেয়ামত পূর্ণ হওয়ার জন্যে যা যা অত্যাবশ্যক, তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এটা জানা কথা যে, আহার একটি কাজ। এর জন্যে ইচ্ছা এবং ইচ্ছাকৃত বস্তুর জ্ঞান জরুরী। এছাড়া আহারের জন্যে খাদ্য জরুরী এবং খাদ্যের জন্যে খাদ্য অর্জিত হওয়ার স্থান এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী দরকার। আমরা এখানে এসব বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

প্রকাশ থাকে যে, উদ্ভিদ তার মূল শিকড় ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে খাদ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। খাদ্য শিকড়ে না পৌঁছলে কিংবা শিকড়ের সাথে মিলিত না থাকলে উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। অন্য স্থান থেকে

খাদ্য আহরণের ক্ষমতা তার নেই। কারণ, সে খাদ্যের জ্ঞানও রাখে না এবং খাদ্য পর্যন্ত পৌঁছতেও পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ক্ষমতা দান করেছেন। সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য ও খাদ্যের অবস্থান জেনে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ছাড়া মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা দ্বারা সে খাদ্যের উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। খাদ্য রন্ধন করা ও তার আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজেও জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগে। আহারের প্রতি আগ্রহও একটি বড় নেয়ামত। কেননা, অনেক রোগী খাদ্য দেখে, কিন্তু খায় না। কারণ, তাদের মনে খাদ্যের প্রতি আগ্রহ থাকে না।

এমনিভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক আহারের ক্ষেত্রেই মানুষকে হাজারো নেয়ামত দান করা হয়েছে। স্বয়ং খাদ্য ও ফল-মূলের সংখ্যা এত বেশী, যা লিখে শেষ করা যায় না।

শোকরে গাফলতির কারণ ঃ মূর্খতা ও গাফলতির কারণে মানুষ নেয়ামতের শোকর করে না। কারণ, সে মূর্খতার কারণে নেয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এটা জানা কথা যে, শোকর আদায় করতে হলে নেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা দরকার। যারা নেয়ামত সম্পর্কে জানে, তাদেরও অনেকের ধারণা, মুখে "আলহামদু লিল্লাহ" অথবা "আল্লাহর শোকর" বলাই হচ্ছে নেয়ামতের শোকর। যে নেয়ামত যে রহস্যের জন্যে সৃজিত হয়েছে, তাকে সেই নেয়ামত পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করাই নেয়ামতের অর্থ সেকথাই তারা জানে না। আর নেয়ামতের প্রার্থিত রহস্য হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আনুগত্য। এ দুটি বিষয় জানার পর শোকরের বাধা কামনা-বাসনার প্রাবল্য এবং শয়তানের আধিপত্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এখন নেয়ামত জানা থেকে গাফিল থাকার কারণ কয়েকটি। এক, মানুষ মূর্খতাবশত যে বস্তু সকলের কাছে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে নেয়ামত মনে করে না। ফলে, কেউ এর শোকর আদায় করে না। উদাহরণতঃ আহার ও খাদ্য সম্পর্কিত যে সকল নেয়ামত উপরে বর্ণিত হয়েছে, কেউ এগুলোর শোকর করে না। কেননা, এগুলো ব্যাপক নেয়ামত। কারও সাথে এগুলোর বিশেষত্ব নেই। অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে কেউ

শোকর করে না। অথচ মুহূর্তের জন্যে গলা চেপে ধরলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। অথবা যদি কাউকে এমন কক্ষে আটকে রাখা হয়, যার বায়ু উত্তপ্ত কিংবা এমন কূপে আটকে রাখা হয়, যার বায়ু হিমশীতল, তবে দমবন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। হাঁ, যদি আটকে রাখার পর পুনরায় মৃতপ্রায় অবস্থায় বের করা হয়, তবে সে বুঝবে বায়ু একটি বড় নেয়ামত। তাই কথায় বলে— قَدْرُ نِعْمَتٍ بَعْدَ زَوَالٍ অর্থাৎ, 'হাতছাড়া হওয়ার পরই নেয়ামতের কদর হয়।' কিন্তু এটা মূর্খতা। কারণ, এতে নেয়ামত হাতছাড়া হওয়ার পর পুনরায় হস্তগত হওয়ার উপর শোকর নির্ভরশীল হবে। অথচ নেয়ামতের শোকর সার্বক্ষণিক হওয়া উচিত। আমরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কখনও চোখের শোকর করতে দেখি না। অন্ধ হওয়ার পর সে চোখের মর্যাদা বুঝে। এরপর যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে, তবে সে একে নেয়ামত মনে করে শোকর করে।

মানুষের বর্তমান অবস্থা এই যে, তারা কেবল ধন-সম্পদেরই শোকর করে— যদি তাতে তাদের কিছু বিশেষত্ব হয়ে যায়। এ ছাড়া অন্য সব নেয়ামত তারা বিস্মৃত হয়ে যায়। বর্ণিত আছে, জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি কোন এক বুযুর্গের কাছে তার দারিদ্র্যের অভিযোগ পেশ করে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করল। বুযুর্গ বললেন ঃ তুমি কি দশ হাজার দিরহাম পাওয়ার বিনিময়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া পছন্দ করবে? লোকটি বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ তুমি কি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বোবা হয়ে যাওয়া মঞ্জুর করবে? লোকটি আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি কি খোঁড়া হতে সম্মত হবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ দশ হাজারের বিনিময়ে তুমি পাগল হওয়া পছন্দ করবে কি? সে বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ তা হলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তোমার লজ্জা হয় না? তিনি পঞ্চাশ হাজার দিরহামেরও অধিক পরিমাণ সম্পদ তোমাকে দিয়ে রেখেছেন। এরপরও তুমি অভিযোগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছ?

একবার হযরত ইবনে সামমাক (রহঃ) সমকালীন খলীফার কাছে গেলেন। খলীফা গ্লাস হতে পানি পান করতে করতে বললেন ঃ আমাকে

উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ মনে করুন আপনি তৃষ্ণার্ত। সঙ্গের যাবতীয় নগদ অর্থকড়ি দিয়েই আপনি এক গ্লাস পানি পেতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন? সকল অর্থ দিয়ে পানি সংগ্রহ করবেন কি না? খলীফা আরয করলেন ঃ অবশ্যই পানির জন্যে সকল অর্থ দিয়ে দেব। ইবনে সামমাক বললেন ঃ যদি এরই বিনিময়ে গোটা রাজত্ব দিতে হয়, তবে তা-ও দিয়ে দেবেন। খলীফা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। ইবনে সামমাক বললেন ঃ তা হলে এরূপ রাজত্বের জন্যে আনন্দিত হওয়া ঠিক নয়, যার মূল্য এক গ্লাস পানির সমান। এ থেকে জানা গেল যে, পিপাসার সময় এক গ্লাস পানির মূল্য সারা বিশ্বের রাজত্বের চেয়েও বেশী।

সাধারণ মানুষ বিশেষ নেয়ামতকেই কেবল নেয়ামত মনে করে, ব্যাপক নেয়ামতকে নয়। এ পর্যন্ত আমরা কেবল ব্যাপক নেয়ামত বর্ণনা করেছি। তাই সংক্ষেপে কিছু বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রত্যক মানুষ যদি নিজের অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে একটি অথবা কয়েকটি নেয়ামত এমন পাবে, যা বিশেষভাবে তারই জন্যে নির্ধারিত। সকল মানুষ অথবা কোন মানুষ এতে তার সাথে শরীক নয়। তিনটি বিষয়ে যে কেউ একথা স্বীকার করে। প্রথম বুদ্ধিমত্তা, দ্বিতীয় চরিত্র এবং তৃতীয় জ্ঞান। বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তো এটা প্রসিদ্ধ যে, هر كس را عقل خود بكمال نمايد

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিমত্তাকে পরিপূর্ণ মনে করে। এমন কোন মানুষ নেই, যে নিজের বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট নয় এবং নিজেকে অন্যের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান মনে না করে। একারণেই কেউ আল্লাহ তাআলার কাছে বুদ্ধিমত্তার জন্যে দোয়া করে না। এটাও বুদ্ধিমত্তার অন্যতম গৌরব যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে মুক্ত, সে-ও এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং যে এ গুণে গুণান্বিত, সেও উল্লসিত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যখন আপন বিশ্বাসে অপরের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, তখন বাস্তবে তাই হলে এ নেয়ামতের শোকর করা তার উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বাস্তবে এরূপ না হলেও শোকর ওয়াজিব। কারণ, তার পক্ষে তো নেয়ামত বিদ্যমান আছে।

চরিত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের মধ্যে কিছু দোষ থাকা

পছন্দ করে এবং অপরের কিছু অভ্যাসকে খারাপ মনে করে। কিন্তু নিজেকে এগুলো থেকে মুক্ত মনে করে। সুতরাং তার শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার অভ্যাসসমূহকে সুন্দর করেছেন এবং অপরকে মন্দ অভ্যাস দিয়েছেন।

জ্ঞান-গরিমার অবস্থা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে এমন কিছু গোপন বিষয় জানে, যা অন্য কেউ জানে না। যদি জেনে ফেলে, তবে সে অপমানিত ও হেয় হয়ে যায়। তাই বিষয়গুলো জানার ব্যাপারে অন্য কেউ তার সাথে শরীক থাকে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যে তার বিষয়গুলো গোপন রেখেছেন, সেজন্যে আল্লাহর শোকর করা উচিত। কারণ, আল্লাহ তার গোপন দোষগুলো মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, ভাল বিষয়গুলো প্রকাশ করেছেন এবং দোষসমূহের জ্ঞান তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেননি। উপরোক্ত তিনটি বিশেষ নেয়ামত প্রত্যেকেই স্বীকার করে।

সারকথা, মানবকুলের সামনে শোকরের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ এটাই যে, তারা যাহেরী, বাতেনী, বিশেষ ও ব্যাপক নেয়ামত সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নয়। এক্ষণে গাফেল অন্তরসমূহের চিকিৎসা বর্ণনা করা হচ্ছে এই আশায় যে, হয়তো তারা গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগ্রত এবং শোকর আদায়ে তৎপর হবে। হুশিয়ার ও বিজ্ঞ অন্তরসমূহের চিকিৎসা এই যে, আমরা ব্যাপক নেয়ামতসমূহের যে সকল প্রকার ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছি, সেগুলো সম্পর্কে তারা গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে। আর যারা বিশেষ নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছুকে নেয়ামতই মনে করে না অথবা বিপদে পড়ে নেয়ামতকে চিনে, তাদের চিকিৎসা এই যে, তারা নিজের চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং জনৈক সূফী যা করতেন, তা করবে। তিনি প্রত্যহ একবার হাসপাতালে ও একবার গোরস্তানে গমন করতেন। হাসপাতালে গিয়ে অনেক মানুষকে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত দেখে নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তার কথা ধ্যান করতেন, যাতে সুস্বাস্থ্য যে একটি বড় নেয়ামত, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শোকর আদায় করা যায়। বুযুর্গ ব্যক্তি গোরস্তানে গিয়ে কল্পনা করতেন যে, মৃতরা

একদিনের জন্যে হলেও পৃথিবীতে ফিরে আসাকে সর্বাধিক পছন্দ করে। গোনাহগার অতীত দিনের ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আর নেককার আরও বেশী নেকী করার জন্যে এটা পছন্দ করে। এরপর তিনি ভাবতেন যে, যার জন্যে তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়, তা তো আমার অর্জিত আছে। অর্থাৎ, আমি অতীত দিনের ক্ষতিপূরণ এবং অধিক নেকী অর্জন এই মুহূর্তে করতে পারি। সুতরাং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো আমি এ কাজেই ব্যয় করি না কেন? এ দিনগুলোকেই আমি আল্লাহর নেয়ামত মনে করে নেই না কেন? এ চিকিৎসায় আশা করা যায়, গাফেল ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে অবগত হয়ে শোকরে তৎপর হবে।

হযরত রবী ইবনে খায়ছাম (রহঃ) পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজের ঘরে একটি কবর খনন করেছিলেন। প্রত্যহ গলায় বেড়ী পরে তিনি এই কবরে শয়ন করতেন এবং বলতেন—

رَبِّ ارْجِعُنِي لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করি।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন ঃ হে রবী, তোর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। তুই সেই সময়ের পূর্বে কিছু করে নে, যখন পুনরায় প্রেরণের আবেদন করবে কিন্তু তোকে প্রেরণ করা হবে না।

যে সকল অন্তর শোকর থেকে দূরে থাকে, একথা জেনে নেয়াও তাদের এক চিকিৎসা যে, যে নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয় না, সে নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা পুনর্বার পাওয়া যায় না। এ কারণেই হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ লোকসকল, তোমরা নেয়ামতসমূহের শোকর অবশ্যই কর। এটা বিরল যে, নেয়ামত একবার চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ নেয়ামতসমূহ বন্য পশুসদৃশ। এগুলোকে শোকর দ্বারা বন্দী করে রাখ। হাদীসে আছে—যখন কারও প্রতি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বেশী হয়, তখন তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনও

বেড়ে যায়। সে যদি এসব প্রয়োজন পূরণে অলসতা করে, তবে প্রকারান্তরে নেয়ামত হারিয়ে ফেলার প্রয়াস চালায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

যেসব বিষয়ে সবর ও শোকর পরস্পর জড়িত ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুতেই আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত পাওয়া যায়। এতে মুসীবতের অস্তিত্ব না থাকাই জরুরী হয়ে পড়ে। মুসীবত না থাকলে সবর কিসের উপর হবে? আর মুসীবত থাকলে শোকর কিরূপে হবে? কেননা, মুসীবতে সবর করার মধ্যে ব্যথা ও কষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। আর শোকর হল আনন্দজ্ঞাপক। অতএব, সবর ও শোকর পরস্পরবিরোধী। এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, নেয়ামত যেমন বিদ্যমান, তেমনি মুসীবতও বিদ্যমান। মুসীবত দূর হওয়াকে নেয়ামত এবং নেয়ামত দূর হওয়াকে মুসীবত বলা হয়। অতএব, উভয়টির অস্তিত্ব জরুরী।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নেয়ামত দু'প্রকার। একটি সর্বাবস্থায় নেয়ামত; যেমন খোদায়ী নৈকট্যের সৌভাগ্য, ঈমান ও সচ্চরিত্রতা। দ্বিতীয় প্রকার যা একদিক দিয়ে নেয়ামত ও অন্যদিক দিয়ে মুসীবত। যেমন অর্থসম্পদ। ধর্মীয় কল্যাণ লাভের দিক দিয়ে এটি নেয়ামত এবং ধর্মের অনিষ্ট হলে এটি মুসীবত। এমনিভাবে মুসীবতও দু'প্রকার। এক, যা সবদিক দিয়ে মুসীবত, যেমন আখেরাতে আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকা দুনিয়াতে কুফর ও অসচ্চরিত্রতা। এগুলোর পরিণতি সর্বাবস্থায় মুসীবত। দুই, যা একদিক দিয়ে মুসীবত ও অন্যদিক দিয়ে মুসীবত নয়; যেমন দারিদ্র্য, রোগব্যাধি ও ভয়ভীতি।

অতএব, যা সর্বাবস্থায় নেয়ামত, তার জন্যে সর্বাবস্থায় শোকর করা উচিত। যা দুনিয়াতে সবদিক দিয়ে মুসীবত, তার জন্যে সবর করার আদেশ নেই; যেমন কুফরের জন্যে সবর করার কোন অর্থ হয় না। বরং কুফর পরিত্যাগ করা কাফেরের জন্যে অপরিহার্য। এ থেকে জানা গেল যে,

দুনিয়াতে যা সবদিক দিয়ে মুসীবত, তা সবর করার জায়গা নয়। অতএব, একই জায়গায় সবর ও শোকর একত্রিত হতে পারে যদি সেটা এমন মুসীবত হয়, যা একদিক দিয়ে মুসীবত কিন্তু অন্যদিক দিয়ে নেয়ামত হয়। উদাহরণতঃ ধনাঢ্যতা নেয়ামত হলেও মাঝে মাঝে এর কারণে ধনী ব্যক্তি ও তার সন্তান-সন্ততি প্রাণ হারায়। এমনিভাবে অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতও নেয়ামতওয়ালার জন্যে মুসীবত হতে পারে এবং পার্থিব মুসীবতও মুসীবতওয়ালার জন্যে নেয়ামত হতে পারে; যেমন অনেক মানুষ দারিদ্র্য ও রোগব্যাধিকেই পছন্দ করে। অতএব, এগুলো মুসীবত হলেও তাদের জন্যে নেয়ামত। কারণ, ধন-সম্পদ বেশী থাকলে এবং শরীর সুস্থ থাকলে মানুষ অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে। সেমতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِبَغَوْا فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানুষকে রিযকে স্বাচ্ছন্দ্য দেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষ ঔদ্ধত্য করে এ কারণে যে, সে নিজেকে ধনাঢ্য দেখতে পায়।

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন কেউ নিজের রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থাও তদ্রূপ।

জ্ঞান নিঃসন্দেহে একটি নেয়ামত। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এটাই দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। তখন অজ্ঞতাকেই নেয়ামত বলতে হয়। উদাহরণতঃ মানুষ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান যদিও নেয়ামত, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে না জানাই নেয়ামত। কারণ, মৃত্যুর সময় জানা হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন তিক্ত হয়ে যাবে এবং সে কোন কাজই করতে সক্ষম হবে না। এমনিভাবে নিজের সম্পর্কে এবং

আত্মীয়দের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের বিশ্বাস না জানা নেয়ামত। কেননা, এই বিশ্বাস জানা হয়ে গেলে দুঃখ পেতে হত এবং হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনক্ষণ, শবেকদর ও জুমআর মকবুল মুহূর্তটি গোপন রেখেছেন। এটাও নেয়ামত। কেননা,এটা গোপন থাকার কারণে অন্বেষণে ইচ্ছা ও চেষ্টা অধিক করতে হয়। ফলে, সওয়াব বেশী হয়।

অতএব, যে অবস্থাকে সর্বদিক দিয়ে মুসীবত এবং সর্বাবস্থায় নেয়ামত বলা যায় না, তাতে সবর ও শোকর উভয়টি করতে হবে। প্রশ্ন হয় যে, সবর ও শোকর তো একটি অপরটির বিপরীত। এগুলো একত্রিত হবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, মানুষ একই কারণে কখনও দুঃখ করে এবং কখনও আনন্দিত হয়। সুতরাং দুঃখের জন্যে সবর করবে এবং আনন্দের জন্যে শোকর। উদাহরণতঃ পার্থিব বিপদ ও রোগব্যাধিতে যদিও দুঃখ হয়, যা সবর দাবী করে; কিন্তু পাঁচটি কারণে বুদ্ধিমানের উচিত এগুলোতে আনন্দিত হওয়া ও শোকর করা। এক, যে বিপদ ও রোগব্যাধি এখন রয়েছে, এরচেয়ে ভয়ংকর কোন রোগ ও বিপদ সম্ভব। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এই রোগ ও বিপদকে দ্বিগুণ করে দেন, তবে বাধা দেয়ার সাধ্য কার? সুতরাং প্রত্যেক অসুখ-বিসুখ ও বিপদে মানুষের শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা এর চেয়ে বড় অসুখ ও বিপদ দেননি। দুই, বিপদ পার্থিব ব্যাপারে হয়েছে দ্বীনদারীতে হয়নি— এটাও শোকরের অন্যতম কারণ।

সেমতে কোন এক ব্যক্তি হযরত সহল তস্তরীর কাছে অভিযোগ করল ঃ আমার ঘরে এক চোর ঢুকে সকল আসবাব নিয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শোকর কর যে, শয়তান তোমার অন্তরে প্রবেশ করে তোমার ঈমানকে পন্ড করে দেয়নি। হযরত আবু এয়াযীদ বুস্তামী এক গলিপথে গমন করছিলেন। উপর থেকে কেউ ছাইয়ের ঝুড়ি তার উপর ঢেলে দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে শোকরের সেজদা আদায় করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, এই পরিস্থিতিতে সেজদা কেন? তিনি বললেন ঃ আমি নিজের উপর আগুন পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। সুতরাং কেবল ছাই পতিত হওয়া আমার জন্যে নেয়ামত।

প্রশ্ন হল, মুসীবতে আমরা কেমন করে আনন্দিত হব, অথচ দেখা যায়, কোন কোন লোক আমাদের চেয়ে বেশী গোনাহ করে; কিন্তু তাদের উপর আমাদের মত মুসীবত আসে না। কাফেররা হরহামেশা কুফর করেও আমাদের মত মুসীবতে পতিত হয় না। জওয়াব এই যে, কাফেরের উপর অনেক বেশী মুসীবত আসবে—আজ না হয় মৃত্যুর পরে আসবে। দুনিয়াতে তাকে সময় দেয়া হয়, যাতে অনেক গোনাহ করে নেয় এবং আযাব দীর্ঘ হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

অর্থাৎ, আমি কাফেরদেরকে এ কারণেই অবকাশ দেই, যাতে তাদের গোনাহ বেড়ে যায়।

গোনাহগার সম্পর্কে কথা হল, কেউ যে আমাদের চেয়েও বেশী গোনাহগার, তা কেমন করে জানা গেল? আল্লাহর সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে অনেকের অন্তরের ধৃষ্টতা এত জঘন্য থাকে যে, এর সামনে বাহ্যিক মদ্যপান ও যিনা কিছুই নয়। এরূপ গোনাহ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

অর্থাৎ, তোমরা একে সহজ মনে কর, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ।

যদি বাস্তবে কারও গোনাহ বেশীও হয়, তবে এটা সম্ভব যে, তার শাস্তি আখেরাতে বেশী হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসীবতে রয়েছে, তার তো শোকর করা দরকার যে, তাকে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, দুনিয়াতে যার শাস্তি হয়ে যায়, তাকে আখেরাতে পুনরায় শাস্তি দেয়া হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেউ গোনাহ করে এবং দুনিয়াতে তার উপর কোন বিপদ এসে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে যান। মুসীবতে আনন্দিত হওয়া ও শোকর করার এ হচ্ছে তৃতীয় কারণ।

চতুর্থ কারণ এই যে, এই মুসীবত লওহে মাহফুযে লিখিত ছিল যে,

অমুক ব্যক্তির উপর আসবে। এটা ঘটা অপরিহার্য ছিল। এখন যখন অল্প কিংবা সবটুকু ঘটে গেল, তখন এটাই নেয়ামত।

পঞ্চম কারণ এই যে, মুসীবতের সওয়াব মুসীবতের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে থাকে। কেননা, দুনিয়ার মুসীবত দু'কারণে আখেরাতের পথ। প্রথম, সে কারণে বিস্বাদ ও তিক্ত ঔষধ রোগীর জন্যে নেয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের দিন বান্দা যখন দেখবে, মুসীবতের কারণে সওয়াব পাওয়া যায়, তখন সে এই নেয়ামতের শোকর করবে। যেমন শিশুরা বড় হওয়ার পর এবং বুদ্ধিমান হওয়ার পর পিতা ও শিক্ষকের প্রহারের শোকর আদায় করে। দ্বিতীয়, সকল পাপের মূল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। পক্ষান্তরে নাজাতের মূলকথা হচ্ছে দুনিয়া থেকে অন্তরের বিচ্ছিন্নতা। বলা বাহুল্য, যদি পার্থিব উদ্দেশ্য অনুযায়ী নেয়ামতসমূহ মুসীবত ছাড়াই পাওয়া যায়, তবে এতে দুনিয়ার প্রতি অন্তরের টান আরও বেড়ে যায়। এমনকি, মানুষের জন্যে দুনিয়া জান্নাতের অনুরূপ হয়ে যায়। আর যদি মুসীবত ও আপদ আসতে থাকে, তবে দুনিয়ার প্রতি অন্তর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়; বরং দুনিয়া কারাগারের মত হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ অর্থাৎ, 'দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফেরের জান্নাত। কাফের তাকে বলা হয়, যে আল্লাহ তা'আলা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। আর মুমিন তাকে বলা হয়, যে আন্তরিকভাবে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং এখান থেকে পলায়ন করতে আগ্রহী।

মোটকথা, বর্ণিত পাঁচটি কারণে মুসীবতে নেয়ামতও থাকে। তাই মুসীবতের জন্যে আনন্দিতও হতে হয়। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝে, সে মুসীবতেও শোকর করবে। আর যে এ সম্পর্কে অজ্ঞ, তার পক্ষে শোকর করা অসম্ভব। মুসীবতেও সবর করা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে—

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যার কল্যাণ করতে চান, তাকে মুসীবত দেন।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন— আমি আমার বান্দার দেহের, অর্থ-সম্পদের অথবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত প্রেরণ করি। সে যদি "সবরে জামীল" সহকারে সেই মুসীবত সহ্য করে, তবে কিয়ামতে তার আমলের জন্যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করতে অথবা আমলনামা খুলতে আমি লজ্জাবোধ করি। এক হাদীসে বলা হয়েছে— বান্দার উপর কোন মুসীবত এলে সে যদি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করে এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ, 'ইলাহী! আমাকে আমার মুসীবতের প্রতিদান দাও এবং এর পরে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর,'

তবে আল্লাহ তা'আলা তাই করেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি রুগ্ন। তিনি বললেন ঃ যে বান্দার ধন বিনষ্ট হয় না এবং অসুখ-বিসুখ হয় না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে প্রিয় করে নেন, তখন তাকে মুসীবতে ফেলেন এবং যখন মুসীবতে ফেলেন, তখন সবর দান করেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন একটি মর্তবা থাকে, যাতে সে আমলের মাধ্যমে পৌঁছতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার দেহের উপর কোন মুসীবত প্রেরণ করেন, যার কারণে সে সেই মর্তবা পেয়ে যায়। খাববাব ইবনে ইরত (রাঃ) বর্ণনা করেন—একবার আমি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম, তখন তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে ছিলেন। আমি অভিযোগের সুরে তাঁকে বল্লাম ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের সাহায্যের জন্যে দোয়া করেন না কেন? কাফেররা আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে মাটি খনন করে গোর দেয়া হত এবং

করাত দিয়ে তাদের মস্তক চিরে দেয়া হত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করত না। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তিকে শাসনকর্তা অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করে, এরপর সেখানেই সে মারা যায়, সে শহীদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রহার করতে করতে মেরে ফেলে, তবু শহীদ হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান এবং তাকে প্রিয় করে নিতে চান, তখন তার উপর মুসীবত ঢেলে দেন এবং বৃষ্টির ন্যায় বিপর্যয় বর্ষণ করেন। যখন সেই বান্দা আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ এই কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হয়। যখন পুনরায় ডাকে এবং "ইয়া রব" বলে, তখন আল্লাহ্ এরশাদ করেন—বান্দা! কি বলতে চাও, বল। আমি হাযির। তুমি যা চাইবে তাই দেব। যদি দুনিয়াতে কোন উত্তম বস্তু তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দেই, তবে তোমার জন্যে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু আমার কাছে রেখে দেই। যখন কিয়ামত হবে, তখন আমলকারীরা হাযির হবে। তাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমল দাঁড়িপাল্লায় ওযন করা হবে এবং পুরাপুরি সওয়াব প্রদান করা হবে। কিন্তু যখন মুসীবতওয়ালা হাযির হবে, তখন তার জন্যে দাঁড়িপাল্লাও স্থাপন করা হবে না এবং আমলনামাও খোলা হবে না। তাদের উপর সওয়াব এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে, যেমন মুসীবত ঢেলে দেয়া হয়েছিল। তখন দুনিয়াতে যারা বিপদমুক্ত ছিল, তারা বাসনা করবে—কি চমৎকার হত যদি আমাদের দেহও কাঁচি দিয়ে কাটা হত এবং মুসীবতওয়ালাদের অনুরূপ সওয়াব আমরাও পেতাম। এ কারণেই কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীরা তো তাদের পুরস্কার বেহিসাব পাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কোন এক পয়গম্বর আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করলেন— ইলাহী! মুমিন বান্দা তোমার আনুগত্য করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু তুমি

দুনিয়াকে তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখ এবং মুসীবত প্রেরণ কর। অপরপক্ষে কাফের তোমার আনুগত্য করে না এবং গোনাহে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তুমি তার কাছ থেকে মুসীবতকে সরিয়ে রাখ। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান কর। ব্যাপার কি? এরূপ কেন? আল্লাহ পাক পয়গম্বরের কাছে ওহী পাঠালেন ঃ বান্দাও আমার, মুসীবতও আমার। প্রত্যেকেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসল ব্যাপার এই যে, মুমিন বান্দার গোনাহ হয়ে যায়। তাই তার কাছ থেকে দুনিয়াকে আলাদা রাখি এবং মুসীবত পাঠিয়ে দেই, যাতে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। সে যখন আমার কাছে আসবে, তখন আমি তার পুণ্যের প্রতিদান দেব। পক্ষান্তরে কাফেরের কিছু পুণ্য থাকে। তাই আমি তাকে রিযক বেশী দেই এবং মুসীবতকে দূরে রাখি, যাতে সে তার পুণ্যের বদলা দুনিয়াতে পেয়ে যায় এবং যখন আমার কাছে আসে, তখন পাপকর্মের শাস্তি দেই। কথিত আছে, যখন مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ (অর্থাৎ, যে মন্দকাজ করবে, তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে) আয়াতখানি নাযিল হল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতের পর আনন্দ কেমন করে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি কি অসুস্থ হও না, যদ্দরুন দুঃখ কর? এটাই তোমার মন্দকর্মের প্রতিদান। অর্থাৎ, সকল মুসীবত তোমার গোনাহের কাফফারা হয়ে থাকে।

হযরত উকবা ইবনে আমেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ, আল্লাহ তা'আলা তার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করে যাচ্ছেন এবং সে নিজের গোনাহে বাড়াবাড়ি করে যাচ্ছে, তখন জেনে নাও যে, এটা তাকে অবকাশ দেয়ার জন্যে করা হচ্ছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যখন তারা নির্দেশিত কাজ পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাদের

সামনে যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা এসব কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে খুব উল্লসিত হয়ে গেল, তখন হঠাৎ করে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ কোন এক সাহাবী পথিমধ্যে জাহেলিয়াত যুগের পরিচিতা এক মহিলাকে দেখলেন। তিনি তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু চলতে চলতে পেছন ফিরে মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্রাচীরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেলেন। ফলে, তার চেহারা যখম হয়ে গেল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোরআন মজীদের এমন একটি আয়াত বলে দিচ্ছি, যা সকল আয়াতের তুলনায় অধিক আশাব্যঞ্জক। শ্রোতারা আরয করল ঃ বলুন। তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে মুসীবত আসে, তা তোমাদের হাতেরই অর্জিত। আল্লাহ অনেক কিছু মাফ করে দেন।

মোটকথা, পার্থিব যাবতীয় মুসীবত গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন, তখন পুনরায় শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই। আর যদি দুনিয়াতে মাফ করে দেন, তবে তাঁর কৃপা চায় না যে, কিয়ামতে শাস্তি দেয়া হোক।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ বান্দার দুটি ঢোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়—এক, ক্রোধের ঢোক, যা সহনশীলতার কারণে বান্দা গিলে ফেলে। দুই, মুসীবতের ঢোক, যা সবরের কারণে গিলে ফেলে। বান্দার দুটি বিন্দুও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়—এক, রক্তবিন্দু, যা

তাঁর পথে জেহাদে প্রবাহিত হয়। দুই, অশ্রুবিন্দু, যা অন্ধকার রাতে বান্দার চোখ থেকে সেজদারত অবস্থায় পতিত হয়। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ একে দেখে না। বান্দার দুটি পদক্ষেপও আল্লাহ্র কাছে অত্যধিক পছন্দনীয়। এক, ফরয নামাযের জন্যে পদক্ষেপ এবং দুই, আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের পদক্ষেপ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, পয়গম্বর হযরত সোলায়মান (আঃ) -এর দুই পুত্রের ইন্তেকালে তিনি নিরতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। যেন তারা বাদী ও বিবাদী। তাদের একজন আরয করল ঃ আমি শস্যক্ষেত বপন করেছিলাম। যখন শস্য তৈরী হয়ে গেল, তখন এই ব্যক্তি ক্ষেতটি দলিত-মথিত করে দিয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার বক্তব্য কি? সে আরয করল ঃ আমি পথ ধরে যেতে যেতে এক ক্ষেতের ধারে পৌঁছলাম। ডানে-বামে লক্ষ্য করে দেখলাম, পথ ক্ষেতের মধ্য দিয়েই ছিল। তাই আমি সেখান দিয়েই গমন করেছি। হযরত সোলায়মান বাদীকে বললেন ঃ তুমি পথের উপর বীজ বপন করলে কেন? তোমার জানা নেই যে, মানুষের চলার পথ অবশ্যই রাখতে হবে? সে আরয করল ঃ তাহলে আপনি পুত্রদের জন্যে এত ভেঙ্গে পড়েছেন কেন? আপনি জানেন না যে, মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের সড়ক? অতঃপর হযরত সোলায়মান তওবা করলেন। পুত্রদের জন্যে পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করলেন না।

হযরত ইবনে মসউদ বলখী (রহঃ) বলেন ঃ মুসীবত এলে যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে অথবা মুষ্টি দ্বারা বুকে আঘাত করে, সে যেন বল্লম দ্বারা আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী হয়। হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ আগুন দ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষা করা হয়। আর ঈমানদার বান্দার পরীক্ষা হয় মুসীবত দ্বারা। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তখন তাদেরকে মুসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। তখন যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে নাখোশ থাকে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি নাখোশ থাকেন।

আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন ঃ একদিন আমার চোয়ালে তীব্র ব্যথা

ছিল। আমি আমার পিতৃব্যকে বললাম ঃ চোয়ালের ব্যথার কারণে সারারাত আমার ঘুম হয়নি। এ কথাটি আমি তিন বার তার কাছে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এক রাতের ব্যথায় এত অভিযোগ করছ। আমি ত্রিশ বছর ধরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি। কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি।

উপরোক্ত হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে মুসীবতের ফযীলত জানা যায়। এগুলো শুনে কেউ বলতে পারে যে, তা হলে তো দুনিয়াতে নেয়ামতের তুলনায় মুসীবত আসাই উত্তম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে মুসীবতের প্রার্থনা করা জায়েয হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে, মুসীবতের আবেদন করা না-জায়েয এবং এর জায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং মুসীবত থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শরীয়তসিদ্ধ। হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁর এবং অন্যান্য পয়গম্বরগণের উক্তি এটাই ছিল—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

অর্থাৎ, হে পালনকর্তা! আমাদেরকে দান করুন দুনিয়ার সৌন্দর্য এবং আখেরাতের সৌন্দর্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। কেননা, নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু একীন ছাড়া কেউ পায়নি। এখানে একীন অর্থ অন্তরের সুস্থতা, যাতে সন্দেহ ও অজ্ঞতার রোগ নেই। কেননা, অন্তরের সুস্থতা দৈহিক সুস্থতার চেয়ে উৎকৃষ্ট।

সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ বলেন ঃ সবর শোকরের চেয়ে উত্তম। কারও মতে শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ উভয়টি সমান। কয়েক জনের অভিমত এই যে, কোন কোন অবস্থায় সবর শ্রেষ্ঠ এবং কোন কোন অবস্থায় শোকর শ্রেষ্ঠ। এ সকল উক্তির প্রবক্তারা নিজ নিজ উক্তির পক্ষে অত্যন্ত অবিন্যস্ত দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল

হয় না। তাই এগুলোর অবতারণা না করে আসল সত্য প্রকাশ করাই উত্তম।

এ প্রসঙ্গে দু'প্রকার বক্তব্য পেশ করা যায়। এক, কেবল বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করা এবং অধিক ঘাঁটাঘাঁটিতে প্রবৃত্ত না হওয়া। এ ধরনের বক্তব্যই সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্যে উত্তম। কেননা, তাদের বোধশক্তি সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। বাহ্যিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, সবর উত্তম। যদিও শোকরের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস অনেক। কিন্তু সবরের ফযীলত তদপেক্ষাও বেশী পরিলক্ষিত হয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, যে পৃথিবীতে সর্বাধিক শোকরকারী ছিল। অতঃপর তাকে শোকরকারীদের সওয়াব প্রদান করা হবে। এরপর সর্বাধিক সবরকারীকে আহ্বান করে তাকে বলা হবে—আমি এই শোকরকারীকে যতটুকু সওয়াব দিয়েছি, ততটুকু তোমাকে দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে কি? সে বলবে ঃ অবশ্যই সন্তুষ্ট হব। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করবেন— তা হবে না। আমি তোমাকে নেয়ামত দিয়েছি। তুমি শোকর করেছ। তোমাকে মুসীবতে ফেলেছি। তুমি সবর করেছ। কাজেই আমি আজ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেব। কোরআন পাকে আছে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

অর্থাৎ, যে খাদ্য খেয়ে শোকর করে, সে সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে রোযা রাখে এবং সবর করে।

এতেও সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কেননা, শোকরের মাত্রা বৃদ্ধিকে সবরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবর শ্রেষ্ঠ না হলে এর সাথে শোকরের তুলনা করা হত না। অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) রাজত্বের কারণে সকলের

পরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর আমার সাহাবীগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ ধনাঢ্যতার কারণে সকলের পেছনে জান্নাতে যাবেন। এর বিপরীতে ফকীর ও মুসীবতগ্রস্তদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, জান্নাতের সকল দরজারই দুটি করে কপাট। কিন্তু সবর-দরজার কপাট একটিই। সর্বপ্রথম যে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে হবে মুসীবতওয়ালা। তাদের নেতা হবেন হযরত আইউব (আঃ)। এটা এমন বক্তব্য, যাতে সাধারণ মানুষ তুষ্ট হয়ে যায় এবং এতেই তাদের ধর্মীয় উপযোগিতা নিহিত।

দ্বিতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলেম ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিষয়সমূহের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা। সুতরাং আমরা বলি, দুটি অস্পষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোনরূপ তুলনা চলে না যে পর্যন্ত প্রত্যেকটির স্বরূপ স্পষ্ট না হয়ে যায়। স্পষ্ট হওয়ার পর যদি সে বিষয়দ্বয়ের বিভিন্ন প্রকার থাকে, তবে তাদের মধ্যেও সমষ্টিগতভাবে তুলনা চলে না; বরং প্রত্যেকটি প্রকারকে আলাদা আলাদা করে তুলনা করা অত্যাবশ্যক। সবর ও শোকরেরও অনেক প্রকার ও শাখা রয়েছে। তাই অস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হতে পারে না; বরং উভয়ের প্রত্যেকটি প্রকারকে পরস্পরে তুলনা করতে হবে।

সবর ও শোকর প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত—মারেফত (জ্ঞান), হাল ও আমল। এখন একটির মারেফতকে অপরটির হাল ও আমলের সাথে তুলনা করা যাবে না; বরং একটির হালকে অপরটির হালের সাথে, একটির মারেফতকে অপরটির মারেফতের সাথে এবং একটির আমলকে অপরটির আমলের সাথে তুলনা করা চলে। এতে পারস্পরিক মিল প্রকাশ পাবে এবং একারণে একটির শ্রেষ্ঠত্ব অপরটির উপর জানা যাবে। উদাহরণতঃ চক্ষু সম্পর্কে শোকরকারীর মারেফত হল চোখের নেয়ামতটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা এবং সবরকারীর মারেফত হল অন্ধত্বকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। সুতরাং এখানে শোকরের মারেফত ও সবরের মারেফত সমান সমান। একটির উপর অপরটির কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এটা তখন, যখন সবরের অর্থ বালা-মুসীবতে সবর নেয়া হয়। কিন্তু সবর কখনও এবাদতেও

হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে সবর ও শোকর একই হবে। কেননা, এবাদতে সবর করা হুবহু এবাদতে শোকরগুযারী করা। সুতরাং এখানেও একটির উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। বালা-মুসীবতে সবরের বিধান এই যে, মুসীবত বলা হয় নেয়ামত বিলুপ্ত হওয়াকে। চক্ষু একটি জরুরী নেয়ামত। এর বিলুপ্তিতে সবরের উদ্দেশ্য এজন্য অভিযোগ না করে আল্লাহর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং অন্ধত্বের কারণে কতক গোনাহের অনুমতি না চওয়া। অপরদিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির শোকর আমলের দিক দিয়ে এই যে, একে গোনাহের কাজে ব্যবহার করবে না বরং আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে। এই উভয় প্রকার শোকর সবর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উদাহরণতঃ অন্ধ ব্যক্তির সুন্দরী মহিলাদের থেকে সবর করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার উপর পতিত হলে সে যদি সবর করে, তবে সে চোখের নেয়ামতের শোকরকারী হবে। আর দ্বিতীয় বার দেখলে এই নেয়ামতের নাশোকরী হবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, সবর শোকরের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে আনুগত্যের কাজে চক্ষু ব্যবহার করলে আনুগত্যে সবর করা হবে।

মানুষ কখনও চোখের নেয়ামতের শোকর এভাবে আদায় করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার অদ্ভুত কারিগরী দেখে, যাতে এর মাধ্যমে মারেফত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ধরনের শোকর সবর অপেক্ষা উত্তম। নতুবা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) যিনি পয়গম্বরগণের মধ্যে চক্ষুষ্মান ছিলেন না, তাঁর মর্তব হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের মর্তবার চেয়ে বেশী হওয়া জরুরী হবে। কারণ, তিনি দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে সবর করেছিলেন, যা মূসা ও অন্য পয়গম্বরগণ করেননি, অথচ হযরত শোয়ায়ব (আঃ) -এর মর্তবা বেশী নয়।

মানুষ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তবে অতিরিক্তকে নেয়ামত বলা হবে। এর শোকর হল, তা দান-খয়রাতে ব্যয় করা— অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। এই শোকরকে সবরের সাথে তুলনা করলে শোকর হবে উত্তম। কেননা, এই শোকর সবরকেও নিজের মধ্যে শামিল রাখে। কারণ, এখানে সবরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতে সন্তুষ্ট হয়ে

ফকীরদের উপর ব্যয় করার কষ্ট সহ্য করা এবং বিলাসিতায় ব্যয় না করা। এরূপ শোকরের মধ্যে দুটি বিষয় বিদ্যমান। তার একটি হচ্ছে সবর। অতএব, সবর হচ্ছে শোকরের অংশ। সুতরাং শোকর বড় এবং সবর তার ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু যদি এই নেয়ামতকে গোনাহের কাজে ব্যয় না করে বৈধ ভোগবিলাসে ব্যয় করে শোকর করা হয়, তবে সবর শোকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবে এবং সবরকারী ফকীর এই ধনবানের তুলনায় উত্তম হবে। কোরআন ও হাদীসসমূহে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় এই বিশেষ স্তরের সবরই উদ্দেশ্য। কেননা, মানুষ নেয়ামতের অর্থ ধন-সম্পদ ভোগ করা, শোকরের অর্থ মুখে আলহামদু লিল্লাহ বলা এবং নেয়ামত দ্বারা গোনাহে সাহায্য না নেয়াকেই বুঝে। এটা কেউ বুঝে না যে, নেয়ামতকে কেবল এবাদতের কাজেই ব্যয় করতে হবে।

সারকথা, সাধারণ মানুষ যাকে সবর বলে, তা সেই শোকর অপেক্ষা উত্তম। হযরত জুনায়দ (রহঃ) এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ ধনশালীর প্রশংসা ধনের কারণে নয়, তেমনি ফকীরের তারীফ ধন না থাকার কারণে নয়; বরং তাদের নিজ নিজ অবস্থার জন্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো যথাযথ পালন করলেই তারা প্রশংসার যোগ্য হয়। কিন্তু ধনী অবস্থার শর্তসমূহ মনের অনুকূলে। এতে ভোগ, আনন্দ ইত্যাদি বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ফকীর অবস্থার শর্তসমূহ ফকীরের মনকে কষ্ট দেয়, তাকে আবদ্ধ ও ভগ্নোৎসাহ রাখে। বলা বাহুল্য, যখন তারা উভয়েই আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ নিজ অবস্থার শর্ত পালন করবে, তখন যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে রাখবে এবং ভগ্নোৎসাহ থাকবে, সে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, যে নিজেকে ভোগ-বিলাসে রাখবে। হযরত জুনায়দের এই বর্ণনাই বাস্তব সম্মত।

কথিত আছে, আবুল আব্বাস ইবনে আতা এ প্রশ্নে তাঁর বিপরীত বলতেন। তাঁর উক্তি ছিল, যে ধনী শোকর করে, সে সবরকারী ফকীরের চেয়ে উত্তম। এতে হযরত জুনায়দ তাকে বদদোয়া করেন। ফলে তিনি অনেক অনিষ্টের সম্মুখীন হন। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পুত্ররা

নিহত হয়। চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তিনি পাগলের মত জীবন যাপন করেন। নিজেই বলতেন ঃ জুনায়দের বদদোয়া আমার উপর লেগে গেছে। এরপর তিনি নিজ উক্তি প্রত্যাহার করে নেন এবং সবরকারী ফকীরকে ধনী শোকরকারীর উপর অগ্রাধিকার দিতে থাকেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন কোন অবস্থায় উভয় উক্তিই ঠিক। অর্থাৎ, অনেক সবরকারী ফকীর শোকরকারী ধনী অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু কখনও এর বিপরীত হয়। তবে সেই শোকরকারী ধনী উত্তম হয়, যে নিজেকে ফকীরের মত মনে করে এবং নিজের জন্যে যতটুকু ধন-সম্পদ প্রয়োজন, ততটুকু রেখে অবশিষ্ট ধন হয় খয়রাত করে দেয়, না হয় অভাবগ্রস্ত ও মিসকীনদের জন্যে রেখে দেয়। অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে এবং যখনই সুযোগ পায়, ব্যয় করে দেয়। এতে সে প্রতিপত্তি ও খ্যাতির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং আল্লাহর ওয়াস্তে গরীব-মিসকীনের হক আদায় করাই তার লক্ষ্য থাকে। এরূপ ধনী নিঃসন্দেহে সবরকারী ফকীর অপেক্ষা উত্তম।

সবর ও শোকর শব্দদ্বয়ের মধ্যে অসংখ্য আমল ও হাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদাহরণতঃ আল্লাহর নেয়ামতসমূহ উপর্যুপরি আসার কারণে বান্দার লজ্জিত হওয়া, নিজেকে শোকর আদায়ে অসমর্থ মনে করা, আল্লাহর সহনশীলতাকে উপলব্ধি করা, এ কথা স্বীকার করা যে, কোনরূপ অধিকার ছাড়াই নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি আসে, নেয়ামত পেয়ে বিনয় ও নম্রতা করা—এ সমস্ত বিষয় পৃথক পৃথক শোকর। যে ব্যক্তি নেয়ামতের মাধ্যম হয়, তার শোকর করাও আল্লাহর শোকরের নামান্তর। যেমন হাদীসে আছে— مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ অর্থাৎ, যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহর শোকর করে না।

অনুরূপভাবে নেয়ামতদাতার সামনে আদবসহকারে থাকাও শোকর এবং নেয়ামতকে উত্তমরূপে গ্রহণ করাও শোকরের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শোকর। অতএব, বিশেষ প্রকারের শোকর ও সবর উদ্দেশ্য না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর একটিকে অপরটির উপর মোটামুটিভাবে কেমন করে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে?

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন—আমি এক সফরে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ যৌবনের শুরুতে আমি আমার চাচাত বোনের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ছিলাম। সেও আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। অবশেষে তার বিবাহ আমার সাথেই সম্পন্ন হল। বাসর রাতে আমি তাকে বললাম ঃ এসো, এ রাত্রি আমরা শোকরানার নফল নামায পড়ে কাটিয়ে দেই। আল্লাহ্ আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন, এজন্যে তাঁর শোকর করা দরকার। সেমতে আমরা উভয়েই সে রাত্রি নামাযে কাটিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় রাত্রিতেও আমরা আগের রাত্রির মত কথাবার্তা বললাম এবং সারারাত শোকরগুযারীতে কাটিয়ে দিলাম। এরপর আমার বয়সের আশি বছর পার হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা অদ্যাবধি সেই শোকরগুযারীর হালেই আছি। আমাদের মধুমিলন সম্ভব হয়নি। আমি ঘটনা সত্য কি না, বৃদ্ধাকেও জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা বলল ঃ বাস্তব ঘটনা তাই, যা আমার স্বামী বলেছে।

এখন লক্ষণীয় যে, যদি তাদের বিবাহ না হত এবং বিরহে সবর করতে হত, তবে তাদের সবরকে তাদের এই শোকরের সাথে তুলনা করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে, এই শোকর সবরের চেয়ে উত্তম। মোটকথা, জটিল বিষয়াদির স্বরূপ সবিস্তার বর্ণনা ছাড়া উদঘাটিত হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খওফ ও রিজা

(ভয় ও আশা)

জানা উচিত যে, খওফ ও রিজা দুটি পাখা, যাতে ভর করে নৈকট্যশীল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মকাম পর্যন্ত উড্ডয়ন করে, অথবা এগুলোকে সওয়ারী বলা যায়, যাতে সওয়ার হলে আখেরাতের প্রতিটি দুর্গম পথ অবিক্রান্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আল্লার নৈকট্য, চিরন্তন সুখ-শান্তি এবং খোদায়ী সন্তুষ্টির সুশোভিত উদ্যান অনেক দূর-দূরান্তে অবস্থিত এবং অপ্রিয় কর্ম ও শারীরিক মেহনত দ্বারা আবৃত। "রিজা" তথা আশার আলোকবর্তিকা ছাড়া কারও পক্ষে সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে জাহান্নামের অগ্নিশিখা সূক্ষ্ম কাম-প্রবৃত্তি এবং অদ্ভুত আনন্দ ও ভোগের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। "খওফ" তথা ভয়ের চাবুক ছাড়া কেউ এ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নয়। তাই খওফ ও রিজার স্বরূপ এবং পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর সমন্বয়ের পন্থা বর্ণনা করা নেহায়েত জরুরী। নিম্নে দুটি পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রিজা

রিজা হচ্ছে অধ্যাত্মপথের পথিক ও সাধকগণের অন্যতম মকাম ও হাল। মকাম ও হালের পার্থক্য এই, যখন কোন গুণ সাধকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কায়েম ও স্থায়ী হয়ে যায়, তখন তাকে মকাম বলা হয়। আর যদি কোন গুণ অর্জিত হওয়ার পর স্থায়ী না হয় এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, তবে তাকে হাল বলা হয়। অন্তরের এ অবস্থাটি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান।

রিজার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে—এলম, হাল ও আমল। এলম থেকে হাল এবং হাল থেকে আমল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কেবল হালকেই রিজা বলা হয়। এর ব্যাখ্যা এই, মানুষের প্রিয় অথবা অপ্রিয়বস্তু অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যত— এই তিন কালের মধ্য থেকে কোন না কোন এক কালে অস্তিত্ব লাভ করবে। যদি অতীত কালে অস্তিত্বপ্রাপ্ত কোন বস্তুর ধ্যান অন্তরে আসে, তবে তাকে "যিকর ও তাযাক্কুর" (স্মরণ করা) বলা হয়। অন্তরে আসা বস্তু যদি বর্তমান কালে বিদ্যমান থাকে, তবে তাকে "ওজদ" (বিভুচিন্তায় মূর্ছাগত হওয়া) ও "খওফ" ভয় বলা হয়। আর যদি অন্তরে কোন বস্তুর শংকা ভবিষ্যত কালে হয় এবং তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে তার নাম হয় "ইন্তেযার" ও "তাওয়াক্কু" (অপেক্ষা ও আশা)। যে বস্তুর অপেক্ষা করা হয়, তা যদি অশুভ হয় এবং মানসিক ব্যথার কারণ হয়, তবে তাকে বলা হয় "খওফ" (ভয়)। পক্ষান্তরে যদি সেই বস্তু প্রিয়, সুখকর ও আনন্দদায়ক হয়, তবে এই সুখ অর্জন করাকে বলা হয় "রিজা"। অতএব, রিজার সংজ্ঞা হচ্ছে, যে বস্তু আন্তরিকভাবে প্রিয়, তার অপেক্ষায় অন্তরের আনন্দিত হওয়া।

বলা বাহুল্য, প্রিয় বস্তুর আশা করার কিছু কারণও থাকবে। যদি এ কারণে আশা করে যে, তার কাছে তার অধিকাংশ উপকরণ মওজুদ আছে,

তবে এরূপ আশা করাকে রিজা বলা সঠিক। আর যদি উপকরণ কিছু না থাকে অথবা অকেজো উপকরণ থাকে, তবে এ আশাকে ধোকা ও বোকামি বলাই উচিত। যদি উপকরণের অস্তিত্ব জানা না থাকে এবং উপকরণ না থাকার বিষয়টিও জানা না থাকে, তবে এরূপ আশা ও অপেক্ষাকে "তামান্না" বলা হয়। মোটকথা, যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয়, এমন বিষয়ের জন্যে রিজা প্রযোজ্য হয়। আর যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত, তার বেলায় রিজা প্রয়োগ করা হয় না। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের সময় আমরা বলি না যে, আমরা সূর্যোদয়ের রিজা তথা আশা করছি এবং সূর্যাস্তের সময় বলি না যে, আমরা সূর্য ডুবে যাবে বলে খওফ তথা আশংকা করছি। কেননা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নিশ্চিত বিষয়। হাঁ, এটা বলা যায় যে, বৃষ্টি বর্ষণের আশা করা যায় এবং খরার আশংকা আছে।

অধ্যাত্মবিদদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, অন্তর মৃত্তিকাসদৃশ, ঈমান যেন বীজ এবং ইবাদত ও সৎকর্ম হালচাষ করা ও খাল কেটে পানি সেচনের ব্যবস্থা করার ন্যায়। লোভী ও দুনিয়ায় নিমজ্জিত অন্তর লবণাক্ত ভূমির ন্যায়, যাতে বীজ গজায় না। আখেরাত হচ্ছে শস্য কাটার দিন। দুনিয়াতে যে যা কিছু বপন করবে, আখেরাতে সে তাই কাটবে। লবণাক্ত ভূমিতে যেমন বীজের ফলন হয় না, তেমনি অন্তরে ভ্রষ্টতা ও অসচ্চরিত্রতার উপস্থিতিতে ঈমানরূপী বীজ কমই ফলপ্রসূ হয়। যে বান্দা মাগফেরাতের আশা করে, তার অবস্থা ক্ষেতের মালিকের মতই মনে করা উচিত। যদি কোন কৃষক উর্বর ভূমি বেছে নেয়, তাতে পয়লা নম্বরের বীজ বপন করে, সময়মত পানি দেয় এবং আগাছা, কাঁটা ইত্যাদি বেছে দেয়, এরপর আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর আশা করে, তবে তার এই আশাকে রিজা বলা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করার পর তার কোন খবর না নেয় এবং ঘরে বসে শস্য পাওয়ার অপেক্ষা করে, তবে তার এই অপেক্ষাকে রিজা বলা হবে না; বরং নির্বুদ্ধিতাই বলা হবে। এ থেকে জানা গেল যে, রিজা কেবল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপেক্ষাকে বলা হয়, যাতে বান্দার এখতিয়ারাধীন সকল উপায়-উপকরণ বান্দার পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়ে যায়, কেবল তাই বাকী থাকে, যা তার এখতিয়ারাধীন নয়।

অনুরূপভাবে বান্দা যদি অন্তরের শস্যক্ষেত্রে ঈমানের বীজ বপন করে, একে ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সিঞ্চন করে, অসচ্চরিত্রতার আগাছা ও কাঁটা থেকে পরিষ্কার রাখে, এরপর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং মঙ্গলজনক জীবনাবসানের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষাকে সত্যিকার রিজা বলা হবে। এ রিজার জন্যে ঈমানের যে সকল উপায়-উপকরণ দ্বারা মাগফেরাত পূর্ণতা লাভ করে, সেগুলো আমৃত্যু পালন করে যাওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ঈমানের বীজ বপন করার পর কোন খবর না নেয়, ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সিঞ্চন না করে, অন্তর কুস্বভাব দ্বারা পরিপূর্ণ রাখে, পার্থিব আনন্দ-উল্লাসের অন্বেষণে নিমজ্জিত থাকে, এরপর মাগফেরাতের অপেক্ষায় থাকে, তবে এই অপেক্ষা বোকামি ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই হবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنّٰي عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ, বোকা সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে আপন খেয়াল-খুশীর অনুগামী করে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের বাসনা করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ـ

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের স্থলে এমন অপদার্থরা আগমন করল, যারা নামাযকে বরবাদ করে দিল এবং কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তারা লাভ করবে পথভ্রষ্টতা।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ـ

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের স্থলে আল্লাহর কিতাবের নালায়েক উত্তরাধিকারীরা আসল। তারা এই হীন জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করত এবং বলত, আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

কোরআন পাকে উদ্যানের মালিকের নিন্দায় বলা হয়েছে যে, সে যখন উদ্যানে গমন করল, তখন বলল ঃ

مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ـ

অর্থাৎ, আমার মনে হয় না যে, এই উদ্যান কোনদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত কায়েম হবে। যদি আমি রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে আমি সেখানে এর চেয়ে উত্তম বস্তু পাব।

মোটকথা, যে বান্দা এবাদত ও আনুগত্যে সচেষ্ট হয় এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে, সে আল্লাহর কাছে নেয়ামত পূর্ণ হওয়ার আশা করার যোগ্য। কিন্তু গোনাহগার যদি তওবা করে এবং কৃত ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নেয়, তবে তওবা কবুল হওয়ার আশা করা তার জন্যে শোভনীয়। কারণাদি পোক্তা হলেই রিজা তথা আশা হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰۤئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করতে পারে।

এর অর্থ এই, তারাই রহমত আশা করার যোগ্য। এই অর্থ নয় যে, আশা কেবল তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। কেননা, আশা অন্যরাও করে, যাদের মধ্যে বর্ণিত গুণাবলী নেই।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আমার মতে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা

হচ্ছে মাফ হওয়ার আশায় অনুতাপ ছাড়াই একের পর এক গোনাহ্ করে যাওয়া, এবাদত না করেই খোদায়ী নৈকট্য আশা করা, অগ্নির বীজ বপন করে জান্নাতের প্রতীক্ষা করা, গোনাহের বিনিময়ে আনুগত্যশীলদের মকাম অন্বেষণ করা এবং আমল ছাড়াই সওয়াবের প্রত্যাশা করা।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, রিজা এলমের এমন একটি অবস্থা, যা অধিকাংশ উপকরণ অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা দাবী করে যে, অবশিষ্ট উপকরণগুলো অর্জন করার ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণতঃ উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যার বীজ ভাল হবে, ভূমিও উর্বর হবে এবং পানিও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে, তার রিজা সাচ্চা হবে। এই রিজা তাকে ক্ষেতের খবরদারী করতে, আগাছা পরিষ্কার করতে, পরিচর্যায় অলসতা না করতে এবং শস্য কাটার সময় পর্যন্ত দেখা-শুনা অব্যাহত রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর কারণ এই যে, রিজার বিপরীত হচ্ছে নৈরাশ্য। নৈরাশ্যে এই দেখা-শুনা হতে পারে না। উদাহরণতঃ যে জানে যে, তার ভূমি লবণাক্ত, পানি পৌঁছানোও সুকঠিন এবং বীজ কখনও অংকুরিত হবে না, সে কখনও চাষাবাদে সম্মত হবে না এবং দেখা-শুনার কষ্টও সহ্য করবে না। নৈরাশ্য আমল থেকে বিরত রাখে এবং রিজা আমলে উৎসাহিত করে। রিজাকারী রিজার ফলশ্রুতিতে সর্বদা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকার মধ্যে আনন্দ পায়, মোনাজাতে স্বস্তি পায় এবং নম্রতা সহকারে আল্লাহর খোশামোদ করতে থাকে। এসব বিষয় সেই ব্যক্তির মধ্যেও প্রকাশ পায়, যে দুনিয়াতে কোন বাদশাহের কাছে রিজা করে। অতএব, সত্যিকার বাদশাহ্ আল্লাহর কাছে রিজা রাখার মধ্যে প্রকাশ পাবে না কেন? যদি প্রকাশ না পায়, তবে বুঝতে হবে যে, এই ব্যক্তি রিজার মকাম থেকে এখনও বঞ্চিত এবং প্রতারণার গর্তে পতিত।

হযরত যায়দ খায়ল বর্ণনা করেন; আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম—আমি জানতে চাই যে, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তার মধ্যে এর কি পরিচয় রাখেন এবং যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আলামত কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার অবস্থা কি? আমি আরয করলাম ঃ আমার অবস্থা এই যে, আমি সৎকর্ম-পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসি। যখন কোন সৎকর্ম করতে সক্ষম হই,

তখন যথাশীঘ্র তা সম্পাদন করে ফেলি এবং এর সওয়াবের বিশ্বাস রাখি। কোন সৎকাজের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলে তজ্জন্যে দুঃখ করি এবং তার আগ্রহ রাখি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ এটাই সেই ব্যক্তির পরিচয়, যার কল্যাণ আল্লাহ তা'আলা করতে চান। আল্লাহ্ তোমার জন্যে অন্য কিছু চাইলে তার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত করতেন এবং তুমি কোন্ বনে হারিয়ে গেছ, তার কোন পরওয়া করতেন না। এই হাদীসে সৎলোকদের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করে, অথচ তার মধ্যে এসব আলামত নেই, সে প্রতারিত।

রিজার ফযীলত ঃ রিজা সহকারে আমল করা খওফ সহকারে আমল করার চেয়ে উত্তম ও শ্রেয়। কেননা, সেই বান্দাই আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়, যে আল্লাহর সাথে সর্বাধিক মহব্বত রাখে। বলা বাহুল্য, রিজা দ্বারা মহব্বত বেশী হয়। উদাহরণতঃ দু'জন বাদশাহের মধ্যে মানুষ একজনের সেবা তার ভয়ে করে এবং অপরজনের সেবা তার অনুগ্রহ লাভের আশায় করে। এমতাবস্থায় শেষোক্ত বাদশাহের প্রতিই মহব্বত বেশী হবে। এ কারণেই শরীয়তে রিজা সম্পর্কে বিশেষত মৃত্যুর সময় অনেক উৎসাহবাণী বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

এখানে নৈরাশ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর হযরত এয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন—তুমি জান আমি তোমার মধ্যে ও ইউসুফের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর কেন খাড়া করেছি? এর কারণ এই যে, তুমি বলেছিলে—

وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ

অর্থাৎ, আমার ভয় হয় যে, তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলবে।

তুমি বাঘের ভয় করলে কেন? আমার কাছে রিজা করলে না কেন?

তুমি ইউসুফ ভ্রাতাদের অসাবধানতার প্রতি নযর দিয়েছ এবং আমার হেফাযতের কথা ভেবে দেখনি।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ, তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, সে যেন আল্লাহ্র প্রতি সুধারণাই রাখে।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ فَلْيَظُنَّ بِىْ مَاشَاءَ

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার ধারণার সাথে থাকি। অতএব, সে আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ধারণা রাখুক।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির কাছে তার অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় গমন করলেন এবং বললেন ঃ এখন তোমার অবস্থা কি? সে আরয করল ঃ আপন গোনাহের জন্যে ভয় করি এবং আল্লাহর রহমতের আশা করি। তিনি বললেন ঃ এ সময়ে যে বান্দার অন্তরে এ দুটি বিষয় (আশা ও ভয়) একত্রিত থাকে, আল্লাহ তাকে তার ঈপ্সিত বস্তু দান করেন এবং যে বিষয়কে সে ভয় করে, তা থেকে নিরাপদে রাখেন।

জনৈক ব্যক্তি অনেক গোনাহের ভয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাকে বললেন ঃ তোমার এই নিরাশ হওয়াটা তোমার সকল গোনাহের চেয়ে বড় গোনাহ।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে এটা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর ক্ষমতা দিয়েছেন, অতঃপর সে মার্জনার আশা রাখে, আল্লাহ তাকে মার্জনা করবেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের দোষ এভাবে বর্ণনা করেছেন—

ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি যে ধারণা রাখতে, সেই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে।

আরও বলা হয়েছে—

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

অর্থাৎ, তোমরা খারাপ ধারণা করলে। বস্তুত তোমরা ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায় ছিলে।

হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন ঃ এর কি কারণ ছিল যে, তুমি মন্দ কাজ দেখে নিষেধ করনি? তখন যদি আল্লাহ তাকে সঠিক জওয়াবের তাওফীক দেন, তবে সে বলবে—ইলাহী! আমি তোমার কাছে রিজা এবং মানুষকে খওফ করেছিলাম। আল্লাহ পাক বলবেন ঃ আমি তোমার অপরাধ মাফ করলাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ -

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে— যা কখনও বিপর্যস্ত হবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বললেন ঃ আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, ক্রন্দন করতে বেশী, বনে-জঙ্গলে বুকে করাঘাত করে ফিরতে এবং আপন রবের দরবারে চীৎকার করতে। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন যে, তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে কেন? অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে রিজা ও আগ্রহের কথাবার্তা বললেন।

আব্বান ইবনে আবী আইয়াশ অধিকাংশ সময় মানুষকে আশার বাণী শুনাতেন। তাকে মৃত্যুর পর লোকেরা স্বপ্নে দেখল যে, তিনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে নিজের সাথে খাড়া করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এ ধরনের কথাবার্তা কেন বলতে? আমি আরয করলাম ঃ আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে দেই। তখন আল্লাহ বললেন ঃ যাও

আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এক হাদীসে আছে—বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মানুষকে নিরাশ করত এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে বলবেন—তুই যেমন আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করেছিস, তেমনি আমি তোকে আজ আমার রহমত থেকে নিরাশ করব।

রিজা লাভের উপায় ঃ রিজার প্রয়োজন দু'ব্যক্তির। এক, যার উপর নৈরাশ্য প্রবল, ফলে সে এবাদত বর্জন করে বসে আছে। দ্বিতীয়, যার উপর খওফ তথা ভয় প্রবল, ফলে, সে এবাদতে বাড়াবাড়ি করে নিজের ও গৃহবাসীদের ক্ষতি করে। এই উভয় ব্যক্তি সমতার সীমা অতিক্রম করে স্বল্পতা ও বাহুল্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাদের এমন চিকিৎসার প্রয়োজন, যা দ্বারা তারা সমতার সীমায় ফিরে আসে।

কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহে প্রতারিত হয়ে আল্লাহর কাছে আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয়ে গোনাহেই ডুবে থাকে, তার জন্যে রিজা বিষতুল্য। এরূপ প্রতারিত ব্যক্তির জন্যে ভয় ও ভয় উৎপাদনকারী বিষয়সমূহ ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই। অতএব, যারা মানুষের মধ্যে ওয়ায-নসীহত করে, তাদের উচিত রোগের কারণ জেনেশুনে উপযুক্ত চিকিৎসা করা। তারা যেন এরূপ চিকিৎসা না করে, যা দ্বারা রোগ আরও বেড়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আলেম সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না করে এবং আযাব থেকে নির্ভীক না বানায়। আমরা রিজার যে সকল উপকরণাদি বর্ণনা করি, সেগুলো নিরাশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্যে বর্ণনা করি অথবা এমন ব্যক্তির জন্যে, যার উপর ভয় প্রবল। কোরআন পাক ও হাদীস শরীফও তাই দাবী করে। কেননা, উভয়ের মধ্যে খওফ ও রিজা পাশাপাশি দেখা যায়। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীসে সকল প্রকার রোগীদের আরোগ্য লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে, যাতে পয়গম্বরগণের ওয়ারিস আলেমগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করে, যেমন বিচক্ষণ চিকিৎসক করে থাকে এবং বোকাদের মত চিকিৎসা না করে। বোকারা এই ধারণায় লিপ্ত যে, প্রত্যেক ঔষধই প্রত্যেক রোগের উপযোগী।

রিজা প্রবল করার উপায়সমূহের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে এরূপ—চিন্তা

করা যে, দুনিয়াতে মানুষের টিকে থাকার জন্যে যে সকল বস্তু জরুরী ছিল, সেগুলো সব আল্লাহ তা'আলা সরবরাহ করেছেন, যেমন খাওয়ার যন্ত্রপাতি, কাজ করার হাতিয়ার, যেমন অঙ্গুলি, নখ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি সাজসজ্জার সামগ্রীও দান করেছেন, যেমন ভ্রূ বক্র করেছেন, চোখে কয়েক প্রকার রঙ দিয়েছেন এবং ওষ্ঠ লাল করেছেন। এসব বস্তু না থাকলেও মানবিক উদ্দেশ্যে কোন ত্রুটি দেখ দিত না— কেবল সৌন্দর্য বিনষ্ট হত। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে মানুষ এগুলোও লাভ করেছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদের প্রতি এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুগ্রহ দানেও ত্রুটি করেননি এবং বাড়তি সাজসজ্জা, প্রয়োজন ও স্থায়িত্বের বস্তুসমূহ তাদের হাতছাড়া হতে দেননি, তখন তিনি তাদেরকে চিরন্তন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে সম্মত হবেন কেমন করে?

রিজা প্রবল করার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে রিজা সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস ও বুযুর্গদের উক্তিসমূহ তালাশ করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে অনেক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

অর্থাৎ, বলে দিন হে আমার সে সকল বান্দা, যারা নিজেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ -

অর্থাৎ, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে রয়েছে, তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, তিনি দোযখকে দুশমনদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন

এবং এর মাধ্যমে নিজের প্রিয় বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন। সেমতে বলা হয়েছে—

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ـ

অর্থাৎ, তাদের জন্যে রয়েছে উপরের দিক থেকে আগুনের ছায়া এবং নিচের দিক থেকে আগুনের তাপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন।

আরও বলা হয়েছে—

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ, সে আগুনকে ভয় কর, যা তৈরি হয়েছে কাফেরদের জন্যে।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ـ

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে একটি জ্বলন্ত আগুনের খবর শুনিয়ে দিলাম। এতে চরম হতভাগ্যই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

فَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাদের জন্যে ক্ষমাশীল।

বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) সর্বদা উম্মতের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতেন। অবশেষে তাঁর প্রতি উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় এখনও কি আপনি সন্তুষ্ট নন?

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হবেন। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও দোযখে থাকে, তবে আমি সন্তুষ্ট হব না।

হযরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেন ঃ তোমরা ইরাকবাসীরা

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

আয়াতখানিকে কোরআন মজীদের সর্ববৃহৎ আশার আয়াত বলে থাক, আর আমরা নবী পরিবারের লোকজন এ আয়াতকে সর্বাধিক আশার আয়াত বলে থাকি— وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ الخ

রিজা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু মূসার বর্ণনায় রসূলে করীম (সাঃ) বলেন—আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। আখেরাতে এই উম্মতকে আযাব দেয়া হবে না। তাদের কুকর্মের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই ভূমিকম্প ও অন্যান্য আপদ দ্বারা দিয়ে দেন। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি কিতাবধারীদের মধ্য থেকে একজনকে পাবে। বলা হবে, তোমার জন্যে দোযখের অগ্নির "ফেদিয়া" (বিনিময়) এই ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে এভাবে বলা হয়েছে—এই উম্মতের প্রত্যেকেই ইহুদী ও খৃস্টানকে আনবে এবং বলবে দোযখের অগ্নির জন্যে এই ব্যক্তি আমার বিনিময়। এরপর সে ইহুদী ও খৃস্টানকে দোযখে নিক্ষেপ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

وَالْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَهِىَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশ বিশেষ। এটা জাহান্নাম থেকে মুমিনের অংশ।

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ـ

অর্থাৎ, কিয়ামতে আল্লাহ নবী ও তাঁর সাথে মুমিনদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সাঃ)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন যে, এই উম্মতের হিসাব আমি আপনার হাতে সোপর্দ করছি। নবী (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী, এরূপ করবেন না। আমার তুলনায় আপনিই তাদের জন্যে উত্তম। আদেশ হল ঃ এখন আমি তাদের ব্যাপারে আপনাকে লাঞ্ছিত করব না।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানালেন যে, আমার উম্মতের গোনাহসমূহের হিসাব আমার কাছে সোপর্দ করুন, যাতে তাদের গোনাহ সম্পর্কে আমাকে ছাড়া কেউ অবহিত না হয়। প্রত্যুত্তরে বলা হল ঃ তারা আপনার তো কেবল উম্মত, কিন্তু আমার বান্দা। আমি তাদের প্রতি আপনার তুলনায় অধিক মেহেরবান। অতএব, তাদের হিসাব আমার ছাড়া কারও হাতে দেব না, যাতে তাদের গোনাহ সম্পর্কে আপনিও অবগত না হোন এবং অন্য কোন ব্যক্তি জানতে না পারে। সোবহানাল্লাহ।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের জন্য উত্তম। জীবদ্দশায় আমি তোমাদের জন্যে শরীয়তের পথ উদঘাটিত করি, আর আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হবে। তখন তোমাদের উত্তম আমলসমূহের জন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করব এবং মন্দ আমলসমূহের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব।

এক হাদীসে আছে— যখন বান্দা কোন গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ দেখ আমার বান্দা গোনাহ করেছে, এরপর ভেবেছে, তার একজন প্রভু আছে, যিনি গোনাহ মাফ করেন এবং শাস্তিও দেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

এক হাদীসে কুদসীতে আছে—বান্দার গোনাহ যদি আকাশচুম্বীও হয়, তবে যতক্ষণ সে ক্ষমা চাইবে এবং আমার কাছে রিজা রাখবে, আমি ক্ষমা করে দেব। এক হাদীসে আছে, যখন মানুষ গোনাহ করে, তখন ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত ফেরেশতা তা আমলনামায় লেখে না। এই সময়ের মধ্যে যদি সে তওবা ও এস্তেগফার করে নেয়, তবে সে গোনাহ লেখাই হয় না। নতুবা একটি পাপ লিখে নেয়া হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন —যখন বান্দা গোনাহ করে, তখন তা তার আমলনামায় লেখা হয়। জনৈক বেদুইন বলল ঃ যদি সে তওবা করে? তিনি বললেন ঃ তবে মিটিয়ে ফেলা হয়। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ যদি পুনরায় গোনাহ্ করে? তিনি বললেন ঃ তবে তার আমলনামায় লিখে নেয়া হয়। বেদুইন আরয করল ঃ যদি সে তওবা করে নেয়? তিনি বললেন ঃ তবে আমলনামা থেকে আবার মিটিয়ে

ফেলা হয়। বেদুইন বলল ঃ এটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ সে তওবা করতে থাকবে। বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনায় ক্লান্ত না হয়, আল্লাহ্ সে পর্যন্ত ক্ষমা করার কাজে অস্থির হন না। এরপর যখন বান্দা পুণ্যকাজের ইচ্ছা করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা তা বাস্তবায়নের পূর্বেই একটি পুণ্য লিখে নেয়। যদি সে ইচ্ছার পর তা বাস্তবায়নও করে, তবে সেই ফেরেশতা দশটি পুণ্য লিখে নেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন মানুষ গোনাহ্ করার ইচ্ছা করে, তখন বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত কিছুই লেখা হয় না। বাস্তবায়ন করলে একটি পাপই লেখা হয়। অতঃপর আল্লাহ্র কৃপায় তা মাফও হয়ে যেতে পারে।

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলতে লাগল ঃ আমি এক মাসের বেশী রোযা রাখি না এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত নামায পড়ি না। আমার ধন-সম্পদে সদকা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কিছুই ফরয নয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পর আমি কোথায় থাকব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ জান্নাতে। লোকটি আরয করল ঃ আপনার সাথে? তিনি মুচকি হেসে বললেন ঃ হাঁ, আমার সাথে এই শর্তে যে, তুমি অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে হেফাযতে রাখবে, জিহ্বাকে গীবত ও মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং চক্ষুকেও দুটি বিষয় থেকে বিরত রাখবে। এক, আল্লাহ্র হারাম করা বস্তুসমূহ দর্শন এবং দুই, কোন মুসলমানকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা। যদি এ সব বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, তবে আমার সাথে একত্রে এবং আমার এই দু' হাতের তালুতে তুমি জান্নাতে যাবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে গৌরব ও মাহাত্ম্য দান করেছেন। যদি কেউ এর এক একটি পাথর আলাদা করে দেয়, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেয়, তবে ততটুকু গোনাহ্ হবে না, যতটুকু আল্লাহ্র একজন ওলীকে হেয় করার কারণে হয়। প্রশ্ন হল—আল্লাহ্র ওলী কারা? তিনি বললেন ঃ ঈমানদার সকলেই আল্লাহ্র ওলী। তুমি কি আল্লাহ্র এই উক্তি শুননি?

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ, আল্লাহ ঈমানদারদের ওলী। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয় কিয়ামতের ভূকম্পন একটি মহা ঘটনা।

অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান এটা কোন্ দিন? এটা সেই দিন, যখন আদম (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হবে—দাঁড়াও এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে দোযখের রসদ বের কর। তিনি আরয করবেন ঃ কি পরিমাণ বের করব? নির্দেশ হবে—এক হাজারের মধ্য থেকে একজনকে জান্নাতের জন্যে এবং অবশিষ্ট নয়শ' নিরানব্বই জনকে দোযখের জন্যে বের কর। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে গেলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করলেন। সেদিন কোন কাজেই তাদের মন বসল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা কাজ করছ না কেন? তারা বললেন ঃ আপনার মুখে সেই হাদীস শোনার পর কাজ করার সাধ্য কারও নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অন্যান্য কওমের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা কত, তা বোধ হয় তোমাদের জানা নেই। কওম তো এত বেশী, যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তাদের সামনে তোমাদের কোন গণনাই হতে পারে না। তাদের সকলের তুলনায় তোমরা যেন কাল বলদের চামড়ায় একটি সাদা চুল কিংবা ঘোড়ার পায়ে অন্য রঙের চিহ্ন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে খওফের চাবুক দিয়ে কিভাবে হাঁকাতেন এবং তারপর রিজার লাগাম টেনে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে নিয়ে আসতেন। তিনি প্রথমে ভয়ের চাবুক দিয়ে হাঁকিয়েছেন; কিন্তু যখন জানতে পারলেন, ভয়ের আতিশয্য তাদেরকে সীমার বাইরে নিয়ে গেছে এবং তারা নৈরাশ্যের গহ্বরে পড়ে গেছেন, তখন অনতিবিলম্বে আশার ঔষধি প্রয়োগ করে তাদের চিকিৎসা করলেন।

এক হাদীসে আছে, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে আল্লাহ তা'আলা অন্য লোক সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহ করবে এবং ক্ষমা পাবে। কেননা, তাঁর সত্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। এক হাদীসে আছে, যদি তোমরা

গোনাহ্ না কর, তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি এমন বিষয়ের আশংকা করি, যা গোনাহের চেয়েও মারাত্মক। প্রশ্ন হল ঃ সে বিষয়টি কি? তিনি বললেন ঃ আত্মম্ভরিতা। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর একশ' রহমতের মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখেছেন এবং একটি মাত্র রহমত দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন। এই এক রহমতের কারণেই সমগ্র মানবজাতি একে অপরের প্রতি রহম করে। জননী তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্তু তাদের বাচ্চাদের আদর করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ এই এক রহমতকে সেই নিরানব্বই রহমতের সাথে যোগ করে সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক রহমত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমপরিমাণ হবে। এহেন রহমতের উপস্থিতিতে সেদিন নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন— তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে অথবা দোযখ থেকে পরিত্রাণ দেবে। (অর্থাৎ রহমত ছাড়া আমল কোন উপকারী হবে না।) লোকেরা আরয করল ঃ আপনিও কি তেমনি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমার অবস্থাও তদ্রূপ যে পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত আমাকে আবৃত করে না নেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে—আমি আমার শাফায়াত উম্মতের গোনাহের জন্যে গোপন রেখেছি। শাফায়াত কেবল মুত্তাকী ও আনুগত্যশীলদের জন্যেই নয়; বরং গোনাহ্গারদের জন্যেও।

এখন রিজা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি শোনা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে গোপন রাখেন, তাঁর কৃপা এটা চায় না যে, তার গোনাহের পর্দা আখেরাতে খুলে দেবেন। আর যে ব্যক্তি গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যায়, আল্লাহ্র সুবিচার এটা চায় না যে, আখেরাতে পুনরায় সে শাস্তি ভোগ করুক। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ আমার হিসাব যদি আমার পিতা-মাতার হাতেই সমর্পণ করা হয়, তবু আমি ভাল মনে করি না। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি পিতামাতার চেয়েও অধিক মেহেরবান। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ ঈমানদার যখন অবাধ্যতা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার অপরাধ ফেরেশতাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দেন, যাতে তারা অপরাধ দেখে সাক্ষী না হয়ে যায়।

মোহাম্মদ ইবনে মুসয়িব এক পত্রে আসওয়াদ ইবনে সালেমকে লিখেন—যখন বান্দা নিজের প্রতি যুলুম করে, এরপর "ইয়া রব" বলে হাত উঠায়, তখন ফেরেশতারা তার আওয়াজ ফিরিয়ে রাখে। দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার তাই করে। এরপর বান্দা যখন চতুর্থ বার "ইয়া রব" বলে ডাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ফেরেশতাগণ, আমার বান্দার আওয়াজ আমার কাছে কতক্ষণ গোপন রাখবে? আমার বান্দা জেনে নিয়েছে যে, তার জন্যে আমার ছাড়া কোন পরওয়ারদেগার নেই, যে গোনাহ মাফ করতে পারে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ এক রাত্রিতে একা একা কা'বা গৃহের তওয়াফ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রাত্রিটি ছিল অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন। আমি মুলতাযামে কা'বার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বললাম ঃ ইলাহী, আমাকে গোনাহ থেকে হেফাযতে রাখ। আমি কখনও যেন তোমার নাফরমানী না করি। তৎক্ষণাৎ এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—হে ইবরাহীম, তুমি আমার কাছে নিষ্পাপতার প্রার্থনা করছ। ঈমানদার মাত্রই এটা চায়। কিন্তু আমি যদি সবাইকে নিষ্পাপ করে দেই, তবে আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা কার জন্যে থাকবে? হযরত হাসান বসরী বলতেন ঃ ঈমানদার যদি গোনাহ না করে, তবে অদৃশ্য জগত ও আসমানী রহস্যসমূহের মধ্যে উড়ে ফিরবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা গোনাহের কারণে তার পাখা ছিঁড়ে দিয়েছেন।

হাদীসে এয়ামনে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে ভাই ভাই ছিল। তাদের একজন গোনাহগার, অপরজন আবেদ। আবেদ সর্বদা গোনাহগার ভাইকে উপদেশ দিত ও তিরস্কার করত। সে উত্তরে বলত—আমি জানি আর আমার পরওয়ারদেগার জানে। তুমি আমার উপর দারোগা নিযুক্ত হওনি। একদিন আবেদ তাকে কবীরা গোনাহ করতে দেখে ফেলল। আবেদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ আল্লাহ তোকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই গোনাহগারকে কিয়ামতের দিন বলবেন— কারও সাধ্য নেই যে, আমার রহমত আমার বান্দা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যা, আমি তোকে ক্ষমা করলাম। আর আবেদকে বলবেন—তোর জন্যে আমি দোযখ অপরিহার্য করে দিলাম।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এই আবেদ এমন কথা বলল, যা দ্বারা তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হয়ে গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে মুশরিকদের জন্যে বদদোয়া করতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আপনার কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ্ তাদেরকে তওবার ক্ষমতা দেবেন,অথবা শাস্তি দেবেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদদোয়া পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ তাদের অধিকাংশকে ইসলাম গ্রহণে ধন্য করলেন।

বর্ণিত আছে, দুই আবেদ ব্যক্তি এবাদতে সমান সমান ছিল। যখন তারা জান্নাতে গেল, তখন একজন অপরজনের চেয়ে উচ্চ মর্তবা পেল। যার মর্তবা কম ছিল, সে আরয করল ঃ ইলাহী, দুনিয়াতে এ ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী এবাদত করত না। কিন্তু তুমি তাকে উচ্চ মর্তবা দান করেছ। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ দুনিয়াতে থাকাকালে সে আমার কাছে উচ্চ মর্তবার আবেদন করত। আর তুমি কেবল জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দোয়া করতে। আমি প্রত্যেককে তার আবেদন অনুযায়ী দান করেছি।

এ থেকে জানা গেল যে, রিজা সহকারে এবাদত করা উত্তম। কেননা, যে রিজা করে, তার মধ্যে মহব্বত প্রবল থাকে। এদিকে লক্ষ্য করেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বড় বড় মর্তবা তলব কর। তোমরা এমন দাতার কাছে যাও, যার জন্যে দান করা মোটেই কঠিন নয়। তিনি আরও বলেন ঃ যখন আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাও, তখন সাগ্রহে চাও এবং উচ্চতম ফেরদাউসের দরখাস্ত কর। কেননা, তার কাছে কোন বস্তুই বড় নয়, যা তিনি দিতে পারেন না।

বর্ণিত আছে, জনৈক উগ্নি-উপাসক হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর কাছে আতিথেয়তা চাইলে তিনি বললেন ঃ তুমি মুসলমান হয়ে গেলে আমি তোমার আতিথেয়তা করব। এতে অগ্নি-উপাসক চলে গেল। আল্লাহ

তা'আলা তৎক্ষণাৎ হযরত ইবরাহীমের প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন—তুমি ধর্মের বিভিন্নতার কারণে তাকে খেতে দাওনি। আমি সত্তর বছর ধরে কুফর সত্ত্বেও তাকে খাদ্য দিয়ে আসছি। তুমি এক বেলা খাইয়ে দিলে তেমন কি হয়ে যেত? হযরত ইবরাহীম কালবিলম্ব না করে অগ্নিউপাসকের পিছনে ছুটলেন এবং তাকে ফিরিয়ে এনে খাইয়ে দিলেন। অগ্নি-উপাসক জিজ্ঞেস করল ঃ এখন আতিথেয়তার কারণ কি? প্রথমে তো আপনি অস্বীকারই করেছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললে অগ্নি-উপাসক বলল ঃ আচ্ছা, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে এমন ব্যবহার করেন! এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল।

ইবরাহীম আতরোশ বর্ণনা করেন, আমরা কয়েকজন বাগদাদের দজলা নদীর তীরে হযরত মারূফ কারখী (রহঃ) -এর সাথে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি ডিঙ্গি নৌকায় কয়েকজন যুবক মদ্যপান করে, ঢোল বাজিয়ে নদী বিহারে বের হল। আমরা হযরত মারূফকে বললাম ঃ দেখুন, এরা প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করছে। এদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন, ইলাহী! তুমি তাদেরকে দুনিয়াতে যেমন প্রফুল্ল রেখেছ, আখেরাতে তেমনি প্রফুল্লতা দান কর। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আমাদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। আপনি তাদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতে প্রফুল্ল রাখেন, তবে প্রথমে দুনিয়াতে তওবা করার শক্তি দেবেন। অর্থাৎ, তাঁর দোয়ার সারমর্ম এই ছিল যে, আল্লাহ তাদেরকে এসব কুকর্ম থেকে তওবা নসীব করুন।

উপরোক্ত বিষয়বস্তুগুলোর দ্বারা ভীত ও নিরাশ ব্যক্তিদের অন্তরে রিজা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু নির্বোধ ও আত্মপ্রতারিতদেরকে কখনও এসব কথা শুনাতে নেই। তাদের জন্যে উপযুক্ত বিষয়বস্তু হচ্ছে খওফ, যা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। কেননা, অধিকাংশ লোক কেবল খওফ দ্বারাই সংশোধনপ্রাপ্ত হয়; যেমন দুষ্ট বালক বেত্রাঘাত ও কঠোর ভাষা ছাড়া ঠিক পথে আসে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খওফ

খওফ বলা হয় অন্তরের ব্যথা ও অভ্যন্তরীণ জ্বালা-যন্ত্রণাকে, যা ভবিষ্যতের কোন খারাপ আশংকার কারণে সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং যে সর্বদা আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করে, তার ভবিষ্যতের প্রতি মোটেই মনোযোগ থাকে না। ফলে তার ভয় ও আশা কোন কিছুই হয় না। তার অবস্থা এসব বিষয়ের ঊর্ধ্বে। কেননা, ভয় ও আশা হচ্ছে দুটি লাগাম, যা মনকে তার অহমিকায় যেতে দেয় না। ওয়াসেতী (রহঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন— খওফ আল্লাহ তা'আলার ও বান্দার মাঝখানের একটি যবনিকা। তিনি আরও বলেন ঃ যখন অন্তরে হক প্রবল হয়, তখন তাতে খওফ ও রিজার অবকাশ থাকে না। প্রেমিকের অন্তর যদি প্রেমাস্পদকে দর্শন করার সময় বিরহের ভয়ে মশগুল থাকে, তবে দর্শনে ত্রুটি দেখা দেবে। বরং দর্শন সর্বদা অব্যাহত থাকা চূড়ান্ত মকাম। কিন্তু আমরা এখানে প্রাথমিক মকাম সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে ভয়ও থাকে।

খওফও তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত—এলম, হাল ও আমল। এলম অর্থ সেই কারণের জ্ঞান, যা অনিষ্টের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অপরাধ করে বাদশাহের লোকজনের হাতে বন্দী হল। সে অবশ্যই মৃত্যুদন্ডের খওফ করবে। যদিও ক্ষমা পাওয়া ও পালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর, কিন্তু তার অন্তরে খওফ সে পরিমাণে হবে, হত্যার কারণ সম্পর্কে যে পরিমাণ জ্ঞান জোরদার হবে। সে যদি জানে যে, তার অপরাধ গুরুতর কিংবা বাদশাহ অত্যধিক প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্রুদ্ধ এবং তার নিজের কাছেও মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, তবে নিঃসন্দেহে তার খওফ অধিক জোরদার হবে। পক্ষান্তরে এসব কারণ দুর্বল হলে খওফও দুর্বল হবে। কখনও অপরাধ ছাড়াই খওফ হয়ে থাকে। যেমন, আমরা বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুকে খওফ (ভয়) করি। এমনিভাবে আল্লাহ

তা'আলাকে খওফ করা কখনও গোনাহের কারণে এবং কখনও তাঁর মারেফত ও ক্ষমতা জানার কারণে হয়ে থাকে। তিনি ইচ্ছা করলে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। এতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। আল্লাহ যা করেন, তার কোন জওয়াবদিহী নেই এবং বান্দাকে তার প্রত্যেকটি কাজের জওয়াবদিহী করতে হবে। এসব বিষয় মানুষ যত বেশী জানবে, তার খওফও তত বেশী হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহকে সে-ই বেশী ভয় করবে, যে নিজেকে বেশী জানবে। একারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহর খওফ বেশী করি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।

এই জ্ঞান পূর্ণ হলে খওফ ও অন্তর্দাহের কারণ হয়। অতঃপর এর প্রভাব অন্তর থেকে দেহে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ফলে, দেহ দুর্বল ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মানুষ ক্রন্দন ও আহাজারি করে এবং কখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। খওফ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আনুগত্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে অতীতের ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে কর্মক্ষমতা অর্জিত হয়। এ কারণেই বলা হয়, সে ব্যক্তি খওফকারী নয়, যে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে চোখ মুছে ফেলে। বরং খওফকারী তাকেই বলা হবে, যে ভয়ের কাজ ত্যাগ করে।

আবুল কাসেম হাকীম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ভয় করে, সে তা থেকে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তাঁর দিকেই ছুটে পালায়।

যুন্নুন মিসরীকে প্রশ্ন করা হল ঃ বান্দা কখন খওফকারী হয়? তিনি বললেন ঃ যখন নিজেকে রোগীর মত করে নেয়। রোগী রোগ বৃদ্ধির ভয়ে পরহেয করে।

খওফের এক প্রভাব এই যে, এতে খাহেশের মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং যাবতীয় আনন্দ বিস্বাদে পরিণত হয়। ফলে, যে গোনাহ প্রিয় ছিল, তা

অপ্রিয় মনে হয়। যেমন মধু পানে আগ্রহী ব্যক্তি যখন শুনে যে, মধুর মধ্যে বিষ রয়েছে, তখন খওফের কারণে আগ্রহ উধাও হয়ে যায়। খওফের কারণে যাবতীয় খাহেশও এমনিভাবে বিলীন হয়ে যায়। অন্তরে বিনয়, নম্রতা ও অসহায়ত্ব সৃষ্টি হয়। অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। আল্লাহর চিন্তা, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকে না। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে কিছু লোকের অবস্থা এমনি ছিল। আল্লাহর মহিমা, গুণাবলী, ক্রিয়াকর্ম এবং নিজের দোষত্রুটির মারেফত শক্তিশালী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ততটুকুই শক্তিশালী হয়, যতটুকু খওফ শক্তিশালী হয়।

খওফের প্রভাব প্রকাশ হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শরীয়তের হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা। যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে হারাম নয় কিন্তু হারাম হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, সেগুলো থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়া এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের নাম "তাকওয়া"। যদি কেউ শুধু প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করে এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু বর্জন করে। যেমন যে ঘরে থাকে না, সে ঘর নির্মাণও করে না, যে বস্তু খাওয়ার নয়, তা সঞ্চয় করে না এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, তবে এই স্তরকে বলা হয় "সিদক" এবং এরূপ ব্যক্তিকে "সিদ্দীক" বলাই শোভনীয়।

কিছু কিছু কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরত থাকা এবং কোন কোন কর্মে তৎপর হওয়ার মাধ্যমেও খওফের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তবে বিশেষ কর্ম থেকে বিরত হওয়াকে শরীয়তে বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণতঃ কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকাকে বলা হয় "ইফফত"। এর উপরের স্তরের নাম 'ওরা', যা প্রত্যেক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়। এর উপরের স্তর হচ্ছে তাকওয়া, যা নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত উভয় প্রকার বিষয় থেকে বিরত থাকার নাম। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে "সিদক ও কুরব"। অর্থাৎ সন্দেহের কারণে বৈধ বিষয় থেকেও বিরত থাকা। এসব স্তর যেহেতু একটি অপরটির উপরে, তাই সর্বোচ্চ স্তরে নিম্নের সবগুলো স্তরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং এগুলোর শাব্দিক নাম পৃথক পৃথক হলেও অর্থ পৃথক নয়।

খওফের স্তর ঃ খওফ একটি উত্তম বিষয় বিধায় কেউ ধারণা করতে

পারে যে, এটি যত শক্তিশালী ও অধিক হবে, ততই মঙ্গলজনক হবে। এ ধারণা সঠিক নয়। আসলে খওফ একটি চাবুক বিশেষ, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে এলম ও আমলের দিকে হাঁকান, যাতে সে নৈকট্যের স্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, খওফের কম-বেশী মাত্রা রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী মাত্রাই উত্তম। কম মাত্রার খওফকে মহিলাদের কান্নার মত মনে করা উচিত। তারা যখন কোন কোরআনের আয়াত শুনে অথবা অন্য কোন ভয়াবহ বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তখন ভয়ে কান্না জুড়ে দেয় এবং অশ্রু মুছতে থাকে। কিন্তু যখনই ভয়ের বিষয়টি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়, তখনই মন পূর্ববৎ গাফেল হয়ে যায়। এ ধরনের খওফ মধ্যবর্তী মাত্রার চেয়ে কম এবং এর উপকারিতাও সামান্য। আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ও আলেমগণ ছাড়া সকল মানুষের খওফ এমনি ধরনের। এখানে আলেম অর্থ তারা নয়, যারা আলেমদের পোশাক পরিধান করে নামসর্বস্ব পণ্ডিত হয়ে যায়। তারা তো সবার চেয়ে বেশী খওফবিহীন। বরং আলেম বলে আমাদের উদ্দেশ্য তারা, যারা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর নেয়ামতসমূহ এবং তাঁর ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। এরূপ আলেম বিরল বটে। এ দিক দিয়েই হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ যখন তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহকে ভয় কর, তখন জওয়াবে নিশ্চুপ থাক। কেননা, যদি ভয় করি বল, তবে মিথ্যাবাদী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খওফ তাই, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং এবাদত ও আনুগত্যের পাবন্দ করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খওফের এই প্রভাব ফুটে না উঠা পর্যন্ত তাকে খওফ না বলে মনের কল্পনা বলাই অধিক সঙ্গত।

মধ্যবর্তী সীমার বেশী খওফ হচ্ছে, খওফ করতে করতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিপতিত হওয়া। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা আমলের পথে প্রতিবন্ধক। মোটকথা, যে খওফ নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, তা নিন্দনীয়। খওফ কোন সময় রোগ, দুর্বলতা, সংজ্ঞাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়। এধরনের খওফও নিন্দনীয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রিজার উপায়-উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্য মাত্রাতিরিক্ত খওফের প্রতিকার করা।

মোটকথা, খওফ যদি আমলে প্রভাব বিস্তার না করে, তবে তার থাকা না থাকা সমান। আর যদি প্রভাব বিস্তার করে, তবে যে পরিমাণে তার প্রভাব প্রকাশ পাবে, সে পরিমাণেই মর্তবা বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণতঃ যদি খওফের কারণে কু-প্রবৃত্তি থেকেই বিরত থাকে, তবে শুধু ইফফতের স্তর অর্জিত হবে। আর যদি খওফ 'ওরা' তথা পরহেযগারীর কারণ হয়, তবে পূর্বের তুলনায় স্তর কিছু বেড়ে যাবে। সর্ববৃহৎ স্তর হচ্ছে সিদ্দীকগণের স্তর। অর্থাৎ, নিজের বাহির ও ভিতরকে আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া এবং তাতে অন্যের কোন অবকাশ না থাকা। খওফের এ স্তরটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটা শারীরিক সুস্থতা ও মস্তিষ্কের নিরাপত্তা সহকারে অর্জিত হতে পারে। যদি খওফ এই স্তরকে অতিক্রম করে যায় এবং বুদ্ধি ও সুস্থতা বিনষ্ট করে দেয়, তবে একে রোগ মনে করে জরুরী পর্যায়ে চিকিৎসা করতে হবে। হযরত সহল তস্তরীর কিছু সংখ্যক মুরীদ দীর্ঘদিন উপবাস করত। তিনি তাদেরকে বলতেন ঃ নিজের মস্তিষ্কের হেফাযত করতে থাকবে। কেননা, আল্লাহর ওলীদের মধ্যে কেউ বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিল না।

খওফের ফযীলত ঃ বলা বাহুল্য, খওফের ফযীলত প্রথমত যৌক্তিক উপায়ে এবং দ্বিতীয়ত কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। যৌক্তিক উপায় এই যে, কোন বস্তুর ফযীলত ততটুকুই হয়, যতটুকু সে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে সহায়ক হয়। কেননা, পারলৌকিক সৌভাগ্য ছাড়া মানুষের আর কোন অভীষ্ট নেই। এ সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর দীদার ও তাঁর নৈকট্য অর্জন। অতএব, এই সৌভাগ্য অর্জনে যে বস্তু যে পরিমাণে সাহায্য করবে, সে পরিমাণে তার ফযীলত হবে। এটা জানা কথা যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত অর্জন করা ছাড়া আখেরাতে তাঁর দীদারের সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। মারেফত ছাড়া মহব্বত অর্জিত হয় না এবং মারেফতের জন্যে সার্বক্ষণিক যিকির ও ফিকির অত্যাবশ্যক। আর তা দুনিয়ার মহব্বত মন থেকে আলাদা করা ছাড়া লাভ করা যায় না। পার্থিব মহব্বত মন থেকে আলাদা করতে হলে পার্থিব আনন্দ ও কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতেই হবে। পার্থিব আনন্দ ও কামনা-বাসনা বর্জন যতটুকু খওফের অনল দ্বারা হতে পারে, অন্য কোন কিছুর দ্বারা ততটুকু হতে পারে না। এতে জানা গেল যে, খওফ এমন একটি অনল, যা দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি

জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুতরাং কাম-প্রবৃত্তি খতম করা, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এবাদত ও আনুগত্যে উৎসাহিত করা যতটুকু কাম্য হবে, ততটুকুই খওফের ফযীলত লাভ হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটা খওফের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভিন্নরূপ হতে পারে।

এ ছাড়া খওফ দ্বারা ইফফত, ওরা, তাকওয়া ও মোজাহাদা অর্জিত হয়। এসবগুলোই ফযীলত ও নৈকট্য অর্জনকারী বিষয়। সুতরাং যে খওফ এমন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ অর্জনের কারণ হয়, তার ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত।

খওফের ফযীলত সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত, রহমত, এলম ও রিজা— জান্নাতীদের এই মকাম চতুষ্টয়কে তিনটি আয়াতে খওফকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। খওফের ফযীলতের জন্যে এটাই যথেষ্ট। হেদায়াত ও রহমত এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে—

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ

অর্থাৎ, হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্যে, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে।

এলম সম্বন্ধে এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ, বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

নিম্নোক্ত আয়াতে খওফকারীদের জন্যে রিযার কথা উল্লিখিত হয়েছে—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা সেই ব্যক্তির জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

এ ছাড়া এলমের ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে, তা দ্বারা খওফের ফযীলতও বুঝা যায়। কেননা, খওফ এলমের ফল। এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, খওফকারীরা "রফীকে

আ'লার" (মহান সঙ্গীর) সাহচর্য লাভ করবে। এতে অন্য কেউ তাদের সাথে শরীক হবে না। এই সাহচর্য বিশেষ ভাবে তাদের জন্যেই নির্ধারিত হওয়ার কারণ এই যে, খওফকারী আলেম হয়ে থাকে। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস বিধায় নবীগণের সাহচর্য আলেমগণই লাভ করবেন। আর নবীগণ ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মহান স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করবেন। এ কারণেই ওফাতের পূর্বে রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখন দুনিয়াতে থাকার অথবা আল্লাহ তা'আলার কাছে চলে যাওয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়, তখন তিনি এ কথাই বলতে থাকেন —

اَسْئَلُكَ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

আমি "রফীকে আ'লা" তথা মহান সঙ্গীকে চাই।

মূল খওফের দিকে লক্ষ্য করলে এ হালটি হচ্ছে এলম এবং খওফের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে এটি হচ্ছে ওরা ও তাকওয়া। তাকওয়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। এমনকি, "আকেবাত" তথা পরিণাম তাকওয়ার জন্যেই নির্দিষ্ট। যেমন "হামদ" আল্লাহর জন্যে এবং দুরূদ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট। এমনিভাবে পরিণামও তাকওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, পরিণাম তাকওয়াওয়ালাদের জন্যে এবং দুরূদ মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি।

তাকওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, তাদের গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।

তাকওয়ার অর্থ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, খওফের ফলে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এর মাহাত্ম্য এ কারণেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে গোনাহ থেকে বেশী বেঁচে থাকে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ۔

অর্থাৎ, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবপ্রাপ্তদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

আরও বলা হয়েছে—

وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ভয় কর— যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

এ আয়াতে নির্দেশসূচক পদ ব্যবহার করে খওফকে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং ঈমানের জন্য এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মুমিনকে খওফ থেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কমবেশী খওফ অবশ্যই থাকবে। খওফ ততটুকুই দুর্বল হবে, ঈমানে যতটুকু দুর্বলতা থাকবে।

এক হাদীসে আছে اَلْحِكْمَةُ مَخَافَةُ اللّٰهِ অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল হচ্ছে আল্লাহর ভয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন — তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে আমার পরে আল্লাহকে খুব ভয় করবে। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে ভয় তার সামনে সর্বপ্রকার কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। হযরত শিবলী বলেন ঃ যখন আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি, তখন

আমার সামনে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভের এক অভূতপূর্ব দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে মুমিন কোন ভুল করে, তার পেছনে দুটি নেকী থাকে। এক, আযাবের খওফ এবং দুই, মাফ হওয়ার আশা। তার ভুলটি খওফ ও রিজার মাঝখানে পড়ে যায়; যেমন দুটো বাঘের মাঝখানে শৃগাল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে আছে—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এরশাদ করবেন, কোন ব্যক্তি হিসাব ছাড়া থাকবে না। তবে যারা ওরা ও তাকওয়াওয়ালা, তাদেরকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করাতে আমি লজ্জাবোধ করি। কারণ, তাদের সম্মান এর চেয়ে ঊর্ধ্বে। বলা বাহুল্য, ওরা ও তাকওয়া শব্দদ্বয়ের অর্থে খওফের শর্ত রয়েছে। খওফ না থাকলে ওরা ও তাকওয়া হবে না।

এমনিভাবে ফযীলতের কতিপয় আয়াতকেও আল্লাহ তা'আলা খওফের সাথে খাস করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ, যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

আরও বলা হয়েছে—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্যে রয়েছে দুটি জান্নাত।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি আমার বান্দার উপর দু'খওফ ও দু'শান্তি একত্রিত করব না। যদি সে দুনিয়াতে আমা থেকে নির্ভয় থাকে তবে কিয়ামতে তাকে ভীত করব। আর যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, তবে কিয়ামতে তাকে অভয় দান করব।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ خَافَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَافَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ خَوَّفَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে প্রত্যেক বস্তু ভয় করে। আর যে

আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বস্তু থেকে ভীত করেন।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ অসহায় মানুষ দারিদ্র্যকে যতটুকু ভয় করে, ততটুকু যদি জাহান্নামের আগুনকে ভয় করতো, তবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যেত। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ যতক্ষণ মানুষ হালাল না খাবে, ততক্ষণ খওফ অর্জিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নির্ভীকতা প্রসঙ্গে যেসকল শাস্তি ও নিন্দাবাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোও খওফের ফযীলত জ্ঞাপন করে। কেননা, কোন বিষয়ের নিন্দা করা হলে তার বিপরীত বিষয়ের প্রশংসা হয়ে যায়। নৈরাশ্যের নিন্দা দ্বারা যেমন আশার ফযীলত জানা যায়, তেমনি ভয়শূন্যতার নিন্দা দ্বারা ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। বরং আমরা বলি, রিজার ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও খওফের ফযীলত-জ্ঞাপক। কেননা, রিজা ও খওফ একটি অপরটির সাথে থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন প্রিয় বস্তু আশা করে, তা না পাওয়ার ভয়ও অবশ্যই তার থাকবে। যদি এ ভয় না থাকে, তবে সে বস্তু তার প্রিয় হবে না এবং তার অপেক্ষা করবে না।

মোটকথা, খওফ ও রিজা পরস্পর জড়িত। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। উভয়টি একত্রিত হয়ে একটি অপরটির উপর প্রবল হতে পারে। এটাও সম্ভব যে, অন্তর একটির সাথে মশগুল হবে এবং অপরটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। খওফ ও রিজা পরস্পর জড়িত বিধায় আল্লাহ তা'আলা উভয়টি এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا

অর্থাৎ, তারা আমাকে আশা ও ভয় সহকারে ডাকে।

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে।

কোরআন মজীদের অনেক জায়গায় রিজা খওফ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এরা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কান্না খওফের ফল বিধায় কান্নার ফযীলত দ্বারাও খওফের ফযীলত

জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا

অর্থাৎ, তাদের উচিত কম হাসা এবং বেশী কাঁদা।

কান্নার ফযীলত দ্বারা হাদীসসমূহ পরিপূর্ণ। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এমন কোন ঈমানদার বান্দা নেই, যার চোখ থেকে সামান্য পরিমাণ অশ্রুও নির্গত হয়ে কপালে প্রবাহিত হয়, এরপর আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন না।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন আল্লাহর ভয়ে ঈমানদারের অন্তর কেঁপে উঠে, তখন তার গোনাহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে। আরও বলা হয়েছে ঃ

لَا يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না, যে পর্যন্ত স্তন থেকে নির্গত দুধ স্তনে ফিরে না যাবে।

হযরত ওকবা ইবনে আমের একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ নিজের বাসনাকে সংযত রাখ, ঘর থেকে বের হয়ো না এবং গোনাহের জন্যে ক্রন্দন কর।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের কেউ কি বে-হিসাব জান্নাতে দাখিল হবে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গোনাহ স্মরণ করে ক্রন্দন করবে, সে বে-হিসাব জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক হাদীসে আছে— আল্লাহ তা'আলার কাছে দুটি বিন্দুর চেয়ে উত্তম কোন বিন্দু নেই। একটি অশ্রুবিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয় এবং দ্বিতীয়টি রক্তবিন্দু, যা জেহাদে শরীর থেকে নির্গত হয়।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَشْفِيَانِ بِتَزْرِفَةِ الدَّمْعِ قَبْلَ اَنْ تَصِيْرَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا ـ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে দুটি অশ্রু বিসর্জনকারী ক্রন্দনকারী চক্ষু দান কর, যা অশ্রু বিসর্জন করে শান্তি দিবে সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন অশ্রু রক্ত হয়ে যাবে এবং চোয়াল হয়ে যাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে ছায়ার মধ্যে রাখবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তিনি বলেন ঃ তাদের মধ্যে একজন হবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে স্মরণ করে নির্জনে কাঁদে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ যে কাঁদতে পারে, সে কাঁদুক এবং যে পারে না, সে কান্নার ভান করুক। হযরত মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির যখন ক্রন্দন করতেন, তখন চোখের পানি মুখমণ্ডলে এবং দাড়িতে মালিশ করে নিতেন এবং বলতেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, যে জায়গায় অশ্রু লাগবে, সেখানে দোযখের আগুন পৌঁছবে না।

হযরত হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশে এমন ওয়ায করলেন, যার ফলে আমাদের অন্তর নরম হয়ে গেল এবং চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর আমি যখন বাড়ী ফিরে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হলাম এবং সাংসারিক কথাবার্তায় মশগুল হলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আমার যে অবস্থা ছিল, তা মন থেকে উধাও হয়ে গেল এবং আমি দুনিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়লাম। এরপর পুনরায় মনে পড়ল। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। কেননা, যে ভয় ও নম্রতা আমার মধ্যে ছিল, তা রইল না। এই চিন্তা মনে আসতেই আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং চিৎকার করে বলতে লাগলাম ঃ হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন ঃ হানযালা কিছুতেই মুনাফিক হয়নি। অতঃপর আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামনে একথা বলতে উপস্থিত হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি মোটেই মুনাফিক হওনি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে ছিলাম। আপনি ওয়ায করলেন । তখন আমার অন্তরে যে ভয় এবং চোখে যে অশ্রু ছিল বাড়ী গিয়ে সংসারকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। এটা কি মুনাফেকী নয়? রসূলুল্লাহ

(সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ হানযালা, এখন তুমি খওফের যে স্তরে অবস্থান করছ, যদি তা অব্যাহত থাকে, তবে ফেরেশতারা তোমার সাথে পথিমধ্যে এবং শয্যায় মোসাফাহা করবে। তবে প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সময় আছে।

মোটকথা, রিজা ও কান্নার ফযীলত সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে, তাতে খওফ ও ভয়ের ফযীলতও বুঝা যায়। কারণ, এগুলো খওফের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন বিষয় খওফের কারণ এবং কোন কোন বিষয়ের কারণ স্বয়ং খওফ।

খওফের প্রবলতা ও রিজার প্রবলতার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ঃ খওফ ও রিজার ফযীলত সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তাই পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? খওফ উত্তম, না রিজা। মোটামুটিভাবে এ প্রশ্ন করা অর্থহীন। এটা এমন, যেমন কেউ প্রশ্ন করে যে, রুটি উত্তম, না পানি? বলা বাহুল্য, এর উত্তর এটাই হবে যে, ক্ষুধার্তের জন্যে রুটি উত্তম এবং তৃষ্ণার্তের জন্যে পানি উত্তম। যদি কারও ক্ষুধা ও পিপাসা দুটিই হয়, তবে উভয়ের মধ্যে যেটি প্রবল হবে, সেটিই ধরতে হবে। অর্থাৎ, ক্ষুধা প্রবল হলে রুটি উত্তম হবে এবং তৃষ্ণা প্রবল হলে পানি উত্তম। উভয়টি সমান হলে রুটি ও পানি সমান হবে।

রিজা ও খওফ অন্তরের চিকিৎসার জন্যে ঔষধি বিশেষ। তাই এদের ফযীলত ততটুকুই হবে, অন্তরে যতটুকু ব্যাধি থাকবে। যদি অন্তরে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়ার রোগ থাকে, তবে খওফ তার জন্যে উত্তম। আর যদি অন্তরে নৈরাশ্য প্রবল থাকে, তবে রিজা উত্তম। এমনিভাবে যদি কারও উপর গোনাহ প্রবল হয়, তাহলেও খওফ উত্তম। এমনও বলা যায় যে, খওফ সর্বাবস্থায় উত্তম। কেননা, গোনাহ ও বিভ্রান্ত হওয়ার রোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশী। হাঁ, খওফ ও রিজার উৎসের প্রতি লক্ষ্য করলে রিজা উত্তম। কেননা, রিজার উৎস হচ্ছে রহমতের দরিয়া এবং খওফের উৎস গযব ও ক্রোধের দরিয়া। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে কৃপা ও রহমতসূচক গুণাবলীর প্রতি যার লক্ষ্য থাকবে, তার মধ্যে মহব্বত প্রবল হবে, যার পরে আর কোন মকাম নেই। খওফের মধ্যে কঠোরতাসূচক গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য থাকে বিধায় এই মনোযোগে মহব্বত ততটুকু থাকে না, যতটুকু রিজাতে থাকে। এ কারণে রিজা উত্তম।

যে পরহেযগার ব্যক্তি যাহেরী ও বাতেনী গোনাহ ছেড়ে দিয়েছে, তার জন্যে উত্তম হচ্ছে খওফ ও রিজা সমান সমান থাকা। এ কারণেই প্রসিদ্ধ একটি উক্তি বর্ণিত আছে যে, যদি মুমিনের খওফ ও রিজা পরিমাপ করা হয়, তবে উভয়টি সমান হবে। বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বৎস! আল্লাহকে এত ভয় কর যে, যদি তুমি তাঁর কাছে ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষের পুণ্য নিয়ে যাও, তবু তিনি সেগুলো কবুল করবেন না। পক্ষান্তরে আশাও এই পরিমাণ কর যে, যদি তুমি তাঁর কাছে সকল মানুষের গোনাহ নিয়ে যাও, তবু তিনি তোমাকে মাফ করে দিবেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা হয় যে, একজন ব্যতীত সকল মানুষ দোযখে যাবে, তবে আমি বলব সেই এক ব্যক্তি আমি হব। পক্ষান্তরে যদি প্রচার করা হয় যে, সকল মানুষ জান্নাতে যাবে কিন্তু শুধু এক ব্যক্তি যাবে না, তবে আমি ভয় করব যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হতে পারি। এটা হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের খওফ ও রিজা।

কিন্তু যদি কোন গোনাহগার ব্যক্তি ধারণা করে যে, যারা দোযখে যাবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে , তবে এটা রিজা নয় বরং তার বিভ্রান্তি। অধিকাংশ লোকের মধ্যে রিজার প্রাবল্য বিভ্রান্তিতে পড়া এবং মারেফত কম হওয়ার পরিচায়ক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে খওফ ও রিজাকে এক সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন ঃ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় ও আশা সহকারে ডাকে।

يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا অর্থাৎ, তারা আমাকে উৎসাহ ও ভীতি সহকারে ডাকে।

কিন্তু হযরত উমরের মত লোক কোথায়, যার খওফ ও রিজা সমান সমান হবে? তাই বর্তমানে যারা আছে, তাদের জন্যে খওফের প্রবলতাই উত্তম— যদি খওফের কারণে নৈরাশ্যে ডুবে না যায়। বলা বাহুল্য, যে খওফ নৈরাশ্যের জন্ম দেয় এবং মানুষ আমল বর্জন করে গোনাহে ডুবে

যায়, তা খওফ নয়। খওফ তাই, যা আমলে উৎসাহিত করে এবং যাবতীয় কামনা-বাসনা মলিন মনে হতে থাকে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত নিছক খওফের দরুন করে, সে ফিকর ও ভাবনার সমুদ্রে ডুবে যায়। আর যে নিছক রিজার দরুন এবাদত করে, সে বিভ্রান্তির প্রান্তরে ঘুরপাক খেতে থাকে। যদি খওফ, রিজা ও মহব্বত এই তিনটির অধীনে কেউ এবাদত করে, তবে সে সরল ও সঠিক পথে অবস্থান করে। এতে বুঝা যায় যে, এবাদতে এই তিন বিষয়ে সমন্বয় জরুরী। কিন্তু খওফ প্রবল থাকা মৃত্যুর সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত অধিক সঙ্গত। মৃত্যুর সময় অবশ্য রিজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, খওফ আমলে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বেত্রদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত। মৃত্যুর সময় কোন আমল করা মানুষের জন্যে সম্ভব নয়। এ সময় খওফের জরুরী কার্যকলাপ বরদাশত করাও অসম্ভব। এতে আগামী কালের মৃত্যু আজই হয়ে যায়। হাঁ, রিজার দ্বারা অন্তরে শক্তি আসে এবং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অন্তরে আসন পাতে। আল্লাহর মহব্বত নিয়ে দুনিয়া থেকে সফর করাই মানুষের জন্যে উপযুক্ত। তাই আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর মহব্বত সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করেন। এ প্রসঙ্গে রসূলে আকরাম (সাঃ) যে দোয়া করতেন, তা করাই আমাদের জন্যে শ্রেয়। তিনি এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে দান কর তোমার মহব্বত এবং তার মহব্বত, যে তোমাকে মহব্বত করে এবং সে আমলের মহব্বত, যা আমাকে তোমার নিকটবর্তী করে। তোমার মহব্বতকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির চেয়েও প্রিয় করে দাও।

সারকথা, মৃত্যুর সময় রিজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, এতে মহব্বত থাকে। মৃত্যুর পূর্বে খওফ উপযুক্ত। কেননা, এর দ্বারা কামনা-বাসনার

আগুন চমৎকাররূপে নির্বাপিত হয় এবং দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। তাই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ

অর্থাৎ, নিজের পালনকর্তা সম্পর্কে সুধারণা ছাড়া তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ আমার কাছে আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বল এবং ওফাত পর্যন্ত অব্যাহত রাখ। আমি আল্লাহর সাথে সুধারণা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই। হযরত সুফিয়ান ছওরী মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে নিজের মধ্যে খওফ অনুভব করলে আশার কথা শুনার জন্যে আলেমগণকে চারপাশে একত্রিত করেন। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা প্রিয় হোক— এটাই এর উদ্দেশ্য। এজন্যেই হযরত দাঊদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী আসে—আমাকে আমার বান্দাদের প্রিয়জন করে দাও। তিনি আরয করলেন ঃ ইলাহী, তা কেমন করে। এরশাদ হল, তাদের কাছে আমার নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণনা কর।

খওফ অর্জন করার উপায় ঃ খওফ তথা ভয়ের দু'টি মকাম রয়েছে— (১) আল্লাহ তা'আলার আযাবকে ভয় করা এবং (২) তাঁর সত্তাকে ভয় করা। দ্বিতীয় প্রকার খওফ তাদের হয়, যারা এলম ও কাশফ তথা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। প্রথম প্রকার খওফ সাধারণ মানুষের হয়, যা কেবল জান্নাত ও দোযখে বিশ্বাস স্থাপন এবং এগুলোকে এবাদত ও নাফরমানীর প্রতিফল বিশ্বাস করার কারণে সৃষ্টি হয়। এই খওফ অনবধানতা ও ঈমানের দুর্বলতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিয়ামতের আতঙ্ক চিন্তা করলে এবং আখেরাতের বিভিন্ন কথা স্মরণ করলে এই অনবধানতা দূরীভূত হয়ে যায়। এছাড়া খওফকারীদেরকে দেখলে এবং তাদের কাছে বসলেও এ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার খওফ অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তাকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে পড়া এবং তাঁর ও বান্দার মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টির আশংকা করা। হযরত যুন্নুন বলেন ঃ বিচ্ছেদের ভয়ের তুলনায়

দোযখের ভয় সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতই। এই খওফ আলেমগণের হয়। সেমতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহকে তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই ভয় করে।

সাধারণ মুমিনরাও এই ভয়ের কিছু অংশ পায়; কিন্তু তাদের ভয় নিছক তাকলীদ তথা অনুকরণ হয়ে থাকে। যেমন অবুঝ শিশু তার পিতার অনুকরণে সাপকে ভয় করে। এই ভয়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকে না বিধায় এটা দুর্বল হয়ে থাকে এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। তবে যদি ভয়ের কারণসমূহ সর্বদা অনুধাবন করা যায় এবং তদনুযায়ী দীর্ঘদিন এবাদত ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা হলে খওফ শক্তিশালী হয়।

মোটকথা, যে ব্যক্তি মারেফতে উন্নীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাযথ চিনতে সক্ষম হয়, সে আপনা-আপনিই খওফ করতে থাকে। তার জন্যে কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। যেমন কোন ব্যক্তি হিংস্র জন্তুর স্বরূপ জেনে নেয়, এরপর নিজেকে তার নাগালের মধ্যে দেখতে পায়, সে আপনা-আপনিই হিংস্র জন্তুকে ভয় করতে থাকবে। এজন্যে তার কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে না। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন — আমাকে ভয় কর যেমন হিংস্র জন্তুকে ভয় করে থাক। বলা বাহুল্য, হিংস্র জন্তুকে ভয় করার জন্যে তার স্বরূপ জানা এবং তার থাবায় পড়ার অবস্থাটি জানাই যথেষ্ট। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানবে ও চিনবে, সে একথাও জানবে যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। যা ইচ্ছা আদেশ করেন। কোন কিছুর পরওয়া করেন না। তিনি কাউকে ভয় করেন না। এরপর আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকবে না।

যারা আরেফ তথা আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানী তাদের সবসময় খাতেমা অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়ার ভয় লেগে থাকে। এর কারণ একাধিক, যা অন্তিম মুহূর্তের পূর্বে সংঘটিত হয়। বেদআত, গোনাহ ও নিফাকও এসব কারণের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এসব থেকে মুক্ত নয়। যদি কেউ

নিজেকে নিফাক থেকে মুক্ত বলে ধারণা করে, তবে তাও নিফাক। কেননা, প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে— যে নিফাকের ভয় করে না, সে মুনাফিক। জনৈক বুযুর্গ এক আরেফকে বললেন ঃ আমি নিজের জন্যে নিফাকের ভয় করি। আরেফ বললেন ঃ যদি তুমি মুনাফিক হতে, তবে নিফাকের ভয় করতে না। মোটকথা, আরেফের দৃষ্টি সর্বদা অন্তিম মুহূর্তের প্রতি থাকে— তা শুভ হবে, না অশুভ। হাদীস শরীফে আছে—

اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضٰى لَايَدْرِىْ مَا اللّٰهُ صَانِعٌ فِيْهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ بَقِىَ لَايَدْرِىْ مَا اللّٰهُ قَاضٍ فِيْهِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَابَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَلَابَعْدَ الدُّنْيَادَارٌ اِلَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ۔

অর্থাৎ, মুমিন বান্দা দুটি ভয়ের মাঝখানে অবস্থান করে। এক, অতীত সময়। আল্লাহ তাতে কি করবেন, তা সে জানে না। দুই, অনাগত সময়, যাতে আল্লাহ কি ফয়সালা দেবেন, তা তার জানা নেই। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পর সন্তুষ্টি অর্জনের কোন উপায় নেই এবং দুনিয়ার পরে জান্নাত অথবা দোযখ ছাড়া কোন গৃহ নেই।

মন্দ অন্তিম মুহূর্ত ঃ এখন মন্দ অন্তিম মুহূর্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে। কেননা, যারা আরেফ, তারা অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়ার ভয় বেশী করে থাকে। জানা উচিত যে, অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়া দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ। তা এই যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রকাশ পাওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ অথবা অস্বীকৃতি প্রবল হয়ে যাওয়া এবং তদবস্থায়ই আত্মা নির্গত হওয়া। এ সন্দেহ ও অস্বীকৃতি আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে অন্তরায় ও দূরত্বের কারণ হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকার যা এরচেয়ে লঘু, তা এই যে, মৃত্যুর সময় বান্দার মনে কোন পার্থিব বস্তুর মহব্বত প্রবল হয়ে যাওয়া অথবা কোন পার্থিব কামনা-বাসনা অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলা, যাতে অন্য কোন কিছুর অবকাশ না থাকে। এই আচ্ছন্নতার ফলে বান্দার মুখমন্ডল ও মস্তক

দুনিয়ার দিকে ফিরানো থাকবে। যখন মুখমণ্ডল আল্লাহর দিক থেকে ফিরে যাবে, তখন অন্তরায় সৃষ্টি হবে এবং আযাব নাযিল হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার প্রজ্বলিত আগুন কেবল আল্লাহর অন্তরালে অবস্থানকারীদেরকে স্পর্শ করবে। যে ঈমানদারের অন্তর দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত, আগুন তাকে বলবে ঃ হে ঈমানদার! এগিয়ে চল। তোমার নূর আমার শিখাকে নির্বাপিত করে দিয়েছে। মোটকথা, দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হওয়ার সময় আত্মা নির্গত হলে তা আশংকার বিষয়। তবে মূল ঈমান ও খোদায়ী মহব্বত দীর্ঘকাল পর্যন্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় এই দুঃখজনক অবস্থা স্থায়ী হবে না। যদি তার ঈমানের শক্তি মেছকাল পরিমাণও হয়, তবে সত্বরই সে দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। যদি আরও কম হয়, তবে অনেক দিন দোযখে থাকতে হবে। আর যদি ঈমানের শক্তি রতি পরিমাণ হয়, তবে হাজারো বছর পরে হলেও দোযখ থেকে রেহাই পাবে।

যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা প্রশ্ন করতে পারে যে, উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, মৃত্যুর পরেই অপরাধীকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে। তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা বিলম্বিত হয় কেন? জওয়াব এই যে, যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা বেদআতী এবং আল্লাহর নূর, কোরআনের নূর ও ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মতে এটাই অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ যে, কবর দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। সহীহ হাদীস থেকেও তাই জানা যায়। সুতরাং যদি মানুষের অন্তিম মুহূর্ত শুভ না হয় এবং হতভাগ্য হয়ে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে, তবে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সে আযাবের পাত্র হয়ে যায় এবং কবর থেকেই আযাব শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সময়ভেদে তার কবরে দোযখের সত্তরটি দরজা খুলে যায়। আযাবের প্রকারও সময়ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কবরে রাখার পর মুনকির-নকীরের সওয়াল হয়, এরপর শাস্তি হয়, এরপর হিসাব-নিকাশের জটিলতা এবং কিয়ামতে সকলের সমক্ষে অপমান ও লাঞ্ছনা হয়।

জানা উচিত যে, অন্তিম মুহূর্ত মন্দ হওয়ার কারণ দুটি বিষয়ে সীমিত।

প্রথম এই যে, পূর্ণ সংসার নির্লিপ্ততা ও যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন সত্ত্বেও বেদআতী হওয়া। বেদআতের অর্থ কোন নির্দিষ্ট মাযহাব ও ধর্মমত অনুসরণ করা নয়; বরং বেদআতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, সিফাত ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করা নিজের খেয়ালখুশী, অনুমান ও বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে অথবা এমনি ধরনের অন্য কোন ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমে। এরূপ বেদআতী ব্যক্তির যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখন তার সামনে এ সত্য আপনিই উদঘাটিত হয়ে যায় যে, তার পূর্ববর্তী বিশ্বাস নিছক মূর্খতাপ্রসূত ও ভ্রান্ত ছিল। এমতাবস্থায় সে কেবল এই বিশ্বাসটিকেই মিথ্যা মনে করে না, বরং অন্যান্য বাস্তব ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহকেও বাতিল মনে করতে থাকে অথবা সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ করতে থাকে। যদি এ অবস্থায় তার আত্মা নির্গত হয়ে যায়, তবে তার অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হয় এবং সে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপ লোককেই বুঝানো হয়েছে—

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় উদঘাটিত হল, যা তারা ধারণাও করত না।

নিম্নোক্ত আয়াতেও এরূপ লোকদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ـ

অর্থাৎ, বলুন, আমি কি তোমাদেরকে আমলে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে বলব? আমলে ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করছে।

মোটকথা, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, সিফাত ও কর্ম সম্পর্কে নিজের মতামত দ্বারা অথবা অন্যের অনুকরণ দ্বারা কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করে, তারা বেদআতী এবং তাদের জন্যে উপরোক্ত বিপদাশংকা

বিদ্যমান। এই বিপদাশংকা দূর করার জন্যে সংসার অনাসক্তি ও সৎকর্ম যথেষ্ট নয়; বরং সত্য বিশ্বাস ছাড়া এ থেকে নাজাতের কোন উপায় নেই। সরল ও সাদাসিধে মানুষ, যারা আল্লাহ , রসূল ও আখেরাতে সংক্ষেপে ঈমান রাখে এবং এর উপরই পাকাপোক্ত থাকে— কোনরূপ তর্ক-বিতর্কের ধারে-কাছে যায় না, তারা এই বিপদাশংকা থেকে দূরে রয়েছে। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

অর্থাৎ, অধিকাংশ জান্নাতী সরল ও আত্মভোলা।

এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ আকায়েদ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও খোঁজাখুঁজি করতে নিষেধ করেছেন। তারা সাধারণ মানুষকে একথাই বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব বিষয় নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে যা বুঝে আসে, তাকে সঠিক মনে করতে হবে। কেননা, সিফাত সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ এবং এ পথ খুবই দুর্গম।

অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতা এবং সংসার আসক্তির প্রবলতা। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর মহব্বতও দুর্বল হয় এবং দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হয়। এই প্রবলতা এতদূর পৌঁছে যে, অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের জন্যে কোন স্থান থাকে না— মহব্বতের জল্পনা থেকে যায় মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ফলে, অন্তর কাল ও কঠিন হয়ে যায়। এরপর উপর্যুপরি গোনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ও মোহরের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। এই অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে আল্লাহর মহব্বত আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ, তখন মনে হতে থাকে, সর্বাধিক প্রিয় বস্তুর বিরহের সময় বুঝি এসে পড়েছে। এই বিরহের কারণে অন্তর দারুণভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মনে ধারণা আসে যে, আল্লাহ তা'আলা কেন এই মৃত্যুকে প্রেরণ করলেন? মৃত্যুর আগমন ও প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যদি ঘটনাক্রমে এই বিদ্বেষ থাকাকালে আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে যায়, তবে অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হওয়া নিশ্চিত। এ

থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল দেখে, সে এই বিপদাশংকা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক গোনাহের মূল শিকড়। এটাই দুরারোগ্য ব্যাধি। সকল মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। কারণ, তারা আল্লাহকে কম চিনে। চিনলে অবশ্যই মহব্বত করত। যে চিনে, সে তাকে মহব্বত করে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاۤءُكُمْ وَاَبْنَاۤءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ـ

অর্থাৎ, বলুন, যদি তোমাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্ত্রী, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, উপার্জিত ধন-সম্পদ,ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পছন্দসই বাসভবন আল্লাহ, রসূল ও তাঁর পথে জেহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা কর।

মোটকথা, স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের মত প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দেয়া মৃত্যু খারাপ মনে হতে থাকে এবং তদবস্থায় তার আত্মা নির্গত হয়ে যায়, সে সেই পলাতক গোলামের মত, যে তার প্রভুর প্রতি বিদ্বেষবশত পলায়ন করে, এরপর জোরজবর দস্তি গ্রেফতার হয়ে প্রভুর সামনে আনীত হয়। প্রভুর হাতে এই গোলামের যে ভীষণ শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে,তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মৃত্যু আল্লাহর মহব্বতের উপর হয়, সে সেই অনুগত গোলামের মত আল্লাহর সামনে আসে, যে পরম আগ্রহ সহকারে প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও সফরের বিপদাপদ সহ্য করে প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়। এই গোলাম দরবারে পৌঁছা মাত্রই যে আদর-যত্ন ও আপ্যায়ন লাভ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের খওফ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি দাঁড়িয়ে কক্ষের মধ্যে সূরা-কেরাত পাঠ করতে শুরু করতেন এবং ভেতরে ও বাইরে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার ভয়েই তা করতেন। একবার সূরা হাক্কার একটি আয়াত পাঠ করে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আরেক বার জিবরাঈলের আকৃতি দেখার পর তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায়। বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর বক্ষে ডেগচির স্ফুটনের ন্যায় শব্দ শুনা যেত। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—আমার কাছে জিবরাঈল যখনই আগমন করতেন, প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন। বর্ণিত আছে, যখন শয়তান বিতাড়িত হল, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল ও মীকাঈল ক্রন্দন শুরু করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা কাঁদছ কেন? তারা আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমরা আপনার পাকড়াও থেকে শংকামুক্ত নই। আদেশ হল ঃ তোমরা এমনিই থাক। অর্থাৎ আমার পাকড়াও থেকে শংকামুক্ত থেকো না।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রেওয়ায়েত করেন—যখন দোযখ সৃষ্টি হল, তখন ভয়ে ফেরেশতাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বনী আদম সৃজিত হলে তাদের মন স্থির হল। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, আমি মীকাঈল (আঃ)-কে কখনও হাসতে দেখি না কেন! তিনি বললেন ঃ দোযখ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তিনি হাসেন না। আরও বর্ণিত আছে—আল্লাহ তা'আলার কিছুসংখ্যক ফেরেশতা আগুন সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই ভয়ে হাসেন না যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হয়ে আগুনের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বাইরে বের হলে তিনি জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন এবং খোরমা খেতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি খাচ্ছ না কেন? আমি আরয করলাম ঃ আমার খোরমা খাওয়ার ক্ষুধা নেই। তিনি

বললেন ঃ আমার ক্ষুধা আছে। আমার খাদ্য গ্রহণ না করার আজ চতুর্থ দিন। এ কয়দিন আমি খাদ্য পাইনি। আমি পরওয়ারদেগারের কাছে চাইলে তিনি আমাকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দান করে দিতেন। হে ইবনে উমর, যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে থাকবে, যারা বছরের খোরাক সঞ্চয় করে রাখবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? তাদের একীন খুব দুর্বল হবে। ইবনে উমর বলেন ঃ আমরা বাগানেই ছিলাম, এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

অর্থাৎ, অনেক জন্তু রয়েছে, যারা তাদের রুযী সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রুযী দান করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ শোষণ করার এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করার হুকুম দেননি। যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী জীবনের উদ্দেশ্যে দীনার সঞ্চিত রাখে, তার জীবন আল্লাহর হাতেই। সাবধান, দীনার ও দেরহাম জমা করে রেখো না এবং আগামীকালের জন্যে জীবনোপকরণ সঞ্চয় করো না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর অন্তরের স্ফুটন এক ক্রোশ দূর থেকে শুনা যেত। হযরত মোজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ হযরত দাঊদ (আঃ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেজদায় পড়ে ক্রন্দন করলেন এবং মাথা তুললেন না। ফলে, তার চোখের পানিতে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠল এবং তাতে তার মস্তক আবৃত হয়ে গেল। গায়েবী আওয়াজ হল, হে দাঊদ, তুমি ক্ষুধার্ত হলে খাওয়া দরকার এবং তৃষ্ণার্ত হলে পানি পান করা উচিত। বস্ত্রহীন হলে বস্ত্রপ্রাপ্ত হবে। হযরত দাঊদ সজোরে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ভয়ের উত্তাপে কাঠ জ্বলে গেল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে তওবা ও মাগফেরাত নাযিল করলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইলাহী! আমার গোনাহ আমার হাতে সমর্পণ কর। তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের তালুতে তাঁর

গোনাহ লিখে দেয়া হল। তিনি যখন পানাহার করতেন অথবা কোন উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেন, তখন এ গোনাহ দেখে ক্রন্দন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তার সামনে পানির পেয়ালা এক-তৃতীয়াংশ খালি পেশ করা হত। তিনি যখন নিজের গোনাহ দেখতেন, তখন পেয়ালা ঠোঁটের সাথে মিলানো পর্যন্ত অশ্রুতে তা ভরে যেত।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে খওফের প্রাবল্য ঃ বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন একটি পাখী দেখে তাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ হায়, আমিও যদি তোমার মত পাখী হতাম। মানুষ না হতাম! হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম এবং কেউ তা কেটে ফেলত! হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত না হওয়া আমার কাছে খুব ভাল মনে হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া আমার কাছে ভাল মনে হয়।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) যখন কোরআন পাকের কোন আয়াত শুনতেন, তখন ভয়ের আতিশয্যে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁকে দেখার জন্যে লোকজন আসা-যাওয়া করত। একদিন তিনি মাটি থেকে একটি কুটা হাতে তুলে বললেন। চমৎকার হত যদি আমি কুটা হতাম এবং কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু না হতাম। হায়, আমি যদি বিস্মৃত হয়ে যেতাম! হায়, আমার জননী যদি আমাকে প্রসব না করতেন। তাঁর মুখমন্ডলে অশ্রুর দুটি কাল রেখা ছিল। তিনি বলতেন, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করে না। যে তাকওয়া অবলম্বন করে, সে খেয়ালখুশী অনুযায়ী কথা বলে না। কিয়ামত না হলে আমরা অন্য কিছুর নমুনা দেখতাম। একদিন তিনি এক ব্যক্তির ঘরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। সে নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিল। তিনি দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। যখন সে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (আল্লাহর আযাব অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তাকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।) পাঠ করল, তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর বাড়ী চলে এলেন এবং মাসাধিক কাল অসুস্থ রইলেন। লোকজন তাকে দেখতে আসত কিন্তু কেউ জানত না, তার অসুখটা কি?

হযরত আলী (রাঃ) একদিন ফজরের নামাযের পর বিষণ্ণ মনে বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহচরগণকে দেখেছি। কিন্তু আজ তাদের মত কোনকিছু দেখি না। বিক্ষিপ্ত কেশ ও ধূলি-ধূসরিত থাকাই তাদের নিয়ম ছিল। তাদের দু'চোখের মাঝখানে সেজদার দাগ পড়ে গিয়েছিল। তারা রাতের বেলায় সেজদা করতেন। নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআন পাঠ করতেন এবং এবাদতে কপাল ও পদযুগলের উপর পালাক্রমে ভর দিতেন। যখন সকাল হত, তখন প্রবল বাতাসে যেমন বৃক্ষ নড়াচড়া করে, তেমনি তারা কাঁপতেন। চোখের পানিতে তাদের পরিধেয় বস্ত্র ভিজে যেত। কিন্তু আজকাল আমি এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করছি, যারা রাতের বেলায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় মগ্ন থাকে।

এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ ছাইভস্ম হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাওয়াকে আমি ভাল মনে করি। হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ বলেন ঃ আমি যদি ভেড়া হতাম এবং আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে যবাহ করে খেয়ে ফেলত, তবে তাই ভাল ছিল। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন যখন উযু করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হয়ে যেত। পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করত, উযু করার সময় আপনার এ অবস্থা হয় কেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা জান আমি কার সামনে দাঁড়াতে চাই?

মূসা ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমরা যখন সুফিয়ান ছওরীর কাছে বসতাম, তখন তাঁর ভয় দেখে মনে হত আগুন যেন চারদিক থেকে আমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। মেসওয়ার ইবনে মাখরামা ভয়ের আতিশয্যে কোরআন পাক মোটেই শুনতে পারতেন না। কেউ এক হরফ অথবা এক আয়াত পাঠ করলে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠতেন এবং কয়েক দিন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত না। একদিন খশম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি আয়াত পাঠ করল—

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ـ

অর্থাৎ, যে দিন আমি মুত্তাকীদেরকে রহমানের কাছে সমবেত করব

এবং হাঁকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায়।

আয়াতটি শুনে মেসওয়ার বললেন ঃ আমি তো অপরাধীদের একজন—মুত্তাকী নই কারী সাহেব, আবার পড়ুন তো! পুনরায় পাঠ করা হলে তিনি সজোরে চিৎকার করে আখেরাতের পথিক হয়ে গেলেন (মৃত্যুবরণ করলেন)। ক্রন্দনকারী এয়াহইয়ার সামনে কেউ এ আয়াতটি পাঠ করল—

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, তাদের পালনকর্তার সামনে তাদের দণ্ডায়মান করানোর দৃশ্যটি যদি আপনি দেখতেন!

আয়াতটি পাঠ করলে তিনি এমন এক চিৎকার দিলেন, যার ফলে দীর্ঘ চার মাস পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। বসরার আশপাশ থেকেও লোকজন এসে তাঁকে দেখে গেল।

মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি কা'বা গৃহের তওয়াফ করছিলাম, এমন সময় দেখি এক যুবতী কা'বার গেলাফ ধরে বলে যাচ্ছে—ইলাহী! অনেক কামনার আনন্দ বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু আযাব বাকী রয়ে গেছে। ইলাহী! তোমার কাছে দোযখ ছাড়া কি অন্য কোন শাস্তি নেই? মহিলাটি একথা বলে কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। আমি এ অবস্থা দেখে নিজের কথা ভেবে চিৎকার করে উঠলাম।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খওফকারীর স্বরূপ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ যার অন্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন এবং চক্ষু কান্নারত, সেই খওফকারী।

হযরত হাসান বসরী এক হাসিতে নিমজ্জিত যুবকের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাকে বললেন ঃ তুমি পুলসিরাত অতিক্রম করেছ? যুবক বলল ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি জান্নাতে যাবে, না দোযখে— এটা তোমার জানা আছে কি? সে আরয করল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে এ হাসি কেন? রাবী বলেন ঃ এরপর থেকে এ যুবককে কেউ হাসতে দেখেনি।

হাম্মাদ যখনই বসতেন, এমনভাবে বসতেন যেন অর্ধেক দাঁড়ানো।

কেউ তাকে শান্তভাবে বসতে বললে তিনি বলতেন ঃ ভয়শূন্য ব্যক্তি শান্তভাবে বসে। আমি ভয়শূন্য নই। কারণ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছি।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে গাফলতে ফেলে রেখেছেন। এটাও রহমত বটে। নতুবা আল্লাহর ভয়ে সকলেই মারা যেত।

মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছি মৃত্যুর সময় মানুষকে বলব— তোমরা আমাকে বেড়ী পরিয়ে শৃঙ্খলিত করে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবে, যেমন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাতেম আসাম বলেন ঃ কোন মনোরম বাসগৃহের জন্যে পাগল হয়ো না। কেননা, জান্নাতের চেয়ে অধিক মনোরম কোন স্থান নেই। কিন্তু আদমের অবস্থা তাতে যা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধিক এবাদতের জন্যে উতালা হয়ো না। কারণ, অধিক এবাদতের পর ইবলীসের অবস্থা সকলেরই জানা। অধিক জ্ঞানের জন্যে গর্বিত হয়ো না। কারণ, বালআম ইসমে আযমের জ্ঞান রাখত। কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছে? সৎকর্মপরায়ণদের সাথে সাক্ষাতের জন্যেও অধীর হয়ো না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর চেয়ে বেশী সৎকর্মপরায়ণ কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ কোন কোন আত্মীয় ও শত্রুর জন্যে মোটেই কল্যাণকর হয়নি।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযীর জননী তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে জানি। তুমি শৈশবেও পূত-পবিত্র ছিলে এবং বড় হয়েও ভালই আছ। কিন্তু তুমি দিবারাত্র এবাদতই করে যাচ্ছ। এ কাজটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর হতে পারে। এত পরিশ্রম করার তোমার দরকার কি? তিনি বললেন ঃ হে স্নেহময়ী জননী, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কোন গোনাহ করতে দেখে নেন, অতঃপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলেন— আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, তবে এ আশংকা থেকে নির্ভয় হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ কোন প্রেরিত পয়গম্বর, নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং সাধু ব্যক্তির প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নেই। কেননা, কিয়ামতের দিন

তাদের কোন শাস্তি হবে না। আমার ঈর্ষা কেবল সে ব্যক্তির প্রতি, যে জন্মগ্রহণই করেনি।

বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারী যুবক দোযখের ভয়ে সর্বক্ষণ কাঁদত। এমনকি কান্নার কারণে সে ঘর থেকেও বের হত না! রসূলে করীম (সাঃ) একদিন তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরলেন! আনসারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে মাটিতে পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। দোযখের ভয় তাঁর কলিজাকে খন্ড-বিখন্ড করে দিয়েছে।

ইবনে আবী মায়সারা শয্যা গ্রহণের পূর্বক্ষণে বলতেন ঃ হায়, আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করত। তার মা একদিন বললেন ঃ হে মায়সারা, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তুমি মুসলমান। অতএব, এত ভয় করছ কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমরা সবাই দোযখে যাব। দোযখ থেকে বের হওয়ার কথা তিনি বলেননি। এটাই ভয়ের কারণ।

হযরত আতায়ে সলমীও খওফকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কখনও জান্নাতের প্রার্থনা করতেন না—কেবল ক্ষমার আবেদন করতেন। রুগ্নাবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনার মন কি চায়? তিনি বললেন ঃ দোযখের ভয় আমার মনে কোন কিছু চাওয়ার জায়গা রাখেনি। কথিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর যাবত কখনও আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাননি এবং এ সময়ে কখনও হাসেননি। একদিন আকাশের দিকে মাথা তুললে ভয়ে ভূতলশায়ী হলেন এবং তাঁর নাড়িভুঁড়ি ফেটে গেল। তিনি রাতের বেলায় নিয়মিত নিজ দেহে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে নিতেন, কোথাও বিকৃত হয়ে যায়নি তো! যখন ধূলিঝড় শুরু হত অথবা বজ্রপাত হত অথবা খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে যেত, তখন বলতেন ঃ এসব বিপদাপদ আমারই কারণে। আমি মারা গেলে মানুষ সুখ পাবে। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন—একদিন আমরা উতবা নামক গোলামের সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন যুবক ও প্রৌঢ় ছিল, যারা এশার উযু দ্বারা ফজরের নামায পড়ত। অধিক নামাযের কারণে তাদের পা ফুলে গিয়েছিল, চক্ষু কোটরাগত ছিল এবং ত্বক হাতের সাথে লেগে গিয়েছিল। তাদেরকে দেখলে মনে হত যেন কবর থেকে বের হয়ে এসেছে। তারা বলত ঃ আল্লাহ

তা'আলা এবাদতকারীদেরকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং নাফরমানদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা এসব কথা বলাবলি করতে করতে এগুচ্ছিল এমন সময় এক জায়গায় পৌঁছে তাদের একজন বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তাঁর চারপাশে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল। কনকনে শীত ছিল। কিন্তু তাঁর কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল। তাঁর চোখে-মুখে পানির ছিটা দেয়া হলে জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গীরা ব্যাপার জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এখানে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছিলাম। এ জায়গা দেখতেই স্মৃতি জাগ্রত হয়ে গেল এবং আমি ভয়ে সংজ্ঞা হারালাম।

সালেহ মুররী বলেন ঃ আমি জনৈক দরবেশের সামনে এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ـ

অর্থাৎ, যেদিন আমি তাদের মুখমণ্ডলকে জাহান্নামে ওলট-পালট করব, তারা বলবে, হায় আমাদের আফসোস! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম!

এতটুকু শুনেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে বলল ঃ হে সালেহ, আর কিছু পাঠ কর। আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি পাঠ করলাম ঃ

إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا

অর্থাৎ, যখন তারা দোযখ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এতটুকু শুনে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যুরারা ইবনে আবী আওফা ফজরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি যখন فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (অর্থাৎ, যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে) পাঠ করলেন, তখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

ইয়াযীদ রাককাশী হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ ইয়াযীদ, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, মৃত্যুবরণকারী খলীফাগণের মধ্যে আপনি প্রথম খলীফা হবেন না। অর্থাৎ, আপনার পূর্বে অনেক খলীফা মৃত্যুবরণ করেছেন। খলীফা কেঁদে বললেন ঃ আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনার ও হযরত আদম (আঃ)-এর মাঝখানে এমন কোন মহৎ ব্যক্তি নেই, যে মৃত্যুবরণ করেনি। খলীফা কাঁদলেন এবং বললেনঃ আরও বলুন। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনার এবং জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে কোন মনযিল নেই। একথা শুনে খলীফা সংজ্ঞা হারালেন।

মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন ঃ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলেরই প্রতিশ্রুতি।

এ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) চিৎকার করে উঠেন এবং মাথায় হাত রেখে বাইরে বের হয়ে যান। এরপর তিন দিন পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

হযরত দাউদ তায়ী জনৈকা মহিলাকে দেখলেন, সে তার পুত্রের কবরে বসে কেঁদে বলছিল, বৎস, জানি না তোমার কোন্ গালকে সর্ব প্রথম পোকা খেয়েছে। দাউদ একথা শুনেই সেই স্থানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

আম্বরী বর্ণনা করেন, একবার হাদীসবিদগণ হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়াসের দরজায় সমবেত হলেন। তিনি এক জানালা পথে তাদের দিকে মাথা বের করলেন। কাঁদার দরুন তাঁর দাড়ি নড়াচড়া করছিল। তিনি বললেন ঃ ভাইসব, কোরআনের উপর সর্বক্ষণ আমল কর এবং নামায যথারীতি কায়েম কর। এটা হাদীসের সময় নয়; বরং মিনতি, অসহায়তা ও ডুবন্ত ব্যক্তির অনুরূপ দোয়া করার সময়। এ যুগে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জিহ্বার হেফাযত করা, নিজের ভেদ প্রকাশ না করা এবং অন্তরের চিকিৎসা করা। জানা বিষয়কে কর্মপন্থা করবে এবং অজানা বিষয়কে বর্জন করবে। একবার তিনি খওফের কারণে উদভ্রান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ জানি না।

যুর ইবনে উমর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, অন্যরা কিছু বললে কেউ কাঁদে না; কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন, তখন চারদিক থেকে কান্নার আওয়াজ শুনি! পিতা বললেন ঃ যে মহিলার সন্তান মারা যায়, তার কান্না এবং যে মহিলা পারিশ্রমিক নিয়ে কাঁদে—উভয়ের কান্নায় তফাৎ অবশ্যই হবে। উদ্দেশ্য এই যে, খওফের কান্না অন্তরে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

সালেহ মুররী বলেন ঃ একবার ইবনুস সাম্মাক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে আপনার সম্প্রদায়ের আবেদদের কিছু অবস্থা দেখান। আমি তাকে এক মহল্লায় কুঁড়েঘরে বসবাসকারী এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা তার কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে তখন মাদুর তৈরীতে ব্যস্ত ছিল। আমি তার সামনে এ আয়াতটি পাঠ করলাম —

اِذِالْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ -

অর্থাৎ, যখন তাদের ঘাড়ে থাকবে বেড়ী এবং তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

আয়াতখানি শুনে লোকটি চিৎকার করে বেহুশ হয়ে গেল। আমরা তাকে তদবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমরা দ্বিতীয় এক ব্যক্তির বাড়ীতে গেলাম এবং তার সামনে একই আয়াত পাঠ করলাম। সেও চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেখান থেকে আমরা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে বললঃ চলে আসুন; কিন্তু আমাকে আমার পরওয়ারদেগার থেকে ফিরাতে পারবেন না। আমি পাঠ করলাম ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ

অর্থাৎ, এটা তার জন্যে, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার শাস্তিবাণীকে!

সে এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল যে, তার নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে

লাগল। এ রক্তের মধ্যেই সে ছটফট করছিল। অবশেষে রক্ত শুকিয়ে গেল। আমরা তাকেও এমনি অবস্থায় রেখে চলে এলাম।

এভাবে আমি ইবনুস সাম্মাককে ছয় ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুরিয়ে আনলাম এবং প্রত্যেককেই বেহুশ অবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে সপ্তম ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে অনুমতি দিল। আমরা দেখলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধ জায়নামাযে বসে আছে। আমরা সালাম বললে সে টের পেল না। আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম ঃ খবরদার, আগামীকাল মানুষকে দাঁড়াতে হবে। বৃদ্ধ বলল ঃ হতভাগা, কার সামনে? একথা বলার পর সে হতভম্ব হয়ে রইল। তার মুখ খোলা এবং দৃষ্টি উপরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সে নিচু স্বরে "উহ্" "উহ্" বলতে শুরু করল। অবশেষে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তার স্ত্রী বলল ঃ এখন আপনারা তার কাছ থেকে চলে যান। কেননা, এখন তার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যাবে না। তার অবস্থা বদলে গেছে। কিছুদিন পর আমি সেখানকার লোকদের কাছে এ সাত ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তাদের তিনজন সুস্থ হয়ে গেছে এবং তিনজন মারা গেছে। আর বৃদ্ধ তিন দিন পর্যন্ত তেমনি হতভম্ব ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রয়েছে। এ সময়ে সে ফরয নামাযও পড়ত না। তিন দিন পর সে জ্ঞান ফিরে পেল।

বর্ণিত আছে, ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদকে মানুষ আবদালের মধ্যে গণ্য করত। তিনি এ মর্মে কসম খান যে, জীবনে কখনও হাসবেন না এবং কখনও বিছানায় শুয়ে ঘুমাবেন না। কখনও ঘৃতপক্ক খাদ্য খাবেন না। তিনি আমৃত্যু এ কসম পূর্ণ করেন। একবার হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জুবায়েরকে প্রশ্ন করলেন ঃ আমি শুনেছি আপনি কখনও হাসেন না। এটা কি ঠিক? তিনি বললেন ঃ দোযখ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ী তৈরি আছে এবং দোযখের ফেরেশতারাও তৎপর রয়েছে। এমতাবস্থায় হাসার কোন উপায় আছে কি?

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবু সাঈদ! আপনার সকাল কেমন কেটেছে? তিনি বললেনঃ ভালই। লোকটি

বলল ঃ আপনার অবস্থা কি? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার অবস্থা জানতে চাও? আচ্ছা বলত, যদি কিছু লোক নৌকায় আরোহণ করে সমুদ্রের মাঝে পৌঁছায়। এরপর নৌকা ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়ে যায় এবং আরোহীদের প্রত্যেকেই এক একটি তক্তা জড়িয়ে ধরে ভাসতে থাকে, তবে তোমার চিন্তায় তাদের অবস্থা কেমন হবে? লোকটি বলল ঃ তাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে সংকটাপন্ন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তাদের চেয়েও ভয়ানক।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের এক বাঁদী তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করল। অতঃপর গৃহ সংলগ্ন মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ে নিদ্রা প্রবল হওয়ায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে স্বপ্নে কান্নাকাটি করল। নিদ্রাভঙ্গের পর হযরত উমরের খেদমতে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? বাঁদী বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমি দেখলাম, দোযখ দোযখীদের জন্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরপর পুলসিরাত এনে তার পৃষ্ঠে স্থাপন করা হল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি হল? সে বলল ঃ এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে আনা হল এবং পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হল। সে কিছুদূর এগুতেই পুল উল্টে গেল এবং আবদুল মালেক দোযখে পড়ে গেল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি দেখলে? বাঁদী বলল ঃ এরপর আবদুল মালেকের পুত্র ওলীদকে আনা হল। সেও কিছুদূর এগুতেই পুল কাত হয়ে গেল এবং সে দোযখে পতিত হল। খলীফা বললেন ঃ এরপর কি হল? সে বলল ঃ ওলীদের পর সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেককে এনে পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেয়া হল। সে-ও কিছুদূর যেতেই পুল আড়াআড়ি হয়ে গেল এবং সে দোযখে পড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরপর কি দেখলে? বাঁদী বলল ঃ এরপর আপনাকে আনা হল। এতটুকু বলতেই খলীফা সজোরে এক চিৎকার মেরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাঁদী উঠল এবং তাঁর কানে জোরে জোরে বলতে লাগল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি আপনি বেঁচে গেছেন। আপনি মুক্তি পেয়েছেন। বাঁদী যতই তাঁর কানে চিৎকার করে বলে যাচ্ছিল কিন্তু তিনি বরাবর হাত-পা ছুঁড়ে মারছিলেন।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ মুমিনের খওফ ততক্ষণ দূর হয় না, যতক্ষণ সে দোযখের পুলকে পেছনে না ফেলে দেয়।

হযরত তাউস (রহঃ)-এর জন্যে বিছানা পাতা হলে তিনি তাতে উত্তপ্ত কড়াইয়ের দানার মত এদিক-ওদিক গড়াগড়ি করতেন। এরপর লাফিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং সকাল পর্যন্ত কেবলার দিকে মুখ করে থাকতেন। তিনি বলতেন ঃ দোযখের বর্ণনা খওফকারীদের নিদ্রা ছিনিয়ে নিয়েছে।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ দোযখ থেকে এক ব্যক্তি এক হাজার বছর পরে মুক্তি পাবে। আমিই সে ব্যক্তি হলে তা হবে আমার সৌভাগ্য। এরূপ বলার কারণ, তিনি অনন্তকাল দোযখবাসের এবং অন্তিমকাল মন্দ হওয়ার ভয় করতেন। কথিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর হাসেননি। রাবী বলেন ঃ আমি যখন তাকে উপবিষ্ট দেখতাম, তখন মনে হত যেন তিনি কয়েদী এবং ঘাড় মটকে দেয়ার জন্যে ধরা পড়েছেন। তিনি ওয়ায করলে মনে হত যেন আখেরাতকে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মত তার অবস্থা বর্ণনা করছেন।

ইউনুস সাম্মাক বর্ণনা করেন—আমি এক মজলিসে ওয়ায করলাম। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল ঃ আজ আপনি ওয়াযে এমন একটি বাক্য বলেছেন, যার পর অন্য কিছু না শুনলেও আমাদের পরওয়া ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ বাক্যটি কি? সে বলল ঃ আপনি বলেছেন, অনন্তকাল জান্নাতবাস অথবা অনন্তকাল দোযখবাস খওফকারীদের অন্তর দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছে। ইউনুস সাম্মাক বলেন ঃ অতঃপর যুবক চলে গেল। দ্বিতীয় ওয়াযে আমি তাকে অনুপস্থিত দেখে লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। জানা গেল, সে অসুস্থ। আমি তাকে দেখতে গেলাম এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। সে জওয়াব দিল ঃ হে আবুল আব্বাস, আপনার সে বাক্যের প্রতিক্রিয়াতেই এ অসুস্থতা। এরপর যুবক এ রোগেই মারা গেল। আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? সে বলল ঃ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আপনার বাক্যের দৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন।

সারকথা, পয়গম্বর, ওলী, আলেম ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যখন এতটা খওফ করেছেন, তখন আমাদের খওফ করা আরও বেশী উচিত। এটা জরুরী নয় যে, গোনাহ বেশী হলেই কেবল খওফ করতে হবে; বরং অন্তর পরিষ্কার এবং মারেফত পুরোপুরি হলেও খওফ করাই বাঞ্ছনীয়। অধিক এবাদত ও গোনাহের স্বল্পতা ভয়হীনতা দাবী করে না; বরং ভয়হীনতার কারণ হচ্ছে কামনা-বাসনার আনুগত্য, দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য এবং অন্তর গাফেল ও কঠোর হওয়ার কারণে নিজের অবস্থা দেখার ব্যাপারে অক্ষমতা। এমন ভয়হীন ব্যক্তি মৃত্যু কাছে এলেও জাগ্রত হয় না, অধিক গোনাহ করেও কম্পিত হয় না এবং মন্দ পরিণামের আশংকাকেও অন্তরে স্থান দেয় না। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলাই নিজ কৃপায় তার অবস্থা শুধরে দেন, তবেই তা সম্ভব। তাই এর জন্যে দোয়া ও কর্মতৎপরতা আবশ্যক। কারণ, শুধু মৌখিক দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যখন দুনিয়াতে ধনী হওয়ার অভিলাষী হই, তখন এর জন্যে কত জরুরী কাজকর্ম সম্পন্ন করি, ক্ষেতে হাল চাষ করি, বীজ বপন করি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের মোকাবিলা করি। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন উচ্চ ডিগ্রী লাভ করতে চাইলে এর জন্যে কত কঠোর সাধনা করি। পড়াশুনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেই। জীবিকার অন্বেষণে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্টই না স্বীকার করি। আল্লাহ তা'আলা রূযীর ওয়াদা দিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকি না। বসে বসে আল্লাহর কাছে আরয করি না যে— ইলাহী! আমাকে রূযী দাও। কিন্তু যখন অনন্ত, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করি, তখন তার জন্যে কেবল মুখে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, ইলাহী! ক্ষমা কর—ইলাহী রহম কর। এর জন্যে যে কঠোর সাধনা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন, সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করি না। অথচ যে সত্তার কাছে আমরা আশাবাদী এবং যার নামে আমরা ধোকায় পড়ে আছি, তিনি নিজে এরশাদ করেন—

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

অর্থাৎ, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করে।

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে প্রতারক শয়তান যেন আল্লাহর নামে ধোকা না দেয়।

يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ, হে মানব, তোমাকে তোমার করুণাময় প্রভুর ব্যাপারে কিসে ধোকায় ফেলে রেখেছে?

এসব উক্তির যে কোন একটি আমাদেরকে আমাদের বিভ্রান্তি ও মিথ্যা আশা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের তওবা কবুল করেন এবং তওবার আগ্রহ আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রোথিত করে দেন। আমরা যেন কেবল মৌখিক তওবা করে ক্ষান্ত না হই। অন্যথায় আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা কথা বলে—কাজ করে না, কানে শুনে—মেনে চলে না এবং ওয়ায শুনে কাঁদে, কাজের সময় গা বাঁচিয়ে চলে।

সপ্তম অধ্যায়

ফক্‌র ও যুহ্‌দ

(দারিদ্র্য ও সংসারবিমুখতা)

দুনিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দুশমন। এর ছলনায় অনেক মানুষ বিপথগামী হয়েছে এবং এর প্রবঞ্চনায় অনেক সাধক সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। দুনিয়ার মোহ যাবতীয় পাপ ও মন্দ কর্মের মূল এবং এর প্রতি বিমুখতা যাবতীয় এবাদত ও আনুগত্যের ভিত্তি। আমরা দুনিয়াপ্রীতির নিন্দা সম্পর্কে তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে দুনিয়া থেকে বিরত থাকা এবং তার প্রতি বিমুখতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কেননা, উদ্ধারকারী বিষয়সমূহের মধ্যে এটাই মূল।

দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে মুক্তির আশা করা যায় না। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপায় দুটি। এক, দুনিয়ার স্বয়ং মানুষের কাছ থেকে আলাদা থাকা, যার নাম "ফক্‌র" তথা দারিদ্র্য এবং দুই, মানুষের দুনিয়া থেকে দূরে অবস্থান করা, যাকে বলা হয় "যুহ্‌দ" তথা সংসারবিমুখতা।

সৌভাগ্য অর্জন এবং সাফল্য ও মুক্তি লাভে সহায়তার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের প্রভাব রয়েছে। তাই আমরা এতদুভয়ের স্বরূপ, স্তর, শর্ত ও বিধি-বিধান দুটি পৃথক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্যের স্বরূপ ও ফযীলত

প্রয়োজনীয় বস্তু না থাকার নাম দারিদ্র্য। অপ্রয়োজনীয় বস্তু না থাকাকে দারিদ্র্য বলা হয় না। প্রয়োজনীয় বস্তু বিদ্যমান থাকলে এবং তা মানুষের আয়ত্তে থাকলে সে মানুষকে "ফকীর" তথা দরিদ্র বলা হবে না। একথা জানার পর সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছু বিদ্যমান সবই দরিদ্র। কেননা, প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যমান বস্তুর নিরন্তর বিদ্যমানতা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার ফল। এই অনুগ্রহ না হলে সে পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হতে পারে না। অতএব, অস্তিত্বের যবনিকায় যদি এমন কেউ থাকে, যার পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান হওয়া কারও অনুগ্রহ ও কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে সে হবে সর্বাবস্থায় ধনী। বলা বাহুল্য, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া এরূপ কোন বিদ্যমান বস্তু নেই— হতে পারে না। সুতরাং অস্তিত্বে ধনী একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত যা কিছু রয়েছে, সবই ফকীর। এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ পাকের এই উক্তিতে وَاللّٰهُ غَنِيٌّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহই সকল সম্পদের মালিক আর তোমরা তার মুখাপেক্ষী। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ ও সম্যক ফক্‌রের তাৎপর্য।

কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্য মানুষের ধন-সম্পদের "ফক্‌র" ও দারিদ্র্য বর্ণনা করা। কারণ, মানুষের প্রয়োজন অসংখ্য ও অগণিত। তন্মধ্যে কতক প্রয়োজন ধন-সম্পদ দ্বারা পূরণ হতে পারে। তাই আমরা এটা বিবৃত করতে চাই। বলা বাহুল্য, যার কাছে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ নেই, তাকে এই ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করে ফকীর ও দরিদ্র বলা হয়। ফকীরের অবস্থা পাঁচ প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে।

প্রথম অবস্থা, কারও কাছে ধন-সম্পদ এলে সে তাকে মন্দ বিবেচনায় মনে যন্ত্রণা অনুভব করে, গ্রহণ করা থেকে পলায়ন করে এবং তার অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এরূপ ব্যক্তিকে "যাহেদ" তথা সংসারবিমুখ বলা হয়। এ অবস্থাটি সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় অবস্থা ধন-সম্পদের বাসনা এত প্রবল থাকে না যাতে অর্জিত হলে আনন্দিত হবে এবং এমন ঘৃণাও থাকে না যাতে যন্ত্রণা অনুভব করবে কিংবা পাওয়া গেলে বর্জন করবে। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা "রাযী" তথা তুষ্ট বলে থাকি।

তৃতীয় অবস্থা, ধন-সম্পদ থাকা না থাকার তুলনায় পছন্দনীয়। তাই ধন-সম্পদের বাসনা থাকে। কিন্তু এমন নয় যে, তা লাভ করার জন্য কর্মতৎপর হবে এবং বিনা কায়ক্লেশে পাওয়া গেলে আনন্দিত হয়। এরূপ ব্যক্তিকে "কানে" তথা অল্পে তুষ্ট বলা হয়। কেননা, সে যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে অর্জন থেকে বিরত থাকে।

চতুর্থ অবস্থা, অক্ষমতার কারণে ধন উপার্জন থেকে বিরত থাকে; নতুবা বাসনা এত বেশী যে, উপার্জনের পথ পেলে পরিশ্রম সহকারে হলেও উপার্জনে মত্ত হবে। এরূপ ব্যক্তিকে "হারীছ" তথা লোভী বলা হয়।

পঞ্চম অবস্থা, যে ধন তার কাছে নেই, সেই ধনের ব্যাপারে নিঃসহায় হওয়া; যেমন ক্ষুধাতুরের কাছে অন্ন না থাকা এবং বস্ত্রহীনদের কাছে বস্ত্র না থাকা। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা 'মুযতর' তথা নিঃসহায় বলে থাকি, উপার্জনের ক্ষেত্রে তার আগ্রহ দুর্বল হোক অথবা প্রবল। এ অবস্থাটি খুব কম দোষমুক্ত।

উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থার মধ্যে যুহ্দ উত্তম। এগুলোর উপরে আরও একটি অবস্থা আছে, যা যুহ্দের চেয়েও উত্তম। তাতে ধন-সম্পদ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান হয়। ফলে, ধন এলেও আনন্দ হয় না এবং গেলেও দুঃখ হয় না। হযরত আয়েশার (রাঃ) অবস্থা এমনি ছিল। তাঁর কাছে দান ও উপঢৌকনের কোন দেরহাম আগমন করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং সেদিনই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর পরিচারিকা আরয করল ঃ আজকের দেরহাম থেকে যদি আপনি এক

দেরহামের গোশত আনিয়ে নিতেন, তবে তা দ্বারা ইফতার করা যেত। তিনি বললেন ঃ আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তাই করতাম। সুতরাং যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ, জগত সংসারের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তার হাতে থাকলেও তাতে তার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, সে সমস্ত ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার মনে করে—নিজের নয়। এ জন্যেই ধন-সম্পদ তার হাতে থাকুক অথবা অন্যের হাতে—উভয়টি তার কাছে সমান। এরূপ ব্যক্তিকে আমাদের মতে "মুস্তাগনী" তথা বেপরওয়া বলা সমীচীন। কেননা, সে অর্থ থাকা ও না থাকা উভয়টির ঊর্ধ্বে। যে বিত্তশালী, সে বিত্ত আগমনের ঊর্ধ্বে; কিন্তু বিত্ত তার কাছে থাকুক, এর ঊর্ধ্বে নয়; বরং এর মুখাপেক্ষী। সুতরাং এদিক দিয়ে বিত্তশালী ফকীর বটে। কিন্তু যে বেপরওয়া, সে অর্থের আগমন, তার কাছে থাকা এবং তার হাত থেকে চলে যাওয়া ইত্যাদি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। এ কারণেই সে আল্লাহ তা'আলার "গনী" গুণের অধিক নিকটবর্তী।

এ ধরনের বান্দা ধন-সম্পদ থাকা না থাকার ব্যাপারে বেপরওয়া হলেও অন্য কোন ব্যাপারে বেপরওয়া নয়। সে আল্লাহ তা'আলার তাওফীকের ব্যাপারে বেপরওয়া নয়, যার ফলে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেপরওয়া হতে পেরেছে। এই বেপরওয়া অবস্থাটি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নেয়ামত। কারণ, যে অন্তর ধন-সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন, সে গোলাম এবং যে এ থেকে বেপরওয়া সে মুক্ত, আযাদ। আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ গোলামী থেকে মুক্ত করেন।

সারকথা, দারিদ্র্যের অবস্থা ও স্তর ছয়টি। তন্মধ্যে মুস্তাগনীর স্তর সর্বোচ্চ, এরপর যাহেদ, এরপর রাযী, এরপর কানে এবং এরপর হারীছ। মুযতর যাহেদ, রাযী ও কানে হতে পারে। সুতরাং অবস্থাভেদে তার স্তর বিভিন্নরূপ হতে পারে। কিন্তু মুস্তাগনী ছাড়া সকলকে ফকীর বলা যায়। মুস্তাগনী ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। তবে নিজের বেপরওয়া অবস্থার জন্যে সে আল্লাহর তাওফীকের মুখাপেক্ষী বিধায় তাকে ফকীর বলা হবে।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ বলে দারিদ্র্য

থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং অন্য এক হাদীসে বলেছেন—

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

এ উক্তির মধ্যেও দারিদ্র্যের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর দরবারে এই বলে মোনাজাত করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا

অর্থাৎ, ইলাহী! আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ এবং মিসকীনরূপে মৃত্যু দান কর।

এই দোয়ায় দারিদ্র্যের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমরা উপরে দারিদ্র্যের যে ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পেশ করেছি, সেমতে হাদীসের উভয় প্রকার বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, যে দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে মুযতর তথা নিঃসহায় ব্যক্তির দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্য পর্যায়ক্রমে কুফরে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। পক্ষান্তরে যে দারিদ্র্যের তিনি প্রার্থনা করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে আপন অসহায়ত্ব, অপমান ও মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করা। অতএব, হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার স্ববিরোধিতা নেই।

দারিদ্র্যের ফযীলত ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থাৎ, সে সব ফকীর ও দেশত্যাগীদের জন্যে, যারা নিজের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি

অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করে। আরও এরশাদ হয়েছে—

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

অর্থাৎ, সে ফকীরদেরকে দেবে, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ। তারা দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করতে সক্ষম নয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশংসার স্থলে ফকীরকে মোহাজির গুণের পূর্বে এবং দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর পথে আবদ্ধ গুণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অগ্রগণ্যতার মাধ্যমে ফক্রের প্রশংসা বুঝা যায়।

হাদীস দ্বারাও ফক্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন- সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তারা আরয করলেন ঃ যে ধনী এবং নিজের ধন থেকে আল্লাহর হক আদায়কারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এ ব্যক্তি উত্তম! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সে নয়। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ তা হলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম! তিনি বললেন ঃ فَقِيْرٌ يُعْطِىْ جُهْدَهٗ যে ফকীর তার আয়াসলব্ধ বস্তু দান করে।

রসূলে করীম (সাঃ) একবার হযরত বেলালকে বললেন ঃ

اِلْقَ اللّٰهَ فَقِيْرًا وَّ لَا تَلْقِهٖ غَنِيًّا

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে ফকীর হয়ে সাক্ষাৎ কর—ধনী হয়ে নয়।

এক হাদীসে আছে—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এমন ছা-পোষা ফকীরকে পছন্দ করেন, যে সওয়াল করে না।

আরও এরশাদ হয়েছে—

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةٍ

অর্থাৎ, আমার উম্মতের ফকীররা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ বছর পূর্বে বর্ণিত রয়েছে। এতে মনে হয়, লোভী ফকীর লোভী ধনীর চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংসারবিমুখ ফকীর সংসারাসক্ত ধনীর তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ থেকে বুঝা যায়, লোভী ফকীর এবং যাহেদ ফকীরের মাঝে স্তরের পার্থক্য সাড়ে বার গুণ। কেননা, পাঁচশ' চল্লিশের সাড়ে বার গুণ বেশী। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, তা অর্থহীন কথার ন্যায় এমনিতেই মুখে উচ্চারিত হয়ে গেছে। বরং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে প্রকৃত সত্যই বর্ণনা করেছেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فُقَرَاءُ هَا وَاَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِى الْجَنَّةِ ضُعَفَاءُ هَا

অর্থাৎ, ফকীর হচ্ছে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর এই উম্মতের দুর্বলরা দ্রুত-জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اِنَّ لِىْ حِرْفَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَمَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ اَلْفَقْرُ وَالْجِهَادُ -

অর্থাৎ, আমার দুটি পেশা—ফকীরী ও জেহাদ। যে এ দুটিকে পছন্দ করবে, সে আমাকে পছন্দ করবে, আর যে এ দুটিকে অপছন্দ করবে, সে আমাকে অপছন্দ করবে।

একবার জিবরাঈল (আঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বললেন ঃ হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি যদি এই পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে আপনার অধিকারভুক্ত করে দেন, তবে আপনি তা পছন্দ করবেন কি না? রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছুক্ষণ নতমস্তকে চুপ করে থেকে বললেন ঃ হে জিবরাঈল!

إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

অর্থাৎ, যার ঘর নেই দুনিয়া তার ঘর, যার অর্থ-সম্পদ নেই, দুনিয়া তার অর্থ-সম্পদ আর যার বোধশক্তি নেই, সে দুনিয়া সঞ্চয় করে।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) জনৈক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করেন। সে চাদর জড়িয়ে ঘুমুচ্ছিল। তিনি তাকে জাগিয়ে বললেন ঃ হে ঘুমন্ত ব্যক্তি, উঠ এবং আল্লাহকে স্মরণ কর। সে বলল ঃ আপনি আমার কাছে কি চান? আমি দুনিয়া বিসর্জন দিয়েছি। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ হে বন্ধু, তা হলে ঘুমো।

আবু রাফে (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ)-এর ঘরে মেহমান আগমন করল। তখন তাঁর কাছে মেহমানের আতিথেয়তার জন্যে কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে খয়বরের এক ইহুদীর কাছে পাঠিয়ে বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন রজব মাসের মেয়াদে আমাকে আটা কর্জ দেয় অথবা বিক্রি করে তার মূল্য। নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ করব। আমি ইহুদীকে এ কথা বললে সে বলল ঃ আমি বন্ধক ছাড়া দেব না। আমি ফিরে এসে এ কথা আরয করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জেনে রাখ, আমি আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ত। সে আমাকে কর্জ দিলে অথবা বিক্রি করে তার মূল্য দিলে আমি অবশ্যই তা শোধ করতাম। যাও, আমার লৌহবর্ম তার কাছে বন্ধক রেখে এস। আমি বের হতেই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى -

অর্থাৎ, আপনি দৃষ্টি প্রসারিত করবেন না সে সম্পদের প্রতি, যা আমি নানা প্রকার লোকদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি। আপনার পালনকর্তার রিযিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনকে দুনিয়ার ব্যাপারে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

আতা খোরাসানী বলেন ঃ কোন এক পয়গম্বর নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে মৎস্য শিকার করতে দেখলেন। সে "বিসমিল্লাহ" (আল্লাহর নামে) বলে জাল নিক্ষেপ করল। কিন্তু একটি মাছও ধরা পড়ল না। অতঃপর তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে "বিসমিশ্ শয়তান" (শয়তানের নামে) বলে জাল নিক্ষেপ করল। তার জালে এত মাছ এল যে, সে ধরে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। পয়গম্বর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! ব্যাপার কি? আমি জানি, সবকিছুই আপনার কুদরতের অধীন। কিন্তু এ কি দেখলাম? আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন আমার বান্দাকে এই দুই শিকারীর মর্তবা দেখিয়ে দাও। পয়গম্বর যখন প্রথম শিকারীর বুযুর্গী ও মাহাত্ম্য এবং দ্বিতীয় শিকারীর লাঞ্ছনা ও অবমাননা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন ঃ ইলাহী! আমি বুঝে ফেলেছি।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে ফকীর দেখেছি এবং দোযখে উঁকি দিয়ে সেখানকার অধিকাংশ লোককে ধনী ও মহিলা দেখেছি। হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে— পয়গম্বরগণের মধ্যে সবার পেছনে হযরত সোলায়মান (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এর কারণ তাঁর সাম্রাজ্য। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ধনাঢ্যতার কারণে সকলের পরে জান্নাতে যাবেন। হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—ধনী ব্যক্তি খুব পরিশ্রম সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, ইলাহী! তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার বন্ধু কারা? আমিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। উত্তর হল ঃ প্রত্যেক ফকীর ও অভাবগ্রস্ত লোক আমার বন্ধু।

একবার আরবের গোত্রপতি ও ধনী ব্যক্তিরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আমাদের জন্যে একদিন এবং ফকীরদের জন্যে একদিন নির্দিষ্ট করে দিন। যেদিন তারা আপনার কাছে আসবে, সেদিন আমরা আসব না। আর যেদিন আমরা আসব, সেদিন তারা আসতে

পারবে না। বলা বাহুল্য, ফকীর বলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত বেলাল, সালমান ফারেসী, সোহায়ব রূমী, আবুযর গেফারী, খাব্বাব ইবনে ইরত, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু হুরায়রা প্রমুখ নিঃস্ব ব্যক্তিবর্গ। দারিদ্র্যের কারণে তারা পশমের পোশাক পরতেন। তীব্র গরমের দিনে তাদের ঘর্মাক্ত পোশাক থেকে দুর্গন্ধ বের হত। এটাই ছিল উদ্ধত ধনীদের নাক ছিটকানোর প্রধান কারণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলে দিলেন ঃ আচ্ছা, আমি তাই করব। একই মজলিসে তোমাদেরকে একত্রিত করব না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ অবতীর্ণ হল ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি।

উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ফকীরদের সাথে থাকুন— ধনীদের আনুগত্য করবেন না।

অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে জনৈক কোরায়শ সরদার উপস্থিত ছিল। এমন সময়ে ইবনে উম্মে মাকতুমের সেখানে আসা এবং প্রবেশের অনুমতি চাওয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অপ্রিয় মনে হয়। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكي او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى -

অর্থাৎ, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। কে আপনাকে তার সম্পর্কে অবগত করল। সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর এ উপদেশ তাকে উপকৃত করত। আর যে বিত্তশালী, আপনি তার প্রতি মনোযোগী।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ফকীরকে ডেকে এমনভাবে উযরখাহী করবেন, যেমন মানুষ একে অপরের সাথে উযরখাহী করে। আল্লাহ বলবেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি দুনিয়াকে তোমার কাছ থেকে এজন্যে বিচ্ছিন্ন রাখিনি যে, তুমি আমার কাছে হেয় ছিলে; বরং এর কারণ ছিল এই যে, এখানে তোমার জন্যে সম্মান ও মাহাত্ম্য মওজুদ রেখেছিলাম। এখন তুমি এই কাতারগুলোতে যাও এবং সে ব্যক্তিকে চিনে নাও, যে দুনিয়াতে একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাকে অন্ন দিয়েছে এবং বস্ত্র দিয়েছে। তুমি তার হাত ধরে নাও। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমি তোমাকে দিলাম। তখন মানুষ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকবে। এই ব্যক্তি কাতার চিরে চিরে দেখবে, তার সাথে এরূপ ব্যবহার কে করেছে। যাকে এরূপ পাবে, তার হাত ধরে সে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— ফকীরদেরকে ভাল করে চিনে নিও এবং তাদের কাছ থেকে নেয়ামত হাসিল করো। কেননা, তাদের কাছে ধন আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তাদের কাছে কি ধন আছে? উত্তর হল— কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে—দেখ, যে তোমাদেরকে এক মুঠো খাদ্য দিয়েছে অথবা এক চুমুক পানি দিয়েছে অথবা বস্ত্র দিয়েছে, তার হাত ধর এবং জান্নাতে পৌঁছিয়ে দাও।

হযরত এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আমার যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। একদিন তিনি বললেন ঃ আমি তোমার ইযযত করি। আমি আমার কলিজার টুকরা ফাতেমাকে দেখতে যাব। সে অসুস্থ।

আমি আরয করলাম। ভাল কথা চলুন। তিনি রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। হযরত ফাতেমার ঘরের দরজায় পৌঁছে তিনি দরজায় টোকা দিয়ে বললেন ঃ আসসালামু আলাইকুম, আমি ভেতরে আসতে পারি কি? হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আব্বাজান, আপনি আসুন। তিনি বললেন ঃ আমি এবং আমার সাথী উভয়েই আসব কি? প্রশ্ন হল ঃ আপনার সাথী কে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ এমরান। হযরত ফাতেমা আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন— এখন আমার গায়ে একটি কম্বল ছাড়া কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতে ইশারা করে বললেন ঃ কম্বলটি এভাবে জড়িয়ে নাও। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন ঃ আমি দেহ আবৃত করেছি; কিন্তু মাথা কি দ্বারা আবৃত করব? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গায়ে একটি পুরাতন চাদর ছিল। তিনি তা কন্যার দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি দিয়ে মাথা বেঁধে নাও। এভাবে তিনি গা ও মাথা আবৃত করার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসসালমু আলাইকুম বলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাছা, সকালে তোমার অবস্থা কেমন ছিল? উত্তর হল ঃ আমি ব্যথায় আক্রান্ত ছিলাম। দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, আমার কাছে খাওয়ারও কিছু নেই। আমি ক্ষুধায় কষ্ট করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ বাছা, উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম, আমিও তিন দিন ধরে কিছু খেতে পাইনি। আল্লাহ আমার ইযযত তোমার চেয়ে বেশী দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করলে তিনি আমাকে খাওয়াতেন, কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এরপর তিনি নিজের হাত হযরত ফাতেমার (রাঃ) কাঁধে রেখে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ, তুমি জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী। তিনি আরয করলেন ঃ ফেরাউন-পত্নী আসিয়া এবং এমরান-তনয়া মরিয়মের মর্তবা কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আসিয়া তার সময়কার মহিলাদের নেত্রী, মরিয়ম তার সময়কার, খাদীজা তার সময়কার এবং তুমি তোমার সময়কার মহিলাদের নেত্রী। তোমরা সকলেই এমন ঘরে থাকবে, যা পান্না নির্মিত অথবা পদ্মরাগ মণি খচিত হবে। এতে কোন প্রকার কষ্ট, শোরগোল ও ক্লান্তি নেই। তিনি আরও বললেন ঃ আমার পিতৃব্য পুত্র আলীকে নিয়েই তুষ্ট থাক। আমি তোমার

বিবাহ এমন ব্যক্তির সাথে দিয়েছি, যে দুনিয়াতেও সরদার এবং আখেরাতেও সরদার।

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন মানুষ তাদের ফকীরদের খারাপ মনে করতে থাকবে, নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করতে থাকবে এবং অর্থ সঞ্চয়ে পারস্পরিক কলহে লিপ্ত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চারটি বিপদের লক্ষ্যস্থল করে দেবেন—প্রথম দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় যুলুম ও অবিচার, তৃতীয় শাসকবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চতুর্থ শত্রুদের জোর।

ফকীর শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মহাজ্ঞানীদের উক্তিও অনেক বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ এক দেরহামওয়ালার তুলনায় দু' দেরহামওয়ালা কঠিনতম হিসাবের সম্মুখীন হবে।

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) একবার সাঈদ ইবনে আমরের কাছে এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত বিষণ্ন মনে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, নতুন কোন ঘটনা ঘটল নাকি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা ভাবছ, তার চেয়েও গুরুতর ঘটনা। তোমার পুরাতন ওড়নাটি আমাকে দাও। ওড়না আনা হলে তিনি সেটি ছিঁড়ে থলে তৈরি করলেন এবং তাতে দীনারগুলো ভরে বন্টন করে দিলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং ভোর পর্যন্ত ক্রন্দন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— আমার উম্মতের ফকীররা ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমনকি, যদি কোন ধনী তাদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যায়, তাকে হাত ধরে বের করে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে বেহিসাব প্রবেশ করবে—এক, যে ব্যক্তি আপন কাপড় ধুতে চাইলে পরার জন্যে অন্য কাপড় থাকে না। দুই, যার চুলায় দু' পাতিল চড়ে না এবং তিন, কেউ পানি চাইলে জিজ্ঞেস করা হয় না যে, কোন্ পানি চাও? অর্থাৎ, যাদের পানাহার ও পোশাকে প্রাচুর্য ও লৌকিকতা নেই।

বর্ণিত আছে, জনৈক ফকীর হযরত সুফিয়ান ছওরীর মজলিসে আগমন করলে তিনি তাকে বললেন ঃ এস, আমার কাছে এস। তুমি ধনী হলে

আমি কাছে ডাকতাম না। তাঁর ভক্তদের মধ্যে যারা ধনী ছিল, তারা কামনা করত, হায়! আমরাও যদি ফকীর হতাম! কারণ, তিনি ফকীরদেরকে অধিক পরিমাণে কাছে বসাতেন এবং ধনীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

মুসেল (রহঃ) বলেন ঃ আমি ধনীকে তাঁর মজলিসে যতটা হেয় দেখেছি, ততটা কোথাও দেখিনি। তাঁর দরবারে ফকীরের যে সম্মান ও ইযযত দেখেছি, তা আর কোথাও নজরে পড়েনি।

জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ বেচারী মানুষ যদি দোযখকে ততটুকু ভয় করত, যতটুকু ফকীরীকে ভয় করে, তবে উভয়টি থেকেই মুক্তি পেয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি জান্নাতের আগ্রহ সেই পরিমাণে করত, যে পরিমাণে ধনাঢ্যতার আগ্রহ করে, তবে উভয়টিই হাসিল হয়ে যেত। আর যদি অন্তরে আল্লাহকে ততটুকু ভয় করত, যতটুকু দৃশ্যত মানুষকে ভয় করে, তবে উভয় জাহানে সৌভাগ্যশালী হয়ে যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধনীত্বের কারণে কারও সম্মান করে এবং ফকীরীর কারণে কাউকে হেয় মনে করে, সে অভিশপ্ত।

হযরত লোকমান একদিন তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বাছা, পুরাতন ছেঁড়া পোশাক দেখে কাউকে হেয়জ্ঞান করো না। কেননা, তোমার ও তার পালনকর্তা একজন-ই।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ ফকীরদের মহববত পয়গম্বরগণের অন্যতম অভ্যাস এবং তাদের সাথে উঠাবসা সৎকর্মশীল হওয়ার পরিচায়ক। আর তাদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা মোনাফেকির অন্যতম লক্ষণ।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি একদিনে লাখ লাখ দেরহাম বন্টন করে দিতেন। এসব দেরহাম তিনি হযরত মোয়াবিয়া, ইবনে আমের প্রমুখের কাছ থেকে পেতেন। অর্থকড়ির এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর ওড়না ছিল তালিযুক্ত। তাঁর পরিচারিকা বলতো, আপনি এক দেরহামের গোশ্ত আনিয়ে নিলে তা দ্বারা ইফতার করা যেত। তিনি এর জওয়াবে বলতেন— আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তাই করতাম। ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর এই বিমুখতার কারণ ছিল এই যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে ওসিয়ত করেছিলেন, আয়েশা! যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে

ফকীরের মত জীবন নির্বাহ করবে এবং ধনীদের কাছে বসবে না। তালি না লাগা পর্যন্ত নিজের ওড়না বাদ দেবে না।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের খেদমতে এক হাজার দেরহাম পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। লোকটি অনেক পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও, দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে আমার নাম ফকীরদের তালিকা থেকে বাদ পড়ুক। আমি কখনও তা হতে দেব না।

সত্যবাদী ও অল্পে তুষ্ট লোকদের দারিদ্র্য ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি সুখী, যে ইসলামের পথপ্রাপ্ত হয়েছে, যার জীবন যাপন প্রয়োজন মাফিক এবং সে এতে সন্তুষ্ট।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

يَامَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللّٰهَ الرِّضٰى مِنْ قُلُوْبِكُمْ تَظْفَرُوْا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَاِلَّا فَلَا

অর্থাৎ, হে ফকীর সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে আন্তরিক সম্মতি জ্ঞাপন কর। এতে তোমরা তোমাদের দারিদ্র্যে সওয়াব লাভে সাফল্যমণ্ডিত হবে— নতুবা নয়।

প্রথম হাদীস দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা নিয়ে সন্তুষ্ট ব্যক্তির ফযীলত জানা যায় এবং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা দারিদ্র্যে সম্মত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। দ্বিতীয় হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মনে হয়, লোভী ব্যক্তি দারিদ্র্যের সওয়াব পায় না। সম্ভবত এখানে লোভীর অর্থ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়া না দেয়ার কাজকে মন্দ মনে করে। এই মন্দ মনে করার কারণে সে দারিদ্র্যের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

হযরত উমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর একটি চাবি আছে। জান্নাতের চাবি হচ্ছে মিসকীনদের মহব্বত। ধৈর্যশীল ফকীর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সহচর হবে। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম বান্দা, যে আল্লাহর দেয়া রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে। এক হাদীসে বলা হয়েছে।

مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِىٍّ اَوْ فَقِيْرٍ اِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهُ كَانَ اُوْتِىَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, প্রত্যেক ধনী ও ফকীর কিয়ামতের দিন বাসনা করবে যে, দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণে ধন-সম্পদ পেলেই ভাল হত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার মনোনীত বান্দারা কোথায়? ফেরেশতারা আরয করবে, ইলাহী! আপনার মনোনীত বান্দা কারা? উত্তর হবে—মুসলমান ফকীর, যারা আমার দানে তুষ্ট এবং আদেশে সম্মত। তাদেরকে জান্নাতে দাখিল কর। সুতরাং তারা জান্নাতে খাওয়া-পরা করবে, আর অন্যরা হিসাব-নিকাশে আটকে থাকবে।

অল্পে তুষ্টির বিপরীত হচ্ছে লালসা। হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ লালসা হচ্ছে অভাবগ্রস্ততা এবং মানুষের কাছ থেকে নৈরাশ্য হচ্ছে ধনাঢ্যতা। যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পত্তি আশা করে না, সে ধনী হয়ে যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিতে ক্রটি আছে। কারণ, দুনিয়ার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়। অথচ দিবারাত্রির চক্র তার আয়ুকে অনবরত করাত দিয়ে কাটতে থাকে, সে জন্য সে দুঃখিত হয় না। আরে হতভাগা! আয়ুষ্কাল কমে গেলে ধন-সম্পদের বৃদ্ধি কি কাজে আসবে?

বর্ণিত আছে, ইবরাহীম ইবনে আদহাম খোরাসানের ধনকুবের ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি নিজ প্রাসাদের জানালা পথে নিচে তাকিয়ে দেখলেন প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি একটি রুটি খাচ্ছে। খাওয়া শেষ

হয়ে গেলে লোকটি সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ইবরাহীম তাঁর চাকরকে বললেন ঃ এই ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। চাকর তাই করল। লোকটি সামনে এলে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সেই রুটিটি খেয়েছিলে? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এতেই তৃপ্ত হয়ে গেছ? এরপর পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়েছ? লোকটি উত্তর দিল ঃ হাঁ। ইবরাহীম মনে মনে বললেন ঃ মন যখন এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করে আমি কি করব?

জনৈক ব্যক্তি আমের ইবনে আবদুল কায়েসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন লবণ ও শাক খাচ্ছিলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে এতটুকু নিয়েই কি তুষ্ট হয়ে গেছেন? আমের বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে এর চেয়ে নগণ্য বস্তু নিয়ে রাযী হয়েছে। সে সেই ব্যক্তি, যে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া নিয়ে তুষ্ট হয়।

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' শুকনা রুটি বের করতেন এবং পানিতে ভিজিয়ে লবণ দিয়ে খেয়ে নিতেন। তিনি বলতেন— যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে এতটুকুতে রাযী হয়ে যায়, সে কারও মুখাপেক্ষী হয় না।

হযরত হাসান বসরী বলতেন—আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করুন, যাদের জন্যে তিনি কসম খেয়েছেন; কিন্তু তারা তাঁর উক্তিকে সত্য জ্ঞান করে না। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ -

অর্থাৎ, আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা কিছু প্রতিশ্রুত। অতএব, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভুর শপথ, এটা অবশ্যই সত্য।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) একদিন জনসমাবেশে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে বললেন— আপনি এখানে লোকজনের মধ্যে বসে আছেন, অথচ ঘরে যে খাবার বলতে কিছু নেই! তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আমাদের সামনে একটি দুর্গম উপত্যকা রয়েছে। সেখানে সেই

আত্মরক্ষা করতে পারবে, যে হালকা হবে। তাঁর পত্নী একথা শুনে খুশী হয়ে চলে গেলেন।

হযরত উসমান যুন্নুরাইন (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপবাসে সবর করে না, সে কুফরের অধিক নিকটবর্তী।

ধনাঢ্যতার বিপরীতে দরিদ্রতার ফযীলত ঃ এ সম্পর্কে নানা মনীষীর নানা মত। হযরত জুনায়দ, খাওয়াস প্রমুখসহ অধিকাংশ বুযুর্গ দরিদ্রতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেন। কিন্তু ইবনে আতা বলেন, যে শোকরকারী ধনী সব রকম হক আদায় করে, সে সবরকারী দরিদ্র অপেক্ষা উত্তম। এই বিরুদ্ধ মত পোষণ করার কারণে হযরত জুনায়দ তাকে বদদোয়া দেন।

কিন্তু ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও মহাজ্ঞানীদের উক্তি থেকে তাই জানা যায়। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, দুটি জায়গায় সন্দেহ থেকে যায়। প্রথমত, যে সবরকারী ফকীর অর্থোপার্জনের লোভ করে না, তাকে অর্থ খয়রাতকারী ও অর্থ আটকে রাখার ব্যাপারে নির্লোভ ধনীর বিপরীতে দেখলে ধারণা হয়, ধনী ফকীরের তুলনায় উত্তম। কেননা, অর্থের লোভ উভয়ের মধ্যে কম। এতে তারা সমান সমান; কিন্তু ধনী সদকা-খয়রাত করে সওয়াব হাসিল করে, যা ফকীরের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, লোভী ফকীরকে লোভী ধনীর বিপরীতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, ধনী উত্তম।

আমাদের মতে এ দুটি জায়গায়ই ইবনে আতার বক্তব্য লক্ষণীয়। কিন্তু যে ধনী ধন-সম্পদ উপভোগ করে, তা বৈধ পন্থায় করলেও সে নির্লোভ ফকীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এর দলীল হাদীসে বর্ণিত এই রেওয়ায়েত যে, একবার ফকীররা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করল— ধনীরা দান-খয়রাত, সাদাকাত, হজ্জ ও জেহাদে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ওযীফা হিসাবে কয়েকটি কলেমা শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এসব কালেমা পাঠ করলে তোমরা ধনীদের তুলনায় বেশী সওয়াব পাবে। এরপর ধনীরাও টের পেয়ে এসব কালেমা শিখে নিল এবং পড়তে শুরু করল। ফকীররা পুনরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল ঃ এখন তো ধনীরাও এসব কালেমা পড়তে শুরু করেছে। এখন কি করা যায়? এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ, এটি হল আল্লাহর কৃপা। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এ থেকে বাহ্যত ধনীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। কিন্তু এই হাদীসের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও বর্ণিত আছে। তা এই যে, তাসবীহ পাঠে ফকীরের সওয়াব ধনীর সওয়াবের চেয়ে বেশী এবং এটা আল্লাহ তা'আলার কৃপা, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। অর্থাৎ, হাদীসে ذلى (এটা) বলে ফকীরের সওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—ধনীর সওয়াবের দিকে নয়।

এই ব্যাখ্যার সপক্ষে যায়েদ ইবনে আসলামের একটি রেওয়ায়েত, যা তিনি আনাস ইবনে মালেকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন— তা পেশ করা হল। সে হাদীসে আছে যে, ফকীররা এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠাল। সে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ফকীরদের প্রেরিত দূত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাকেও মারহাবা এবং যাদের কাছ থেকে এসেছ, তাদেরকেও মারহাবা। তাদেরকে আমি পছন্দ করি। দূত আরয করল ঃ ধনী হজ্জ করে—আমরা করতে পারি না। তারা ওমরা করে —আমাদের ক্ষমতা নেই। তারা অসুস্থ হলে তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করে। এভাবে সমস্ত সওয়াবই তারা নিয়ে যায়। ফকীররা সওয়াব হাসিল করতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ ফকীরদেরকে আমার পক্ষ থেকে বলে দিও—তোমাদের যে কেউ সবর করবে এবং সওয়াবের প্রত্যাশী হবে, তার জন্যে তিনটি বিষয় অর্জিত হবে, যা ধনীদের অর্জিত হবে না। প্রথম এই যে, জান্নাতে অনেক খিড়কী হবে, যেগুলো জান্নাতবাসীরা এমনভাবে দেখবে, যেমন পৃথিবীর লোক আকাশের তারকাকে দেখে। এই খিড়কীদার জান্নাতে পয়গম্বর ফকীর, শহীদ ফকীর এবং ঈমানদার ফকীর ছাড়া কেউ যাবে না। দ্বিতীয়ত, ফকীররা ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। তৃতীয়ত, ধনী যখন বলে সোবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর এবং ফকীরও তাই বলে, তখন ধনী ফকীরদের সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যদিও দশ হাজার দেরহাম খয়রাত করে। অন্যান্য সৎকর্মকেও এমনি মনে করা উচিত। দূত একথা শুনে ফিরে এল এবং ফকীরদেরকে অবহিত করল। তারা সমস্বরে বলে উঠল ঃ আমরা

রাযী, আমরা নিরুদ্বেগ। এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ বলে ফকীরদের সওয়াব বেশী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করলেও ফকীর বিপদাশংকা থেকে অধিকতর দূরে থাকে। কেননা, ধনাঢ্যতার ফেতনা নিঃস্বতার ফেতনা থেকে অধিক তীব্র হয়ে থাকে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম বলেন ঃ আমরা নিঃস্বতার ফেতনায় সবর করে বেঁচে গেলাম। কিন্তু ধনাঢ্যতার ফেতনায় সবর করতে পারলাম না। এটা প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। খুব কম লোকই এ থেকে মুক্ত। শরীয়তের বিধান বিরল ব্যক্তিদের জন্যে নয়; বরং সকলের জন্যে। নিঃস্বতা সকলের জন্যে উপযোগী— যদিও বিরল ব্যক্তির জন্যে নয়; তাই শরীয়ত ধনাঢ্যতার নিন্দা করেছে এবং দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করেছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—দুনিয়াদারদের ধন-দৌলতের দিকে তাকিও না। তাদের ধন-দৌলতের চাকচিক্য তোমার ঈমানের নূরকে বিলীন করে দেবে। জনৈক আলেম বলেন ঃ ধন-দৌলতের আগমন ঈমানের মিষ্টতা হরণ করে। হাদীসে আছে— প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি গোবৎস আছে। আমার উম্মতের গোবৎস হচ্ছে দেরহাম ও দীনার। ইহুদীদের গোবৎসও স্বর্ণ ও রূপার অলংকার দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

সারকথা, অর্থ ও পানি এবং স্বর্ণ ও পাথর সমান হওয়া ওলী ও পয়গম্বরগণের বেলায় সম্ভব। তারাও এটা পূর্ণরূপে তখন অর্জন করেন, যখন আল্লাহর অনুগ্রহে বিস্তর মোজাহাদা ও সাধনা করে নেন। সেমতে দুনিয়া যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সুসজ্জিত ও কামনার মূর্তি হয়ে ধরা দিত, তখন তিনি দুনিয়াকে বলতেন ঃ আমার কাছ থেকে দূরে থাক। হযরত আলী (রাঃ) বলতেন ঃ হে চকচকে সোনা, যা অন্য কাউকে ধোকা দে এবং হে ধবধবে রূপা, যা অন্য কারও সাথে ছলনা কর। তিনি যখন মনে দুনিয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার প্ররোচনা অনুভব করতেন, তখন উপরোক্ত বাক্য বলতেন। অন্তরে ধন ও পানির মূল্য সমান হওয়াকে বলা হয় "গিনায়ে মুতলক" তথা ধনাঢ্যতা। হাদীসে আছে—অন্তরের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা—সম্পদের ধনাঢ্যতা নয়। শেখ সা'দী এর তরজমা করে বলেন—তাওয়াঙ্গরী বদিল আস্ত, না বমাল। যেহেতু এটা সুকঠিন, তাই

ধন-সম্পদ না থাকার মধ্যেই সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিহিত থাকা উচিত, যদিও ধন-সম্পদ থাকে তা কেবল দান-খয়রাতের মধ্যেই ব্যয় করে। কেননা, ধন-সম্পদ হাতে এলে তার প্রতি টান সৃষ্টি হওয়া এবং তা সুখের জন্যে ব্যয় করার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে, ইহজগতের মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং পরজগতের প্রতি অনীহা আত্মপ্রকাশ করে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের কারণসমূহ অপসারিত হয়ে গেলে অন্তরও দুনিয়া ও দুনিয়ার সাজসজ্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্তর আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। কেননা, অন্তর কোন সময় খালি থাকে না। যে অন্তর গায়রুল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, সে অন্তর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর যে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়, সে গায়রুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। অন্তর যে পরিমাণে একদিকে ধাবিত হবে, সে পরিমাণে অপরদিক থেকে দূরবর্তী হবে এবং যতটুকু একদিকের নিকটবর্তী হবে, ততটুকু অপরদিক থেকে দূরবর্তী হবে। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি তার অন্তরের দিকেই থাকা উচিত যে, সে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয় কিনা? তার প্রতি আসক্ত হয় কিনা? মোটকথা,অর্থ-সম্পদের সাথে অন্তরের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই ধনী ও দরিদ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়।

সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন ধনাঢ্যতা অর্জিত হওয়া যখন অসম্ভব অথবা অত্যন্ত দুরূহ, তখন একথা বলাই সঙ্গত যে, সাধারণ মানুষের জন্যে দারিদ্র্যই উত্তম। কেননা, দুনিয়ার সাথে ফকীরের সম্পর্ক ও টান কম থাকে। এ সম্পর্ক যত দুর্বল হয়, ততই তাসবীহ ও এবাদতের সওয়াব বেশী হয়। কেননা, তাসবীহের উদ্দেশ্য শুধু জিহ্বার নড়াচড়া নয়; বরং যার তাসবীহ পাঠ করা হয়, তার সাথে সম্পর্ক গাঢ় হওয়াই উদ্দেশ্য। এ কারণেই জনৈক মনীষী বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়া অন্বেষণে রত অবস্থায় বৈরাগ্য ও এবাদত করে, সে এমন, যেমন কেউ খড়-কুটা দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করতে চায়। হযরত সোলায়মান দারানী বলেন ঃ কামনা-বাসনামুক্ত অবস্থায় ফকীরের শ্বাসগ্রহণ ধনীর হাজার বৎসরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে পছন্দের বস্তু দেখে, অতঃপর সবর করে ও সওয়াবের প্রত্যাশা করে, এটা তার জন্যে আল্লাহর পথে হাজার দীনার ব্যয় করা অপেক্ষা শ্রেয়!

জনৈক ব্যক্তি বশীর ইবনে হারেসকে বলল ঃ আপনি আমার জন্যে

দোয়া করুন, পরিবারের লোকজন আমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তোমার পরিবারের লোকজন আটার রুটি নেই বলে অভিযোগ করতে থাকে, তখন তুমি আমার জন্যে দোয়া করো। কেননা, তোমার সেই সময়কার দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ধনীদের মুখ থেকে মারেফাতের কথা শুনা পছন্দ করতেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এরূপ দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الذُّلَّ عِنْدَ الْمُتَعَنِّفِ مِنْ نَفْسِىْ وَالزُّهْدَ فِيْمَا جَاوَزَ الْكِفَافَ -

অর্থাৎ, ইলাহী! আমার নফস যখন পূর্ণ হক চায়, তখন আমি তোমার কাছে অপমান প্রার্থনা করি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে তোমার কাছে বৈরাগ্য প্রার্থনা করি।

হযরত আবু বকর ছিলেন কামেল ও পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ। তিনিই যখন দুনিয়াকে ভয় করেছেন, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, ধন-সম্পদ না থাকা, থাকার চেয়ে শ্রেয়।

এছাড়া ধনীর অবস্থাসমূহের মধ্যে উত্তম অবস্থা হালাল উপার্জন করা এবং সৎকাজে ব্যয় করা। এ সত্ত্বেও কিয়ামতের মাঠে তার হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হবে এবং অনেক সময় আটকে থাকতে হবে। হাদীস অনুযায়ী সে হিসাবের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে পড়বে, সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। এ কারণেই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমার দোকান মসজিদের দরজায় অবস্থিত হয়, ফলে কোন নামায ফওত না হয় এবং প্রত্যহ পঞ্চাশ দীনার করে লাভ হয়, যা আমি আল্লাহর পথেই ব্যয় করি, তবু আমি এটাকে পছন্দ করব না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এতে খারাপ কি দেখলেন ঃ তিনি বললেন ঃ হিসাব-নিকাশের দীর্ঘসূত্রতা।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ ফকীররা তিনটি বিষয় এবং ধনীরা তিনটি বিষয় পছন্দ করেছে। ফকীরদের পছন্দ করা বিষয়গুলো হচ্ছে— মনের প্রশান্তি, অন্তরের ঝামেলামুক্ততা এবং হিসাব-নিকাশের দ্রুততা। পক্ষান্তরে ধনীদের পছন্দ করা তিনটি বিষয় হচ্ছে— মানসিক কষ্ট, অন্তরের ব্যাপৃত থাকা এবং হিসাব-নিকাশ কঠোর হওয়া।

এ পর্যন্ত অল্পেতুষ্ট ফকীর ও শোকরকারী ধনী সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন লোভী ফকীর ও লোভী ধনী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, তাদের মধ্যে উত্তম কে?

মনে কর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের অভিলাষী এবং সেজন্য চেষ্টাচরিত্রও করে, কিন্তু ধন-সম্পদ পায় না। এরপর ঘটনাচক্রে সে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে গেল। এ ব্যক্তি লোভী ফকীর এবং লোভী ধনী উভয় বিশেষণে বিশেষিত। তার এ দুটি বিশেষণের মধ্যে কোন্ বিশেষণটি উত্তম, তাই দেখতে হবে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এ ব্যক্তি যদি এতটুকু ধন-সম্পদের অভিলাষী হয়, যতটুকু জীবিকা ও জীবনের জন্যে জরুরী এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে ধর্মের পথ অতিক্রম করা ও তাতে সাহায্য নেয়া, তবে তার জন্যে ধন-সম্পদ থাকা উত্তম। কেননা, দারিদ্র্য জীবিকা অন্বেষণে ব্যাপৃত রাখে, ফলে যিকির ও এবাদত ঠিকমত হতে পারে না। তাই রসূলে করীম (সাঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كِفَافًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ পরিবারের খাদ্য ততটুকু কর, যতটুকু জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন— كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا

অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরের নিকটবর্তী।

এখানে দারিদ্র্য অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুপস্থিতি।

পক্ষান্তরে যদি প্রার্থিত ধন-সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় অথবা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হয় কিন্তু উদ্দেশ্য ধর্মের কাজে সাহায্য নেয়া না হয়, তবে দারিদ্র্যাবস্থাই উত্তম ও শ্রেয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে অর্থের লোভ ও ধন-সম্পদের মোহে ফকীর ও ধনী উভয়েই সমান এবং ধর্মের কাজে সাহায্য না নেয়ার মধ্যেও সমান। কিন্তু পার্থক্য এই, যার কাছে ধন-সম্পদ থাকবে, তার মনে ধনের মহব্বত থাকবে আর যার কাছে থাকবে না, তার মন এই মহব্বত থেকে মুক্ত থাকবে। দুনিয়া তার কাছে কয়েদখানার মত মনে হবে, যা থেকে সে নিষ্কৃতি চাইবে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর সময় যার মন দুনিয়ার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকবে, তার অবস্থা অপরের চেয়ে খারাপ

হবে। হাদীস শরীফে আছে, পবিত্রাত্মা আমার মনে একথা বদ্ধমূল করেছেন যে, احبب من احببت فانك مفارقه অর্থাৎ, যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করে নাও। তোমাকে তার কাছ থেকে অবশ্যই পৃথক হতে হবে।

এতে বুঝানো হয়েছে যে, প্রিয়জনের বিরহ অত্যন্ত কঠিন। অতএব এমন ব্যক্তিকে বন্ধু করা উচিত, যে কখনও পৃথক হয় না। বলা বাহুল্য, সে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা।

ফকীরের আদব ঃ ফকীরের জন্যে অন্তরে, বাইরে, লোকের সাথে মেলামেশায় এবং স্বীয় কাজেকর্মে কয়েকটি আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। অন্তরের আদব হল আল্লাহ তা'আলা তাকে যে অবস্থায় ফেলেছেন, তার প্রতি অনীহা না থাকা। অর্থাৎ, অন্তরে ফকীরীকে খারাপ মনে করবে না এবং ভাববে না যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নি। এটা সর্বনিম্ন স্তর এবং ফকীরের জন্যে এটা ওয়াজিব। এর খেলাফ হারাম। রসূলে করীম (সাঃ)-এর উক্তির উদ্দেশ্যও তাই। তিনি বলেন ঃ হে ফকীর সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন কর, যাতে তোমরা তোমাদের ফকীরীর সওয়াব পাও, অন্যথায় সওয়াব পাবে না। এর উপরের স্তর হচ্ছে ফকীরীতে খুশী থাকা। আরও উপরের স্তর হচ্ছে ফকীরী প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা যে, প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ তিনি অবশ্যই দেবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ফকীরী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিও দেন, সওয়াবও দেন। সওয়াব দেয়ার পরিচয় এই, তিনি বান্দার অভ্যাস ভাল করে দেন। ফলে, সে পরওয়ারদেগারের আনুগত্য করে এবং কারও কাছে নিজের দারিদ্র্যের অভিযোগ করে না; বরং সে জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে শাস্তি দেয়ার আলামত এই, ফকীর চরিত্রহীন হয়, আল্লাহর নাফরমানী করে এবং ঘনঘন অভিযোগ করে। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ফকীরী ভাল নয়; বরং যে ফকীরীতে অসন্তুষ্টি ও অভিযোগ নেই, তাই ভাল।

ফকীরের বাহ্যিক আদব হল, কারও কাছে না চাওয়া, নিজের সুখ ও সচ্ছলতা প্রকাশ করা, কারও কাছে অভিযোগ না করা এবং দারিদ্র্যকে গোপন রাখা বরং এই গোপন রাখাকেও গোপন রাখা। হাদীস শরীফে

আছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা অভাবগ্রস্ত ফকীরকে ভালবাসেন— যে সওয়াল করা থেকে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন —

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

অর্থাৎ, সওয়াল না করার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তি তাদেরকে ধনী মনে করে।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় সহনশীলতা উত্তম আমল। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ দারিদ্র্য গোপন করা পুণ্যের অন্যতম ভান্ডার।

অন্যের সাথে ফকীরের মেলামেশার আদব হল এই, কোন ধনীর সামনে তার ধনাঢ্যতার কারণে বিনয়ী হবে না, বরং অহংকার করবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সওয়াব লাভের আশায় ফকীরের সামনে ধনীর বিনয়ী হওয়া খুবই উত্তম। এর চেয়েও উত্তম হচ্ছে ধনীর সামনে ফকীরের অহংকার করা। আল্লাহর উপর ভরসা করে ফকীরের এ অবস্থাটি হচ্ছে একটি উচ্চ মর্তবা। কিন্তু নিম্ন মর্তবা হল, ফকীরের ধনীদের কাছে না বসা এবং ধনীদেরকে নিজের কাছে বসাতে আগ্রহী না হওয়া। কেননা, এগুলোই হচ্ছে লোভ ও লালসার উৎস।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ ফকীর ধনীদের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে জানবে, সে রিয়াকার আর বাদশাহের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে মনে করবে, সে চোর। জনৈক সাধক বলেন ঃ ফকীর যখন ধনীদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তার আস্থা ঢিলে হয়ে যায়। যখন তাদের কাছে প্রত্যাশা করে, তখন পবিত্রতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর যখন তাদের মধ্যে বসবাস করতে থাকে, তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ফকীরের উচিত, ধনীদের খাতিরে ও তাদের দান পাওয়ার লোভে সত্যপ্রকাশে দ্বিধা না করা। বরং সে যা সত্য ও সঠিক মনে করবে, তা বলে দেবে।

ফকীরের নিজের ক্রিয়াকর্মে আদব হল ফকীরীর কারণে কোন এবাদতে অলসতা না করা এবং খরচ বাদে কিছু অর্থ বেঁচে গেলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে দ্বিধা না করা। কেননা, স্বল্প পুঁজিওয়ালার চেষ্টা ও সাধনা এটাই। এর সওয়াব ধনীর দেয়া অনেক ধনের সওয়াবের চেয়ে বেশী। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, খয়রাতের এক দেরহাম আল্লাহ তা'আলার কাছে লক্ষ দেরহামের চেয়ে উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ এটা কিরূপে হতে পারে? তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি তার অগাধ ধন-সম্পদ থেকে এক লক্ষ দেরহাম বের করে খয়রাত করল। অপরদিকে এক ব্যক্তির কাছে দু'দেরহাম ছাড়া কিছুই ছিল না। সে তা থেকে মনের খুশীতে এক দেরহাম দান করে দিল। এখানে এক দেরহামওয়ালা লক্ষ দেরহামওয়ালার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

ফকীরের উচিত অর্থ সঞ্চয় না করা বরং প্রয়োজন পরিমাণে রেখে বাকীটা দান করে দেয়া। সঞ্চয় করার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, শুধুমাত্র একদিন ও একরাত্রির সামগ্রী রাখবে। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। দুই, চল্লিশ দিনের সামগ্রী রাখবে। আলেমগণ এটা হযরত মূসা (আঃ)-এর মেয়াদ থেকে চয়ন করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। এ থেকে মনে করে নেয়া হয়েছে যে, জীবনের আশা চল্লিশ দিন পর্যন্ত করা জায়েয। এটা মুত্তাকীদের স্তর। তিন, এক বছরের সামগ্রী সঞ্চিত রাখা। এটা সর্বনিম্ন ও সৎকর্মপরায়ণদের স্তর। যে ব্যক্তি এক বছরেরও বেশী সময়ের জন্যে সামগ্রীর ভাণ্ডার গড়ে তুলে, সে লোভীদের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবিগণের খাদ্যসামগ্রী এমনিভাবে বণ্টন করতেন। অর্থাৎ, কোনোখান থেকে কিছু এলে তিনি তা থেকে কোন কোন পত্নীকে এক বছরের, কাউকে চল্লিশ দিনের এবং কাউকে এক দিন এক রাত্রির খাদ্যসামগ্রী দিতেন। তিনি একদিন একরাত্রির খাদ্য হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাঃ)-কে দিতেন।

অযাচিতভাবে কিছু এলে ফকীর কি করবে ঃ ফকীরের কাছে কিছু এলে তার তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত— স্বয়ং অর্থের দিকে, দাতার উদ্দেশ্যের দিকে এবং নিজের উদ্দেশ্যের দিকে। অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখার অর্থ, তা হলো হালাল ও সকল প্রকার সন্দেহ থেকে মুক্ত হলে তবে তা গ্রহণ করা, নতুবা হাত গুটিয়ে নেয়া। দাতা যদি মন জয় করা ও মহব্বত লাভের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে সেটাকে বলা হয় "হাদিয়া"। আর যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে দেয়, তবে তার নাম সদকা ও খয়রাত। হাদিয়া গ্রহণ

করতে কোন দোষ নেই। বরং এটা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি কোন কোন হাদিয়া কবুল করতেন এবং কারও কারও হাদিয়া ফিরিয়ে দিতেন এবং বলতেন— আমি মনস্থ করেছি, কোরেশী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী ছাড়া কারও হাদিয়া গ্রহণ করব না। কোন কোন তাবেঈও এমনটা করেছেন। সেমতে কাতাহ মুসেলীর কাছে একবার পঞ্চাশ দেরহামের একটি থলে এলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে আত্তার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যার কাছে অযাচিতভাবে কোন রুযী আসে এবং সে তা ফিরিয়ে দেয়, সে যেন আল্লাহর কাছেই তা ফেরত দেয়। অতঃপর তিনি থলেটি খুলে তা থেকে একটি দেরহাম গ্রহণ করলেন এবং অবশিষ্টগুলো ফিরিয়ে দিলেন। হযরত হাসান বসরীও এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাঁর কাছে কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ও খোরাসানের চিকন বস্ত্রের একটি থান প্রেরণ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং মানুষের কাছ থেকে এ প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর কাছে সওয়াবের কোন অংশ পাবে না।

এ থেকে বুঝা যায়, যারা আলেম ও ওয়ায়েয, তাদের দান গ্রহণ করা খুবই খারাপ। হযরত হাসান বন্ধু-বান্ধবের হাদিয়া গ্রহণ করতেন। হযরত ইবরাহীম তায়মী বন্ধুদের কাছ থেকে এক-দু'দেরহাম চেয়ে নিতেন। কিন্তু অন্য কেউ শত শত দেরহাম পেশ করলেও তা গ্রহণ করতেন না। আবার কারও কারও নিয়ম ছিল কোন বন্ধু তাদেরকে কিছু দিলে তারা বলত এটা নিজের কাছেই রেখে দাও এবং ভেবে দেখ এটা নেয়ার পর যদি আমি তোমার মনে নেয়ার পূর্বের তুলনায় উত্তম হই, তবে আমাকে জানিও। আমি নিয়ে নেব। নতুবা নেব না। এ অবস্থাটির পরিচয় এই, যদি গ্রহীতা প্রত্যাখ্যান করে, তবে দাতার কাছে অপ্রিয় মনে হয় আর গ্রহণ করলে সে খুশী হয় এবং গ্রহণ করাকে নিজের প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। গ্রহীতা যদি জানে যে, এ হাদিয়ার মধ্যে কিছুটা করুণাও মিশ্রিত রয়েছে, তবে হাদিয়া গ্রহণ করা মোবাহ। কিন্তু সাচ্চা ফকীরদের মতে মাকরূহ।

হযরত বিশর বলেন ঃ আমি কারও কাছে কখনও কিছু চাইনি সিররী সিকতি ছাড়া। কেননা, আমার কাছে তার সংসার অনাসক্তি প্রমাণিত। তার হাত থেকে কোন বস্তু বের হয়ে গেলে তিনি খুশী হন। কাজেই তার বস্তু গ্রহণ করা আমি তাকে খুশী হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করি।

জনৈক খোরাসানী হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর কাছে কিছু অর্থ নিয়ে আগমন করল এবং বলল ঃ আপনি এগুলো ভোগ করুন। তিনি বললেন ঃ

এগুলো ফকীরদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। খোরাসানী বলল ঃ ফকীরদেরকে দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি এতদিন কোথায় বাঁচব যে, তোমার অর্থ ভোগ করব? খোরাসানী আরয করল ঃ আমার উদ্দেশ্য তা নয় যে, আপনি এ অর্থ চাটনী ও ব্যঞ্জনে ব্যয় করবেন, বরং আমি চাই যে, শিরনী, ফল-মূল ইত্যাদিতে ব্যয় করুন। হযরত জুনায়েদ কবুল করে নিলেন। খোরাসানী আরয করল ঃ বাগদাদ শহরে এমন কেউ নেই, যার অনুগ্রহ আমার প্রতি আপনার চেয়ে বেশী। হযরত জুনায়েদ বললেন ঃ তোমার মত লোক ছাড়া অন্য কারও হাদিয়া কবুলও করা উচিত নয়।

যদি দাতা কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে, তবে এই দান যাকাত হলে ফকীর নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে, সে যাকাত পাওয়ার যোগ্য কি না। যদি বিষয়টি সন্দিগ্ধ হয়, তবে কবুল করাও সন্দেহজনক হবে। আর যদি দান-খয়রাত হয়, তবে ফকীর মনে মনে চিন্তা করবে, যদি সে এমন কোন গোনাহ করে থাকে, যা দাতা জানলে খয়রাত দেবে না, তবে গ্রহণ করা হারাম। উদাহরণতঃ কেউ এ ধারণার বশবর্তী হয়ে খয়রাত দিল যে, লোকটি আলেম। কিন্তু বাস্তবে ফকীর এগুণে গুণান্বিত নয়। এমতাবস্থায় দান গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে হারাম।

যদি দাতা লোক-দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে দান করে, তবে ফকীরের উচিত তার দান গ্রহণ না করা এবং তার কুউদ্দেশ্যে সাহায্যকারী না হওয়া। হযরত সুফিয়ান ছওরীকে কেউ কিছু দিলে তিনি তা ফেরত দিতেন এবং বলতেন ঃ আমি যদি জানতাম, এ দানকে মানুষ গর্বভরে উল্লেখ করে না, তবে গ্রহণ করে নিতাম। জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কিছু পাঠালে আপনি তা ফিরিয়ে দেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি মমতা ও উপদেশের ভঙ্গিতে ফিরিয়ে দেই। কেননা, তারা দান করে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে এবং এ প্রকাশ হওয়াকে ভাল মনে করে। ফলে, তাদের মাল হাতছাড়া হয় অথচ সওয়াব পায় না। তাই আমি ফিরিয়ে দেই।

ফকীর দান গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি সে প্রয়োজন পরিমাণ বস্তুর অভাবগ্রস্ত হয়, তবে গ্রহণ করা উত্তম। হাদীসে আছে —

مَا الْمُعْطِي مِنْ سَعَةٍ بِأَعْظَمَ اَجْرًا مِنَ الْاٰخِذِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا .

অর্থাৎ, গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হলে সচ্ছল দাতা সওয়াবে তার চেয়ে বড় নয়।

অন্য এক হাদীসে আছে—

مَنْ اَتَاهُ شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلَا اِسْتِشْرَافٍ فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ -

অর্থাৎ, যার কাছে এ ধন-সম্পদের কিছু অংশ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আসে, সে যেন একে আল্লাহর দেয়া রিযিক মনে করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, সে যেন একে ফিরিয়ে না দেয়। জনৈক আলেম বলেন ঃ যে কিছু পায় এবং গ্রহণ না করে, সে একদিন চাইবে, কিন্তু পাবে না। সিররী সিকতী (রহঃ) হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে কিছু প্রেরণ করতেন। একবার তিনি ফিরিয়ে দিলেন। সিররী বললেন ঃ হে আহমদ, ফিরিয়ে দেয়ার বিপদকে ভয় কর। ইমাম আহমদ বললেন ঃ ফিরিয়ে দেয়ার কারণ এই, আমার কাছে এক মাসের খাদ্য মওজুদ আছে। তাই এটি আপনি নিজের কাছেই রাখুন। এক মাস পর আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এখন দরকার নেই। কোন কোন আলেম বলেছেন, ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য এই আশংকা আছে, হতে পারে আল্লাহ তাকে শাস্তিস্বরূপ লোভাক্রান্ত করবেন। তাই আগত সম্পদ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়, তাহলে তা নিজের ধ্যানে মশগুলও থাকতে পারে অথবা তা দ্বারা অন্যান্য অসহায় ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য করে বদান্যতার পরিচয়ও দিতে পারে। যদি সে পরকালপন্থী সাধক হয় আর ভাবে, এ সম্পদ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রয়োজনের বেশী সম্পদ সঞ্চয় প্রবৃত্তির আনুগত্য ছাড়া কিছুই নয়। আর যে কাজ আল্লাহর জন্যে নিবেদিত নয়, তা শয়তানের জন্যে। সেদিকে পদার্পণ মানেই কলংকিত হওয়া।

সম্পদ গ্রহণের পদ্ধতিও দুটি। এক, প্রকাশ্যে গ্রহণ করে গোপনে সরিয়ে দেয়া অথবা অসহায়দের মাঝে বিলিয়ে দেয়া। এটা 'সিদ্দীক'দের স্তর। প্রবৃত্তির জন্যে খুবই কঠিন—যদি সাধনার উত্তাপে তা পরিশুদ্ধ না হয়ে থাকে। দুই, সম্পদ গ্রহণই না করা; বরং মালিক তার পছন্দ মোতাবেক তার চেয়ে অধিক অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে অথবা তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে প্রদান করবে। এখানে প্রকাশ্যে লেনদেন

উত্তম, না গোপনে এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা "যাকাতের তত্ত্ব ও রহস্য' অধ্যায়ে করেছি। কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) সিররী সিকতীর হাদিয়া কবুল করেননি তাঁর প্রয়োজন ছিল না বিধায়। কারণ তখনও তাঁর কাছে এক মাসের খাবার মওজুদ ছিল। তাছাড়া হাদিয়া গ্রহণপূর্বক অন্যদেরকে দিয়ে দেয়ার পথও ধরেননি। কারণ, ওতেও রয়েছে হাজার ঝামেলা। পরহেযগারী হলো, সংশয় ও ফিতনার জায়গা থেকে দূরে থাকা। মক্কার কিছু পড়শী আছে— তারা বলে, আমার কাছে কিছু পয়সা ছিল, আমি তা আল্লাহর পথে খরচ করার জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। একবার এক ফকীরকে দেখলাম খোদার ঘর তওয়াফপূর্বক বিড়বিড় করে বলছে—

প্রভু হে, তুমি জান আমি ক্ষুধার্ত—
পরনে আমার বস্ত্র নেই,
ক্ষুধার্ত-উলঙ্গ আমি—
সর্বাবস্থায় তুমিই সহায়॥

আমি দেখলাম, তার গায়ের দুটো কাপড়ই ছেঁড়া। আবরুও ঢাকা যায় না। ভাবলাম, আমার পয়সাগুলো দিয়ে একে কাপড় কিনে দেয়ার চাইতে আর উত্তম দান হতে পারে না। আমি পয়সাগুলো তার কাছে নিয়ে এলাম। সামনে ধরলাম। সে তার মধ্য থেকে পাঁচটি দেরহাম তুলে নিল। বলল, চার দেরহাম দিয়ে দুটি চাদর কিনে নেব আর এক দেরহাম তিন দিনের খরচ হয়ে যাবে। এরচে' বেশী আমার দরকার নেই। আমি দ্বিতীয় রাতে তাকে দেখলাম। তার গায়ে দুটি নতুন চাদর। তার মধ্যে তখন শয়তানী সংশয়ের সৃষ্টি হলো। সে তখন আমার দিকে তাকাল। আমার হাত ধরল। আমাকে নিয়ে সাতবার বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করল। প্রতিবারের তওয়াফেই আমরা মূল্যবান খনিজ পদার্থ দেখতে পাচ্ছিলাম। কখনো স্বর্ণ, কখনো রূপা, কখনো ইয়াকুত, কখনো মোতি, কখনো ভিন্ন জওহর। দেখছিলাম আমাদের হাঁটু পর্যন্ত বেড়ে উঠছিল এগুলো। সে বলল, আল্লাহ তাআলা আমাকে এসবই দিয়েছেন; কিন্তু আমি ধরেছি যুহ্দ ও বৈরাগ্যের পথ। কারণ, এ সবই বোঝা আর বিপদ। এগুলো থেকে যৎসামান্য গ্রহণ করাটা বান্দার জন্যে রহমত ও নেয়ামত।

অর্থাৎ প্রয়োজনের বাইরে বান্দার কাছে যা থাকে, তা তার পরীক্ষাস্বরূপ। আর প্রয়োজনমাফিক যতটুকু প্রদত্ত হয়, তা দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ। এরশাদ হচ্ছে—

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, আমি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে—তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম (তা দেখার জন্যে) এই মর্তলোকের সকল কিছু সৃষ্টি করেছি তারই শোভাস্বরূপ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَاحَقَّ لِابْنِ اٰدَمَ اِلَّا فِىْ ثَلٰثٍ طَعَامٍ يُقِيْمُ صُلْبَهٗ وَثَوْبٍ يُوَارِىْ عَوْرَتَهٗ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهٗ فَمَازَادَ فَهُوَ حِسَابُهٗ -

অর্থাৎ, তিনটি জিনিসের মধ্যে মানুষের হক রয়েছে। তাকে পিঠ সোজা রাখার মত খাদ্য, তার আবরূ ঢাকবার মত পোশাক ও তাকে আশ্রয় দেয়ার মত ঘর। এরচে' বেশী যা হবে, তা হিসাবের বিষয়।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনমাফিক এই তিনটি থেকে গ্রহণ করে, তাহলে সে প্রতিদান পাবে। যদি প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করে, তাহলে এর জন্যে আল্লাহর দরবারে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। যদি নাফরমানী করে, তাহলে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। মানুষকে সম্পদের দ্বারা পরীক্ষা করার অর্থ হলো, আল্লাহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে কিংবা রিপুর তাড়নাকে দুর্বল করার মানসে কোন সম্পদ বর্জনের অঙ্গীকার করল। এ ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকার পূরণ করাই উত্তম। কারণ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অভ্যাস একবার হয়ে গেলে বারবার তাই করতে চাইবে। তখন আর তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বর্জনই উত্তম। দাতাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে যুহ্দ। যারা 'সিদ্দীকীন', তারাই শুধু এই সাধনায় বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দরাজহস্ত হয়, অসহায় লোকদের দেখা-শোনার অভ্যাস থাকে, তাহলে সে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী গ্রহণ করতে পারে এবং অসহায়দের উদ্দেশ্যে গৃহীত সম্পদ যথাশীঘ্র খরচ করে ফেলাই উত্তম। রাখলেই আবার নতুন করে পরীক্ষায় পড়ার আশংকা। ওর সাথে মনও লেগে যেতে পারে। অনেকে আবার অসহায় মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে অবশেষে সম্পদের প্রেমে পড়ে ধ্বংস হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ দ্বারা আদায় করার নিয়তে ঋণ করে এবং ঋণ আদায়ের পূর্বেই মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দিবেন।

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, আল্লাহর প্রতি তাদের উত্তম ধারণা অনুযায়ী তারা খরচ করেন। কথিত আছে, এক বুযুর্গ মারা যাওয়ার সময় ওসিয়ত করে যান, আমার সম্পদ তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিবে। এক, শক্তিশালী। দুই, দানশীল। তিন, ধনী। কেউ জিজ্ঞেস করলো, এর উদ্দেশ্য কি?

তিনি বললেন ঃ শক্তিশালী অর্থ— যারা আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে। দানশীল অর্থ— যারা আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখে। আর ধনী অর্থ— যারা আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। অর্থাৎ যদি ফকীর, সম্পদ ও দাতার মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে ফকীর সেই সম্পদ গ্রহণ করতে পারে। তবে নেয়ার সময় অবশ্যই মনে রাখবে, যা কিছু নিলাম, তা আল্লাহর কাছ থেকেই নিলাম, দাতা কেবলমাত্র মাধ্যম। তাকে আল্লাহ তাআলা দেয়ার জন্যেই পাঠিয়েছেন। সে দিতে বাধ্য।

এক ব্যক্তি হযরত শফীক বলখী (রহঃ), তাঁর মুরীদগণসহ আরও পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে দাওয়াত করল। খুব ভালো মানের খাবার তৈরী করল। তিনি যখন উপবেশন করলেন, তখন মুরীদদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ দাওয়াতকারী বলছে, যে ব্যক্তি একথা মনে না করে যে, এই খাবার আমি তৈরী করেছি, আমিই এই খানা পরিবেশন করেছি, তার জন্যে এই খানা হারাম। একথা শুনে সকলেই উঠে চলে গেল। তবে একজন লোক বসে রইল। তিনি অতবড় মাপের ছিলেন না। দাওয়াতকারী হযরত বলখীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযুর! আপনার কথা আমি বুঝিনি। তিনি বললেন ঃ আমি তাদের তাওহীদের পরীক্ষা নিতে চেয়েছি। হযরত মূসা (আঃ) একবার আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! তুমি বনী ইসরাঈলের হাতে আমার রিযিক প্রেরণ করেছ। সকালে একজনে খাওয়ায়, বিকালে অন্যজন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করলেন, আমি আমার বন্ধুদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। আমি তাঁদের রিযিক আমার বান্দাদের মধ্যে বড়দের দ্বারা বন্টন করে দেই। যেন এই ওসীলায় তারা সওয়াব লাভ করতে পারে। সুতরাং কেউ যদি কারও কাছ থেকে কিছু পায়, তাহলে সে যেন মনে করে এটা আল্লাহর দান। তিনি এই দাতাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন।

প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করার অবৈধতা এবং অভাবী ব্যক্তির জন্যে সওয়ালের আদব ঃ জেনে রাখতে হবে, সওয়ালের ব্যাপারে অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর বাণী রয়েছে। আবার কিছু কিছু রেওয়ায়েতে সওয়ালের ব্যাপারে অনুমতিও রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সওয়ালকারী যদি ঘোড়ার উপরে আরোহণ করে আসে তবু তার একটি প্রাপ্য রয়েছে। তিনি আরও এরশাদ করেন, 'ভস্মীভূত খুরের অংশ দিয়ে হলেও ফকীরকে বিদায় কর। এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে, কারণ, সওয়াল করা একেবারেই হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম হলে হাদীসের মাধ্যমে এমন একটি নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হত না। সারকথা হল, মৌলিকভাবে সওয়াল করা হারাম, তবে একান্ত প্রয়োজনে সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে।

সওয়াল করা বা অন্যের কাছে হাত পাতা এ জন্যে হারাম যে, এতে আর তিনটি হারাম কর্ম সংঘটিত হয়ে যায়। এক, আল্লাহর প্রতি অভিযোগ। কারণ, সওয়াল করার অর্থই হল নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করা এবং নিজের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করা। আর এটা নিঃসন্দেহে অভিযোগ। বিষয়টিকে এ ভাবে বুঝা যেতে পারে যে, কারো ভৃত্য যদি অন্যের কাছে সওয়াল করে, তাহলে এতে মনিবের অসম্মান হয় এবং প্রকারান্তরে মনিবের প্রতিই শেকায়েত করা হয়। ঠিক তেমনি ভাবেই বান্দার জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট হাত পাতার অর্থই হল আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আর এ জন্যেই সওয়াল করা হারাম হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে প্রয়োজনের সময় হালাল হতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময়ও মৃত বস্তুও হালাল হয়ে যায়।

দুই, সওয়ালকারী সওয়ালের মাধ্যমে নিজকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে অপমানিত করে। আর কোন ঈমানদারের জন্যেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট নিজকে অপমানিত করার অনুমতি নেই। সে নিজকে একমাত্র প্রভুর কাছেই ছোট করবে, এর মধ্যেই রয়েছে তার জন্যে সীমাহীন ইযযত। অন্যান্য মানুষ সকলেই তার মত। সুতরাং এমনিতেই প্রয়োজন ছাড়া সম পর্যায়ের কারও কাছে নিজকে ছোট করা উচিত নয়।

তিন, সওয়ালের মাধ্যমে অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া হয়। কেননা, অনেক সময় যার কাছে হাত পাতা হয়, সে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে রাযী থাকে না, বরং লজ্জা পাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে অথবা লোক-দেখানোর জন্যে সওয়ালকারীর দাবী পূরণ করে থাকে । কিন্তু মনে মনে ঠিকই কষ্ট পায়।

আবার অনেক সময় দাবী পূরণ করতে না পারার কারণেও লজ্জা পেতে হয়। কারণ, মানুষ তাকে কৃপণ মনে করতে থাকে। মোটকথা, প্রথম অবস্থায় তার সম্পদের ক্ষতি হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তার মানের ক্ষতি হয়। আর এ উভয় অবস্থার ক্ষতিই তার জন্যে কষ্টের কারণ এবং এ কষ্ট তাকে সওয়ালকারীর কারণেই পেতে হয়। সুতরাং সওয়াল করা হারাম। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষের কাছে হাত পাতা একটি ঘৃণিত কাজ এবং এর চাইতে বড় বৈধ কোন ঘৃণিত কাজ নেই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, রসূল (সাঃ) সওয়ালকে একটি ঘৃণিত কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এ ঘৃণিত কাজটি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বৈধ হতে পারে না। যেমন খাওয়ার সময় যদি কারও কণ্ঠনালীতে লোকমা আটকে যায় এবং পানি না থাকে, তাহলে প্রয়োজন মাফিক মদ পান করে গলার বিষম ছুটানোর অনুমতি রয়েছে।

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে সওয়াল করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামে নিজের জন্যে আগুনের পরিধি বৃদ্ধি করে। হাদীসে আরও এসেছে, সচ্ছল ব্যক্তি সওয়াল করার কারণে কিয়ামতের দিন সে এমন ভাবে আগমন করবে যে, তার মুখমন্ডল থাকবে অস্থিসার, তাতে মাংসের কোন উপস্থিতি থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সওয়ালকারীর সওয়াল তার মুখমন্ডলে দাগ হয়ে থাকবে। হাদীসের এ সমস্ত শব্দমালা দ্বারা সওয়ালের ব্যাপারে অবৈধতাই প্রমাণ হয়।

রসূল (সাঃ) একবার কিছু লোকের নিকট থেকে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর আনুগত্যের অঙ্গীকার নিলেন, এরপর ছোট একটি বাক্য বললেন যে, তোমরা কখনো কারও নিকট হাত পাতবে না।

প্রকৃতপক্ষে রসূল (সাঃ)-এর আদর্শই এমন ছিল যে, তিনি মানুষকে সওয়াল করার ব্যাপারে সর্বদা বারণ করতেন। তিনি বলতেন, যে আমাদের কাছে হাত পাতবে, তাকে তো আমরা দিব, কিন্তু যে আত্মনির্ভর থাকতে চাইবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আত্মনির্ভর রাখবেন। তিনি আরও বলেন, যে সওয়াল করবে না, সে আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। রসূল (সাঃ) আরও এরশাদ করেন, তোমরা মানুষের কাছে সওয়াল করবে না। আর সওয়াল যত কম করা যায়, ততই উত্তম। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনার কাছে কি সওয়াল করা যাবে? রসূল (সাঃ) বললেন, আমার কাছেও কম করবে।

হযরত উমর (রাঃ) দেখলেন, একজন ভিক্ষুক মাগরিবের পর ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। তিনি তার গোত্রের একজন লোককে বললেন, তাকে খাবার দিয়ে দাও। সে খাবার দিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর আবার তাকে ভিক্ষা করতে শুনলেন। তিনি গোত্রের লোকটিকে বললেন, আমি কি তোমাকে ভিক্ষুকটিকে খাবার দিতে বলিনি? লোকটি বলল, আমি তো তাকে খাবার দিয়ে দিয়েছি। হযরত উমর এবার ভিক্ষুকের ঝুলি পরীক্ষা করলেন, দেখলেন তাতে রুটির স্তূপ রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তো ভিক্ষুক নও, ব্যবসায়ী। অতঃপর তিনি ঝুলিটি নিয়ে যাকাতের উটের সামনে ঢেলে দিলেন এবং ভিক্ষুকটিকে দোররা মারলেন, আর বললেন, ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো এরূপ করবে না।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, সওয়াল করা যদি হারামই না হত, তাহলে তিনি ভিক্ষুককে দোররা মারলেন কেন এবং তার ঝুলিই বা ছিনিয়ে নিলেন কেন। এখানে কিছু সংখ্যক ফেকাহবিদ হযরত উমর (রাঃ)-এর এ কাজটিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। তারা মনে করেন যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর এ কাজটি ঠিক ছিল না। কারণ, ভিক্ষুককে তিনি আদবের জন্যে প্রহার করে থাকলেও তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ঠিক হয়নি। কেননা, ইসলামে সম্পদ বাজেয়াপ্ত বা শাস্তি স্বরূপ জরিমানার কোন বিধান নেই।

আমি বলতে চাই, হযরত উমরের উপর ঐ সকল লোকদের আপত্তি উঠেছে তাদের অজ্ঞতার কারণে। হযরত উমর (রাঃ) ঐ সকল ফেকাহবিদের তুলনায় অনেক বড় ফকীহ। তিনি যতটুকু পরিমাণ ধর্মের রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, ততটুকু আর কেউ ছিল না। তেমনি প্রজাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি সবার চেয়ে ভাল জানতেন। হযরত উমরের কি এ কথা জানা ছিল না যে, সম্পদ গ্রহণ করে জরিমানা আদায় করা ইসলামে বৈধ নয়? অথবা এমনটা কি হতে পারে যে, তিনি জানতেন ঠিকই কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হয়ে আল্লাহর নাফরমানী করে ফেলেছেন। অথবা শাস্তি দিতে যেয়ে তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন, যা রসূল (সাঃ)-এর আনীত শরিয়তে বৈধ নয়? কখনও না। এমনটা হতেই পারে না। মূলত হযরত উমর (রাঃ) যে কারণে এ কাজটি করেছিলেন সেটি হল, তিনি লোকটিকে সওয়াল করার অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন এবং অন্যদেরকে তিনি এ বিষয়টি জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসে তাকে দান করেছ, তা ভুল। কেননা, সে মূলত অভাবী

নয়, বরং মিথ্যুক ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়ত, সে যে খাদ্যবস্তুগুলো মানুষের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে, সেগুলোর মালিক সে হয়নি। কারণ, প্রতারণার মাধ্যমে গ্রহণ করার কারণে রুটিগুলোর উপর তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপরদিকে রুটিগুলোর মালিকের সন্ধান না থাকার কারণে সেগুলো মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়াও মুশকিল ছিল। ফলে, এ লাওয়ারিস সম্পদগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কোন কাজে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। আর এ জন্যেই হযরত উমর (রাঃ) এগুলো বায়তুল মালের যাকাতের উটের খাদ্যের তালিকায় নির্ধারিত করে দিলেন। কেননা, যাকাতের উটের খাদ্যের ব্যবস্থাও বায়তুল মালের পক্ষ থেকেই করতে হয়। মোটকথা হল, প্রতারণার মাধ্যমে বা মিথ্যা কথা বলে ভিক্ষুকরা যে সম্পদ গ্রহণ করে থাকে, এগুলোর তারা মূলত মালিক হয় না এবং এগুলোর ব্যবহার তাদের জন্যে হারাম। তাদের উচিত এ ধরনের সম্পদ মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। হযরত উমরের কর্ম থেকে আমরা এ ধরনেরই শিক্ষা পাই।

যখন জানা গেল যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে সওয়াল করা যায়, তখন এ কথাও জানতে হবে যে, 'প্রয়োজন' মূলত চার প্রকার। এক, একান্ত প্রয়োজন। দুই, বড় ধরনের প্রয়োজন। তিন, হালকা প্রয়োজন। চার, নিষ্প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজনওয়ালা ব্যক্তিকে চরম অভাবী বলা হয়। চরম অভাবীর অবস্থা হল— যেমন কেউ এমন ক্ষুধার্ত যে, সে নিজের উপর মৃত্যু বা অসুস্থতার আশংকা করে। অথবা সে এ পর্যায়ের দরিদ্র যে. নিজের সতর ঢাকার মত বস্ত্রও তার নিকট নেই। এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্যে সওয়াল করার অনুমতি রয়েছে। তবে সওয়াল করার জন্যে অন্যান্য শর্তগুলোও বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন- যার নিকট সওয়াল করা হচ্ছে, তার আন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ততা। সওয়ালকারী ব্যক্তির উপার্জনের অক্ষমতা, ইত্যাদি। । কারণ, যার উপার্জন ক্ষমতা রয়েছে, তার জন্যে সওয়াল করা নাজায়েয।

প্রয়োজনের চতুর্থ নম্বরটি হল-নিষ্প্রয়োজন। নিষ্প্রয়োজনীয়তা হল সচ্ছল ব্যক্তির অবস্থা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কোন কিছুর জন্যে অন্যের নিকট হাত পাততে হয় না। বরং যে বস্তুর জন্যে সে অন্যের নিকট হাত পাতবে এর সম পরিমাণ বা দ্বিগুণ তার নিজের কাছেই রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্যে সওয়াল করা হারাম। অথচ যদি তার কাছে এক বা একাধিকটি মওজুদ থাকে, তাহলে সওয়াল করা হারাম। পক্ষান্তরে যদি কারও কাছে

পরার মত কাপড় তো আছে, কিন্তু শীতের কাপড় নেই এবং শীত তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে অনুরূপ কোন ব্যক্তি সফরে আছে গন্তব্যে পর্যন্ত পৌছার ভাড়া তার কাছে নেই। অবশ্য খুব কষ্টে পায়ে হেঁটেও গন্তব্যে পৌছতে পারে এমন ব্যক্তির জন্যে সওয়াল করা মোবাহ্—বৈধ। কারণ, তার প্রয়োজন তো স্পষ্ট। অবশ্য এক্ষেত্রেও ধৈর্যধারণ সওয়াল অপেক্ষা অনেক উত্তম। তবে সওয়াল করা মাকরূহ নয়। তবে শর্ত হলো, সত্য বলতে হবে। প্রয়োজনের বাস্তবতাটাও তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে যদি হেরফের করে যেমন—জামা আছে কিন্তু ছেঁড়া, বাইরে যেতে একটি ভাল কাপড় দরকার। গাধা ভাড়া করার পয়সা আছে কিন্তু সে ঘোড়া ভাড়া করার পয়সা চায়। এখানে সে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে শুধু প্রয়োজন বলে সওয়াল করল, তাহলে জায়েয হবে না। কারণ, এতেও এক রকমের ধোকা আছে। কিন্তু ধোকা না দিলে সমস্যা নেই। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি অভিযোগ, নিজেকে লাঞ্ছিত করে কিংবা অন্যকে কষ্ট দিয়ে সওয়াল করলেও সেটা হারাম।

কেউ যদি বলে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে সওয়াল কিভাবে করা যাবে? তার জবাব হল, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, মাখলুকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করবে এবং ভিক্ষুকদের মত সওয়াল করবে না। বরং এভাবে বলবে, আমার যা কিছু আছে, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার নফস চাচ্ছে উপরে পরার জন্যে আরেকটি কাপড়। অথচ এটা না হলেও চলে যায়। এভাবে বললে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করা হলো না। আর লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচার উপায় হল, প্রয়োজনে নিজের বাপ, আত্মীয় কিংবা এমন কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে চাইবে, যারা সওয়ালের কারণে তাকে ছোট মনে করবে না। অথবা এমন ব্যক্তির কাছে চাইবে, যিনি দানশীল এবং দান করার জন্যে টাকা জমা করে রেখেছে এবং কোন সওয়ালকারী আসলে সে খুশী হয়। কেউ তার দান কবুল করলে সে খুশী হয়, মনে করে তার উপর অনুগ্রহ করা হলো। এ ধরনের লোকের কাছে সওয়াল করাটা লাঞ্ছনা নয়।

কষ্টদান থেকে বেঁচে থাকার উপায় হল, সওয়াল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে না করে বরং ইশারা-ইংগিতে অবস্থার বর্ণনা দেয়া, যার দেয়ার আগ্রহ আছে সে যেন দিতে পারে। কিন্তু কোন মজলিস যদি এমন হয়, যেখানে সওয়াল করলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্যদের নজর পড়ে এবং সে দান না করলে

অন্যরা তাকে ভর্ৎসনা করে আর সেই ভর্ৎসনার ভয়েই সে বাধ্য হয়ে দান করে। তাছাড়া ব্যক্তি বিশেষের কাছে সওয়াল করার সময়ও নাম না নিয়েই সওয়াল করা উত্তম। যাতে সে ইচ্ছা করলে কাটিয়ে যেতে পারে। আর আন্তরিকভাবে দিতে চাইলে দিতে পারে। এমতাবস্থায় দিলে বুঝা যাবে খুশী হয়ে দিয়েছে। অনুরূপ দেয়ার সময় যদি সওয়ালকারী মনে করে দাতা লজ্জায় পড়ে দিয়েছে, উপস্থিতি কিংবা 'আমার' প্রতি লজ্জার আশংকা না থাকলে সে আদৌ দিত না, তাহলে এই অর্থ গ্রহণ হারাম। এটা কাউকে রাস্তায় ধরে মারপিট করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়ার মতোই। কেননা, বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে কারও মনে আঘাত দেয়া শরীরে আঘাত দেয়ার চাইতেও কঠিন। কিন্তু কেউ যদি বলে, বাহ্যত তো সে লোক হাসিমুখেই দিয়েছে। সুতরাং তার মনে সওয়ালের কারণে কষ্ট হচ্ছে কি-না তা আমরা কিভাবে বুঝব? অথচ হাদীস শরীফে আছে—

إِنَّا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক বিষয়ের আলোকে ফয়সালা করি, আর গোপন বিষয়ের অধিপতি আল্লাহ তাআলা।

এর জবাব হল, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে শাসক যখন ফয়সালা করে ভেতরগত অবস্থা তার জানা থাকে না, তাই সে বাধ্য হয় বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়সালা করতে। অথচ মানুষের রসনা অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলে থাকে। এটা তো হল একটা প্রয়োজনের ব্যাপার। কিন্তু এখানে আমরা যাদের আলোচনা করছি, সেতো হলো আল্লাহ ও তাঁর বিশেষ বান্দার কথা। আল্লাহ তো মানুষের ভেতর-বাহির সব জানেন। সমান ভাবে জানেন।

সুতরাং এক্ষেত্রে মালিক যদি লজ্জাবোধের খাতিরে দান করে, তাহলে ফেরত দেয়া চাই। আর যদি লজ্জাবোধের কারণে গ্রহণ করতে না চায়, তাহলে আপাতত রেখে দিয়ে পরবর্তীতে হাদিয়া হিসাবে দিয়ে দেয়া উচিত। যদি সে হাদিয়াও কবুল করতে না চায়, তাহলে তার ওয়ারিসদের কাউকে দিয়ে দিলেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে গ্রহীতা মনে করছে দাতা সন্তুষ্ট চিত্তেই দিচ্ছে অথচ প্রকৃত অবস্থা হল সে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট নয়। আর এটা উদ্বার করাও কঠিন। তাই মুত্তাকীগণের অনেকেই সওয়াল করাটাকেই সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলেছেন। হযরত বিশরী (রহঃ) একারণেই হযরত সিররী (রহঃ) ছাড়া অন্য কারও

কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। বলতেন, আমি জানি, সিররী কোন জিনিস দিতে পারলে খুশীই হয়। আর আমি তার পছন্দের বিষয়ে তাকে সাহায্যও করতাম। সওয়াল করতামও না। করতে জোর নিষেধ করতাম। কারণ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করা জায়েয নেই। আর প্রয়োজন তো হলো, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া। সওয়াল ভিন্ন যখন আর জীবন রক্ষার গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া চাওয়া ছাড়া কেউ কিছু দিচ্ছেও না। তখনই মাত্র সওয়াল করা যায়।

কোন কোন বুযুর্গের আমল ছিল, তাদেরকে কোন জিনিস দিলে তারা তার কিছু অংশ রেখে কিছু অংশ ফেরত দিতেন। যেমন রসূল (সাঃ)-এর দরবারে একবার কিছু ভেড়া, ঘি ও পনীর হাদিয়া নিবেদিত হল। রসূল (সাঃ) সেখান থেকে ঘি ও পনীর রেখে ভেড়া ফিরিয়ে দেন।

এটা ছিল তাঁদের অবস্থা যাঁদের কাছে চাওয়া ছাড়াই সম্পদ আসতো। অধিকন্তু মর্যাদা লাভের স্বার্থে যারা হাদিয়া দিত, তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারা দুই অবস্থায় সওয়াল করতেন। এক, একান্ত প্রয়োজনের সময়। যেমন হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। আর তাঁরা জানতেন, যাদের কাছে চাচ্ছেন, তারা আন্তরিকভাবে দিবেন।

দুই, ভাই-বন্ধুদের কাছে সওয়াল করা। প্রথম যুগের বুযুর্গগণ নিজেদের ভাইদের সম্পদ চাওয়া ছাড়াই ব্যবহার করতেন। কারণ, তারা জানতেন. এতে তারা খুশী হবে। মুখে উচ্চারণ কোন বড় বিষয় নয়। তাদের ক্ষেত্রে সওয়ালের দরকারই হত না। তারা সওয়াল বৈধ মনে করতেন এমন ক্ষেত্রে যে, যার কাছে চাচ্ছি, সে আমার প্রয়োজনের কথা জানলে নিজ থেকেই তা দিয়ে দিত। এক্ষেত্রে কোন হিল্লা বাহির করার দরকার হয় না। তাহলে সওয়ালকারীর তিন অবস্থা হলো—

এক— সওয়ালকারীর একীন আছে যে, দাতা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে।

দুই— সওয়ালকারী নিশ্চিত, দাতা আন্তরিকভাবে অসন্তুষ্ট।

এই দুই অবস্থার প্রথম অবস্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হালাল। দ্বিতীয় অবস্থায় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

তিন— সওয়ালকারী ঠিক বুঝতে পারছে না দাতা কি সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছে, না নারায হয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় সে তার মনকেই ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে—মনে যে বিষয়ে সন্দেহ থাকবে ওটা বর্জন করবে আর যে বিষয়ে তৃপ্তি ও মনের সমর্থন পাবে, সেটাই গ্রহণ করবে। অনেক ক্ষেত্রে

এমনও হয় যে, দাতার সূক্ষ্ম স্বভাবের কারণে তার মনের অবস্থা কিছুতেই নিরূপণ করা যায় না। একারণেই রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ

অর্থাৎ, হাতের কামাই-ই হলো সর্বাধিক পবিত্র খাবার।

সওয়াল করা হারাম। রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ اَوْيَسْتَكْثِرْ

অর্থাৎ, সচ্ছলতা সত্ত্বেও সওয়াল করা মানে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা কামনা করা। চাই বেশীর সওয়াল করুক বা কমের সওয়াল করুক।"

কিন্তু এই সচ্ছলতার সীমারেখা কি? এটা নির্ধারণ করা মুশকিল। তাছাড়া আমরা এটা করতেও পারি না। এটা শুধু নবীই (সাঃ) জানেন। হাদীস শরীফে আছে—

اِسْتَغْنُوْا بِغِنَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْ غَيْرِهٖ قَالُوْا وَمَاهُوَ؟ قَالَ غَدَاءُ يَوْمٍ وَعَشَاءُ لَيْلَةٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহর ধনে ধনাঢ্যতা কামনা কর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ তা আবার কি? রসূল (সাঃ) বললেন ঃ একদিন ও একরাতের খাবার!

অন্য একটি হাদীসে আছে—

مَنْ سَأَلَ وَلَهٗ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا

'যার কাছে পঞ্চাশ দেরহাম কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে সওয়াল করল, সে উপরি সওয়াল করল।

অন্য একটি বর্ণনায় চল্লিশ দেরহামের কথা আছে। হাদীস সবগুলোই বিশুদ্ধ। ধনী হওয়ার সীমারেখাও ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের শ্রেণী-বিভেদের কারণে সচ্ছলতার ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এর চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ

করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে আছে—

لَاحَقَّ لِابْنِ اٰدَمَ اِلَّا فِىْ ثَلٰثٍ طَعَامٍ يُقِيْمُ بِهٖ صُلْبَهٗ وَثَوْبٍ يُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتَهٗ وَبَيْتٍ يَسْكُنُهٗ فَمَازَادَ فَهُوَ حِسَابٌ -

অর্থাৎ, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে মানুষের হক আছে। পিঠ সোজা রাখতে পারে পরিমাণ খাবার, আবরূ ঢাকার মত কাপড় ও আশ্রয় গ্রহণ করার মত ঘর। এরচে' বেশী যা হবে, তার হিসাব দিতে হবে।

অর্থাৎ খাবার, পোশাক ও ঠিকানা— এ তিনটিই হল মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজনের তিনটি মৌলিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি হলো মৌলিক প্রয়োজন বা এ জাতীয় যা আছে। যেমন এক ব্যক্তি মুসাফির। তার জন্যে ভাড়ারও প্রয়োজন হবে যদি সে পায়ে হাঁটতে না পারে। এই ভাড়াও তখন ঐ তিনটির মধ্যে গণ্য হবে। অনুরূপ যাদের ভরণ-পোষণ তার উপর জরুরী, সেগুলোও এরই মধ্যে শামিল। তবে এ ক্ষেত্রে একজন দ্বীনদারের প্রয়োজনই তার প্রয়োজন বলে বিবেচিত হবে। একান্ত স্বাভাবিক দিন গুজরানই হবে তার প্রয়োজন—যদি তা একান্ত স্বভাব বিরোধী না হয়।

খাদ্যের মধ্যে সারা দিন-রাত এক মুদ্ অর্থাৎ, প্রায় দেড় পোয়া ধর্তব্য। এই পরিমাণ প্রচলিত খাদ্যের মধ্যে হবে যদিও তা সবই হয়। সব সময় ব্যঞ্জন থাকা প্রয়োজনের বাইরে। এটা সম্পূর্ণ বর্জন করাও কষ্টকর। তাই মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করার অনুমতি রয়েছে।

বাসস্থানের পরিমাণ কমপক্ষে ততটুকু হওয়া দরকার, যতটুকুতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এতে সাজ-সজ্জার কোন কথা নেই। অতএব, সাজ-সজ্জা অথবা ঘর প্রশস্ত করার জন্যে সওয়াল করা অপ্রয়োজনীয় সওয়ালরূপে গণ্য হবে। এটা উপরোক্ত হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সময়ের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষ একদিন ও এক রাত্রির খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়। বস্ত্র ও বাসস্থান জরুরী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে সওয়াল করলে তার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, এমন বস্তু, যার প্রয়োজন পরবর্তী দিন হবে। দুই, এমন বস্তু, যার প্রয়োজন চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিনে হবে। তিন, যার প্রয়োজন এক বছরে হবে। এখন আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বলা যায়, যার কাছে এ পরিমাণ আসবাবপত্র আছে যে, তার এবং তার পরিবারের এক বছরের

জন্যে যথেষ্ট, তার সওয়াল করা হারাম। কেননা, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের ধনাঢ্যতা। হাদীসে বর্ণিত পঞ্চাশ দেরহাম এ ধনাঢ্যতারই সীমা। যদি এমন বস্তু হয় যে, এক বছরের মধ্যে প্রয়োজন হবে, তবে দেখা উচিত, সওয়ালকারী প্রয়োজনের সময়ও সওয়াল করতে সক্ষম কিনা এবং তখন সওয়াল করার সুযোগ থাকবে কিনা? যদি সক্ষম হয় এবং সুযোগও থাকে, তবে এই মুহূর্তে সওয়াল করা জায়েয হবে না। কেননা, যখন প্রয়োজন হবে, তখন সে জীবিত না-ও থাকতে পারে। জীবিত না থাকলে তো প্রয়োজনই হবে না। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, প্রয়োজনের সময় সওয়ালের সুযোগ থাকবে না এবং কোন দাতা পাওয়া যাবে না, তবে এ মুহূর্তে সওয়াল করা বৈধ। কেননা, এক বছর বেঁচে থাকার আশা করা অবান্তর নয়।

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতে রিযক আসার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থার অধিকারী, সে একদিনের খাদ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে তার মর্তবা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক বড়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন তার ও তার পরিবারের আজকের রিযক দিয়েছেন, তখন কালকের জন্য ভয় করা বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং শয়তানের প্ররোচনা ছাড়া অন্য কোন কারণে হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا -

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং তোমাদেরকে নির্লজ্জ কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ ওয়াদা দেন আপন ক্ষমা ও অনুগ্রহের।

সওয়ালও মন্দ বিষয়, যা কেবল প্রয়োজনের জন্যেই বৈধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর সওয়াল করে, যার প্রয়োজন বছরের মধ্যে দেখা দেবে, তার অবস্থা সে ব্যক্তির তুলনায় বেশী খারাপ, যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এক বছর পরেও প্রয়োজনের জন্যে রেখে দেয়। শরীয়তের বাহ্যিক ফতোয়ার দিক দিয়ে এতদুভয় কাজই বৈধ। কিন্তু উভয় কাজের কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত, উচ্চাশা এবং আল্লাহর অনুগ্রহের উপর অনাস্থা, যা মূলত বিনাশকারী বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে সঠিক পথ অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সত্যাশ্রয়ী ফকীরগণের কিছু অবস্থা ঃ হযরত বিশর (রহঃ) বলেন ঃ

ফকীরগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যারা সওয়াল করে না এবং কেউ দিলে গ্রহণ করে না। এরূপ ফকীর ইল্লিয়্যীনে আধ্যাত্মিক লোকদের সাথে থাকবে। দুই, যারা সওয়াল করে না কিন্তু কেউ কিছু দিলে গ্রহণ করে। তারা নৈকট্যশীলদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে থাকবে। তিন, যারা প্রয়োজনের সময় সওয়াল করে। তারা আসহাবে ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, সওয়ালের নিন্দায় সকলেই একমত। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামকে হযরত শাকীক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ খোরাসানে আপনার বন্ধুদের মধ্যে যারা ফকীর, তাদেরকে আপনি কি অবস্থায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এই অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদেরকে কেউ কিছু দিলে তারা শোকর করে, আর না দিলে সবর করে। হযরত শাকীক বললেন ঃ বলখের কুকুররাও তাই করে। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে আপনার মতে ফকীর কারা? তিনি বললেন ঃ ফকীর তারা, যাদেরকে কিছু না দিলে শোকর করে, আর দিলে নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দেয়া বস্তু তারই হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ থেকে জানা গেল যে, সবর, শোকর ও সওয়ালের ক্ষেত্রে বুযুর্গগণের স্তর অনেক। এগুলোর পার্থক্য জানা অধ্যাত্ম পথের পথিকদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। কেননা, এগুলো না জানলে তারা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারবে না।

আল্লাহ পাক মানুষকে সুন্দরতম কাঠামোতে সৃষ্টি করে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর "আলা ইল্লিয়্যীন" তথা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা যে ব্যক্তি উন্নতি ও অধঃপতনের মধ্যে পার্থক্য জানবে না, সে নিশ্চিতই উন্নতি করতে পারবে না।

সওয়াল করার কারণে মর্তবা উন্নত হওয়ার মত অবস্থাও কোন কোন সময় বুযুর্গগণের উপর প্রবল হয়ে যায়। সেমতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুযুর্গ হযরত আবুল হাসান নূরী (রহঃ)-কে মানুষের কাছে সওয়ালের হাত পাততে দেখে মনে মনে বললেন ঃ এরূপ বুযুর্গের সওয়াল করা মোটেই সমীচীন নয়। অতঃপর তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। জুনায়েদ বললেন ঃ নূরীর এ কাজকে খারাপ মনে করো না। তিনি মানুষকে কিছু দেবার জন্যেই মানুষের কাছে সওয়াল করেন— নেয়ার জন্যে নয়। অর্থাৎ, সওয়াল এ জন্যে করেছেন, যাতে দাতা আখেরাতে সওয়াব পায় এবং তার কোন ক্ষতি না হয়। বলা বাহুল্য, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সে উক্তির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাতে তিনি বলেন ঃ يَدُ الْمُعْطِىْ هِىَ الْعُلْيَا দাতার হাত উপরে। এরপর

হযরত জুনায়েদ বললেন ঃ দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এসো। দাঁড়িপাল্লা আনা হলে তিনি একশ' দেরহাম ওযন করলেন, অতঃপর আরও এক মুষ্টি দেরহাম এই একশ' দেরহামের সাথে মিলিয়ে বললেন ঃ এগুলো নূরীর কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে দান কর। বর্ণনাকারী বুযুর্গ বলেন ঃ আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে বললাম, ওযন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা। কিন্তু তিনি এক শ' দেরহাম ওযন করলেন এবং এর সাথে অগুনতি এক মুষ্টি মিলিয়ে দিলেন। এতে তো পরিমাণ নির্দিষ্ট হল না। এর মর্ম কি? তিনি তো বিজ্ঞ ব্যক্তি! কিন্তু প্রশ্ন করতে আমি লজ্জাবোধ করলাম। অতঃপর দেরহামের থলেটি আমি হযরত নূরীর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন ঃ দাঁড়িপাল্লা আন। অতঃপর তিনি দাঁড়িপাল্লা দিয়ে একশ' দেরহাম ওযন করে বললেন ঃ এগুলো জুনায়েদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং বলো, আমি তার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করিনি। একশ' দেরহামের বেশী যা আছে, তা নিয়ে নিলাম। তার একথা শুনে আমার বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ জুনায়েদ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সে রশির উভয় মাথা নিজেই ধরতে চায়। সে একশ' দেরহাম মেপে সেটাকে নিজের মনে করে আখেরাতে সওয়াব পাওয়ার জন্যে দিয়েছে। এর সাথে এক মুষ্টি বিনা ওযনে যা দিয়েছে, সেটা আল্লাহর নিয়তে দিয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহর ওয়াস্তে যা ছিল, তা গ্রহণ করেছি, আর যা তার নিজের ছিল, তা ফেরত দিয়েছি। অতঃপর আমি এই মুদ্রাগুলো হযরত জুনায়েদের কাছে নিয়ে এলে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন ঃ নূরী নিজের মাল গ্রহণ করেছেন এবং আমার মাল ফিরিয়ে দিয়েছেন। যাক, আল্লাহ্ মালিক।

এখানে দেখা উচিত যে, এই বুযুর্গগণের অন্তর কেমন স্বচ্ছ ছিল এবং তাদের অবস্থা কেমন একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে ছিল। তারা একে অপরের মনের খবর মৌখিক কথাবার্তা ছাড়াই জেনে নিতেন। এটা ছিল হালাল খাদ্য, সংসারবিমুখতা এবং সর্বতোভাবে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়ারই ফল। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ সব বিষয় অস্বীকার করে; সে মূর্খ। যেমন কেউ ঔষধ পান না করেই সেটা যে বিরেচক তা অস্বীকার করে। অনেক দিন সাধনা করার পরও যদি এটা কেউ অর্জন করতে না পারে এবং সে অন্যের জন্যেও এটা অস্বীকার করে, তবে সে সেই ব্যক্তির মত, যে বিরেচক ঔষধ পান করে কিন্তু তার কোন অভ্যন্তরীণ রোগের কারণে দাস্ত হয় না। ফলে, যে ঔষধটি বিরেচক, সে তা অস্বীকার করে বসে। এ ব্যক্তি মূর্খতায় যদিও প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম, কিন্তু সে-ও যে পূর্ণ মূর্খ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুহদ

যুহদ তথা সংসার অনাসক্তি অধ্যাত্ম পথের পথিকগণের একটি উৎকৃষ্ট মকাম। এটা এলম, হাল ও আমলের মাধ্যমে গঠিত হয়। আমাদের মতে যুহদের মানে হচ্ছে এক বস্তু থেকে অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আগ্রহ পোষণ করা। যে ব্যক্তি কোন বস্তু থেকে অন্য বস্তুর প্রতি আগ্রহ করে, সে প্রথম বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ থেকে বুঝা গেল, যুহদের জন্যে দুটি বস্তু প্রয়োজন। এক, যার দিক থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়া হয় এবং দুই, যার প্রতি আগ্রহ পোষণ করা হয়। এই দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুর তুলনায় উত্তম হওয়া শর্ত। প্রথম বস্তুর জন্যেও এমন হওয়া শর্ত যে, তার প্রতি কোন না কোন কারণে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমন বস্তু থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়াকে যুহদ বলা হবে না, যা স্বয়ং কাম্য নয়। যেমন, পাথর ও মাটি থেকে যে আগ্রহ সরিয়ে নেয়, সে যাহেদ তথা দরবেশ হবে না। কেননা, এগুলোর প্রতি আগ্রহই হয় না। দরবেশ হবে সে লোক, যে টাকা-পয়সা বর্জন করে। দ্বিতীয় বস্তুর জন্যেও শর্ত এই যে, তা দরবেশের মতে প্রথম বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে হবে, যাতে সে তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হয়। যেমন বিক্রেতা নিজের পণ্য সামগ্রী ততক্ষণ বিক্রি করে না, যতক্ষণ তার মতে বিনিময় উৎকৃষ্ট না হয়। এ কারণেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে —

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

অর্থাৎ, তারা ইউসুফকে বিক্রি করে দিল সামান্য দামে— গোনাগুনতি কয়েক দেরহামের বিনিময়ে। এ ব্যাপারে তারা দরবেশ হয়ে গিয়েছিল।

আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইউসুফের ব্যাপারে দরবেশী প্রদর্শন করেছে। অর্থাৎ, তারা লোভ করেছে যেন, পিতার মনোযোগ কেবল তাদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। এটা তাদের কাছে ইউসুফের তুলনায় অধিক প্রিয় ছিল। এই বিনিময় পাওয়ার আশায়ই তারা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল।

এই বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, দুনিয়াতে যাহেদ তথা দরবেশ তাকেই বলা হবে, যে দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত কাজ করবে, অর্থাৎ, আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে, সে আখেরাতের পক্ষে দরবেশ হবে। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যে বিশেষভাবে দুনিয়াকেই বিক্রি করে, তাকেই দরবেশ বলা হয়। যেমন "এলহাদ" বিশেষভাবে সেই প্রবণতাকেই বলা হয়, যা বাতিলের প্রতি হয়। নতুবা অভিধানে কেবল প্রবণতাকেই এলহাদ বলা হয়—বাতিলের প্রতি হোক অথবা সত্যের প্রতি।

যুহদের জন্যে এটাও শর্ত যে, যে বস্তু থেকে আগ্রহ সরিয়ে নেয়া হবে, তা কোন না কোনরূপে কাম্য হতে হবে। এ কারণেই যুহদ তখনই হবে, যখন এই বস্তুর তুলনায় দ্বিতীয় বস্তুটি অধিকতর কাম্য ও প্রিয় হবে। নতুবা প্রথম কাম্য বস্তুটি ত্যাগ করা অসম্ভব হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যসব বস্তুর প্রতি বিমুখ হয়, এমনকি বেহেশতের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য না রাখে— কেবল আল্লাহর প্রতি আগ্রহ রাখে, সে সর্বাবস্থায় দরবেশ। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভোগসামগ্রীর প্রতি বিমুখ হয়, কিন্তু আখেরাতের ভোগসামগ্রী পাওয়ার বাসনা রাখে এবং বেহেশতের হূর, প্রাসাদ, নহর ও ফলমূলের লোভ পোষণ করে, সেও কতক দরবেশ হবে, কিন্তু প্রথম ব্যক্তির তুলনায় কম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কতক ভোগসামগ্রী ত্যাগ করে এবং কতক ত্যাগ করে না; যেমন ধন-সম্পদ বর্জন করে এবং যশ-প্রতিপত্তি বর্জন করে না, এরূপ ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই দরবেশ বলা যাবে না। দরবেশদের মধ্যে তার মর্তবা তওবাকারীদের মধ্যে সেই তওবাকারীর অনুরূপ হবে, যে কোন কোন গোনাহ থেকে তওবা করে এবং কোন কোন গোনাহ থেকে করে না। তবে তার দরবেশী জায়েয হবে, যেমন কোন কোন গোনাহ্ থেকে তওবা করা জায়েয। কেননা, তওবা হচ্ছে নিষিদ্ধ ও হারামকে ত্যাগ করার নাম আর দরবেশী হচ্ছে বৈধ বিষয়াদি ত্যাগ করার নাম।

মানুষ কিছু কিছু নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং কিছু কিছু ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি শুধু নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করে, সে দরবেশ নয়। দরবেশ যে বৈধ বিষয়টি ত্যাগ করবে, তা তার ক্ষমতাধীন হওয়াও শর্ত। কেননা, যে বস্তু অর্জন করার ক্ষমতা নেই, তা ত্যাগ করার কোন অর্থ হয় না। এ কারণেই হযরত ইবনে মোবারককে কেউ "হে দরবেশ" বললে তিনি বললেন ঃ দরবেশ হলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয (উমাইয়া খলীফা)। কেননা, দুনিয়া তাঁর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আগমন

করেছে। তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি কি বস্তু ত্যাগ করেছি যে, দরবেশ হব?

যুহদের জন্য এলম দরকার, যা থেকে হাল উৎপন্ন হয়। আর এই এলম হল একথা জানা যে, যা ত্যাগ করা হবে, তার তুলনায় প্রার্থিত বস্তু উৎকৃষ্ট। যেমন ব্যবসায়ী যখন জেনে নেয় পণ্যের তুলনায় বিনিময় উত্তম, তখনই সে পণ্য ত্যাগ করতে আগ্রহী হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জেনে নেয় যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম এবং আখেরাত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী, সে আখেরাত ও আল্লাহর প্রতিই উৎসাহী হয়। অতএব, দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্যের এলম যত বেশী হবে, যুহদের আগ্রহ তত বেশী হবে। যুহদে যতটুকু এলম দরকার, তা হচ্ছে আখেরাতকে উত্তম ও অক্ষয় জানা। এটা অনেক মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা দুনিয়া ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণ বিশ্বাসের দুর্বলতা অথবা কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ থাকা অথবা শয়তানের অনুসরণ ছাড়া কিছু নয়। তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকে এবং তদবস্থায় মৃত্যু এসে তাদেরকে চেপে ধরে। তখন অনুতাপ ও অনুশোচনা ছাড়া কিছুই সঙ্গে যায় না। দুনিয়ার নিকৃষ্টতার প্রমাণ এই আয়াত قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ অর্থাৎ, বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার খুবই নগণ্য।

আর আখেরাতের উৎকৃষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ

অর্থাৎ, আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা বললেন ঃ সর্বনাশ হোক তোমাদের, ঈমানদারের জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত সওয়াব উত্তম।

যুহদের হাল থেকে উদ্ভূত আমল হচ্ছে বর্জন করা ও অর্জন করা। অর্থাৎ, দুনিয়াকে তার সমস্ত উপকরণ ও সম্পর্কসহ এমনভাবে বর্জন করা যাতে তার মহব্বত অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে যায় এবং এবাদত ও আনুগত্যের মহব্বত অন্তরে আসন পাতে। যে বস্তু অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তা চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ থেকেও দূর হতে হবে এবং এগুলো আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যে নিয়োজিত থাকতে হবে। নতুবা শুধু দুনিয়া বর্জন করলে এমন হবে, যেমন কেউ পণ্যদ্রব্য ক্রেতার হাতে দিয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করে না।

যুহদের ফযীলত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ -

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমক সহকারে উপস্থিত হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ আহা, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে, তা যদি আমাদেরকেও দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল , তারা বলল ঃ ধিক তোমাদেরকে, যে ঈমানদার, তার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত সওয়াবই শ্রেষ্ঠ।

এ আয়াতে যুহদকে আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা যুহদের চূড়ান্ত প্রশংসা। আরও বলা হয়েছে—

اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, সবর করার কারণে তারা তাদের পুরস্কার দু'বার পাবে।

তাফসীরকারগণ বলেন ঃ যারা দুনিয়াতে যুহদ করতে গিয়ে সবর করেছে, আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার ফসল চায়, তাকেও দুনিয়ার কিছু অংশ দেই এবং সে আখেরাতে কিছুই পাবে না।

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

অর্থাৎ, আমি কাফেরদের কতককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব

জীবনের যে চাকচিক্য ভোগ করতে দিয়েছি, সেদিকে আপনি কখনও লক্ষ্য করবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযক শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী।

অন্য আয়াতে আছে ঃ

يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ, তারা অখেরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে।

এটা কাফেরদের বিশেষণ। এ থেকে জানা যায়, মুমিন সেই, যে এর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত হয়। অর্থাৎ, আখেরাতকে পছন্দ করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার কর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ বিশৃঙ্খল ও রুযী অনিশ্চিত করে দেন। সে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। তার দুনিয়া ততটুকু অর্জিত হয়, যতটুকু লিখিত আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল আখেরাতের চিন্তা করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রচেষ্টাকে সংহত এবং জীবিকাকে সুরক্ষিত রাখেন। তার অন্তর ধনী হয়ে যায় এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে তার কাছে ধরা দেয়।

এক হাদীসে আছে, যখন তোমরা কাউকে চুপ থাকতে ও দুনিয়াতে যুহদ করতে দেখ, তখন তার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর। কেননা, তাকে প্রজ্ঞা শিখানো হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ, যে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, সে অশেষ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ اَرَدْتَّ اَنْ يُحِبَّكَ اللّٰهُ فَازْهَدْ فِى الدُّنْيَا

অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহর মহব্বত চাও, তবে দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন কর।

এতে যুহদকে মহব্বতের কারণ বলা হয়েছে।

আহ্‌লে বায়ত থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلزُّهْدُ وَالْوَرَعُ يَجُوْلَانِ فِى الْقُلُوْبِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَاِنْ صَادَفَا قَلْبًا فِيْهِ الْاِيْمَانُ وَالْحَيَاءُ اَقَامَا فِيْهِ وَاِلَّا ارْتَحَلَا -

অর্থাৎ, যুহদ ও পরহেযগারী মানুষের অন্তরসমূহে ঘুরাফেরা করে। যদি

ঈমান ও লজ্জাশীল কোন অন্তর পায়, তবে সেখানে থেকে যায়। অন্যথায় চলে যায়।

হযরত হারেসা (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন ঃ আমি নিশ্চিতই ঈমানদার। তিনি বললেন ঃ তোমার ঈমানের স্বরূপ কি? হারেসা (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমি নিজেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। দুনিয়ার পাথর ও সোনা আমার কাছে সমান। আমি যেন জান্নাত ও দোযখের মধ্যস্থলে আমার রবের আরশের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই চিনেছ! এখন এর উপর কায়েম থেকো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর এই বান্দার অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত হারেসা (রাঃ) ঈমানের স্বরূপ যুহদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

এক আয়াতে অছে—

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্যে উন্মোচিত করে দেন।

এই অন্তর উন্মোচনের অর্থ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ যখন নূর প্রবেশ করে, তখন তার জন্যে বক্ষ খুলে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ এর কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এর লক্ষণ হচ্ছে ধ্বংসশীল দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং মৃত্যুর পূর্বে তার প্রস্তুতি নেয়া। এখানে যুহদকে ইসলামের লক্ষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহর কাছে যথার্থ লজ্জা কর। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমরা তো আল্লাহর কাছে লজ্জা করি। তিনি বললেন ঃ না, কর না। কারণ, তোমরা এমন ঘর নির্মাণ কর, যাতে বসবাস কর না এবং এমন সামগ্রী সঞ্চয় কর, যা ভোগ কর না। এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই উভয় বিষয় আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ করার পরিপন্থী।

একবার এক স্থান থেকে একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমরা মুমিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মুমিন হওয়ার পরিচয় কি? তারা বলল ঃ বিপদে সবর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করা, আল্লাহর নির্দেশে সন্তুষ্ট থাকা এবং শত্রুর উপর

বিপদ এলে আনন্দিত না হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ যদি তোমরা এমনি হও, তবে যা খাওয়ার নয়, তা সঞ্চয় করবে না, যে ঘর বসবাস করার নয়, তা নির্মাণ করবে না এবং যে বস্তু ত্যাগ কর, তার আগ্রহ করবে না। এই হাদীসে যুদহকে ঈমানের পরিশিষ্ট বলা হয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) খোতবায় এরশাদ করলেন ঃ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এর সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করবে না, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অন্য কিছু মিশ্রিত না করার মানে কি? এর ব্যাখ্যা করে দিন। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়াকে প্রিয় মনে করা। কিছু লোক রসূলগণের মত কথাবার্তা বলে, কিন্তু কাজ যালেম শাসকবর্গের মত। অতএব, যার মধ্যে এসব বিষয়ের কোন কিছু নেই, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্ষুধার অবস্থা দেখে আমি কান্না সামলাতে পারিনি। আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে খাদ্য প্রার্থনা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, যদি আমি আমার পরওয়ারদেগারের কাছে স্বর্ণের পাহাড় প্রার্থনা করতাম, তবে আল্লাহ আমার ইচ্ছামত স্বর্ণের পাহাড় বশীভূত করে দিতেন এবং সে আমার সাথে সাথে চলত। কিন্তু আমি দুনিয়ার ক্ষুধাকে তৃপ্তির উপর, দারিদ্র্যকে ধনাঢ্যতার উপর এবং দুঃখকে খুশীর উপর অবলম্বন করে নিয়েছি। হে আয়েশা! দুনিয়া মোহাম্মদ ও তার পরিবারবর্গের জন্যে উপযুক্ত নয়। আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা বড় বড় পয়গম্বরগণের জন্যে যা পছন্দ করেছেন, আমার জন্যেও তাই পছন্দ করেছেন। যে আদেশ তাদেরকে দিয়েছেন, আমার জন্যে তাই মনোনীত করেছেন। কোরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অর্থাৎ, বড় বড় পয়গম্বরগণ যেমন সবর করেছেন, আপনিও তেমনি সবর করুন।

আল্লাহর কসম, আমি তাঁর আনুগত্য থেকে পালাতে পারি না। তাদের মত আমিও যথাসাধ্য সবর করব। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সবর করার শক্তিও নেই।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন অনেক দেশ বিজিত হল,

তখন তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) পিতার খেদমতে আরয করলেন ঃ যখন দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিনিধিদল আপনার কাছে আসে তখন আপনি মিহিন বস্ত্র পরিধান করুন এবং আপনি নিজেও খান এবং অপরকেও খেতে দিন। হযরত উমর বললেন ঃ হে হাফসা, তোমার তো জানা আছে যে, স্বামীর অবস্থা তার পত্নী অধিক জানে। হযরত হাফসা বললেন ঃ হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি— তুমি কি জান না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত বছর নবী রইলেন কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ কখনও দিনের খাদ্য তৃপ্ত হয়ে খেতে পারেননি। তারা দিনে খেলে রাতে অভুক্ত থাকতেন এবং রাতে খেলে দিনে অভুক্ত থাকতেন। তুমি জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত বছর পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু খয়বর বিজিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ পেট ভরে খোরমাও খেতে পারেননি। তুমি জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি কম্বল দু'ভাঁজ করে তার উপর শয়ন করতেন। এক রাত্রিতে কেউ সেটাকে চার ভাঁজ করে দিল। তিনি তার উপর খুব সুখে নিদ্রা গেলেন। অতঃপর জেগে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমাকে রাত্রি জাগরণে বাধা দিয়েছ। এখন থেকে কম্বলকে আগের মত দু'ভাঁজ করে বিছাবে। তুমি আরও জান, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরার কাপড় ধোয়ার জন্যে খুলতেন এবং ধুয়ে রৌদ্রে দিতেন। ইতিমধ্যে বেলাল এসে নামাযের কথা জানাত। নামাযে যাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে অন্য কাপড় থাকত না। তাই সে কাপড় শুকালেই তিনি নামাযে যেতেন। তুমি জান, বনী কুফরের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্যে দুটি চাদর, একটি লুঙ্গি ও একটি উত্তরীয় তৈরি করেছিল এবং এগুলোর মধ্যে প্রথমে একটি চাদর পাঠিয়ে দিয়েছিল। কারণ, অন্যগুলো তখনও তৈরি হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই একটি মাত্র চাদরই গায়ে জড়িয়ে নামাযে বের হলেন। চাদরের দুই প্রান্ত ঘাড়ের কাছে বেঁধে নিয়েছিলেন। কারণ, তখন তাঁর দেহে অন্য কোন কাপড় ছিল না। এভাবেই তিনি নামায পড়লেন।

মোটকথা, হযরত উমর কন্যার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুহদের অবস্থা এত বেশী বর্ণনা করলেন যে, হযরত হাফসা কাঁদতে লাগলেন এবং তিনিও সজোরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। মনে হচ্ছিল যেন এখনই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত উমরের আরও কথা বর্ণিত আছে।

তিনি আরও বললেন ঃ আমার দু'জন সঙ্গী ছিলেন, যারা একই পথে গমন করেছেন। এখন যদি আমি অন্য পথে চলি, তবে অচিরেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। আল্লাহর কসম, আমি তাদের মত জীবন নিয়েই সবর করব, যাতে তাদের সাথে তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পূর্বের পয়গম্বরগণ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। তাঁরা কম্বল ছাড়া অন্য কিছু পরতেন না। উকুন দ্বারা তাদের পরীক্ষা হত। এত বেশী উকুন হত যে, তারা উকুনের জ্বালায় মরোণোন্মুখ হয়ে পড়তেন। কিন্তু এ অবস্থাই তাঁদের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। মোটকথা, আল্লাহর নবী ও রসূলগণ সাধারণ মানুষের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক জানতেন এবং আখেরাতের সাফল্য সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের যুহদের অবস্থা ছিল এই, যা বর্ণিত হল।

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে— কোরআনের এই আয়াত—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا ... الخ

যখন অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ধিক দুনিয়ার প্রতি এবং ধিক দীনার ও দেরহামের প্রতি। অর্থাৎ, টাকা-পয়সা ও আশরফীর প্রতি। এতে আমরা সবাই আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সোনা-রূপার ভাণ্ডার গড়ে তুলতে নিষেধ করেছেন। এখন আমরা কোন্ বস্তুর ভাণ্ডার গড়ে তুলব? তিনি বললেন ঃ তোমাদের এই বিষয়গুলো হাসিল করা উচিত—যিকরকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং সৎস্বভাবা স্ত্রী, যে আখেরাতের কাজে স্বামীর সহায়তা করে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—

مَنْ اٰثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ بِثَلَاثٍ هَمًّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ اَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَسْتَغْنِىْ اَبَدًا وَحِرْصًا لَا يَشْبَعُ اَبَدًا -

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বিষয়ের সাথে জড়িত করে দেন। এক, এমন চিন্তা,

যা তাঁর অন্তর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। দুই, এমন দারিদ্র্য, যা তাকে কখনও ধনী হতে দেয় না। তিন, এমন লোভ, যা তাকে কখনও পরিতৃপ্ত হতে দেয় না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ দুনিয়া একটি পুল। এটি পার হয়ে যাও। এর উপর প্রাসাদ নির্মাণ করো না। লোকেরা আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী, আপনি অনুমতি দিলে আমরা একটি গৃহ নির্মাণ করে দেই, যাতে আপনি এবাদত করবেন। তিনি বললেন ঃ যাও, পানির উপর দালান কেমন করে টিকে থাকবে?

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরওয়ারদেগার আমার সামনে এই প্রস্তাব রাখেন— আপনি চাইলে মক্কার সমস্ত কংকরময় ভূমিকে আপনার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়া হবে। আমি আরয করলাম ঃ আমি চাই না; বরং আমি একদিন অভুক্ত থাকতে চাই এবং একদিন পেট পুরে খেতে চাই, যাতে যেদিন অভুক্ত থাকি, সেদিন আপনার দরবারে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করি এবং যেদিন খাই, সেদিন আপনার প্রশংসা ও হামদ করি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলের সাথে বাইরে যান। সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে জিবরাঈল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় আমার পরিবারের লোকজন এক মুঠো ছাতুও পায়নি এবং এক মুঠো আটাও পায়নি। এ কথাটি শেষ করতে না করতেই তিনি হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি বজ্রনাদ শুনতে পেলেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামতের আদেশ হয়ে গেল নাকি? জিবরাঈল আরয করলেন ঃ না! বরং আপনার কথা শুনামাত্রই ইসরাফীল (আঃ) নীচে অবতরণ করেছেন। অতঃপর ইসরাফীল খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ আপনার কথা আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন। এখন আমাকে পৃথিবীর চাবি দিয়ে পঠিয়েছেন এবং একথা আরয করতে আদেশ করেছেন যে, আপনার মরযী হলে আমি মক্কার পাহাড়সমূহকে পান্না, চুনি ও সোনা-রূপায় পরিণত করে আপনার সাথে সাথে ঘুরার ব্যবস্থা করব। আর আপনি ইচ্ছা করলে পয়গম্বর ও বাদশাহ হবেন এবং ইচ্ছা করলে পয়গম্বর ও বান্দা হবেন। জিবরাঈল ইশারা করলেন, আপনি আল্লাহর জন্যে বিনয় করুন। সেমতে রসূলুল্লাহ

(সাঃ) তিনবার বললেন ঃ আমি রসূল ও বান্দা থাকব।

এক হাদীসে আছে —

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ وَهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ فَلْيَزْهَدْ فِى الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ তাকে শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞান দান করুন এবং পথ প্রদর্শন ব্যতিরেকে সুপথ দান করুন, তার উচিত দুনিয়াতে যুহদ করা।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

مَنِ اشْتَاقَ اِلَى الْجَنَّةِ يُسَارِعُ اِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ لَهِىَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ تَرَكَ اللَّذَّاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِى الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيْبَاتُ -

অর্থাৎ, যে জান্নাতের আগ্রহী হয়, সে সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হয়। যে জাহান্নামকে ভয় করে, সে কুপ্রবৃত্তিসমূহ ভুলে যায়। যে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করে। আর যে দুনিয়াতে যুহদ করে, বিপদাপদ তার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, মানুষকে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ করে আখেরাতের প্রতি আগ্রহী করার জন্যেই পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা মানুষের সাথে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, তার অধিকাংশই দুনিয়ার অনিষ্ট ও নিন্দা সম্বলিত ছিল। এখানে তাদের সকল হাদীস ও বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। যতটুকু বর্ণিত হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্যে তাই যথেষ্ট।

এ সম্পর্কে মনীষী জনদের উক্তিও অসংখ্য ও অগণিত। সেমতে বর্ণিত আছে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সর্বদা মানুষের উপর থেকে আল্লাহর ক্রোধকে দূরে সরিয়ে রাখে— যে পর্যন্ত মানুষ তাদের হ্রাসপ্রাপ্ত দুনিয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে। এক রেওয়ায়েতে আছে, যে পর্যন্ত দুনিয়ার বিষয়াদিকে আখেরাতের বিষয়াদির উপর প্রাধান্য না দেয়। আর যদি প্রাধান্য দেয়, এরপর মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তবে আল্লাহ বলে

দেবেন—তুমি মিথ্যাবাদী। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমরা সকল আমলই করেছি; কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়া থেকে যুহদ করার চেয়ে বড় আমল কোনটি পাইনি।

জনৈক সাহাবী এক তাবেঈকে বললেন ঃ তোমরা সাহাবীগণের তুলনায় আমল ও চেষ্টা বেশী কর। এতদসত্ত্বেও তারা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেউ প্রশ্ন করল ঃ এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তারা তোমাদের তুলনায় দুনিয়াতে যুহদ বেশী করতেন। বেলাল ইবনে সা'দ বলেন, আমাদের এ গোনাহ্‌ই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে যুহদ করতে বলেন, আর আমরা দুনিয়ার প্রতিই ঔৎসুক্য পোষণ করি।

এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান ছওরীর খেদমতে আরয করল ঃ আমি একজন আলেম ও যাহেদকে দেখার বাসনা রাখি। তিনি বললেন ঃ হতভাগা, এটা তো হৃত বস্তু, যা পাওয়া যায় না। ওয়াহব ইবনে মুনাব্বেহ্‌ বলেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। যখন জান্নাতীরা এসব দরজার দিকে ধাবিত হবে, তখন দারোয়ানরা বলবে— পরওয়ারদেগারের ইযযতের কসম, এসব দরজা দিয়ে যাহেদদের পূর্বে কেউ যাবে না। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তিনটি বিষয় কামনা করি—যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন (১) যেন আমার কাছে একটি দেরহামও না থাকে, (২) আমার উপর কোন ঋণ না থাকে এবং (৩) আমার হাড়ে যেন মাংস না থাকে। কথিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই তিনটি বাসনাই পূর্ণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, বাদশাহ একবার ফেকাহবিদ আলেমগণের কাছে কিছু পুরস্কার প্রেরণ করেন। তারা সেই পুরস্কার কবুল করে নেন; কিন্তু ফুযায়ল ইবনে আয়াযের কাছে প্রেরিত দশ হাজার দেরহাম তিনি কবুল করলেন না। এতে তার পুত্ররা আরয করল ঃ সকলেই কবুল করেছেন, আর আপনি দরিদ্রতা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এটা কেন? জওয়াবে হযরত ফুযায়ল কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক এমন, যেমন কিছু লোকের একটি বলদ ছিল, যা দ্বারা তারা হালচাষ করত। বলদটি যখন বুড়ো হয়ে হালচাষের অযোগ্য হয়ে পড়ল, তখন একদিন তারা সেটিকে যবাহ করে ফেলল। এখন দেখা যাচ্ছে, তোমরাও আমাকে যবাহ্‌ করতে চাও। কারণ, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বৎসগণ, বুড়ো পিতাকে যবাহ করার তুলনায় তোমাদের ক্ষুধায় মরে যাওয়া উত্তম।

হযরত ওবায়দ ইবনে ওমায়র বলেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ) পশম পরিধান করতেন এবং গাছের পাতা খেতেন। তাঁর মরে যাওয়ার মত কোন পুত্রও ছিল না এবং নষ্ট হওয়ার মত কোন গৃহও ছিল না। তিনি আগামীকালের জন্যে কিছুই রাখতেন না। যেখানে রাত হত, সেখানেই শুয়ে পড়তেন। হযরত আবু হাযেমের স্ত্রী একদিন স্বামীকে বলল ঃ এখন শীত সমাগত। তাই খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও লাকড়ী সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া উপায় নেই। তিনি বললেন ঃ এসব বস্তু ছাড়াও উপায় আছে। উপায় নেই কেবল এটি ছাড়া যে, আমরা মরব, এরপর পুনরুত্থিত হয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হব। এরপর হয় জান্নাত, না হয় দোযখ।

হযরত ইবরাহীম বলেন ঃ আমাদের অন্তরের উপর তিনটি পর্দা পড়ে রয়েছে। এগুলো দূর না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস স্পষ্ট হয় না। এক— উপস্থিত বস্তুতে তুষ্ট হওয়া, দুই— হারানো বস্তুর জন্যে দুঃখ করা এবং তিন— প্রশংসা শুনে আনন্দিত হওয়া। যে উপস্থিত বস্তুতে তুষ্ট হয়, সে লোভী। যে হারানো বস্তুর জন্যে দুঃখ করে, সে রাগী। রাগী মাত্রই শাস্তিযোগ্য। আর যে প্রশংসা শুনে আনন্দিত হয়, সে অহমিকা করে। অহমিকা আমলকে বাতিল করে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু আমাদেরকে দেননি, সেগুলোর অনুগ্রহ দেয়া বস্তুসমূহের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ, দেয়ার চেয়ে না দিয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন। এই উক্তিটিতে যেন নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, অথচ সে তা পছন্দ করে। যেমন তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে ক্ষতির ভয়ে পানাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

রোগীকে কুখাদ্য না দেয়ার পরিণতি হচ্ছে স্বাস্থ্য উদ্ধার, যা রোগীর কাম্য আর রোগীকে কুখাদ্য দেয়ার পরিণতি হচ্ছে রোগবৃদ্ধি, যা কারও কাম্য নয়। রোগী যদি এ বিষয়টি বুঝে, তবে সে বুঝতে পারবে, কুখাদ্য দেয়ার তুলনায় কুখাদ্য না দেয়ার আচরণটিই উত্তম।

হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ দুনিয়া ক্ষয়শীল— অক্ষয় নয়; বিপদের আবাসস্থল— সুখের আবাসস্থল নয়। যে একে চিনে নেয়, সে এর বিস্তৃতি দেখে আনন্দিত হয় না এবং সংকোচন দেখে দুঃখিত হয় না। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ চারটি বস্তু তথা ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন এবাদতকারীর এবাদত খাঁটি হয় না।

হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি এমন লোকদেরকে দেখেছি এবং এমন লোকদের সঙ্গ লাভ করেছি, যারা দুনিয়ার কোন কিছু লাভ করে তুষ্ট হত না এবং কোন কিছু হারিয়ে দুঃখিত হত না। দুনিয়া তাদের দৃষ্টিতে মাটির চেয়েও নিকৃষ্টতম ছিল। তাদের কেউ পঞ্চাশ ও ষাট বছর জীবন অতিবাহিত করত এভাবে যে, তাদের কোন কাপড় ভাঁজ করা হত না এবং তাদের জন্যে উনানে হাঁড়ি চড়ানো হত না, মাটিতে বিছানা করা হতো না এবং নিজ গৃহে আহার করা হতো না। রাত হলে তারা দাঁড়িয়ে যেত সেজদা করার জন্যে, অশ্রু প্রবাহিত করার জন্যে এবং মুক্তির জন্যে, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করার জন্যে। কোন পুণ্য কাজ করলে তার শোকর আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং তা কবুল করার জন্যে আবেদন করত।

যুহদের স্তর ঃ যুহদের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম ও সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দুনিয়াতে যুহদ করা এবং দুনিয়ার খাহেশ ও তার প্রতি টানও রাখা; কিন্তু মোযাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে সেই টানকে দমিত রাখা। এরূপ যুহদকারীকে "মুতাযাহ্হিদ" (যুহদের ভানকারী) বলা হয়। এটা যুহদের সূচনা। এরূপ ব্যক্তি আশংকার মধ্যে থাকে। কেননা, তার খাহেশ যে কোন সময় প্রবল হয়ে যেতে পারে। ফলে, সে দুনিয়ার দিকে ফিরে যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর হল দুনিয়াকে নিজের আগ্রহে বর্জন করা। যে বস্তুর আশা করেছে, তার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করার কারণে। যেমন কেউ দু' দেরহাম পাওয়ার আশায় এক দেরহাম ছেড়ে দেয়। এরূপ ব্যক্তি নিজের যুহদকে বুঝে এবং লক্ষ্য রাখে। ফলে, সে অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ কারণে যুহদের এ স্তরটিও ত্রুটিমুক্ত নয়।

তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নিজের খুশীতে যুহদ করা এবং যুহদের মধ্যেও যুহদ করা। অর্থাৎ, নিজের যুহদকে কিছুই মনে না করা। কেননা, সে দুনিয়াকে নিছক একটি অবস্তু মনে করে; যেমন কেউ মৃৎপাত্রের ভাঙা

টুকরা দিয়ে মোতি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সে মনে করবে না যে, সে এই মোতিটি কিছু দিয়ে গ্রহণ করেছে। সে মাটির এই ভাঙ্গা টুকরার কথা কোনদিন চিন্তাও করবে না। মোতির তুলনায় মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা যেমন নগণ্য ও হেয়, আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় দুনিয়া আরও বেশী তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। সুতরাং যুহদের পরাকাষ্ঠা এই স্তরেই নিহিত। এরূপ যাহেদ কখনও দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে- এরূপ আশংকা নেই।

যুহদে যে বস্তু কাম্য হয়ে থাকে, তারও তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দোযখের আগুন, কবরের আযাব, হিসাব-নিকাশের বিপদ, পুলসিরাতের বিপদ ইত্যাদি থেকে মুক্তি কাম্য হওয়া। এরূপ কামনা নিয়ে তারা যুহদ করে, যাদের মধ্যে খওফ অর্থাৎ, ভয় প্রবল।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে যুহদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সওয়াব, পুরস্কার ও জান্নাতের অনাবিল সুখ কাম্য হওয়া । এরূপ কামনা নিয়ে তারা যুহদ করে, যাদের মধ্যে রিজা অর্থাৎ, আশা প্রবল।

তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে যুহদে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর দীদার কাম্য হওয়া এবং দোযখের কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করা, জান্নাতের হূর, প্রাসাদ ইত্যাদি সুখ-সম্ভোগের প্রতিও লক্ষ্য না থাকা। আপাদমস্তক আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমজ্জিত থাকা। সত্য বলতে কি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু কামনা না করাই হচ্ছে সত্যিকার তাওহীদ-বিশ্বাস। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু কামনা করা "শিরকে খফী" তথা গোপন শিরক। এই রকম যুহদ তারাই করে, যারা আল্লাহর আশেক ও দোস্ত। আর তারাই হচ্ছে আরেফ। কেননা, যে আল্লাহকে চিনে, সেই তাঁকে মহব্বত করে। যে ব্যক্তি দীনার ও দেরহামকে চিনে এবং একথাও যানে যে, উভয়টি এক সাথে রাখতে পারবে না, সে দীনারকেই রাখবে এবং তাকে মহব্বত করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দীনার ও দেরহামকে চিনে এবং একথাও জানে যে, আল্লাহর দীদার এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি, হূর-গেলমান, প্রাসাদ এক সাথে দেখা সম্ভবপর নয়, সে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর দীদারই কামনা করবে।

যে বস্তু থেকে যুহদ করা হয়, তার দিক দিয়েও যুহদের অনেক স্তর রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে যুহদ করা উচিত, এমনকি

নিজ সত্তা থেকেও যুহদ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নফসের উপকারী বিষয় থেকে যুহদ করা; যেমন খাহেশ, ক্রোধ, অহংকার, ক্ষমতালিপ্সা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, জাঁকজমক ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি থেকে যুহদ করা। চতুর্থত, জ্ঞান, সক্ষমতা, দীনার ও দেরহাম থেকে যুহদ করা। যে জ্ঞান ও সক্ষমতার দ্বারা মানুষের অন্তরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে তাই উদ্দেশ্য। বর্ণিত বিষয়সমূহ এভাবে সম্প্রসারিত করা হলে যেসব বিষয় থেকে যুহদ করতে হবে, সেগুলোর সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে এগুলোর মধ্য থেকে সাতটি উল্লেখ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী।

অন্য এক আয়াতে এগুলোকে পাঁচ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِعْلَمُوْا اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ -

অর্থাৎ, জেনে রাখ, পার্থিব জীবন হচ্ছে তামাশা, ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন ও জনের মধ্যে প্রাচুর্যের বিকাশ।

এরপর আরও এক আয়াতে এগুলোকে দু'য়ে সীমিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো কেবল তামাশা ও ক্রীড়াকৌতুক।

এরপর সবগুলোকে একের মধ্যে শামিল করে ব্যক্ত করা হয়েছে—

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ, এবং যে নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

এখানে هوى তথা খেয়ালখুশী শব্দটি যাবতীয় জৈবিক কামনা বাসনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব, এ থেকেই যুহদ করা উচিত। বলা বাহুল্য, আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পার্থক্য শুধু এই যে, এক আয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে সংক্ষেপে। সারকথা, যুহদ হচ্ছে যাবতীয় জৈবিক কামনা-বাসনা থেকে মন তুলে নেয়া। জৈবিক বাসনা থেকে মন তুলে নিলে দুনিয়া থেকেও তুলে নেয়া হবে এবং অবশ্যই আশা-নেশাও খাটো হবে। কারণ, ভোগ-বিলাসের জন্যেই জীবন কাম্য হয়ে থাকে এবং এর জন্যেই মানুষ স্থায়িত্ব কামনা করে। যখন ভোগ-বিলাস থেকেই মন তুলে নেয়া হবে, তখন জীবনও কাম্য থাকবে না। এ কারণেই যখন প্রথম প্রথম জেহাদ ফরয করা হয়, তখন অনেকেই বলতে থাকে—

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর জেহাদ ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে আরও কিছুকাল বাঁচতে দিলেন না কেন?

জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

অর্থাৎ, হে নবী, বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অল্প দিনের।

অর্থাৎ, তোমরা তো ভোগের জন্যেই বেঁচে থাকতে চাও। জেনে রাখ, সেটা সামান্যই। এরপর যুহদকারী ও মুনাফিকদের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গেল। যারা আল্লাহর মহব্বত রাখত এবং যুহদ করত, তারা আল্লাহর পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে যুদ্ধ করল। জেহাদের ডাক এলেই তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জান্নাতের সুবাস ছড়িয়ে পড়ত এবং তারা আগুনে পতঙ্গের মত

যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যাতে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখতে এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তাদের কেউ বিছানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হলে শাহাদতের মর্যাদা না পাওয়ার কারণে দুঃখ ও পরিতাপের অন্ত থাকত না। ইসলামের বীর সেনানী হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ শেষ বয়সে যখন বিছানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে থাকেনঃ আমি শাহাদতপ্রাপ্তির আশায় অনেক রণাঙ্গনে কাফেরদের দুর্ভেদ্য সারিতে ঢুকে গেছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে মর্যাদা পাইনি। আজ বৃদ্ধদের মত মৃত্যুবরণ করছি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর দেহে আটশ' ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এটা ছিল সত্যিকার ঈমানদারদের অবস্থা। অপরদিকে মুনাফিকদের অবস্থা কি ছিল? তারা মৃত্যুর ভয়ে কাপুরুষের মত দল ত্যাগ করে চলে যেত। তাদেরকে বলা হত—

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

অর্থাৎ, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা তোমাদেরকে ধরবেই।

তারা জীবিত থাকাকে শাহাদতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের অবস্থা এই হল যে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ -

অর্থাৎ, তারা ক্রয় করেছে পথভ্রষ্টতাকে হেদায়েতের বিনিময়ে। ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়নি।

খাঁটি বান্দারা তো জান্নাতপ্রাপ্তির অঙ্গীকারে নিজেদের জান ও মাল আল্লাহ তা'আলার হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা যখন দেখবে, বিশ-বাইশ বছর ভোগের বিনিময়ে অনন্ত সুখ অর্জিত হয়েছে, তখন তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না।

যুহদের সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের যে সব উক্তি বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোতে কেবল যুহদের কয়েক প্রকারই বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকেই এ

প্রসঙ্গে হয় সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল কিছু লিখেছেন, না হয় নিজের মধ্যে যা প্রবল দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ হযরত বিশর বলেনঃ দুনিয়া থেকে যুহদ করা অর্থ হচ্ছে লোকজন থেকে যুহদ করা। এ উক্তিতে কেবল জাঁকজমক থেকে যুহদ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত কাসেম জওয়ী বলেন ঃ দুনিয়া থেকে যুহদ কেবল উদর থেকে যুহদকে বলা হয়। মানুষ যতই উদরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, ততই তার যুহদ হবে। এতে একটি খাহেশের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা অন্যান্য খাহেশ অপেক্ষা গুরুতর।

হযরত ফুযায়ল বলেনঃ দুনিয়া থেকে যুহদের উদ্দেশ্য অল্পে তুষ্ট থাকা। এতে কেবল ধন-সম্পদ থেকে যুহদ বুঝানো হয়েছে। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেনঃ যুহদ আশা ও নেশাকে খাটো করার নাম। এ উক্তিতে যাবতীয় খাহেশ অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যার আশা খাটো হয়, সে যেন সকল খাহেশ থেকে মন তুলে নেয়। হযরত ওয়ায়স বলেনঃ যুহদকারী যখন জীবিকার অন্বেষণে বের হয়, তখন তার যুহদ পণ্ড হয়ে যায়। এ উক্তিতে যুহদের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়নি; বরং তাতে তাওয়াক্কুলের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

হাদীসবিদগণ বলেনঃ দুনিয়া হচ্ছে বুদ্ধির মাধ্যমে আমল করা। আর যুহদ হচ্ছে এলেমের অনুসরণ করা এবং সুন্নতের অনুসরণকে অপরিহার্য করে নেয়া। এতে কেবল জাঁকজমকের কিছু সামগ্রীর প্রতি অথবা নিরর্থক খাহেশের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উদাহরণতঃ এমন কিছু শাস্ত্র রয়েছে, যার কোন উপকারিতা নেই। কিন্তু মানুষ সেগুলোকে এত বিস্তৃতি দিয়েছে যে, কেউ সারা জীবন তাতে ব্যাপৃত থাকলেও পূর্ণরূপে অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যুহদকারীর জন্যে প্রথমে অনর্থক বিষয় থেকে যুহদ করা প্রয়োজন।

হযরত হাসান বলেনঃ যুহদকারী সে ব্যক্তি, যে কাউকে দেখে বলে উঠে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, তাঁর মতে বিনয়ের অপর নামই যুহদ। এতে জাঁকজমক ও আত্মম্ভরিতা না থাকার প্রতি ইশারা আছে, যা যুহদের একটি প্রকার মাত্র। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেনঃ যে ব্যক্তি কষ্টে সবর করে, খাহেশ পরিত্যগ করে এবং হালাল পথে রুযী-রোযগার করে, মৌলিক যুহদ সে-ই অর্জন করতে পেরেছে।

যুহদ সম্পর্কে এমনি ধরনের আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। মনীষীগণের এরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করার কারণ এটা নয় যে, এ বিষয়ে

তাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল; বরং কারণ এই যে, তারা যা বর্ণনা করেছেন, প্রয়োজনের মুহূর্তেই বর্ণনা করেছেন। ফলে যে পরিমাণ প্রয়োজন দেখেছেন, সে পরিমাণই বর্ণনা করেছেন। প্রয়োজন বিভিন্নরূপ হয় বিধায় তাদের জওয়াবও বিভিন্নরূপ হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আবু সোলায়মান দারানী যা বলেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও পূর্ণাঙ্গ ও স্বরূপ প্রকাশক। তিনি বলেনঃ যুহদ সম্পর্কে আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি। আমাদের মতে যুহদ হচ্ছে আল্লাহর পথে যা কিছু অন্তরায়, তা বর্জন করা। তাঁর আরও একটি উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে অথবা হাদীস লিপিবদ্ধ করে, সে দুনিয়াপ্রবণ। এতে তিনি এসব বিষয়কে যুহদের খেলাফ ব্যক্ত করেছেন। একবার তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন—

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থাৎ, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসে।

তিনি বলেনঃ এখানে সুস্থ অন্তর অর্থ সে অন্তর যাতে আল্লাহ ছাড়া কোনকিছু নেই।

বিধানের দিক দিয়ে যুহদ তিন স্তরে বিভক্ত— ফরয, নফল ও মোস্তাহাব। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম তাই বলেন। হারাম বিষয় থেকে যুহদ করা ফরয।

অন্তরের গোপন বিষয়াদি ত্যাগ করার দিকে লক্ষ্য করলে যুহদের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কেননা, অন্তরের গোপন বিষয়াদি যেমন— কুচিন্তা, জল্পনা-কল্পনা এবং গোপন রিয়া ইত্যাদির কোন শেষ নেই; বরং বাহ্যিক বিষয়াদির মধ্যেও যুহদের স্তর অসীম। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সেই যুহদ, যা হযরত ঈসা (আঃ) অর্জন করেছিলেন। তিনি একবার মাথার নিচে পাথর রেখে শুয়েছিলেন। শয়তান এসে বললঃ আপনি তো দুনিয়া বর্জন করেছিলেন। এখন একি দেখছি? তিনি বললেনঃ তুমি আমার মধ্যে দুনিয়ার কি দেখলে? শয়তান বললঃ আপনি মাথার নিচে পাথর রেখেছেন, যাতে মাথা উঁচু থাকে এবং আপনি আরাম পান। তিনি মাথার নিচ থেকে পাথরটি বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ নিয়ে যা, এই পাথর এবং দুনিয়া উভয়টিই নিয়ে যা।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সদাসর্বদা চট পরতেন। ফলে তাঁর দেহে চটের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। ত্বক আরাম পাবে—এই ভয়ে তিনি নরম পোশাক পরতেন না। তার স্নেহময়ী জননী বললেনঃ চটের পরিবর্তে পশমের জামা পর। তিনি তাই করলেন। পরক্ষণেই ওহী আগমন করলঃ হে ইয়াহইয়া, আমার উপর দুনিয়াকে পছন্দ করে নিলে? তিনি কাঁদতে কাঁদতে জামা খুলে ফেলে পূর্বের মত চটের পোশাক পরে নিলেন।

হযরত ইমাম আহমদ বলেনঃ হযরত ওয়ায়সের যুহদই ছিল যুহদ। তার উলঙ্গতার সীমা এতদূর পৌছেছিল যে, তিনি একটি চাটাইয়ের থলে বানিয়ে তাতে বসে থাকতেন। হযরত ঈসা (আঃ) একটি দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন। দেয়ালের মালিক তাঁকে সেখান থেকে তুলে দিল। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে তুলে দাওনি; বরং আমার জন্যে ছায়ার সুখ যার অভিপ্রেত নয়, তিনিই তুলে দিয়েছেন।

মোটকথা, ভেতর ও বাইর উভয় দিক দিয়ে যুহদের স্তর অসংখ্য। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রত্যেক সন্দেহযুক্ত ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যুহদ করা। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ হালাল বস্তু থেকে যুহদ করলেই সেটাকে যুহদ বলা হবে। সন্দিগ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যুহদ করলে সেটা যুহদের কোন স্তরে পড়ে না। বর্তমান যুগে হালালের অস্তিত্ব নেই বিধায় এখন তার মতে যুহদ অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করাই যখন যুহদ, তখন পানাহার করা, পোশাক পরা, মানুষের সাথে মেলামেশা করা ও কথাবার্তা বলার পরও যুহ্দ কিরূপে হবে? কেননা, এসব বিষয়ে মশগুল হওয়া তো আল্লাহ ছাড়া অন্য বিষয়ে মশগুল হওয়া। জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলাতে মশগুল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দিকে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বপ্রযত্নে মনোযোগী হওয়া। এটা জীবন ধারণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। জীবন ধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং মানুষ যদি এবাদতে দেহ দ্বারা সাহায্য নেয়ার উদ্দেশে দেহের জন্যে ক্ষতিকারক বিষয়াদিকে প্রতিহত করে, তবে একাজ দ্বারা সে গায়রুল্লাহর মধ্যে মশগুল হবে না। কেননা, যে কাজ ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয় না, সে

কাজও উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয়। এমনিভাবে এবাদতের উদ্দেশ্যে দেহকে ক্ষুধা, পিপাসা, উত্তাপ ও শৈত্য থেকে পানাহার, পোশাক ও বাসস্থান দ্বারা হেফাযত করাও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হবে, যদি তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। সুতরাং এসব বিষয় যুহদের পরিপন্থী নয় বরং এগুলো জরুরী।

জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে যুহদের সীমা ঃ মানুষ দু'রকম বিষয়ে মশগুল রয়েছে—প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় বিষয় যেমন পালিত ঘোড়া। মানুষ অধিকাংশ সময় আরামে সওয়ার করার জন্যে ঘোড়া রাখে, অথচ পায়ে হেঁটেও চলতে পারে। প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন আহার করা, পান করা ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিমাণ, প্রকার ও সময়ের দিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে যুহদের সীমা বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় বিষয় মোটামুটি ছয়টি—(১) অন্ন, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪), আসবাবপত্র, (৫) পরিবার-পরিজন ও (৬) ধন-সম্পদ। নিম্নে এসব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) অন্ন মানুষের জন্যে এই পরিমাণ জরুরী, যা তাকে সুস্থ ও সবল রাখে। কিন্তু এতে যুহদ অর্জন করার জন্যে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কিছুটা হ্রাস করতে হবে। দৈর্ঘ্য হচ্ছে সারা জীবনের দিক দিয়ে। কেননা, কেউ একদিনের অন্ন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। আর প্রস্থ হয় অন্নের পরিমাণ, প্রকার ও সময়ের মধ্যে। অতএব দৈর্ঘ্য হ্রাস করার উপায় হচ্ছে আশাকে খাটো করা। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে যখন তীব্র ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির আশংকা দেখা দেয়, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিমাণে আহার্য গ্রহণ করা। যে এরূপ করবে, সে দিনের খাদ্য থেকে কিছু রাতের জন্য রেখে দেবে না। এটা যুহদের সর্বোচ্চ স্তর। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে একমাস অথবা চল্লিশ দিনের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত করে রাখা। তৃতীয় স্তর হচ্ছে এক বছরের জন্যে সঞ্চিত করা। এটা দুর্বল যুহদকারীদের অবস্থা। যে ব্যক্তি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে, তাকে যুহদকারী বলা অসম্ভব। সে নিশ্চিতই দীর্ঘ আশাবাদী। হাঁ, যদি কোন পেশা না থাকে এবং মানুষের কাছে সওয়াল করতে মন না চায়, তবে এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করায় দোষ নেই; যেমন, হযরত দাউদ তায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দীনার প্রাপ্ত হয়ে তা সঞ্চয় করে

রাখেন এবং বিশ বছরে ব্যয় করেন। এটা তার যুহদের খেলাফ ছিল না। তবে যাদের মতে যুহদে তাওয়াক্কুল শর্ত, এটা তাদের খেলাফ।

পরিমাণের দিক দিয়ে প্রস্থ হ্রাস করার মাত্রা হচ্ছে একদিন ও একরাতের জন্যে নিম্নে এক পোয়া, মাঝারি আধাসের এবং সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ আহার করা, যা কাফ্ফারায় মিসকীনদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি এর বেশী আহার করবে, সে অতিভোজী ও উদরসেবী বলে গণ্য হবে।

প্রকারের দিক দিয়ে হ্রাসের মাত্রা হচ্ছে যে খাদ্য সুলভ, তাই আহার করা, তা ভুষির রুটি হোক না কেন। মাঝারি স্তরে যব ও বুটের রুটি আহার করা এবং সর্বোচ্চ স্তরে চালা হয়নি এমন গমের রুটি আহার করা। যে ব্যক্তি চালা গমের রুটি আহার করবে, সে যুহদের সর্বনিম্ন স্তর থেকেও খারিজ হয়ে যাবে। ব্যঞ্জনের মধ্যে নিম্নে লবণ, অথবা শাক অথবা সিরকা, মাঝারি স্তরে যয়তূনের তৈল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত বস্তু এবং উচ্চস্তরে যে কোন প্রকার গোশ্ত। এটা সপ্তাহে এক দু'বার হবে। দু'বারের বেশী হলে যুহদের কোন প্রকারেই দাখিল থাকবে না।

সময়ের দিক দিয়ে হ্রাসের মাত্রা নিম্নে রাতে ও দিনে একবার আহার করা অর্থাৎ রোযা রাখা। মাঝারি স্তরে একদিন রোযা রাখা ও রাতে না খেয়ে শুধু পানি পান করা, দ্বিতীয় দিন রোযা রেখে রাতে খাওয়া পানি পান করবে না এবং উচ্চস্তরে তিন দিন অথবা সপ্তাহের রোযা রাখা। এসব ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁরা খাদ্য ও ব্যঞ্জন হ্রাস করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যেত, যখন প্রদীপও জ্বলত না এবং আগুনও জ্বালানো হত না। কেউ প্রশ্ন করলঃ তা হলে পানাহার কেমন করে চলত? তিনি বললেনঃ দু'টি কাল বস্তু— খোরমা ও পানি দিয়ে। এখানে গোশ্ত, শোরবা, ব্যঞ্জন ইত্যাদি সবকিছুর বর্জন পাওয়া যায়। হযরত হাসান বলেনঃ রসূলে খোদা (সাঃ) গাধায় আরোহণ করতেন, পশমের বস্ত্র পরিধান করতেন, ছেঁড়া জুতা ব্যবহার করতেন এবং আহারের পর অঙ্গুলি লেহন করতেন। তিনি মাটিতে বসে আহার করতেন এবং বলতেনঃ আমি দাস এবং দাসের মতই আহার

করি এবং বসি। হযরত ফুযায়ল বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর কখনও তিন দিন পেট ভরে রুটি খাননি। হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ হে বনী ইসরাঈল, খাঁটি পানি পান কর এবং জঙ্গলের শাক ও যবের রুটি খাও—গমের রুটি থেকে বিরত থাক। তোমরা এর শোকর আদায় করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কুবাবাসীদের কাছে আগমন করেন, তখন তারা দুধে মধু মিশিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করে। তিনি পিয়ালা রেখে দেন এবং বলেনঃ আমি এটা হারাম করি না; কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ের জন্যে বর্জন করছি।

(২) বস্ত্রের মধ্যে নিম্নস্তর হল এমন পোশাক, যা উত্তাপ ও শৈত্য দূর করে এবং উলঙ্গতা নিবারণ করে। এরূপ পোশাক হচ্ছে একটি চাদর ও একটি পায়জামা। এর বেশী বস্ত্র হলে, সেটা যুহদের সীমার বাইরে। যুহদের জন্যে শর্ত এই যে, যখন কাপড় ধৌত করে, তখন দ্বিতীয় কাপড় পরিধানের জন্যে না থাকা। তখন যুহদকারী ঘরে বসে থাকবে। জামা, পায়জামা ও পাগড়ী দু'টি করে থাকলে, সেটা যুহদের সকল প্রকারের বাইরে।

পোশাকের প্রকারের মধ্যে নিম্নস্তর হচ্ছে মোটা চট, মাঝারি স্তর কম্বল এবং উচ্চস্তর মোটা সূতী বস্ত্র। এ ব্যাপারে সর্বাধিক সময় হচ্ছে এক বছর পরিধান করা যায় এমন পোশাক এবং সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে এক দিন পরিধান করা যায় এমন কাপড়। মাঝারি সময় এমন পোশাক, যা এক মাস অথবা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পরা যায়। সুতরাং এক বছরের বেশী টিকে এমন কাপড় তালাশ করা যুহদের পরিপন্থী। কেউ এই পরিমাণের বেশী কাপড় পেলে সে অন্যকে দিয়ে দেবে। কেননা, রেখে দিলে যুহদ বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারেও পয়গম্বর এবং সাহাবায়ে কেরামেরও তরীকার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) বলেনঃ হযরত আয়েশা আমাকে একটি চাদর ও একটি মোটা বস্ত্র দেখিয়ে বললেনঃ এ দু'টি বস্ত্রেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়েছে।

একবার হযরত আমর ইবনে আসওয়াদ বললেনঃ আমি কখনও খ্যাতির বস্ত্র পরিধান করব না, কখনও রাতে বিছিয়ে শুব না, কখনও উৎকৃষ্ট

সওয়ারীতে সওয়ার হব না এবং কখনও পেটপুরে আহার করব না। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর তরীকা দেখতে পছন্দ করে, সে আমর ইবনে আসওয়াদকে দেখুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক বস্ত্র ক্রয় করেন, যার মূল্য ছিল চার দেরহাম। তাঁর বস্ত্র জোড়াটি ছিল দশ দেরহামের। তাঁর লুঙ্গি দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার হাত ছিল। মাঝে মাঝে তিনি দু'টি এয়ামনী মোটা চাদর পরিধান করতেন, যার নাম ছিল হুল্লা। তিনি তিন দেরহাম দিয়ে পায়জামা খরিদ করেছেন। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি হলদে রেখাবিশিষ্ট রেশমী চাদর পরিধান করেন, যার মূল্য ছিল দু'শ' দেরহাম। সাহাবায়ে কেরাম এসে চাদরটি স্পর্শ করতেন এবং অবাক হয়ে বলতেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটি আপনার কাছে জান্নাত থেকে এসেছে। অথচ সেটি আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস তাঁর জন্য হাদিয়ারূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনার্থে চাদরটি পরিধান করেন। এরপর খুলে জনৈক মুশরিকের কাছে প্রতিদানস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার পর তিনি পুরুষদের জন্যে রেশমী বস্ত্র হারাম ঘোষণা করেন। এমনিভাবে তিনি একদিন সোনার আংটি পরিধান করেন এবং পরক্ষণেই খুলে ফেলেন। অতঃপর পুরুষদের জন্যে তা হারাম ঘোষণা করেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার বললেনঃ আকাশের ফেরেশতারা আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতি দেখে বাহ্যত হাসে; কিন্তু গোপনে আযাবের ভয়ে কাঁদে। তাদের বোঝা অন্যের উপর হালকা এবং নিজেদের উপর ভারী। তারা ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করে এবং দুনিয়াত্যাগী দরবেশদের অনুসরণ করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে থাকলেও অন্তর আরশের নিকটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন—যদি তুমি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে ধনীদের কাছে বসা থেকে বিরত থাকবে এবং তালি না লাগা পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বর্জন করবে না। হযরত ওমরের কাপড়ে বারটি তালি ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ছিল চামড়ার। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেনঃ পোশাক এমন হওয়া উচিত, যা বিজ্ঞজনদের কাছে খ্যাতি নয় এবং সাধারণ লোকের কাছে ঘৃণার নয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ

আমি সুফিয়ান ছওরীর পোশাকের মূল্য এক দেরহাম অপেক্ষা কিছু বেশী অনুমান করেছি। ইবনে শায়বা বলেন ঃ আমার কাপড়সমূহের মধ্যে সেটি উত্তম, যেটি আমার খেদমত করে, আর মন্দ কাপড় সেগুলো, যেগুলোর খেদমত আমি করি। আবু সোলায়মান দারানী বলেনঃ কাপড় তিনটি—এক, আল্লাহর ওয়াস্তে যা দ্বারা উলঙ্গতা নিবারণ হয়। দুই, নফসের জন্যে, যার কোমলতা কাম্য হয় এবং তিন, মানুষের জন্যে, যার সৌন্দর্য উদ্দেশ্য হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ যার কাপড় পাতলা, তার ধর্মও পাতলা। আরও এক বুযুর্গ বলেনঃ প্রথম যুহদ পোশাকের যুহদ।

হাদীসে আছে اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, পোশাকের পুরানত্ব ঈমানের অঙ্গ। মিসরের শাসনকর্তা ফুযালা ইবনে ওবায়দের মাথার চুল বিক্ষিপ্ত এবং মাথা খালি দেখে এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনি একজন নেতা হয়ে এমন করেন কেন? তিনি বললেনঃ রসূলে আকরাম (রাঃ) আমাদেরকে আরাম করতে নিষেধ করেছেন এবং কখনও খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুরূপ পোশাক পরে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা রঙ-বেরঙের খাদ্য ও পোশাকের চিন্তায় থাকে।

(৩) বাসস্থানে যুহদ করারও তিনটি স্তর রয়েছে। উৎকৃষ্ট স্তর হচ্ছে কোন স্থান নিজের জন্যে তালাশ না করা; বরং আসহাবে সুফফার ন্যায় মসজিদের কোণে পড়ে থেকে তুষ্ট থাকা। মাঝারি স্তর হচ্ছে খড় ও ছনের কুঁড়েঘর তৈরী করে নেয়া। নিম্নস্তর হচ্ছে কোন বিশেষ কক্ষ তৈরী করে অথবা ভাড়া করে তাতে বসবাস করা। এরূপ কক্ষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় না হলে এবং তাতে সাজসজ্জা না থাকলে যুহদ বহির্ভূত হবে না।

মোটকথা, যে বস্তু প্রয়োজনের জন্যে কাম্য হবে, তার সীমা যেন প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে না যায়। দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণই ধর্মের সহায়ক। যে পরিমাণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে, সে পরিমাণই ধর্মের খেলাফ। বাসস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে রোদ, বৃষ্টি ও শৈত্য থেকে আত্মরক্ষা। কতটুকুর দ্বারা এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তা জানা, এর বেশী অপ্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি

অপ্রয়োজনীয় বস্তু অন্বেষণ করে, সে নিশ্চিতই যুহদ থেকে দূরে অবস্থান করে।

হযরত হাসান বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত কোন ইটের উপর ইট রাখেননি। অর্থাৎ, কোন প্রকার গৃহ নির্মাণ করেননি। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অকল্যাণ চান, তার ধন-সম্পদ চুনা, বালি ও মাটির কাদায় বরবাদ করেন। হযরত নূহ (আঃ) একটি ঘর নির্মাণ করলে কেউ এসে আরয করলঃ ঘরটি পাকা হলেই তো ভাল হত। তিনি বললেনঃ যে মারা যাবে, তার জন্যে এটাই অনেক। হযরত হাসান বলেনঃ আমরা সাফওয়ান ইবনে মুহায়রিযের খেদমতে গেলাম। তিনি একটি বাঁশ নির্মিত ঘরে ছিলেন এবং ঘরটি নুয়ে পড়েছিল। আমাদের একজন বললঃ ঘরটি মেরামত করে নিলে ভাল হত। তিনি বললেনঃ অনেক মানুষ এ ঘরে থেকে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি।

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক খরচের জন্যে মানুষ সওয়াব পায়; কিন্তু পানি ও কাদাতে যা খরচ করা হয়, তাতে কোন সওয়াব হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে—

كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا أَمْكَنَ مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে; কিন্তু যা উত্তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে (তা নয়)।

সিরিয়া যাবার পথে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) চুনা ও ইট নির্মিত একটি প্রাসাদ দেখেন। তিনি বলে উঠেনঃ আল্লাহু আকবার। আমার ধারণা ছিল না যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি হবে, যে হামানের মত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করবে। কথিত আছে, সর্বপ্রথম যার জন্যে চুনা ও ইটের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়, সে ছিল ফেরাউন। তার হুকুমেই হামান এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। এরপর তারই অনুসরণ করে অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করে।

জনৈক বুযুর্গ এক শহরে একটি জামে মসজিদ দেখে বললেন, আমি এ

মসজিদটি খেজুরের শাখা দিয়ে নির্মিত দেখেছি, এরপর কাঁচা মাটির চাঁই দ্বারা নির্মিত দেখেছি। আর এখন পাকা ইট দ্বারা নির্মিত দেখছি। যারা প্রথমে এটি নির্মাণ করেছিল, তারা দ্বিতীয় নির্মাণকারীদের তুলনায় উত্তম ছিল। আর দ্বিতীয়বার যারা নির্মাণ করেছে, তারা তৃতীয়বার নির্মাণকারীদের তুলনায় ভাল ছিল। পূর্ববর্তীদের মধ্যে কিছু লোক তাদের বাসগৃহ জীবনে কয়েক বার তৈরী করতেন। কারণ, তাদের বাসগৃহ খুব দুর্বল হত এবং তারা নিজেরা আশা খাটো রাখতেন। কেউ কেউ হজ্জ অথবা জেহাদে চলে যাওয়ার সময় ঘর ভেঙ্গে রেখে যেতেন অথবা কাউকে দান করে যেতেন। আবার ফিরে এলে নতুন ঘর তৈরী করে নিতেন। তাদের ঘর ছিল ঘাস ও চর্ম নির্মিত। আজ পর্যন্ত আরবদের মধ্যে এ অভ্যাস বিদ্যমান আছে। তাদের ঘরের উচ্চতা ছিল একজন মানুষের মাথার উপর অর্ধ হাত। হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করতাম, তখন হাত দিয়ে ছাদ স্পর্শ করতাম।

আমর ইবনে দীনার বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি ছয় হাতের উপরে উঁচু করে ঘর নির্মাণ করে, তখন এক ফেরেশতা তাকে ডেকে বলে ঃ হে নরাধম, আর কত উঁচু করবি? হযরত সুফিয়ান ছওরী মযবুত দালান দেখতে নিষেধ করেছেন। কারণ, কেউ না দেখলে এরূপ দালান নির্মিত হত না। সুতরাং যে তাকিয়ে থাকে, সে যেন নির্মাণকারীর সাহায্য করে। হযরত ফুযায়ল বলেনঃ আমি সে ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত হই না, যে দালান তৈরী করে এবং তা রেখে মারা যায়। বরং আমার বিস্ময় তাদের জন্যে, যারা এ দালানটি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। হযরত ইবনে মসঊদ বলেনঃ এক সম্প্রদায় আসবে, যারা দালানকে উঁচু করবে এবং ধর্মকে নীচু।

(৪) আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও যুহদের অনেক স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল একটি চিরুনি ও পানি রাখার একটি মৃৎপাত্র সঙ্গে রাখতেন। একদিন এক ব্যক্তিকে নদীতে পানি পান করতে দেখে তিনি মৃৎপাত্রটিরও প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং সেটি ফেলে দেন।

মাঝারি স্তর হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণে আসবাবপত্র থাকা। কিন্তু এক বস্তু দ্বারা একাধিক কাজ নিতে হবে। উদাহরণতঃ পিয়ালা থাকলে তাতে

খাবে এবং তা দিয়ে পানি পান করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ একই পাত্রকে কয়েক কাজে ব্যবহার করাকে উত্তম মনে করতেন। যদি গণনায় আসবাবপত্রের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়, তবে তা যুহদের সকল স্তর থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও রসূলে আকরাম (আঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ করা দরকার। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার গদী। ভেতরে খেজুর গাছের ছোবড়া ভর্তি ছিল। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিছানা হয় দু'ভাঁজ করা কম্বল হত, না হয় খেজুরের ছোবড়া ভর্তি চামড়ার গদী।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। তিনি তখন খেজুরের ছোবড়ার রশি দিয়ে তৈরী খাটে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসলে ওমর (রাঃ) তাঁর পিঠে রশির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে খাত্তাব পুত্র, তোমার চোখে পানি কেন? হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমি রোম ও পারস্য সম্রাটদের কথা ভাবছি, তাদের কাছে অগণিত ধন-দৌলত স্তূপীকৃত রয়েছে। আর আপনার কথাও ভাবছি। আপনি আল্লাহর হাবীব ও মনোনীত রসূল। আপনি কিনা এই মোটা রশির খাটে শয়ন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর না যে, তাদের জন্যে দুনিয়া হোক আর আমাদের জন্যে আখেরাত?

এক ব্যক্তি হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। এরপর আরয করল ঃ আপনার ঘরে তো কোন আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন ঃ আরও একটি ঘর আছে। ভাল আসবাবপত্র আমি সেখানে পাঠিয়ে দেই। লোকটি বলল ঃ আপনি যতদিন এখানে থাকেন, ততদিন এখানেও কিছু আসবাবপত্র থাকা দরকার। আবু যর বললেন ঃ ঘরের মালিক আমাকে এ ঘরে থাকতে দেবেন না।

রসূলে আকরাম (রাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে আদরের দুলালী হযরত ফাতেমার ঘরে যেতে চাইলেন। তাঁর ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানো ছিল এবং তাঁর হাতে রুপার চুড়ি ছিল। তিনি এসব দেখে সেখান থেকেই ফিরে

এলেন। তখন আবু রাফে হযরত ফাতেমার কাছে গেলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফিরে যাওয়ার কথা বললেন। অতঃপর আবু রাফে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ পর্দা এবং চুড়ি দেখে ফিরে এসেছি। অতঃপর হযরত ফাতেমা চুড়ি জোড়াটি হযরত বেলালের হাতে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলো বিক্রি করে তার মূল্য আসহাবে সুফ্ফাকে দিয়ে দাও। হযরত বেলাল আড়াই দেরহামে সেগুলো বিক্রয় করে মূল্য সুফ্ফাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কন্যার ঘরে গমন করলেন।

একরাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে নতুন বিছানা পাতেন। এর আগে তিনি কম্বল দু'ভাঁজ করে তার উপর শয়ন করতেন। সে রাতে তিনি সকাল পর্যন্ত বিনিদ্র অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করে কাটান। ভোর হলে হযরত আয়েশাকে বললেন ঃ এ শয্যা সরিয়ে নাও এবং পুরনো কম্বল বিছিয়ে দাও। এটি সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয়নি।

এমনিভাবে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রাতের বেলায় পাঁচটি অথবা ছয়টি দেরহাম আগমন করল। তিনি সেগুলো থাকতে দিলেন; কিন্তু তাঁর ঘুম এল না। অবশেষে তিনি সেগুলো বিলিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা বলেন ঃ তখন তিনি ঘুমালেন এবং আমি তাঁর নাসিকাধ্বনি শুনতে পেলাম। নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি বললেন ঃ যদি এই দেরহামগুলো আমার কাছে থেকে যেত এবং আমার ওফাত হয়ে যেত, তবে আমার প্রতি আল্লাহর কি ধারণা হত? হযরত হাসান বলেন, আমি সত্তরজন দরবেশকে দেখেছি, যাদের কাছে একটি কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের কেউ মাটিতে কোন কাপড় বিছায়নি। যখন ঘুমুতে চেয়েছে, মাটিতে দেহ লাগিয়ে উপরে কাপড় রেখে নিজেকে আবৃত করে নিয়েছে।

(৫) পঞ্চম প্রয়োজন বিবাহ সম্পর্কে কিছু লোকের মত এই যে, মূল বিবাহ এবং বহু বিবাহের মধ্যে যুহদ বলতে কিছু নেই। এটাই সহল তস্তরীর উক্তি। তিনি বলেন ঃ যাহেদকুল শিরমণি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যখন মহিলাদের পছন্দ করতেন, তখন তাদের ব্যাপারে আমরা কেমন করে

যুহদ করতে পারি। এ মতের সপক্ষে হযরত ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে অধিকতর যুহদকারী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর চার স্ত্রী এবং দশজনের অধিক বাঁদী ছিল। এ প্রসঙ্গে সোলায়মান দারানীর উক্তি বিশুদ্ধ। তিনি বলেন ঃ যা কিছু আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে— স্ত্রী হোক অথবা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি—সবই মানুষের জন্যে খারাপ। মাঝে মাঝে মহিলাও আল্লাহ থেকে বাধা দেয়। সেজন্যেই কোন কোন অবস্থায় অবিবাহিত থাকাই উত্তম। তখন বিবাহ না করা যুহদের মধ্যে গণ্য। যে ক্ষেত্রে কাম-প্রবৃত্তি দমন করার জন্যে বিবাহ উত্তম, সেখানে তো বিবাহ ওয়াজিব। সেখানে বিবাহ বর্জন করা কেমন যুহদ হতে পারে? হ্যাঁ, যদি বিবাহ না করার মধ্যে কোন বিপদ না থাকে এবং করলেও কোন দোষ হয় না, তবে আল্লাহর মহব্বতকে ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ বর্জন করা যুহদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব যদি জানা যায়, মহিলা আল্লাহর পথে বাধা নয়, এরপরও কেবল দৃষ্টির স্বাদ ও সহবাসের আনন্দ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যদি কেউ বিবাহ বর্জন করে, তবে তা যুহদ নয়। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ, যা প্রজন্ম রক্ষা ও উম্মতে মোহাম্মদী বৃদ্ধি করায় সহায়ক ও সওয়াবের কারণ। এতে যে আনন্দ অর্জিত হয়, তা অপরিহার্য ও জরুরী। এটা যদি আসল উদ্দেশ্য না হয়, তবে ক্ষতিকর নয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ স্বাদ ও আনন্দ লাভ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রুটি খাওয়া ও পানি পান করা বর্জন করে, তবে তা যুহদ নয়। কেননা, এটা আত্মহত্যার শামিল। এমনিভাবে বিবাহ বর্জন করলে নিজের প্রজন্ম কর্তন করা হয়। সুতরাং কেবল আনন্দ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিবাহ বর্জন করা অনুচিত যে পর্যন্ত অন্য কোন বিপদের আশংকা না থাকে। সহল তস্তরীর উদ্দেশ্য তাই এবং একারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবাহ করেছিলেন। বহু বিবাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করত না। এখন কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এরূপ হয়, তবে তার কেবল সহবাসের আনন্দ থেকে বাঁচার জন্যে বিবাহ বর্জন করা কোন ফলপ্রসূ যুহদ নয়। কিন্তু পয়গম্বর ও ওলীগণ ছাড়া এরূপ অবস্থা কার হতে পারে? এখন তো অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, রমণীদের আধিক্য তাদের মনকে বিমুখ করে দেয়। কাজেই এখন বিবাহ না করাই সমীচীন।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে মহিলা মর্যাদাহীন অথবা এতীম, তাকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বিবাহ করবে। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ আমার পছন্দ মতে মুরীদ প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিষয়ে মন লাগাবে না। নতুবা তার হাল বদলে যাবে। প্রথম পেশা, দ্বিতীয় হাদীস সংগ্রহ এবং তৃতীয় বিবাহ।

(৬) **ষষ্ঠ প্রয়োজন** ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি, যা উপরোক্ত পাঁচটি প্রয়োজন পূরণ করার উপায়। প্রতিপত্তির অর্থ হচ্ছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া, যাতে এর মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কর্মে ব্যবহার করা যায়। যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করতে পারে না এবং অপরের খেদমতের মুখাপেক্ষী, তার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি খেদমতকারীর অন্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রতিপত্তির সূচনা নিঃসন্দেহে সৎ ও সাধু। কিন্তু পরিণামে এটা মানুষকে বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, কাজলের কক্ষে প্রবেশ করলে দাগ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মানুষের অন্তরে স্থান করা কোন উপকার লাভের উদ্দেশে হবে, অথবা ক্ষতি দূরীকরণের উদ্দেশে অথবা কারও যুলুম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে হবে। ধন-সম্পদের উপস্থিতিতে উপকার লাভের প্রয়োজন নেই। কেননা, পারিশ্রমিক নিয়ে যে খেদমত করে, সে খেদমত করবেই অন্তরে প্রভুর মান-মর্যাদা থাক বা না থাক। হাঁ, যে ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে খেদমত করে, তার অন্তরে স্থান করার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষতি দূরীকরণের উদ্দেশে প্রতিপত্তির প্রয়োজন এমন শহরে হয়, যেখানে ন্যায় বিচারের অভাব থাকে অথবা এমন প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস করে, যারা তাকে জ্বালাতন করে এবং সে তাদের অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম হয় না।

প্রতিপত্তির পথে যারা চলে, তারা ধ্বংসের পথের পথিক। যুহদকারীর উচিত কখনও অন্তরে স্থান করার প্রয়াসী না হওয়া। কারণ, তার অন্তর এবাদত ও ধর্মকর্মে নিয়োজিত থাকে। এতেই মানুষের অন্তরে কষ্ট না পাওয়ার মত স্থান হয়ে যাবে— যদিও সে কাফেরদের মধ্যে অবস্থান করে।

সারকথা, অন্তরে স্থান করার প্রয়াস চালানোর অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। এর অল্প পরিমাণ অধিক পরিমাণের দিকে টেনে নেয় এবং তার অভ্যাস মদের অভ্যাসের চেয়েও কঠোরতর। অতএব, এর অল্প ও বেশী সবকিছু থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ধন-সম্পদ জীবনের জন্যে জরুরী। কিন্তু সামান্য ধন-সম্পদই যথেষ্ট। যদি কোন ব্যক্তি পেশাদার হয়, হবে একদিনের প্রয়োজন পরিমাণে ধন অর্জিত হয়ে গেলে কাজ না করা উচিত। এটা যুহদের জন্যে শর্ত। যদি কেউ এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে ধন উপার্জন করে, তবে যুহদকারীদের ছোট-বড় কোন কাতারেই থাকবে না। যদি কারও কাছে ভূখণ্ড থাকে এবং সে তাওয়াক্কুলে অধিক বিশ্বাসী না হয়, তবে উৎপন্ন ফসল এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে রাখা যুহদ বহির্ভূত হবে না— যদি সে অতিরিক্ত ফসল সদকা করে দেয়। তবে এরূপ ব্যক্তি দুর্বল যুহদকারী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে রেশমের পোকার মত। রেশমের পোকা প্রথমে নিজের উপর রেশমের জাল বুনে, এরপর জালের ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে চায়; কিন্তু কোন পথ খুঁজে পায় না। ফলে সেখানেই মরে যায়। এভাবে সে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়। এমনি ভাবে যে দুনিয়ার কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, সে নিজের অন্তরকে শৃঙ্খল পরায়। অর্থ, যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন প্রভৃতি হচ্ছে আলাদা আলাদা শৃঙ্খল। এরপর যদি সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং এগুলোর বেড়াজাল থেকে বের হতে চায়, তবে বের হতে পারে না। কেননা, এসব শৃঙ্খল ছিন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এমনি অবস্থায় মালাকুল মওত এসে তাকে যাবতীয় প্রিয় বস্তু থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখন তার অবস্থা হয় অত্যন্ত করুণ। একদিকে তার অন্তর থাকে দুনিয়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আর মালাকুল মওতের থাবা তার অন্তরের শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়ে আখেরাতের দিকে টানতে থাকে এবং অপরদিকে দুনিয়ার শিকলগুলো তাকে দুনিয়ার দিকে সজোরে টানতে থাকে। মাঝখানে পড়ে তার অবস্থা এমন হয়, যেমন কোন ব্যক্তির দেহের অর্ধাংশকে করাত দিয়ে চিরার পর দু'দিক থেকে দু'ব্যক্তি ধরে সজোরে টান দেয় এবং পৃথক করে ফেলে।

আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে সে বিষয়টিই ঢুকিয়ে দেন, যা রসূলে করীম (সাঃ)-এর অন্তরে অবস্থান করেছিল। অর্থাৎ, তাঁকে বলা হয়েছিল—

اَحْبِبْ مَنْ اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهٗ

অর্থাৎ, আপনি যাকে ইচ্ছা মহব্বত করুন, তবে জেনে রাখুন, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহর ওলীগণ জানতে পেরেছেন যে, মানুষ নিজের খাহেশ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজেকে রেশমের পোকার মত ধ্বংস করে। সে কারণেই তারা দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি বদর যোদ্ধাদের সত্তরজনকে এমন দেখেছি, যারা হালাল বস্তুসমূহে এতটুকু যুহদ করতেন, যতটুকু তোমরা হারাম বস্তুতেও কর না। তোমরা তাদেরকে দেখলে পাগল মনে করতে, আর তারা তোমাদের কোন সাধু ব্যক্তিকে দেখলে বলতেন, ধর্ম-কর্মে তার কোন অংশ নেই। তোমাদের কোন অসৎ লোককে দেখলে বলতেন যে, সে কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না। তাদের সামনে হালাল ধন-সম্পদ পেশ করা হলেও তারা তা গ্রহণ করতেন না। বলতেন ঃ এটা গ্রহণ করলে আমার অন্তর বিগড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

দুনিয়ার মহব্বত যাদের অন্তরকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রশান্ত, আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফেল।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا -

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। সীমালজ্ঘনই হচ্ছে তার কাজ।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -

অর্থাৎ, অতএব মুখ ফিরিয়ে নিন সে ব্যক্তি থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই চায় না। এটাই তার বিদ্যার দৌড়।

এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের এই পার্থিব জীবনে ডুবে থাকার কারণ হচ্ছে গাফলতি ও অজ্ঞতা।

যুহদের আলামত ঃ কখনও এরূপ ধারণা হয় যে, ধন-দৌলত বর্জন করলেই যুহদ হবে অথচ বাস্তবে তা নয়। কেননা, যে ব্যক্তি যুহদের উপর মানুষের প্রশংসাকে ভাল মনে করে, তার পক্ষে ধন-সম্পদ বর্জন করা খুবই সহজ। সুতরাং শুধু ধন-দৌলত বর্জন যুহদের অকাট্য প্রমাণ নয়। বরং এর জন্যে ধন ও লোক-প্রশংসা উভয়টি বর্জন করা জরুরী।

সত্য বলতে কি, যুহদ চেনা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং যুহদকারীর কাছেও তার যুহদ সন্দিগ্ধ থাকে। অতএব, যুহদকারীর উচিত নিজের মধ্যে তিনটি আলামতের উপর ভরসা করা। যুহদের প্রথম লক্ষণ হল উপস্থিত বস্তুর জন্যে আনন্দিত না হওয়া এবং যা হাতছাড়া হয়ে যায় তার জন্যে দুঃখ না করা।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ -

অর্থাৎ, তোমাদের হাতে যা আসেনি, তার জন্যে দুঃখ করো না এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লসিত হয়ো না; বরং এর বিপরীত হওয়া উচিত অর্থাৎ, হাতে ধন এলে দুঃখিত হওয়া এবং ধন না এলে আনন্দিত হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় পরিচয় এই যে, যুহদকারীর কাছে নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারী উভয়ই সমান হবে। এটা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যুহদ করার আলামত— যেমন, প্রথমটি ধন-দৌলতে যুহদ করার লক্ষণ।

তৃতীয় আলামত হল, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আকর্ষণ থাকা। অন্তরে তাঁর আনুগত্যের মিষ্টতা প্রবল থাকা। কেননা, অন্তর মহব্বতশূন্য থাকে না, তা দুনিয়ার মহব্বত হোক অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বত। অন্তরে এই উভয় প্রকার মহব্বতের অবস্থা গ্লাসে পানি ও বায়ুর অবস্থার মত। গ্লাসে যখন পানি ঢেলে দেয়া হয়, তখন তার ভেতর থেকে বায়ু বের হয়ে যায়। পানি ও বায়ু একত্রে গ্লাসে থাকে না। যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী, সে তাতেই নিমগ্ন থাকে—অন্য কিছুতে মশগুল হয় না। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গকে যখন প্রশ্ন করা হল, যুহদ যুহদকারীকে কোথায় পৌঁছায়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে নিমগ্নতায়। আল্লাহর প্রতি টান ও দুনিয়ার প্রতি টান উভয়টি একত্রিত হতে পারে না। সেমতে মারেফতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বলেন, যখন ঈমান বাহ্যিক অন্তরে থাকে, তখন মুমিন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে মহব্বত করে এবং উভয়ের জন্যে কাজ করে। আর যখন ঈমান অন্তরের কাল বিন্দুতে থাকতে শুরু করে, তখন সে দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তার কাজও করে না।

যুহদকারীর জন্যে দু'টি মকামের মধ্য থেকে একটিতে থাকা জরুরী। প্রথম মকাম এই যে, সে নিজের মধ্যে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকবে যে, তার কাছে প্রশংসা ও নিন্দা, ধনাঢ্যতা ও নিঃস্বতা সমান হবে। এই অবস্থায় সামান্য ধন-সম্পদ রাখার কারণে তার যুহদ বিনষ্ট হবে না। ইবনে আবুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মানকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত দাউদ তায়ী যাহেদ ছিলেন কিনা? তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দীনার পেয়ে তা বিশ বছরে ব্যয় করেছিলেন। আবু সোলায়মান বললেন ঃ তিনি অবশ্যই যাহেদ ছিলেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন বস্তু সক্ষমতা সত্ত্বেও কেবল মন ও ধর্মের ভয়ে বর্জন করবে, সে যুহদের সে পরিমাণ অংশই পাবে। আর যুহদের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করা, এমনকি পাথরের উপরও মাথা না রাখা, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) করেছিলেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদেরকে অন্তত যুহদের প্রাথমিক স্তর নসীব করেন। চূড়ান্ত স্তরসমূহের

লোভ করা আমদের মত লোকদের জন্যে কেমন করে সম্ভবপর?

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, যুহদের আলামত হচ্ছে দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, সম্মান, অপমান এবং প্রশংসা ও নিন্দা সমান হওয়া। এখন জানা দরকার এর আরও অনেক প্রাসঙ্গিক লক্ষণও রয়েছে; যেমন দুনিয়াকে এমনভাবে বর্জন করা যে, সেটা কোথায় গেল, কার কাছে গেল, তার কোন পরওয়া না করা। কারও কারও মতে যুহদের আলামত হচ্ছে দুনিয়াকে যেমন-তেমনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং এরূপ না বলা যে, সরাইখানা তৈরী করা হবে অথবা মসজিদ নির্মাণ করা হবে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যুহদের আলামত উপস্থিত বস্তু দান করে দেয়া। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মন্দকে এক কক্ষে বন্ধ করেছেন এবং দুনিয়ার মহব্বতকে এর চাবি করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি সকল কল্যাণকে এক কক্ষে বন্ধ করে যুহদকে তার চাবি করেছেন।

তাওয়াক্কুল ব্যতিরেকে যুহদ পূর্ণতা লাভ করে না। তাই অতঃপর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অষ্টম অধ্যায়

দুনিয়ার নিন্দা

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়া আল্লাহর শত্রু, তাঁর ওলীগণের শত্রু এবং তাঁর শত্রুদেরও শত্রু। আল্লাহর শত্রু এ কারণে যে, সে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে চলতে দেয় না; রাহাজানি করে। এ কারণেই যখন থেকে আল্লাহ দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, তার দিকে কখনও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেননি।

দুনিয়া আল্লাহর ওলীগণের শত্রু এ কারণে যে, সে তাদের সামনে খুব সজ্জিত ও চাকচিক্যময় হয়ে আসে এবং নিজের আলেয়া প্রদর্শন করে, যাতে তারা কোনরূপে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তাদেরকে প্রাণান্তকর সাধনা করতে হয়।

দুনিয়া আল্লাহর শত্রুদের শত্রু এ কারণে যে, সে তাদেরকে ধাপে ধাপে নিজের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে নেয়। অবশেষে তারা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে তাদেরকে এমন কাঙ্গাল করে ছাড়ে যে, দুঃখ ও অনুতাপ ছাড়া কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারে না। তারা চিরস্থায়ী সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। দুনিয়ার বিরহ জ্বালার সাথে সাথে আখেরাতের নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ফরিয়াদ করলে এই জওয়াব শুনবে اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ অর্থাৎ, জাহান্নামে থেকে লাঞ্ছিত হও এবং কোন কথা বলো না।

তারা হবে এই আয়াতের প্রতীক—

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

অর্থাৎ, তারাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

দুনিয়ার আপদ-বিপদ ও নষ্টামির যখন এই অবস্থা, তখন প্রথমে দুনিয়া

কাকে বলে, তা চিনা নেহায়েত জরুরী। এ ছাড়া দুনিয়াকে সৃষ্টি করার রহস্য, তার প্রতারণা ও অনিষ্টের পথগুলো জানা অত্যাবশ্যক। নিম্নে আমরা এসব বিষয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে সচেষ্ট হব।

কোরআন মজীদে দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত আয়াত অনেক। অধিকাংশ আয়াতে মানুষকে দুনিয়ার দিক থেকে চোখ বন্ধ করে আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যও কেবল এটাই। এদিক দিয়ে আল্লাহর কালাম থেকে সনদ পেশ করার প্রয়োজন নেই। নিম্নে কেবল এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার একটি মৃত ছাগলের কাছ দিয়ে যাবার সময় সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ এই ছাগল তার মালিকের কাছে ঘৃণিত নয় কি? তারা আরয করলেন ঃ ঘৃণিত না হলে কি এখানে ফেলে দিয়েছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, দুনিয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ছাগলের চেয়েও অধিক ঘৃণিত। যদি দুনিয়া আল্লাহর কাছে একটি মাছির পালকের মত হতও তাহলেও ভাল হত, তবে কাফের এ থেকে এক চুমুক পানিও পেত না।

অন্য হাদীসে আছে— الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر অর্থাৎ, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত।

আরও বলা হয়েছে—

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ما كان لله منها -

অর্থাৎ, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে, সেগুলোও অভিশপ্ত; কিন্তু যা আল্লাহর জন্যে, তা স্বতন্ত্র।

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

من احب دنياه اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنياه فاثروا ما يبقى على ما يفنى -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের দুনিয়াকে মহব্বত করে, সে তার আখেরাতের ক্ষতি করে এবং যে আখেরাতকে ভালবাসে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপর অক্ষয় বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বত যাবতীয় পাপের মূল।

যায়দ ইবনে আকরাম বলেন ঃ আমরা হযরত আবু বকরের সাথে ছিলাম, এমন সময় তিনি পানি চাইলেন। লোকেরা মধুমিশ্রিত পানি এনে উপস্থিত করল। তিনি পানি মুখের কাছে নিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে সঙ্গীরা সকলেই কান্না শুরু করে দিল এবং কেঁদে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু হযরত আবু বকরের কান্না থামল না। অবশেষে সবাই মনে করল, তারা কান্নার কারণও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। অতঃপর তিনি চোখ মুছে ফেললেন। লোকেরা আরয করল ঃ হে নায়েবে রসূল (সাঃ), আপনার কাঁদার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় দেখলাম যে, তিনি কাউকে বলছেন—আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যা। অথচ সেখানে কেউ ছিল না। আমি আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনি কাকে দূর হতে বলছেন? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে দুনিয়া দেহ ধারণ করে আমার সামনে আসে। আমি তাকে বললাম ঃ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যা। এরপর সে আবার আসল এবং বলল ঃ আপনি আমার কাছ থেকে বেঁচে থাকলেও আপনার পরবর্তী লোকেরা বেঁচে থাকবে না।

এক রেওয়ায়েতে আছে—রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার একটি ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ এস, দুনিয়া দেখে যাও। অতঃপর তিনি ঘোড়ার উপর থেকে একটি পচা বস্ত্র ও গলিত অস্থি হাতে নিয়ে বললেন ঃ এটা দুনিয়া। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়ার সাজসজ্জাও এই বস্ত্রের মত দ্রুত পুরাতন হয়ে যাবে এবং যে সব দেহ দুনিয়াতে লালিত হয়, সেগুলোও এই অস্থির মত গলে যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ দুনিয়াকে প্রভু বানিয়ো না। সে তোমাকে গোলাম বানিয়ে নেবে। নিজের ভাণ্ডার এমন লোকের কাছে গচ্ছিত রাখ, যে আত্মসাৎ না করে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যার ধন-ভাণ্ডার আছে,

তার উপর বিপদ আসার আশংকা থাকে। যার ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর কাছে থাকে, তার কোন বিপদের ভয় নেই। তিনি আরও বলেন ঃ হে আমার অনুচরবৃন্দ, আমি দুনিয়াকে তোমাদের জন্যে উপুড় তথা অধোমুখী করে দিয়েছি। তোমরা যেন আমার পরে একে আবার সোজা করে দাঁড় না করাও। এটা দুনিয়ার একটি নষ্টামি যে, মানুষ এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। অথচ দুনিয়ার মোহ না কাটা পর্যন্ত আখেরাত পাওয়া যায় না। অতএব, দুনিয়াকে সরাইখানা মনে কর এবং মুসাফিরের ন্যায় এতে দিনাতিপাত কর। দালানকোঠা নির্মাণ করো না। মনে রেখ, সকল অনিষ্টের মূল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। প্রায়ই এক মুহূর্তের কামনা দীর্ঘকালীন দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। এটাও তাঁরই উক্তি যে, তোমাদের জন্যে দুনিয়া অধোমুখী হয়ে পড়ে আছে। তোমরা তার পিঠে বসে আছ। অতএব, দুনিয়ার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও মহিলারা যেন তোমাদের মোকাবিলা না করে। অর্থাৎ রাজা-বাদশাহদের সাথে দুনিয়ার জন্যে কলহ করো না। কেননা, তাদের প্রতি এবং তাদের দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মোহ না থাকলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করবে না। মহিলাদের কাছ, থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে নামায-রোযা।

হযরত ঈসা (আঃ) আরো বলেন ঃ দুনিয়া স্বয়ং কিছু লোকের অন্বেষণ করে এবং কোন কোন লোক দুনিয়াকে অন্বেষণ করে। যারা আখেরাতের জন্যে কাজ করে, দুনিয়া সারাজীবন তাদের অন্বেষণ করে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার অন্বেষণ করে; আখেরাত মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে আহ্বান করে।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান ইবনে দাঊদ (আঃ) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক আবেদের কাছে যান। তাঁর সাথে ছিল সৈন্যসামন্ত। ডানে ও বামে মানুষ ও জিনের সারি ছিল। এ দৃশ্য দেখে আবেদ আরয করলঃ হে সোলায়মান. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। সোলায়মান (আঃ) বললেনঃ একবার "সোবহানাল্লাহ" উচ্চারণ করা মুমিনের আমলনামায় এসকল জাঁকজমক অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এই জাঁকজমক ধ্বংসশীল; কিন্তু আল্লাহর যিকর সর্বক্ষণ সাথে থাকবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থাৎ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে

দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ বলে, এটা আমার, ওটা আমার। অথচ তার ততটুকুই যতটুকু সে খেয়ে শেষ করে দেয়, পরে উড়িয়ে দেয় অথবা খয়রাত করে সঞ্চিত করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) একদিন আমাকে বললেনঃ আমি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত বস্তুসমূহ দেখাব। আমি আরয করলামঃ খুব ভাল কথা। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মদীনার একটি জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় মৃত মানুষের মাথার খুলি, পায়খানা, হাড়গোড় ও ছিন্নবস্ত্র ছিল। তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা, এসব খুলি তেমনি আকাঙ্ক্ষা করত, যেমন তুমি কর এবং তেমনি আশা করত, যেমন তুমি কর; কিন্তু আজ এমন হয়ে গেছে যে, এগুলোর উপর চামড়া পর্যন্ত নেই। কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো ভস্ম হয়ে যাবে। এই যে পায়খানা দেখছ, এগুলো তাদের খাদ্য ছিল। খোদা জানে কোথা থেকে উপার্জন করে খেয়েছিল। আজ এমন হয়ে গেছে যে, তোমার ঘৃণা হয়। আর এই ছিন্নবস্ত্র ছিল তাদের পোশাক। বায়ু একে এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে ফিরে। আর এই পায়ের হাড়গুলো তাদের চতুষ্পদ জন্তুর, যেগুলোর পিঠে চড়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে যেত। ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়ার যখন এই পরিণতি, তখন এটা শিক্ষা গ্রহণেরই স্থান।

হযরত দাউদ ইবনে হেলাল বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফায় লিখিত আছে— হে দুনিয়া, তুই সৎকর্মপরায়ণদের কাছে অত্যন্ত লাঞ্ছিত, যাদের সামনে তুই সেজেগুঁজে গমন করিস। আমি তাদের অন্তরে তোর প্রতি শত্রুতা স্থাপন করেছি। তোর চেয়ে অধিক বিকৃত আমি কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। তোর প্রতিটি অবস্থা ঘৃণ্য যোগ্য। শেষ পর্যন্ত তুই ফানা হয়ে যাবি। যেদিন আমি তোকে সৃষ্টি করেছি, সেদিনই নির্দেশ দিয়েছি যে, তুই কারও কাছে থাকবি না এবং কেউ তোর কাছে থাকবে না। সুসংবাদ সেই সৎলোকদের জন্যে, যাদের অন্তরে সন্তুষ্টি এবং মনে সততা ও দৃঢ়তা বিদ্যমান। আমার কাছে তাদের প্রতিদান ও সওয়াব এই যে, তারা কবর থেকে উঠে যখন আমার দিকে ধাবিত হবে, তখন তাঁদের আগে আগে নূর থাকবে। তাদের আশেপাশে ফেরেশতারা থাকবে। আমার কাছে তারা যে পরিমাণ রহমত আশা করবে, আমি সে পরিমাণ দেব।

হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনীতে বর্ণিত আছে, যখন তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন, তখন তাঁর পেটে গোলমাল দেখা দিল এবং পায়খানার প্রয়োজন হল। এমন প্রতিক্রিয়া জান্নাতের অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ছিল না। কেবল এই বৃক্ষের মধ্যেই এই প্রতিক্রিয়া নিহিত ছিল এবং একারণেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি পায়খানার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। জনৈক ফেরেশতাকে আদেশ করা হল— আদমকে জিজ্ঞাসা কর সে কি চায়? আদম বললেন ঃ আমার পেটে যে বিপদ দেখা দিয়েছে, তা কোথাও ফেলে দিতে চাই। ফেরেশতা খোদায়ী ইঙ্গিত অনুযায়ী বলল ঃ এখানে কোন্ জায়গাটি এর উপযুক্ত? এখানে তো কেবল ফরশ, সিংহাসন, নির্ঝরিণী এবং বৃক্ষসমূহের মনোরম ছায়া। এগুলোর মধ্যে কোনটিই একাজের উপযুক্ত নয়। এজন্যে দুনিয়াতে যাও।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন কিছু লোক মক্কার পাহাড়সমূহের সমান আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কি নামাযীও হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ, তারা নামাযী হবে, রোযাদার হবে এবং রাতের কিছু অংশ জেগে এবাদতও করবে। কিন্তু তাদের অপরাধ এই যে, যখন দুনিয়ার কোন বস্তু তাদের সামনে আসত, তখন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—মুমিনের অন্তরে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মহব্বত একত্রিত হতে পারে না; যেমন এক পাত্রে আগুন ও পানি একত্রিত হতে পারে না। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে বললেনঃ আপনি পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বাধিক বয়স পেয়েছেন। বলুন তো, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপনি দুনিয়াকে কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেনঃ আমার মনে হয়েছে একটি ঘরের দু'টি দরজা। আমি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে এসেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ তোমরা দুনিয়া থেকে সাবধান থাক। কেননা, দুনিয়া হারূত ও মারূতের চেয়েও বড় জাদুকর।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে এসে বলতে লাগলেনঃ তোমাদের কেউ কি কামনা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চক্ষুষ্মান করে দেবেন এবং অন্ধত্ব দূর করে দেবেন? জেনে রাখ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে এবং তাতে দীর্ঘ আশা করবে, আল্লাহ্ সে পরিমাণে তাকে অন্ধ করবেন। পক্ষান্তরে যে নিজের আমল সংক্ষিপ্ত করবে এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকেই জ্ঞান দান করবেন এবং কারও নির্দেশনা ছাড়াই হেদায়েত দান করবেন। স্মরণ রেখো, তোমাদের পরে সত্বরই এমন লোক সৃষ্টি হবে, যাদের কাছে খুন-খারাবী ছাড়া রাজত্ব থাকবে না, গর্ব ও ঔদ্ধত্য ছাড়া ধনাঢ্যতা থাকবে না এবং স্বার্থ ছাড়া মহব্বত থাকবে না। অতএব, তোমাদের যে ব্যক্তি সে সময়টি পাবে এবং ধনাঢ্যতায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যে সবর করবে, প্রতিশোধ গ্রহণ ও সম্মান লাভের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুতা ও লাঞ্ছনা সহ্য করবে এবং সবর ও সহনশীলতা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে পঞ্চাশ জন সিদ্দীকের সওয়াব দান করবেন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)- কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। আনসাররা তার আগমনের সংবাদ শুনে সবাই ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে শরীক হন। নামাযান্তে তিনি যখন ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আনসাররা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ আবু ওবায়দা কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছে। তারা আরয করল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা সুখী হও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কষ্ট দূর করেছেন। আমি এটা আশংকা করি না যে, তোমরা নিঃস্ব হয়ে যাবে ; বরং ভয় এই যে, কোথাও তোমাদের উপর দুনিয়ার প্রাচুর্য এমন না হয়ে যায়, যেমন পূর্ববর্তীদের উপর হয়েছিল। তোমরাও না তাদের মত দুনিয়াতে ডুবে যাও। এরপর দুনিয়া তাদের মত তোমাদেরকেও না ধ্বংস করে দেয়!

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَّا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উপর যে বিষয়ের বেশী ভয় করি, তা সেই বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বের করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বরকত।

লোকেরা আরয করল ঃ পৃথিবীর বরকত কি? তিনি বললেন ঃ

زُبْدَةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, দুনিয়ার নির্যাস।

আম্মার ইবনে সায়ীদ রেওয়ায়েত করেন—হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক গ্রামের উপর দিয়ে যাবার সময় গ্রামের অধিবাসীদেরকে বারান্দায় ও রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি অনুচরবর্গকে বললেনঃ নিশ্চয় এরা আল্লাহ তা'আলার গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তা নাহলে একে অপরকে দাফন করত। অনুচররা বললঃ এরা কেন মারা গেল তা জানতে পারলে আমাদের খুব উপকার হত। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে এ তথ্য জানতে চাইলে এরশাদ হল ঃ রাতের বেলায় এদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো। জওয়াব পাবে। সে মতে রাত হলে হযরত ঈসা (আঃ) টিলার উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিলেনঃ গ্রামবাসীগণ! তাদের একজন জওয়াব দিল ঃ কি বলেন, হে রূহুল্লাহ। তিনি বললেনঃ তোমাদের এই অবস্থা কেন? সে জওয়াব দিল ঃ সন্ধ্যায় সুস্থ অবস্থায় শুয়েছিলাম। ভোরে দোযখে পতিত হলাম। আমরা দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত ছিলাম এবং পাপীদের আনুগত্য করতাম। ঈসা (আঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা দুনিয়াকে কতটুকু মহব্বত করতে? উত্তর হল ঃ যতটুকু শিশু তার জননীকে মহব্বত করে। জননী সামনে থাকলে সে আনন্দিত হয় এবং আড়ালে চলে গেলে দুঃখিত হয়ে কাঁদতে থাকে। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তোমার সঙ্গীরা জওয়াব দেয় না কেন? জওয়াব এল ঃ কারণ, তাদের মুখে আগুনের লাগাম রয়েছে। সে লাগাম কড়া মেযাজের ফেরেশতারা ধরে রেখেছে। তিনি জিজ্ঞেস

করলেন ঃ তবে তুমি কিরূপে কথা বলছ? উত্তর হল ঃ আমি তাদের মত কাজ করতাম না। কিন্তু তাদের সাথে বসবাস করার কারণে আযাব আমাকেও ছাড়েনি। এখন আমি দোযখের কিনারায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছি। জানি না, দোযখ থেকে রক্ষা পাব, না তাতে নিক্ষিপ্ত হব। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) অনুচরবর্গকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হতে পারলে যবের রুটি মোটা লবণ দিয়ে খাওয়া, চট পরিধান করা এবং ময়লা-আবর্জনার উপর ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভাল।

কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যাতে আমি আল্লাহকে মহব্বত করতে শুরু করি। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে শত্রুতা কর, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন। হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا اَوْلَهَانَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا وَلَاٰثَرْتُمُ الْاٰخِرَةَ -

অর্থাৎ, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। দুনিয়া তোমাদের কাছে লাঞ্ছিত হত এবং তোমরা আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যার মধ্যে ছয়টি বিষয় বিদ্যমান থাকে, সে জান্নাত লাভের জন্যে কোন কাজ বাকী রাখেনি এবং জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন ত্রুটি অবশিষ্ট রাখেনি। এক, আল্লাহকে চিনে তার আনুগত্য করা। দুই, শয়তানকে চিনে তার অবাধ্যতা করা। তিন, সত্যকে চিনে তার অনুসরণ করা। চার, বাতিলকে জেনে তার থেকে বেঁচে থাকা। পাঁচ,দুনিয়া সম্পর্কে জেনেশুনে তাকে বর্জন করা। ছয়, আখেরাতের যথার্থতা বুঝে তা অন্বেষণ করা।

হযরত লোকমান তার পুত্রকে বলেন ঃ দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। এতে অনেক মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে। তুমি দুনিয়াতে খোদাভীতিকে নিজের নৌকা বানাও। তাতে ঈমানকে রাখ এবং তাওয়াক্কুলের পাল তুল,

যাতে ঢেউ থেকে মুক্তি পেতে পার। তবে মুক্তি যে পাবেই তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

এক ব্যক্তি আবু হাশেমের কাছে এই বলে দুনিয়ার মহব্বতের অভিযোগ করল যে, আমি দুনিয়াতে থাকব না— এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত আমার ভেতরে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দেন, তা হালাল পথে আসে কি না, তা দেখে নেবে। এরপর সেটা উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করবে। এরূপ করলে দুনিয়ার মহব্বত ক্ষতি করবে না। একথা বলার কারণ এই যে, কেবল মহব্বতের কারণেই শাস্তি হলে মহাবিপদ হবে এবং মানুষ অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি দুনিয়া সোনার তৈরী হত এবং ধ্বংস হয়ে যেত, আখেরাত মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা হতো এবং অক্ষয় থাকতো, তবে বুদ্ধিমানদের জন্যে অক্ষয়কেই পছন্দ করা সমীচীন হত; যদিও এখন ধ্বংসশীল দুনিয়াই মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা আর অক্ষয় আখেরাত স্বর্ণের।

হযরত ইবনে মসউদ বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ মেহমান এবং তার ধন-সম্পদ আমানত। মেহমান একদিন বিদায় হয়ে যাবে এবং আমানত মালিকের হাতে ফিরে যাবে।

হযরত রাবেয়ার কাছে তাঁর জনৈক মুরীদ সার্বক্ষণিক থাকার উদ্দেশ্যে, হাযির হল এবং দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে তার নিন্দা করতে লাগল। তিনি বললেন ঃ চুপ কর। দুনিয়ার আলোচনা করো না। তোমার অন্তরে তার জায়গা না থাকলে তুমি এত বেশী আলোচনা করতে না। বলা বাহুল্য, মানুষ যে বস্তুকে মহব্বত করে, তার আলোচনাই বেশী করে।

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ যদি তুমি দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে দিয়ে দাও, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহান লাভ হবে। আর আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে দিয়ে দিলে উভয় জাহানে লোকসান হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। একভাগ মুমিনের জন্যে, একভাগ মুনাফিকের জন্যে এবং একভাগ কাফেরের জন্যে। মুমিন তার অংশকে আখেরাতের সম্বল

করে। মুনাফিক বাহ্যিক সাজ-সজ্জা করে। কাফের তার দ্বারা কামিয়াব হয়।

হযরত আবু ওসামা বাহেলী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন প্রেরিত হন, তখন শয়তানের বাহিনী শয়তানের কাছে এসে বলল ঃ নবী প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর উম্মত আত্মপ্রকাশ করেছে। শয়তান জিজ্ঞেস করল ঃ তাঁর উম্মতের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত আছে কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, দুনিয়ার মহব্বত আছে! সে বলল ঃ দুনিয়ার মহব্বত থাকলে মূর্তিপূজা না করলে কি হবে? এখনও তিন পন্থায় তাদের কাছে আমার সকাল-সন্ধ্যায় আনাগোনা হবে। প্রথম, অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়, অস্থানে তা ব্যয় করা। তৃতীয়, ব্যয় করার প্রকৃত স্থান থেকে ফিরিয়ে রাখা। এগুলো এমন বিষয় যে, সমস্ত কুকর্ম এরই পেছনে চলে।

হযরত আলী (রাঃ)-কে কেউ দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সুদীর্ঘ বর্ণনা করব, না সংক্ষেপে? প্রশ্নকারী বলল ঃ সংক্ষেপে। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ায় যা হালাল, তার হিসাব দিতে হবে এবং যা হারাম, তার আযাব সহ্য করতে হবে।

হযরত আবু মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ এই জাদুকর অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বেঁচে থেকো। সে আলেমদের অন্তরে জাদু করে। কিন্তু এটা অন্তরে থাকলে আখেরাত তাতে থাকে না। কারণ, আখেরাত সম্ভ্রান্ত আর দুনিয়া নীচ। নীচের সাথে সম্ভ্রান্ত থাকতে পারে না। এ উক্তিটি অত্যন্ত কঠোর। আমাদের মনে হয় এ সম্পর্কে হযরত ইয়াসার ইবনে হাকামের উক্তি অধিক বিশুদ্ধ। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি একত্রে থাকে। একটি প্রবল হলে অপরটি তার অনুসারী হয়ে যায়।

হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ যতই দুনিয়া লাভের জন্যে চিন্তা করবে, ততই আখেরাতের চিন্তা অন্তর্হিত হয়ে যাবে এবং যতই আখেরাতের চিন্তা করবে, ততই দুনিয়ার চিন্তা মন থেকে সরে যাবে। এ উক্তিটি হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি থেকে নির্গত। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া এবং আখেরাত হল দুই সতীন। একজন যে পরিমাণে তুষ্ট হবে, অপরজন সে পরিমাণে রুষ্ট হবে।

হযরত হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা এমন সব মনীষী

পেয়েছি, যাদের কাছে দুনিয়া পায়ের ধুলোর চেয়েও ঘৃণিত ছিল। দুনিয়া কোন্ দিক থেকে এল এবং কোন্ দিকে চলে গেল, কার কাছে রইল এবং কার কাছে চলে গেল— এসব বিষয় তারা আদৌ পরোয়া করতেন না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেন, সে যদি সেই ধন-সম্পদ খয়রাত, আত্মীয় এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে ব্যয় করার পর নিজের ভোগ-বিলাসেও ব্যয় করে, তবে তা জায়েয হবে কি না? তিনি বললেন ঃ না। যদি সমগ্র দুনিয়াও তার হয়ে যায়, তবু নিজের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণই ব্যয় করবে। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ তার অভাবের দিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের জন্যে রেখে দেবে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি সমস্ত দুনিয়া হালাল উপায়ে আমার কবযায় চলে আসে এবং তার হিসাব-কিতাবও আখেরাতে আমার কাছ থেকে না নেয়া হয়, তবু আমি তাকে অপবিত্রই মনে করব; যেমন তোমরা মৃতকে অপবিত্র মনে কর এবং তা থেকে আঁচল বাঁচিয়ে চল।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গমন করেন, তখন হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ্ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে আসেন, যার লাগাম ছিল দড়ির। হযরত ওমর তাঁর ঘরে চলে যান। তিনি সেখানে ঢাল, তরবারি ও উষ্ট্রীর গদি ছাড়া আর কিছুই না দেখে বললেন ঃ ঘরের আসবাবপত্র তৈরী করে নিলে ভাল হয় না? হযরত আবু ওয়ায়দা আরয করলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এই আসবাবপত্র আমাকে চির নিদ্রার কক্ষে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট।

এ ঘটনা তখনকার, যখন আবু ওবায়দা সিরিয়ার উদ্দেশে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সিরীয় খৃষ্টানদের আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত ওমর সন্ধির কথাবার্তা চূড়ান্ত করার জন্যে সেখানে গমন করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে— মুসলিম বাহিনীর সকল অধিনায়কই হযরত ওমরের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আবু ওবায়দা তা করেননি। হযরত ওমর তাকে বললেন ঃ আমি আপনার বাসস্থান দেখতে চাই। তিনি আরয করলেন ঃ আপনি আমার ঘরে গিয়ে কাঁদবেন। খলীফা বললেন, কোন অসুবিধা নেই। সেমতে ঘরে পৌঁছে তিনি কেবল তরবারি, ঢাল ও বসার জন্য একটি মাত্র চাটাই দেখতে পান।

এছাড়া ছিল পানির একটি মৃৎপাত্র। এই বৈরাগ্য দেখে খলীফার কান্না এসে গেল। আবু ওবায়দা আরয করলেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আমার ঘরে গিয়ে আপনি কাঁদবেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার সহচরদের মধ্যে তুমিই পূর্ববর্তী তরীকায় কায়েম রয়েছ। অন্যান্য সকলের কাছ থেকে দুনিয়া কিছু না কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

মোটকথা, এই মনীষীগণই দুনিয়াকে কিছু চিনতে পেরেছিলেন। তাঁরা খোদায়ী বিধানাবলীকে অন্তর দিয়ে সত্য জ্ঞান করতেন এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর অনুসরণে পাগলপারা ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ দুনিয়াকে দেহের জরুরী সুখ ও আরামের জন্যে এবং আখেরাতকে অন্তরের শান্তির জন্যে গ্রহণ করা উচিত।

হযরত হাসান বলেন ঃ বনী ইসরাঈল আল্লাহ-পূজার পর মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মহব্বত।

হযরত ওয়াহহাব বলেন ঃ আমি এক কিতাবে পাঠ করেছি, দুনিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে সুবর্ণ সুযোগ এবং মূর্খের জন্যে গাফলতির কারণ। অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়াকে সৎকর্ম করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে আর মূর্খ তা বুঝে না। সে যখন এখান থেকে ইন্তেকাল করে, তখন ফিরে আসার বাসনা করে। কিন্তু ফিরে আসা সম্ভব কোথায়!

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণের পর থেকেই সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে এবং আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। সুতরাং নিজেকে নিকটবর্তী ও সম্মুখবর্তী জায়গায় পৌছানো উচিত। দূরবর্তী জায়গায় লাভ কি?

হযরত আমর ইবনে আস একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন ঃ যে বস্তুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনাসক্তি প্রকাশ করতেন, আমি তাতে তোমাদেরকে অধিক আগ্রহী দেখতে পাই। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর দিয়ে কখনও এমন তিন দিন অতিবাহিত হয়নি, যাতে তাঁর আমদানী দেনার চেয়ে বেশী থাকত।

হযরত হাসান (রাঃ) একবার এই আয়াতখানি পাঠ করলেন ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

অতঃপর বললেন ঃ জান, এটা কার উক্তি? এ হল তাঁর উক্তি যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। অতএব দুনিয়ার অবস্থা তিনিই ভাল জানেন। তোমাদের উচিত দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এতে অনেক কাজ-কারবার থাকে। এক কাজের মুখোমুখি হলে আরও দশটি কাজ সামনে এসে যায়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর কাছে একবার নাজরান থেকে একজন লোক এল। তার বয়স ছিল দুশ' বছর। তিনি লোকটিকে দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলল ঃ কয়েক বছর বিপদে কেটেছে এবং কয়েক বছর আরামে। দিবারাত্র এভাবেই অতিবাহিত হয়। যারা জন্মগ্রহণ করার, তারা জন্মগ্রহণ করে এবং যারা মরার, তারা মরে যায়। যদি কেউ জন্মগ্রহণ না করে, তবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ না মরলে দুনিয়াতে স্থান সংকুলান হবে না। হযরত মোয়াবিয়া বললেন ঃ তোমার যা মনে চায়, আমার কাছে প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে। লোকটি আরয করল ঃ আপনি আমার অতীত জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন অথবা ভবিষ্যত মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারেন? খলীফা বললেন ঃ এ দুটির কোনটিই সম্ভব নয়। সে আরয করল ঃ তা হলে আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

দাঊদ তায়ী বলেন ঃ হে মানুষ, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে আনন্দিত হও; অথচ জান না, আয়ু বিনষ্ট করে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। তুমি আমল করার ব্যাপারে আজ কাল কর। মনে হয় উপকার অন্য কেউ পাবে।

আবু হাশেম বলেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন খুশী নেই, যার সাথে দুঃখ নেই।

হযরত হাসান বলেন ঃ মানুষের প্রাণবায়ু দুনিয়ার তিনটি বেদনা নিয়ে বের হয়। এক, যা সঞ্চয় করেছিল, তাতে অতৃপ্তির বেদনা। দুই, বাসনা অপূর্ণ থাকার বেদনা। তিন, আখেরাতের সম্বল পুরোপুরি না থাকার বেদনা।

দুনিয়ার অবস্থা ঃ জানা উচিত যে, দুনিয়া অত্যন্ত দ্রুতগামী। সে

প্রত্যেককে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ প্রত্যেকের মুখে মুখে। বাহ্যত স্থির মনে হয়; অথচ দ্রুতগতিতে তাড়াহুড়া করে পালিয়ে যাচ্ছে। তার গতিশীলতা দেখে বুঝা যায় না; কিন্তু বছর ও মাসের সমাপ্তি দ্বারা অনুভূত হয়। দুনিয়া ছায়ার মত। ছায়াকেও দৃশ্যত গতিশীল মনে হয় না; কিন্তু বাস্তবে গতিশীল থাকে। বুযুর্গগণও দুনিয়াকে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সামনে দুনিয়ার আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ দুনিয়া পড়ন্ত ছায়া অথবা বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন। দুনিয়া তার কল্পনা দ্বারা মানুষকে ধোকা দেয় এবং দুনিয়া থেকে বের হওয়ার পর সঙ্গে কিছুই থাকে না। তাই দুনিয়াকে স্বাপ্নিক কল্পনার সাথে তুলনা করা হয়। হাদীসে আছে—

اَلدُّنْيَا حُلْمٌ وَاَهْلُهَا عَلَيْهَا مُجَازُوْنَ وَمُعَاتَبُوْنَ

অর্থাৎ., দুনিয়া একটি স্বপ্ন। দুনিয়াবাসীদেরকে প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

ইউনুস ইবনে ওবায়দ বলেন ঃ আমার মতে দুনিয়া এমন, যেমন কোন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন খারাপ অথবা সুখবর বিষয় দেখে দুঃখিত অথবা আনন্দিত হয়। মানুষও এমনিভাবে যেন স্বপ্নে দুনিয়ার সুখ ও দুঃখ দেখে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর যখন তাদের চোখ খুলবে, তখন কিছুই পাবে না।

দুনিয়া তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের প্রাণের শত্রু এবং তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে। এদিক দিয়ে সে সেই নারীর মত, যে পুরুষদের জন্যে প্রচুর অঙ্গসজ্জা করে। এরপর যখন কারও সাথে বিবাহ হয়, তখন তাকে হত্যা করে। দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। প্রথম প্রথম তাকে খুব সুশ্রী, কোমল ও লাজুক মনে হয়; কিন্তু অবশেষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামনে দুনিয়া একজন ফোকলা বৃদ্ধার আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধার গায়ে সর্বপ্রকার অলংকার ও মূল্যবান গহনাগাটি শোভা পাচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ পর্যন্ত তোর কয়জন স্বামী হয়েছে? সে বলল ঃ সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ তারা সকলেই তোকে ছেড়ে মারা

গেছে, না তোকে তালাক দিয়েছে? সে আরয করল ঃ আমি তাদের হত্যা করেছি। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তা হলে তো তোর বর্তমান স্বামীদের দুর্ভোগ বলতে হবে। তারা পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তুই এক একজনকে খতম করছিস, অথচ তারা তোকে ভয় করে না।

যেহেতু দুনিয়ার বহির্ভাগ এক রকম এবং ভিতরভাগ অন্য রকম, তাই দুনিয়াকে এমন এক কুশ্রী বৃদ্ধার সাথে তুলনা করা যায়, যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, চমকপদ্র পোশাক এবং অলংকার পরে গায়ে বোরকা জড়িয়ে মানুষকে তন্বী যুবতী বলে ধোকা দেয়। মানুষ যখন তার ভেতরের অবস্থা জানতে পারে এবং মুখের উপর থেকে ঘোমটা খুলে দেখে, তখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

আলা ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ আমি স্বপ্নে এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, যার গায়ের ত্বক বার্ধক্যের কারণে কুঞ্চিত ছিল। সে মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরেছিল। লোকজন তার চার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখে যাচ্ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম। এতে সকলই বিস্মিত হল। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ তুমি আমাকে চিন না? আমি বললাম ঃ না। সে বলল ঃ যদি আমার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে টাকা পয়সাকে অশুভ মনে করবে।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বাগদাদ পৌঁছার পূর্বে দুনিয়াকে স্বপ্নে এক অস্থি কংকালসার বৃদ্ধার আকৃতিতে দেখলাম। সে হাততালি দিচ্ছিল এবং লোকজন তার পেছনে হাততালি দিয়ে নৃত্য করছিল। বৃদ্ধা আমার সামনে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ সুযোগ পেলে আমি তোমার অবস্থাও তাদের মত করব। এ স্বপ্নটি বর্ণনা করে আবু বকর কেঁদে ফেললেন।

ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক কুশ্রী, বিবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করা হবে। তার দাঁত সামনের দিকে বের হয়ে থাকবে। তাকে মানুষের সামনে রেখে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তোমরা কি এ বৃদ্ধাকে চিন? তারা আরয করবে ঃ এর পরিচয় থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়

চাই। এরশাদ হবে ঃ এই হল সে দুনিয়া, যার জন্যে তোমরা গর্ব, অহংকার শত্রুতা ও প্রতারণা করতে এবং তার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলে। এরপর বৃদ্ধাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সে আরয করবে ঃ ইলাহী, আমার অনুসরণকারীরা কোথায়? আদেশ হবে ঃ তাদেরকেও তার সঙ্গী করে দাও।

মানুষ দুনিয়া অতিক্রম করে ঠিক; কিন্তু বাস্তবে তার কোন যথার্থতা নেই। কেননা, মানুষের তিন অবস্থা। প্রথম, সেই সময়কাল, যাতে সে জন্মগ্রহণ করেনি; অর্থাৎ আদিকাল থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়। দ্বিতীয়, মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত সময়। এতে সে দুনিয়াকে দেখে না। তৃতীয়, জীবদ্দশার সময়, যাকে দুনিয়া বলা হয়। যদি জীবদ্দশার এই সময়কে আদি ও অনন্তকালের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা এক দীর্ঘ সফরের সামান্য একটু স্থানের সমানও হবে না। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَالِیْ وَالدُّنْیَا وَاِنَّمَا مَثَلِیْ وَمَثَلُ الدُّنْیَا کَمَثَلِ رَاکِبٍ سَارَ فِیْ یَوْمٍ صَائِفٍ فَرُفِعَتْ لَهٗ شَجَرَةٌ فَقَالَ تَحْتَ ظِلِّهَا سَاعَةً ثُمَّ رَاحَ وَتَرَکَهَا -

অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন অশ্বারোহী গ্রীষ্মের খরতাপে পথ অতিক্রম করে। এরপর সে একটি বৃক্ষ পেয়ে তার ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর তা পরিত্যাগ করে আবার নিজের গন্তব্য পথে রওয়ানা হয়ে যায়।

কোন ব্যক্তি দুনিয়াকে এই দৃষ্টিতে দেখলে সে কখনও তার প্রতি আগ্রহী হবে না এবং এর দিনগুলো সুখে অতিবাহিত হচ্ছে, কি দুঃখে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। সে ইটের উপর ইট রেখে গৃহ নির্মাণ করবে না। দুনিয়ার অবস্থা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্যক জানা ছিল বিধায় তিনি সারা জীবন ইটের ঘর নির্মাণ করেননি— কাঠেরও নয়। বরং কোন কোন সাহাবীকে কাঠের ঘর নির্মাণ করতে দেখে এরশাদ করেছেন—

اَرَی الْاَمْرَ اَعْجَلَ مِنْ هٰذَا

অর্থাৎ, আমি জীবনটাকে দেখছি এর চেয়ে দ্রুত বিলীয়মান।

হযরত ঈসা (আঃ)-ও এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ দুনিয়া একটি পুল। একে অতিক্রম করে যাও। এতে দালান-কোঠা তৈরী করো না। এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত পরিষ্কার। কেননা, জীবন হচ্ছে আখেরাতে পৌছার একটি পুল। এর এক স্তম্ভ হচ্ছে দোলনা এবং অপর স্তম্ভ কবর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সীমিত। কোন কোন লোক এই পুলের অর্ধেক অতিক্রম করেছে। কেউ এক-তৃতীয়াংশ, কেউ দুই-তৃতীয়াংশ এবং কারও এক কদমই অতিক্রম করা বাকি আছে, কিন্তু সে তা জানে না। মোটকথা, এই পুল অতিক্রম করা জরুরী। পুলের উপর দালান নির্মাণ করা এবং নানা প্রকার সজ্জায় সজ্জিত করা এরপর তা ছেড়ে চলে যাওয়া একান্তই নির্বুদ্ধিতা।

দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা খুব সহজ ও কোমল বিধায় দুনিয়াদার মনে করে. দুনিয়া থেকে সহি-সালামতে বের হয়ে যাওয়াও তেমনি সহজ ও আনন্দদায়ক হবে। অথচ ব্যাপার তা নয়। এর জালে আবদ্ধ হওয়া খুব সহজ এবং সহি-সালামতে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এর দৃষ্টান্ত হযরত আলী (রাঃ) সালমান ফারেসীকে লিখিছেন যে, দুনিয়া সাপের মত। তাতে হাত লাগালে বাহ্যত নরম ও মসৃণ মনে হয়; কিন্তু তার বিষ মানুষের জীবন নাশ করে। অতএব, দুনিয়ার যে বস্তু তোমার ভাল লাগে, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। কারণ, তা তোমার হাতে খুব কম থাকবে। দুনিয়ার সর্বাধিক আনন্দের বিষয়টি সর্বাধিক ভয়ের কারণ। কেননা, দুনিয়াতে যখনই কেউ আনন্দ লাভ করে, তারপর তেমনি দুঃখও পায়।

দুনিয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَالْمَاشِي فِي الْمَاءِ هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِيْ يَمْشِيْ فِي الْمَاءِ أَنْ لَا تَبْتَلَّ قَدَمَاهُ -

অর্থাৎ, দুনিয়াদারের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে পানিতে হাঁটে। পানিতে হাঁটলে পর পদযুগল না ভিজা কি সম্ভবপর?

এই হাদীস থেকে তাদের মূর্খতা জানা গেল, যারা বলে যে, আমাদের দেহ কেবল দুনিয়ার আনন্দের সাথে জড়িত- অন্তর এ থেকে পাক ও পবিত্র। এটা শয়তানের একটা ধোকা মাত্র। কেননা, তাদেরকে যদি দুনিয়ার আনন্দ ও বিলাসিতা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়, তবে তাদের দুঃখ ও বিষাদের অন্ত থাকে না। আন্তরিক সম্পর্ক না থাকলে এই দুঃখ ও কষ্ট কেন হয়?

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ সত্য। পানিতে হাঁটলে যেমন পদযুগল অবশ্যই ভিজে যায়, তেমনি দুনিয়ার সাথে মেলামেশার দ্বারাও অন্তরে এক প্রকার সম্পর্ক ও তামসিক ভাব সৃষ্টি হয়। বরং দুনিয়ার সাথে এই সম্পর্কের কারণে অন্তরে এবাদতের স্বাদ থাকে না। সেমতে হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ আমি সত্য বলছি, রুগ্ন ব্যক্তি যেমন রোগের তীব্রতায় খাদ্যের স্বাদ পায় না, তেমনি যে দুনিয়ার রোগী, সে এবাদতের স্বাদ পায় না।

সারকথা, যে বিষয়ের যতটুকু ভাল থাকা মনে হয়, সেই বিষয় না থাকার কারণে কষ্টও ততটুকুই হয়। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীকে বললেন ঃ তুমি কি তোমার খাদ্য লবণ-মরিচ সহকারে খেয়ে তার উপর পানি ও দুধ পান কর না? যাহ্হাক আরয করলেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এরপর এই খাদ্যের পরিণতি কি হয়, তা তো আপনারই জানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে সে বস্তুর তুল্য বলেন, যা পরিণামে খাদ্য দ্বারা তৈরী হয়ে যায়। হযরত হাসান বলেন ঃ আমি দেখি প্রথমে খাদ্যের মধ্যে খুব মসলা ও সুগন্ধি দেয়া হয়। এরপর একে কোথায় ফেলে আসে! আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

অর্থাৎ, মানুষ লক্ষ্য করে দেখুক তার খাদ্যের প্রতি!

এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে খাদ্য বলে খাদ্যের পরিণতিকে বুঝানো হয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমরকে বলল ঃ আমি আপনাকে একটি

প্রশ্ন করতে চাই; কিন্তু লজ্জা বোধ হয়। তিনি বললেন ঃ লজ্জা করা উচিত নয়। জিজ্ঞেস কর। লোকটি বলল ঃ মানুষ পায়খানা করার পর তার দিকে দেখবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ফেরেশতা তাকে বলে ঃ যে বস্তু নিয়ে কৃপণতা করতে তার পরিণাম কি হয়েছে দেখে নে।

হযরত বশীর ইবনে কা'ব বলেন ঃ হে লোকগণ! চল, তোমাদেরকে দুনিয়া দেখিয়ে দিই। এরপর তিনি তাদেরকে কোন পায়খানার স্তূপের কাছে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন ঃ এগুলো হচ্ছে, মানুষের ফলমূল, মুরগী, মধু ও ঘি।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আখেরাতে দুনিয়ার পরিমাণ এমন, যেমন কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল রাখার পর দেখে, আঙ্গুলে কতটুকু পানি এসেছে। অর্থাৎ, আখেরাতের সামনে দুনিয়া তুচ্ছ।

দুনিয়াদার মানুষ দুনিয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়। এরপর বড় বড় দুঃখ ও বেদনা সহ্য করে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত তেমনি, যেমন কিছু লোক জাহাজে সওয়ার হয়ে কোন দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছার পর নাবিক তাদেরকে বলল ঃ যার প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন, সে এখানে নেমে প্রয়োজন সেরে আসতে পারে। কিন্তু স্থানটি খুব বিপজ্জনক। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় জাহাজ ছেড়ে যাবে। সেমতে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নেমে পড়ল এবং দ্বীপের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর কেউ কেউ নাবিকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল; অর্থাৎ, প্রস্রাব-পায়খানা সেরেই কালবিলম্ব না করে জাহাজে ফিরে এল। ফলে, তারা জাহাজে পছন্দসই ও আরামের জায়গা পেয়ে গেল। কতক লোক দ্বীপে বিলম্ব করে তার লতা-পল্লব, ফুলকলি, প্রান্তর, মনমুগ্ধকর সুর লহরী, বিহঙ্গকুলের কলকাকলি, নানা প্রকার মণিমুক্তা, অভাবনীয় চিত্রকলা ও উদ্যানসমূহের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করল। কিন্তু জাহাজ না পাওয়ার আশংকায় ভ্রমণ শেষ করেই জাহাজে ফিরে এল। তারা যদিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিস্তীর্ণ জায়গা পেল না; কিন্তু সঠিকভাবে বসার মত সুযোগ পেল। তৃতীয় এক দল লোক উল্লিখিত অপরূপ সৌন্দর্যসমূহ অবলোকন করে তাতে নিমগ্ন হয়ে গেল। তারা মূল্যবান মণিমুক্তা, ঝিনুক ও সুমিষ্ট ফলমূল ছেড়ে আসতে চাইল না। ফলে,

সেগুলো যে যতটুকু পারল সঙ্গে নিয়ে নিল। কিন্তু জাহাজে এসে দেখল, বসার মত জায়গা খালি নেই— জিনিসপত্রের বোঝা রাখা তো দূরের কথা। ফলে বাধ্য হয়ে বোঝাগুলো মাথায় বহন করেই জাহাজে বসতে হল। তারা নিজেদের এই কাজের জন্যে অনুতপ্ত ছিল। আরেক দল লোক জঙ্গলে প্রবেশ করে জাহাজের কথা বেমালুম ভুলেই গেল। তারা ভ্রমণে এমনভাবে মেতে রইল যে, নাবিকদের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছল না। এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ছিল হিংস্র জন্তুর ভয়। তারা বুঝত, এই উঁচুনীচু জায়গায় পদস্খলনও হবে, বিপদে পড়তে হবে, পায়ে কাঁটা বিঁধবে, জন্তু-জানোয়ারের ভয়াবহ শব্দে কলিজা কেঁপে উঠবে এবং ঝোপঝাড়ে লেগে কাপড়-চোপড় ছিন্ন হয়ে উলঙ্গ থাকতে হবে। এরপর ফিরে যেতে চাইলেও যাওয়া হবে না। এমনি সময়ে তারা জাহাজের লোকদের আওয়াজ শুনে মাথায় বোঝা বহন করে তীরে পৌঁছল। কিন্তু জাহাজে জায়গা না পেয়ে অবশেষে ক্ষুধা ও পিপাসায় সেখানে মৃত্যুবরণ করল। আরও কিছু লোক জাহাজীদের আওয়াজ শুনল না এবং জাহাজও চলে গেল। ফলে, তাদের কিছু সংখ্যক হিংস্র জন্তুদের খোরাক হয়ে গেল। কিছু সংখ্যক দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে মারা গেল। কিছু সংখ্যক পাঁকে ডুবে মরল।

যাত্রীদের মধ্যে তৃতীয় যে দলটি জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে জাহাজে সওয়ার হতে পেরেছিল, এখন সেগুলোর সংরক্ষণ তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিল। কয়েকদিন পরে ফুল শুকিয়ে গেল, পাথর ইত্যাদির রং বদলে গেল, ফলমূল পচে গলে দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। পূর্বে কেবল রাখার সমস্যা ছিল। এখন দুর্গন্ধের কারণে জাহাজে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে গেল। ফলে, অনন্যোপায় হয়ে সকল বোঝা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হল। কিন্তু এই দুর্গন্ধের প্রভাবে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময়ে ভুগল।

যারা তাদের পূর্বে জাহাজে পৌঁছেছিল, তারা মনমত জায়গা না পেলেও দেশে পৌঁছে কোন অসুখে-বিসুখে পড়েনি। আর যারা সর্বপ্রথম জাহাজে পৌঁছেছিল, তারা জাহাজেও সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করেছে এবং দেশে কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়নি।

দুনিয়ার লোকদের অবস্থাও তেমনি। তারা আসল দেশ বিস্মৃত হয়ে দুনিয়ারূপী দ্বীপের পুষ্পোদ্যান, প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যে এমন বিভোর হয়ে

পড়েছে যে, এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করারও অবকাশ নেই। এ বিপদে প্রায় সকলেই পতিত; কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার কথা ভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর বাণীর প্রতি তাদের বিশ্বাস দুর্বল। এদিক দিয়ে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ আমার, তোমাদের এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন সম্প্রদায়ের লোকজন ধুলায় অন্ধকার জঙ্গলে সফর করে। চলতে চলতে তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে এটাও জানা থাকে না যে, যতটুকু পথ অতিক্রান্ত হয়েছে, তা বেশী, না যা বাকী রয়েছে, তা বেশী। এই পর্যায়ে তাদের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা জীবনের আশা ত্যাগ করে জঙ্গলেই পড়ে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে তারা অনেক দূরে একজন সুবেশী ব্যক্তিকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। তার পোশাক থেকে পানি ঝরছিল। মনে হচ্ছিল সে কোন শস্যশ্যামল ভূখণ্ড থেকে আসছে। লোকটি তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলঃ তোমাদের একি অবস্থা? তারা বলল ঃ আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বর্ণনা করার প্রয়োজন কি। লোকটি বলল ঃ আমরা আপনার কথামত কাজ করব। এতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না। লোকটি বলল ঃ আমি যদি তোমাদেরকে পানি ও শস্যক্ষেত্রের ঠিকানা বলে দেই, তবে তোমরা কি করবে? তারা বলল ঃ এতেই কাজ হবে না। পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করতে হবে। সেমতে তারা আল্লাহর কসম খেয়ে অঙ্গীকার করল কোন ব্যাপারেই তারা নাফরমানী করবে না। এমনি কথাবার্তার পর লোকটি উৎকৃষ্ট পানি ও শস্যশ্যামল ভূখণ্ডের ঠিকানা বলে দিল। সে নিজেও কিছুদিন তাদের মধ্যে বসবাস করল। অতঃপর তাদেরকে বলল ঃ ভাইয়েরা আমার, এখানে আর থাকা যাবে না। এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাও। তারা বলল ঃ কোথায় যাব? এর চেয়ে সুন্দর ঝরণা আর উদ্যান অন্যত্র কোথায়? কেউ কেউ যুক্তি পেশ করল ঃ এ জায়গাটি অপ্রত্যাশিত নেয়ামতের মত পেয়েছি। এর চেয়ে সুন্দর জায়গা নিয়ে আমরা কি করব?

অল্প সংখ্যক লোক বলল ঃ ভাই সব, এই লোকের সাথে আমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করেছি যে, তার অবাধ্যতা করব না। সে পূর্বে যা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। এখনও তার কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সেমতে তারা লোকটির সাথে রওয়ানা হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরা সেখানেই পড়ে রইল। প্রত্যুষে শত্রুপক্ষ এসে আক্রমণ করে তাদের কতককে হত্যা করল এবং কতককে বন্দী করে নিয়ে গেল।

এই হাদীসে 'লোকটি' বলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। তিনি উম্মতকে আখেরাতের দিকে আহ্বান করেন। যে ব্যক্তি আখেরাত দুনিয়া থেকে উত্তম—একথাটি সত্য জেনে তাঁর অনুসরণ করে, সে নিরাপদ থাকে। নতুবা প্রাণের শত্রু শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুনিয়াতে মানুষ প্রথম প্রথম খুব মজা লুটে, অবশেষে তার বিরহ জ্বালায় কাতর হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি নতুন ঘর নির্মাণ করে তাকে খুব সজ্জিত করে। এরপর এক এক সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা সেই ঘরে ভোজের নিমন্ত্রণ করে। যখন এক সম্প্রদায় ঘরে আসে, তখন তার সামনে স্বর্ণের একটি আতরদানী পেশ করে, যাতে তার ঘ্রাণ নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের জন্যে রেখে দেয়। কিন্তু এই সম্প্রদায় ভোজসভার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে মনে করে বসে, পাত্রসহ আতর তাদেরকে দেয়া হয়েছে। ফলে, তারা আতরদানীর সাথে অন্তরের খুব সম্পর্ক গড়ে তুলে। কিন্তু গৃহকর্তা যখন আতরদানীটি ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা দুঃখিত হয়। অপরপক্ষে যে সম্প্রদায় রীতি-নীতি জানে, সে ঘ্রাণও নেয়, গৃহকর্তার শোকরও করে এবং হৃষ্ট-চিত্তে আতরদানীটি ফিরিয়েও দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার রীতি-নীতি জানে, সে মনে করে দুনিয়া একটি নিয়ন্ত্রণ গৃহ, যার আসবাবপত্র মেহমানদের জন্যে ওয়াকফ। তাই সে দুনিয়ার জিনিসপত্র দ্বারা মুসাফিরের ন্যায় উপকৃত হয় এবং সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়ে না। ফলে, মৃত্যুর সময়ও সে বিরহ-জ্বালা ভোগ করে না।

বান্দার জন্যে দুনিয়ার অবস্থা ঃ কেবল দুনিয়ার নিন্দা জেনে নেয়া যথেষ্ট নয়; বরং একথাও জানতে হবে যে, কোন্ দুনিয়া নিন্দার যোগ্য এবং কোন্ দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা করা অপরিহার্য। বলা হয় অন্তরের দু'টি অবস্থার নাম দুনিয়া ও আখেরাত। যে অবস্থাটি অন্তরের নিকটবর্তী; অর্থাৎ

মৃত্যুর পূর্বে, তাকে দুনিয়া বলা হয়। পক্ষান্তরে যে অবস্থাটি এর পরবর্তী; অর্থাৎ মৃত্যুর পরে, তার নাম আখেরাত। এ থেকে বুঝা গেল, যেসব বস্তুর দ্বারা আনন্দ, খাহেশ ও উদ্দেশ্য মৃত্যুর পূর্বে অর্জিত হয়, সেগুলো মানুষের জন্যে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এ থেকে বুঝা উচিত নয় যে, যে বস্তুর প্রতিই ঔৎসুক্য হয়, তাই মন্দ; বরং বস্তুসমূহ তিন প্রকার। প্রথম, সেইসব বিষয়, যা আখেরাতে সঙ্গে থাকে এবং যার ফলাফল মৃত্যুর পর জানা যায়। এরূপ বিষয় দু'টি—একটি এলম ও অপরটি আমল। এলম অর্থ এমন এলম, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম জানা যায় এবং ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, রসূল এবং আকাশ ও পৃথিবীর জ্ঞান অর্জিত হয়। আমল অর্থ আল্লাহ তা'আলার খাঁটি এবাদত। সুতরাং আলেম ব্যক্তি যদিও মাঝে মাঝে এলমের সাথে এমন একাত্ম হয়ে যায় যে, সকল বস্তুর চেয়ে অধিক আনন্দ এলমের মধ্যেই পায়, এমনকি এর খাতিরে যাবতীয় সংসার ধর্মও বর্জন করে, তবু একে নিন্দিত দুনিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয় না; বরং একে আখেরাতের মধ্যেই গণ্য করা উচিত। এমনিভাবে এবাদতকারী ব্যক্তিও তার এবাদতে এমন স্বাদ ও আনন্দ পায় যে, এবাদত না করাকে সে রীতিমত আযাব মনে করতে থাকে। এমনকি জনৈক আবেদ বলেন, মৃত্যুতে আর তো কোন ভয় নেই, ভয় কেবল তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার। অপর একজন আবেদ এই বলে দোয়া করতেন—ইলাহী, কবরে আমাকে নামায, রুকু ও সেজদার শক্তি দান করো। এহেন আনন্দ ও আগ্রহের কারণে এই এবাদতকে দুনিয়া বলা যায়; কিন্তু যে দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, এটা সে দুনিয়া নয়।

অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে—

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ -

অর্থাৎ, দুনিয়ার তিনটি বস্তুকে আমার প্রিয় করা হয়েছে—নারী, সুগন্ধি এবং নামাযে আমার চক্ষুর শীতলতা। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযকেও দুনিয়ার আনন্দসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় দুনিয়ার

বর্ণনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং নিন্দিত দুনিয়ার বর্ণনাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় প্রকার আনন্দের বস্তু সেই সব, যা দ্বারা কেবল জীবদ্দশায়ই উপকার পাওয়া যায় এবং আখেরাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। যেমন, পাপকর্মের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বৈধ বস্তু ভোগ করা তথা প্রচুর সোনারুপা, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, গোলাম, বাঁদী, দালান-কোঠা, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক ও উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করা। এসব বস্তুর আনন্দ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই পাওয়া যায়। তাই এগুলো নিন্দিত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি অনর্থক—এ বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু দারদাকে হেমসের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানে দুই দেরহাম ব্যয় করে একটি পায়খানা তৈরী করান। এতেই হযরত উমর তাকে লিখে পাঠান, উমর ইবনে খাত্তাব আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আবু দারদার জানা উচিত যে, পারস্য ও রোমের যে সকল দালান-কোঠা বিদ্যমান ছিল, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ পাক যে দুনিয়াকে বিধ্বস্ত করার আদেশ দিয়েছেন, তুমি তাকে আবাদ করলে কেন? এখন পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি পরিবার-পরিজনসহ দামেশকে চলে যাও। এরপর হযরত আবু দারদা সারা জীবন দামেশকেই বসবাস করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ওমর এতটুকু দুনিয়াকেও অনর্থক জ্ঞান করেছেন।

তৃতীয় প্রকার আনন্দের বস্তু হচ্ছে বর্ণিত উভয় প্রকারের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ। উদাহরণতঃ জীবন রক্ষা হয়—এই পরিমাণ খাদ্য, এক জোড়া মোটা বস্ত্র এবং অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য বস্তু; যাতে মানুষ এলম ও আমল অর্জনে সক্ষম হয়। এই প্রকার আনন্দের বস্তু দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না; বরং আখেরাতের কাজে সহায়ক হয় বিধায় এগুলো প্রথম প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এগুলোকে সহায়তা লাভের নিয়তে সংগ্রহ করবে, তাকে দুনিয়াদার বলা হবে না। আর যদি কেবল পার্থিব আনন্দ লাভের উদ্দেশে সংগ্রহ করে, তবে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দুনিয়ার বস্তুরূপে গণ্য হবে।

মৃত্যুর পর মানুষের সাথে তিনটি বিষয় থাকে— (১) দুনিয়ার

মলিনতা থেকে অন্তরের পবিত্রতা, (২) আল্লাহর যিকরের প্রতি আসক্তি এবং (৩) আল্লাহর মহব্বত। অন্তরের পবিত্রতা দুনিয়ার খাহেশ বর্জন ব্যতীত অর্জিত হয় না। যিকরের আসক্তি অধিক ও সার্বক্ষণিক যিকর ছাড়া সহজসাধ্য হয় না। আল্লাহর মহব্বত মারেফত ছাড়া হাসিল হয় না। এ তিনটি বিষয় অর্থাৎ, পবিত্রতা, আসক্তি এবং মহব্বত মৃত্যুর পরই সৌভাগ্য ও মুক্তির কারণ হয়। দুনিয়া খাহেশ থেকে অন্তরের পবিত্রতা এজন্যে মুক্তির কারণ হয় যে, এটা আযাব ও মানুষের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মানুষের আমল তার পক্ষ থেকে লড়বে। উদাহরণতঃ আযাব যখন পায়ের দিক থেকে আসবে, তখন তাহাজ্জুদ তাকে রুখে দাঁড়াবে। যখন হাতের দিক থেকে আসবে, তখন যাকাত তাকে বাধা দেবে। মহব্বত এ কারণে মুক্তিদাতা যে, এর কারণে খোদায়ী দীদারের গৌরব নসীব হয়। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষ এই গৌরবের অংশপ্রাপ্ত হয় এবং জান্নাতে দীদারের সময় পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। ফলে, মৃত্যুর পরই কবর সুখ ও শান্তির আবাসস্থল হয়ে যায়। কেন হবে না, আশেকের প্রিয়জন তো একজনই, যার মিলনে পার্থিব সম্পর্ক অন্তরায় ছিল। মৃত্যুর কারণে যখন সে অন্তরায় দূর হয়ে গেল, তখন প্রিয়জন ও প্রার্থিত দীদারের আর কি বাধা রইল? দুনিয়াদার ব্যক্তির কবরে আযাব হয়। কেননা, তার প্রেমাস্পদ কেবল দুনিয়া ছিল, যা মৃত্যুর কারণে হস্তচ্যুত হয়ে গেল এবং তাতে ফিরে আসার কোন পথই আর রইল না। যখন প্রেমাস্পদই নেই, তখন দুঃখ ও আযাব হবে না তো কি হবে!

এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি দুনিয়ার খাহেশ দমন করার জন্যে নিরন্তর যিকর, চিন্তাভাবনা ও আমল করতে থাকে, সে আখেরাতের পথিক। সুস্বাস্থ্য ছাড়া এসব বিষয় সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য, খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান ছাড়া সম্ভব নয়। এদের প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক সাজসরঞ্জাম দরকার। অতএব, যে ব্যক্তি খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান আখেরাতের প্রয়োজন পরিমাণে হাসিল করে, সে দুনিয়াদার নয়। বরং দুনিয়া হবে তার জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যে এসব বস্তু কেবল মানসিক আনন্দ ও বিলাসিতার জন্যে হাসিল করে, সে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য হবে।

কিন্তু পার্থিব আনন্দের আগ্রহও দু'প্রকার। এক, যাতে আগ্রহী ব্যক্তি

আখেরাতে আযাবের যোগ্য হয়। একে বলা হয় হারাম। দুই, যাতে আগ্রহী ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না এবং হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হয়। এর নাম হালাল। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে, কিয়ামতের ময়দানে হিসাবের অপেক্ষায় থাকাও একটি আযাব। সেমতে হাদীসে আছে—

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَّحَرَامُهَا عَذَابٌ

অর্থাৎ, দুনিয়ার হালাল হল হিসাব এবং হারাম হল আযাব।

আরও বলা হয়েছে—

حَلَالُهَا عَذَابٌ اِلَّا اَنَّهٗ اَخَفُّ مِنْ عَذَابِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ, দুনিয়ার হালালও আযাব। তবে এটা হারামের আযাবের চেয়ে হালকা।

যদি হিসাব না-ও হয়, তবে উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং মনে সে বাসনা উদয় হওয়াও আযাবের চেয়ে কম নয়। এর নযীর দুনিয়াতেই দেখা যায়, কোন সমকক্ষ ব্যক্তি পার্থিব সৌভাগ্যে অগ্রগামী হয়ে গেলে অন্তরে কেমন পরিতাপের জ্বালা অনুভূত হয়! অথচ এই পার্থিব মর্যাদা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। সুতরাং পার্থিব আনন্দেই যখন এই জ্বালা, তখন আখেরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে সে জ্বালা আরও তীব্র হবে।

অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগ করে, তা কোন প্রাণীর সুললিত কণ্ঠস্বর থেকে হলেও তার আনন্দের অংশ আখেরাতে হ্রাস পাবে। অনুরূপভাবে যদি কোন পুষ্পোদ্যান দেখে অথবা ঠাণ্ডা পানি পান করে কেউ আনন্দ লাভ করে, তাহলে কিয়ামতে তার বিনিময়ে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ আনন্দ হ্রাস পাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত এরশাদের উদ্দেশ্য তাই। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ

هٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِىْ يُسْئَلُ عَنْهُ

অর্থাৎ, এটাও সে নেয়ামত, যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

এখানে ঠাণ্ডা পানির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ কারণেই যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর পানির পিপাসা হলে

লোকেরা মধুমিশ্রিত পানি উপস্থিত করে, তখন তিনি পানি হাতে ঘুরাতে-ফিরাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পান না করে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

عَنِّىْ حِسَابَهَا اَعْزِلُوْا -

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে এর হিসাব সরিয়ে নাও।

সারকথা, দুনিয়া অল্প হোক কি বেশী হোক— হারাম হোক কি হালাল— সবই দূষিত কিন্তু যে পরিমাণ দুনিয়া খোদা-ভীতির সহায়ক, সে পরিমাণ ভাল। বরং এ পরিমাণটি দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যার আল্লাহর মারেফত অধিকতর শক্তিশালী হবে, সে দুনিয়ার আনন্দ থেকে অধিকতর বেঁচে থাকবে। হযরত ঈসা (আঃ) একবার শোয়ার সময় পাথরের উপর মাথা রেখেছিলেন। কিন্তু ইবলীস মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এসে আরয করল ঃ আপনিও কি দুনিয়ার প্রতি উৎসুক? তিনি তৎক্ষণাৎ পাথরটি মাথার নীচ থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন।

একারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সাঃ) থেকে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি উপর্যুপরি কয়েকদিন খাবার গ্রহণ করতেন না। ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। ওলীগণের অবস্থাও তেমনি হয়ে থাকে। এর কারণে আখেরাতে তাদেরকে পূর্ণ অংশ দান করা হবে। স্নেহশীল পিতা তার পুত্রকে ফলমূল ইত্যাদি থেকে ফিরিয়ে রাখে; কিন্তু ইনজেকশন ও অপারেশন করে ব্যথা দেয়। এ কাজ কৃপণতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে করা হয় না; বরং এর কারণ স্নেহ ও মহব্বত।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে বস্তু বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তাই হল দুনিয়া। আর যে বস্তু বিশেষভাবে আল্লাহ্র জন্যে, তা দুনিয়া নয়। কোন্ বস্তুটি বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে—এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা হবে— বস্তু তিন প্রকার। প্রথম, এমন বস্তু, যা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। যেমন, গোনাহের কাজকর্ম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং সে সমস্ত বৈধ নেয়ামত, যেগুলো নিছক দৈহিক আরাম ও সুখের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বস্তুই

বিশেষভাবে দুনিয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দনীয়। দ্বিতীয় এমন বস্তু, যা দৃশ্যত আল্লাহর জন্যে; কিন্তু গায়রুল্লাহর জন্যেও হতে পারে। এরূপ বস্তু তিনটি—চিন্তাভাবনা, যিকর ও খাহেশ থেকে বিরত থাকা। এই তিনটি কাজ যদি গোপন করা হয় এবং এর পেছনে আল্লাহর খাহেশ ও আখেরাতে ভয় ছাড়া অন্য কোন কারণ না থাকে, তবে এগুলো আল্লাহর জন্যে হবে এবং দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। কিন্তু পার্থিব স্বার্থে এগুলো করা হলে দুনিয়ার মধ্যেই গণ্য হবে। যেমন, কেউ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট হওয়ার উদ্দেশে ফিকরের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে, মানুষের মধ্যে সাধক বলে খ্যাত হওয়ার জন্যে যিকর করে এবং ধনসম্পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অথবা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্যে খাহেশ বর্জন করে।

তৃতীয় এমন বস্তু, যা বাহ্যত মানসিক আনন্দ লাভের জন্যে; কিন্তু মর্মগতভাবে আল্লাহর জন্যেও করা যায়; যেমন খাদ্য, বিবাহ ইত্যাদি। এগুলোতে নিয়ত কেবল মানসিক আনন্দ হলে এগুলো দুনিয়া। আর যদি এবাদতে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে আল্লাহর জন্যে হবে। হাদীসে আছে—

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَمَنْ طَلَبَهَا اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ও গর্ব করার জন্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দারিদ্র্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং নিজেকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে দুনিয়া অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উঠবে যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। দেখ, শুধু নিয়ত বদলে যাওয়ার কারণে অবস্থা কেমন বদলে যায়। এ থেকে জানা গেল, সেই আনন্দকেই দুনিয়া বলে, যা জীবদ্দশায় শেষ হয়ে যায় এবং আখেরাতে কোন কাজে আসে না। একেই "হাওয়ায়ে নফস" তথা রৈপিক কামনা বলা হয়। নিম্নের

আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ, এবং যে নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টির নাম দুনিয়া বলা হয়েছে—

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ –

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন হচ্ছে খেলাধুলা, ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্বাহংকার এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা।

এই পাঁচটি বিষয় থেকে সাতটি ফলাফল অর্জিত হয়, যা নিম্ন আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু।

অতএব, যে বস্তু আল্লাহ তা'আলার জন্যে, তা দুনিয়া নয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পরিমাণ হয়, তবে তা আল্লাহর জন্যে। আর এসব বস্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত আকর্ষণ করা বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহর জন্যে নয়। এ দু'টি স্তরের মাঝখানে

আরও একটি স্তর আছে, যাকে অভাব বলা হয়। এই অভাবেরও দু'টি প্রান্ত ও একটি মধ্যভাগ আছে। এক প্রান্ত প্রয়োজনের সীমার কাছাকাছি। এটা কিছুতেই ক্ষতিকর নয়। কেননা, মানবীয় প্রয়োজনাদি সত্ত্বেও কেবল প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ থাকা মানুষের জন্যে অসম্ভব। অভাবের অপর প্রান্ত বিলাসিতার সীমার কাছাকাছি। এ প্রান্ত থেকে নিজেকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখাই উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি রাজকীয় চারণভূমির কাছে কাছে জন্তু নিয়ে ঘুরাফেরা করে, তার জন্যে চারণভূমিতে ঢুকে পড়া আশ্চর্য নয়। প্রয়োজনের কাছাকাছি যে প্রান্তটি রয়েছে, যথাসম্ভব তার কাছেই থাকবে। কেননা, এসব বিষয়ে পয়গম্বর ও ওলীগণের অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাঁদের সবাই সদাসর্বদা নিজেদেরকে প্রয়োজনের সীমার কাছাকাছি রাখতেন।

সেমতে হযরত ওয়ায়স কারনী নিজেকে প্রয়োজনের সীমার এত কাছাকাছি রাখতেন যে, পরিবারের সবাই তাকে পাগল মনে করত। তারা তাঁর বসবাসের জন্যে বাড়ীর দরজায় একটি কক্ষ তৈরী করে দিয়েছিল। তিনি তাতেই থাকতেন। কখনও এক বছর, কখনও দু'বছর এবং কখনও তিন বছর পর বাড়ী আসতেন। এতদিন পর্যন্ত কেউ তার মুখ দেখতে পেত না। এশার শেষ সময়ের পরে কক্ষে আসতেন এবং ফজরের আযানের পূর্বে বের হয়ে যেতেন। আহার এই স্থির করেছিলেন যে, সারা দিন খোরমার বীচি কুড়াতেন। কোন শুষ্ক বড় খোরমা তাতে পাওয়া গেলে সেটি ইফতারের জন্যে রেখে দিতেন। বেশী পাওয়া গেলে নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু রেখে ফকীরদেরকে সদকা করে দিতেন। কোন বড় খোরমা না পেলে বীচি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে কোন খাবার কিনে খেয়ে নিতেন। তাঁর বস্ত্রের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা ছেঁড়াবাস কুড়িয়ে এনে ফোরাতের পানিতে ধুতেন। অতঃপর সেগুলোকে একত্রে সেলাই করে পরতেন। অধিকাংশ শিশু তাকে পাগল মনে করে নুড়ি নিক্ষেপ করত। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন ঃ ভাইয়েরা আমার, যদি আমাকে ঢিল মার, তবে ছোট ছোট ঢিল মারবে। বড় ঢিল মারলে যদি রক্ত বের হয়ে যায়, তবে পানি না পাওয়া গেলে নামাযে ব্যাঘাত হতে পারে। এগুলো ছিল হযরত ওয়ায়স কারনীর স্বভাব-চরিত্র। এ কারণেই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নিজের কালামে তাঁকে একজন মহান

ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করেই এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি করুণাময়ের সুগন্ধি এয়ামনের দিক থেকে পাই।

হযরত উমর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন সবাইকে সমবেত করে বললেন, তোমরা সবাই কুফায় বসে যাও। সবাই বসে গেল। এরপর খলীফা বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ইরাকের অধিবাসী, সে দাঁড়াও। এরপর বললেন ঃ তোমরাও বসে যাও। তবে মুদার গোত্রের কেউ থাকলে দাঁড়াও। অতঃপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি কারনের অধিবাসী, সে ছাড়া সকলেই বসে যাক। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রইল। খলীফা তাকে বললেন ঃ তুমি কি কারনের অধিবাসী? সে বলল ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি ওয়ায়স ইবনে আমের কারনীকে চিন? এরপর তিনি তার যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। লোকটি বলল ঃ জী হাঁ চিনি হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আল্লাহর কসম, আমাদের গোত্রে ওয়ায়স সর্বাধিক নির্বোধ ও পাগল ব্যক্তি। একথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি যা কিছু বলেছি, নিজে থেকে বলিনি; বরং এসব কথা আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি। তিনি আরও বলেছেন,

يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

অর্থাৎ, তাঁর শাফায়েতের মধ্যে রবীয়া ও মুযার গোত্রের সমপরিমাণ লোক অন্তর্ভুক্ত হবে।

হারম ইবনে হাব্বান (রাঃ) বলেন ঃ হযরত উমরের মুখে এসব কথা শুনে আমি কুফায় গেলাম। ওয়ায়সের সন্ধান লাভ করা ছাড়া এ সফরের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য ছিল তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা। সেমতে আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি তখন ফোরাতের তীরে বসে দুপুরের সময় উযু করছিলেন। হারম ইবনে হাব্বান বলেন ঃ আমি শুনে আসা চিহ্নসমূহের মাধ্যমে চিনে নিলাম যে, ইনিই ওয়ায়স কারনী। গৌর বর্ণের এই লোকটি অত্যন্ত শক্ত দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ মুণ্ডিত এবং দাড়ি অত্যন্ত ঘন ছিল। দেখতে বিশ্রী ছিলেন।

আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি করমর্দন করতে অস্বীকার করলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত হোক আপনার প্রতি। আপনার কি অবস্থা হে ওয়ায়স কারনী। একথা শুনে তার দু'চোখ মহব্বতের অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। তখন তার যে অদ্ভুত অবস্থা দেখা গেল, তার কিছুটা আমি জানি। অবশেষে আমিও কাঁদলাম, তিনিও কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ হে হারম ইবনে হাব্বান, আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন—এখানে কেমন করে এলে? তোমার অবস্থা কি? আমার ঠিকানা কোথায় পেলে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার কাছে আসার পথপ্রদর্শন করেছেন।

ইবনে হাব্বান বলেন ঃ আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না যে, তিনি আমাকে কেমন করে চিনতে পারলেন! অথচ আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে না আমি কখনও তাঁকে দেখেছিলাম, না তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে কেমন করে চিনলেন এবং আমার পিতার নাম কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন ঃ

نَبَّأَنِى الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন।

তুমি জান না, আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে। আমার আত্মা তোমার আত্মাকে চিনে নিয়েছে। মুমিনগণ একে অপরকে চিনে। তারা পরস্পরের বন্ধু। আত্মাদের পারস্পরিক কথাবার্তা হয়; যদিও তাদের বাসস্থান দূরে দূরে থাকে এবং মাঝখানে বহু মনযিলের দূরত্ব থাকে। আমি বললাম ঃ কোন একটি হাদীস বর্ণনা করুন। আমি আপনার মুখ থেকে একটি হাদীস শুনতে আগ্রহী। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখিনি এবং কখনও তাঁর পবিত্র খেদমতে হাযির হতে পারিনি। তবে আমি তাঁদেরকে দেখেছি, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মুখ থেকে আমি হাদীস শুনেছি, যেমন তুমি শুনেছ। আমি নিজের উপর এর দরজা উন্মুক্ত করা ভাল মনে করি না। আমি মুহাদ্দিস, মুফতী অথবা কাযী হতে চাই না। ইবনে হাব্বান! আমি আত্মসংশোধনে এত অধিক ব্যস্ত যে, এসব বিষয়ে মানুষের সাথে ব্যাপৃত

থাকার ফুরসত নেই। অতঃপর আমি বললাম ঃ তা হলে কোরআন পাকের কোন আয়াতই পাঠ করুন আমি শুনি। আমার জন্যে দোয়া করুন এবং আমাকে উপদেশ দিন, যা আমি স্মরণ রাখব। আপনার সাথে আমার নিছক মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে। ইবনে হাব্বান বলেন ঃ এরপর তিনি উঠলেন এবং আমার হাত ধরে ফোরাতের কিনারায় পায়চারি করতে লাগলেন। এসময় বললেন ঃ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم -

অতঃপর কাঁদলেন এবং আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقنا هما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون

অর্থাৎ, আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এতদুভয়কে সৎ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

এ আয়াতটি তিনি انه هو العزيز الرحيم পর্যন্ত পাঠ করে এত জোরে চীৎকার করে উঠলেন যে, আমার মনে হল তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ হে ইবনে হাব্বান, তোমার পিতা মারা গেছেন। অতি সত্বর তুমিও মরবে। অতঃপর জান্নাতে অথবা দোযখে যাবে। শুরু থেকে দেখ, আদম ও হাওয়ার ওফাত হয়েছে। এরপর নূহ (আঃ)-এর মিলন হয়েছে। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর ইন্তেকাল হয়েছে। মূসা (আঃ) বিদায় নিয়েছেন এবং দাঊদ (আঃ) পরলোকগমন করেছেন। এরপর আসমান ও যমীন সৃষ্টির মূল কারণ, রাব্বুল আলামীনের প্রিয়জন, শাফিউল মুযনিবীন মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঊর্ধ্ব জগতের অধিপতি হয়েছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) উপরের ফেরদাউসে আস্তানা গেড়েছেন। এরপর আমার ভাই ও বন্ধু হযরত উমর

(রাঃ)-ও তাঁর পশ্চাদগমন করেছেন। একথা বলে তিনি 'হায় উমর', 'হায় উমর' বলে কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! হযরত উমর তো এখনও জীবিত আছেন—মারা যাননি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওফাতের সংবাদ আমাকে দিয়েছেন এবং আমার ওফাতের খবরও দিয়েছেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি ও তুমিও যেন মৃতদের মধ্যেই রয়েছি। এরপর হযরতের বিদেহী আত্মার প্রতি দুরূদ পাঠ করে নীরবে অনেক দোয়া করলেন।

এরপর হযরত ওয়ায়স কারনী বললেন ঃ ইবনে হাব্বান! আমার উপদেশ এই যে, আল্লাহর কিতাব ও সৎকর্মপরায়ণদের পদ্ধতিকে নিজের কর্মপদ্ধতি রাখবে। আমার ও তোমার মৃত্যুর খবর আমি পেয়ে গেছি, মৃত্যুকে সদা-সর্বদা স্মরণ রাখবে এবং এক মুহূর্তও গাফেল হবে না। যখন নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করবে, উপদেশ দেবে এবং সমস্ত উম্মতের শুভ কামনা করবে। যদি দল থেকে অর্ধ হাত পরিমাণে আলাদা হয়ে যাও, তবে ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে যাবে অথচ টেরও পাবে না। পরিণামে দোযখে পতিত হবে। নিজের জন্যে এবং আমার জন্যে দোয়া করবে। এরপর তিনি বললেন ঃ ইলাহী, এ ব্যক্তি নিজ জানা মতে আমাকে তোমার জন্যে ভালবাসে এবং তোমার জন্যেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। জান্নাতেও তার মুখমণ্ডল আমাকে দেখাবে এবং দারুস-সালামে তাকে আমার কাছে পাঠাবে। সে যতদিন জীবিত থাকে, তার প্রাণ ও ধন-সম্পদের দেখাশুনা করো এবং সামান্য দুনিয়া নিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার তৌফিক তাকে দান করো। আমার পক্ষ থেকেও তাকে প্রতিদান দিও। এরপর বললেন ঃ হে হারম ইবনে হাব্বান, এখন তোমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর আর কখনও আমার কাছে আসবে না। আমি খ্যাতি অপছন্দ করি। নির্জনতা আমার ভাল লাগে। আমি অন্তর দ্বারা তোমার কাছে আছি যদিও দেখতে দূরে। অতএব তালাশ করার প্রয়োজন নেই। আমাকে স্মরণ করে আমার জন্যে দোয়া করবে। আমিও ইনশাআল্লাহ্ তাই করব। এখন আমি এদিকে যাচ্ছি। তুমি ওদিকে যাও। আমি কিছুদূর তার

সাথে চলতে চাইলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না এবং আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি তাঁর অবস্থা কতভাবে জানতে চেয়েছি; কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। আল্লাহ তাঁর মাগফেরাত করুন। এ ছিল আখেরাতের লোকদের অবস্থা।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল, আকাশের নিচে ও যমীনের উপরে যা কিছু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেসব বস্তু আল্লাহর জন্যে, সেগুলো ছাড়া বাকী সবই দুনিয়া। দুনিয়া আখেরাতের বিপরীত। যে বস্তু দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য তাই আখেরাত। সুতরাং দুনিয়ার যেটুকু দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের শক্তি অর্জিত হয়, সে পরিমাণ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। এ বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো যাক। উদাহরণতঃ কোন হাজী হজ্জের পথে কসম খেল যে, সে হজ্জ ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হবে না। এরপর সে হজ্জের পথে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের হেফাযত করল, সওয়ারীকে ঘাস-পানি খাওয়াল অথবা আসবাবপত্রের থলে সেলাই করল। এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। তাকে হজ্জের মধ্যেই মশগুল বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে মানুষের দেহও আত্মার সওয়ারী, যা দ্বারা সে জীবনের দূরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাং এলম ও আমলের শক্তি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দেহের যত্ন নেয়া দুনিয়ার মধ্যে নয়; বরং আখেরাতের মধ্যে গণ্য হবে। অবশ্য যদি যত্ন নেয়া দেহের আনন্দ ও বিলাসের জন্যে হয়, তবে তা হবে বৈরী কাজ। এতে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। তানানেসী (রহঃ) বলেন ঃ আমি কা'বা মসজিদের বনী শায়বা দরজায় সাতদিন পর্যন্ত উপবাস করলাম। অষ্টম রাত্রিতে আমি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম—যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত দুনিয়া গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তশ্চক্ষুকে অন্ধ করে দেবেন। "মানুষের জন্যে দুনিয়ার অবস্থা" শীর্ষক এই বর্ণনা সম্পর্কে খুব চিন্তা কর। ইনশাআল্লাহ হেদায়াত পাবে।

যে সব কারণে মানুষ নিজেকে ও স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়েছে ঃ প্রকাশ থাকে যে, বাইরে বিদ্যমান বস্তুসমূহকে সাধারণত দুনিয়া বলে ব্যক্ত করা

হয়। এগুলো হচ্ছে পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরিস্থিত বস্তুসমূহ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, পৃথিবীর সবকিছুকে আমি পৃথিবীর সাজসজ্জা করেছি; যাতে মানুষকে পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার আমল উত্তম।

পৃথিবী তো মানুষের শয্যা, বাসস্থান ও অবস্থানস্থল। তার উপরিস্থিত বস্তুসমূহ পানাহার, বস্ত্র ও সংসর্গে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের বস্তুসমূহ তিন প্রকার—খনিজ, উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজ। উদ্ভিদ খাদ্য ও ঔষধের জন্যে কাম্য। খনিজ পদার্থ যন্ত্রপাতি ও পাত্র নির্মাণে ব্যবহৃত। প্রাণীজ দু'প্রকার—মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু। চতুষ্পদ জন্তুকে মাংস, বোঝা বহন ও সাজসজ্জার জন্যে রাখা হয়। মানুষ দ্বারা কখনও সেবা নেয়া উদ্দেশ্য হয়। যেমন, গোলাম ও বাঁদী দ্বারা নেয়া হয়। কখনও সঙ্গম উদ্দেশ্য হয়; যেমন নারীদের মধ্যে স্ত্রী ও বাঁদীদের সাথে করা হয়। আবার কখনও সম্মান ও তাযীম পাওয়ার জন্যে অন্তরসমূহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা লক্ষ্য হয়। একে বলা হয় "জাহ" তথা মানুষের মনের মালিক হওয়া।

অতএব, এ সকল বস্তুকে বলা হয় দুনিয়া। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে এগুলোকে একত্রে উল্লেখ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ -

অর্থাৎ সুসজ্জিত করা হয়েছে মানুষের জন্যে নারী ও সন্তান-সন্ততির মোহ।

এগুলো মানুষ সম্পর্কিত।

وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অর্থাৎ, সঞ্চিত স্বর্ণরৌপ্যের মোহ।

এগুলো খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত। এতে মোতি, এয়াকূত ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ

অর্থাৎ, চিহ্নিত অশ্ব ও গবাদি পশুর মোহ।

এগুলো প্রাণীজ সম্পর্কিত। وَالْحَرْثِ এবং ক্ষেত্র-খামারের মোহ। এগুলো উদ্ভিদ সম্পর্কিত।

কিন্তু মানুষের সাথে ভূ-পৃষ্ঠের এসকল বস্তুর সম্পর্ক দু'টি। একটি তার অন্তরের সাথে এবং অপরটি দেহের সাথে। অন্তরের সাথে সম্পর্ক হল, মানুষের অন্তরে এসব বস্তুর মহব্বত। ফলে সে এগুলোর হেফাযত করে এবং এগুলোর প্রতি সর্বশক্তি নিয়োজিত করে; যেন সে দুনিয়ার দাস। এ সম্পর্কের মধ্যে দুনিয়ার সাথে জড়িত অন্তরের সকল গুণাগুণ অন্তর্ভুক্ত। যেমন, অহংকার, দ্বেষ, হিংসা, রিয়া, সুখ্যাতি, কুধারণা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি। এ সম্পর্ককে বাতেনী দুনিয়া বলা হয়। আর যাহেরী দুনিয়া হচ্ছে উল্লিখিত বস্তুসমূহ। দেহের সাথে সম্পর্ক হল দেহ এসব বস্তুকে ঠিকঠাক রাখার কাজে দেহের নিয়োজিত হওয়া, যাতে এগুলো নিজের এবং অপরের আনন্দ লাভের যোগ্য হয়ে যায়। এ সম্পর্কের মধ্যে যাবতীয় পেশা ও কারিগরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে মানুষ দিবারাত্র মশগুল ও নিমজ্জিত।

উপরোক্ত দু'টি সম্পর্কের কারণে মানুষ না নিজের খবর রাখে, না দুনিয়াতে তার পরিণাম ও সূচনা সম্পর্কে কোন চিন্তা করে। যদি সে নিজেকে এবং নিজের পালনকর্তাকে চিনত এবং দুনিয়ার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করত, তবে নিশ্চিতরূপেই জানতে পারত যে, দুনিয়ার বস্তুসমূহ অর্থাৎ, যাহেরী বা বাহ্যিক দুনিয়া সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, যে সওয়ারীতে বসে আল্লাহ তা'আলার কাছে যেতে হবে, তার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করা। এখানে সওয়ারী অর্থ মানবদেহ। পানাহার, বাসস্থান ও বস্ত্র ব্যতীত এ দেহ টিকে থাকতে পারে না। হজ্জের পথে উট যদি দানাপানি ও বিশ্রাম না পায়, তবে সে জীবিত থাকতে পারে না। যে মানুষ দুনিয়াতে নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, সে সেই হজ্জযাত্রীর মত, যে মনযিলে অবস্থান করে কেবল

উটের ঘাস-পানি, সাজসজ্জা ও খেদমতের কাজে মশগুল থাকে। কোন জায়গা থেকে ঘাস আনে আর কোন জায়গা থেকে ঠাণ্ডা পানি সংগ্রহ করে। এমনি চিন্তায় ব্যাপৃত থাকার কারণে সে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সে জানেও না যে, এরূপ করলে হজ্জ তো যাবেই, তৎসঙ্গে উটসহ সে নিজেও কীটপতঙ্গ ও পোকা-মাকড়ের খোরাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিচক্ষণ হাজীর অন্তর কা'বাগৃহ ও হজ্জের মধ্যে ব্যাপৃত থাকবে এবং সওয়ারীর সেবাযত্ন প্রয়োজন পরিমাণে করবে, যাতে তার চলার ক্ষমতা বহাল থাকে।

অনুরূপভাবে আখেরাতের সফরে যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, সে দেহের জরুরী খেদমত কর; যেমন কেউ প্রয়োজনের সময় পায়খানায় যেয়ে বসে। আহার্য গ্রহণ করা এবং তাকে মলদ্বার দিয়ে বের করায় কোন তফাৎ নেই। উভয় কাজ প্রয়োজনের জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং পায়খানার কাজে যেমন মানুষ প্রয়োজন পরিমাণেই ব্যাপৃত হয়, তেমনি উদরপূর্তির কাজেও প্রয়োজন অনুযায়ী মশগুল থাকা দরকার। যে বস্তুটি মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে অধিকতর ফিরিয়ে রাখে, সেটি হচ্ছে উদর। এর কারণেই মানুষ দুনিয়া ও তার রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার ফলেই সীমাহীন কর্মব্যস্ততা প্রয়োজন এবং এসব কর্মব্যস্ততায় পেরেশান হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য ভুলে যায়।

আমরা এখানে দুনিয়ার কাজকর্মের বিবরণ এবং তৎপ্রতি মানুষের প্রয়োজন বিশদভাবে বর্ণনা করব, যাতে জানা যায় যে, দুনিয়ার কাজকর্মের কারণে মানুষ আল্লাহর দিক থেকে কিভাবে গাফেল হয়ে যায় এবং নিজের পরিণতি কিভাবে বিস্মৃত হয়ে থাকে?

দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত রয়েছে। এসব বৃত্তির প্রাচুর্যের কারণ এই যে, মানুষ তিনটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। অন্ন জীবন ধারণের জন্যে, বস্ত্র শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং বাসস্থান উত্তাপ ও শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং পরিবার-পরিজন ও জান-মালের হেফাযতের জন্যেও প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান এরূপ করে সৃষ্টি করেননি যে, তাতে মানুষের কর্ম ও নৈপুণ্যের কোন দখল থাকবে না। অবশ্য চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের জন্যে এরূপ করেছেন। উদাহরণতঃ পশুখাদ্য ঘাস রান্না করে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে পশুদের

দেহের লোম পোশাকসদৃশ হওয়ার কারণে তাদের আলাদা পোশাকের প্রয়োজন নেই। তাদের মাংসই এমনভাবে গঠিত যাতে উত্তাপ ও শৈত্য প্রভাব বিস্তার করে না। তারা বনে জঙ্গলে থাকতে পারে। তাই বাসস্থানেরও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এজন্যে প্রাথমিক স্তরে এবং মূলত পাঁচটি শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কৃষি, পশুচারণ, শিকার, বুনন ও নির্মাণ। অতএব, কৃষক শস্য উৎপাদন করে। রাখাল গবাদি পশুর দেখাশুনা করে এগুলো থেকে বাচ্চা গ্রহণ করে। শিকারী এমন বস্তু সংগ্রহ করে, যার সৃষ্টিতে মানবকর্মের কোন দখল নেই— আপনা থেকে উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করার জন্যে অনেক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজন হয়। অতঃপর প্রত্যেক বিদ্যার জন্যে যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার দরকার হয়, যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতি, বুনন যন্ত্রপাতি এবং গৃহ নির্মাণ যন্ত্রপাতি। শিকারের যন্ত্রপাতি কাষ্ঠ নির্মিত, লৌহনির্মিত, অথবা জন্তু-জানোয়ারের চর্মনির্মিত হয়ে থাকে। এতে আরও তিন প্রকার কারিগর প্রয়োজন হয়— কাঠমিস্ত্রী, কামার ও চামড়া শিল্পী। কাঠমিস্ত্রী সেই, যে আমাদের উদ্দেশ্যে কাঠের কাজ করে। কামার সেই ব্যক্তি, যে খনিজ পদার্থের কাজ করে— লোহার কাজ করুক অথবা স্বর্ণের। চামড়া শিল্পীও সেই ব্যক্তি, যে চামড়ার ও জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গ ও অংশের কাজ করে। সুতরাং এগুলো হচ্ছে মৌলিক কারিগরি।

এরপর মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একা থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধতার মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, তার মত অন্য মানুষ তার কাছে থাকতে হবে। দু'কারণে সমাজবদ্ধতার প্রয়োজন। প্রথমত, মানবজাতির অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্যে। নারী ও পুরুষের একত্রে থাকা ছাড়া এটা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, একে অপরকে খাদ্য ও পোশাক তৈরীতে এবং সন্তান-সন্ততির লালন-পালনে সাহায্য করার জন্যে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একাকী কৃষি কাজ করতে পারে না। কারণ, কৃষিকাজের জন্যে যন্ত্রপাতি দরকার। যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্যে কাঠমিস্ত্রী, কামার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। খাদ্যের জন্যে আটা পিষ্টকারী, রন্ধনকারী আবশ্যক। সারকথা, মানুষের একাকী বসবাস করা কঠিন।

সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার জন্যে সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণ করে এক একটি পরিবার তাদের সাজ-সরঞ্জামসহ আলাদা আলাদা থাকা জরুরী, যাতে

বাহ্যিক যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয় এবং চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকেও হেফাযতে থাকা যায়। এসব কারণেই শহর ও নগরসমূহের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। লোকজন যখন শহরে একত্রে বসবাস করে এবং পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তখন পারস্পরিক কলহ-বিবাদও সৃষ্টি হয়। যদি তাদেরকে কলহের ভেতর ছেড়ে দেয়া হয়, তবে লড়াই করে করে ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব কারণে অনেক শিল্পের উদ্ভব হয়। প্রথমত, জরিপ শাস্ত্র। এর দ্বারা ভূমির পরিমাণ জানা যায় এবং কলহ দেখা দিলে সঠিকভাবে সমান বন্টন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত, সামরিক বিদ্যা, যাতে তরবারির জোরে চোর-ডাকাতের কবল থেকে নগরের হেফাযত করা যায়। তৃতীয়ত, পঞ্চায়েত ও শাসনবিদ্যা, যাতে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। চতুর্থত, ফিকাহ; অর্থাৎ শরীয়তের আইন, যা দ্বারা মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম থাকে এবং পারস্পরিক লেন-দেনে সীমা লংঘন না হয়। এসবের প্রত্যেকটির জন্যে নির্দিষ্ট গুণের অধিকারী লোকের প্রয়োজন।

এখন দেখা দরকার, শুরুতে কেবল অন্ন , বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু পরিণামে কত ঝামেলা দেখা দিয়েছে। দুনিয়ার সব কাজ-কারবারের অবস্থা তাই। এক কাজ শুরু করলে দশ কাজ সামনে এসে হাযির হয়। এরপর সীমাহীন কাজ আসতেই থাকে। দুনিয়া যেন একটি তলাহীন দোযখ। মানুষ যখন এর এক গর্তে পতিত হয়, তখন সেখান থেকে অন্য গর্তে পিছলে পড়ে। মানুষের চারপাশে কেবল কাজই কাজ। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই তার সব কাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে সে নিজেকে এবং নিজের পরিণতিকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততার কারণে তাদের চক্ষু উন্মোচিত হয় না। খাদ্য অন্বেষণের চেষ্টা করাই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য। যারা কৃষি ও কারিগরি কাজে লিপ্ত, তারা দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি পায় না এবং ধর্ম-কর্মে মনোযোগ দেয় না। রাতের খাদ্যের জন্যে সারাদিন পরিশ্রম করে এবং রাতে দিনের বেলার পরিশ্রম করার জন্যে খাদ্য গ্রহণ করে। তারা আমৃত্যু এমনিভাবে কলুর বলদের মত নির্দিষ্ট কাজ করে যায়।

কিছু লোকের ধারণা, শরীয়তের উদ্দেশ্য কাজকর্ম করেই ক্ষান্ত থাকা

এবং জীবনের আনন্দ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকা নয়; বরং উদরের খাহেশ ও যৌন বাসনা পূর্ণ করাই সৌভাগ্য। ফলে, তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে নারী সম্ভোগে ও সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা এগুলোকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে নিয়েছে।

অন্য এক দল মানুষ মনে করেছে, অর্থ-সম্পদ ও ধন-ভাণ্ডারের প্রাচুর্যই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। ফলে, তারা রাতদিন কেবল অর্থ সংগ্রহের চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। এজন্যে কঠোর পরিশ্রম করে এবং দূর-দূরান্তের সফর করে। প্রয়োজন ছাড়া কার্পণ্যবশত অর্থ ব্যয় করে না। আশি ও নিরানব্বইয়ের চক্করে পড়ে থাকে। মৃত্যুর পর তাদের উপার্জন হয় ভূ-গর্ভেই থেকে যায়, না হয় কোন "খাদক" ব্যক্তির হাতে পড়ে যায়। সে তো বিলাসিতা করে; কিন্তু যে পাই পাই করে সঞ্চয় করেছিল, সে বিপদ ও শাস্তিতে গ্রেফতার থাকে। অন্য সঞ্চয়কারীরা এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ করে না।

কিছু লোক ধারণা করে, সৌভাগ্য সুখ্যাতির মধ্যে সীমিত। মানুষ তাদের সুবেশ ও ভদ্রতার প্রশংসা করুক, তারা তাই চায়। ফলে, তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার সামান্য অংশ পানাহারে ব্যয় করে। অবশিষ্ট সকল সম্পদ পোশাক ও চিত্তাকর্ষক যানবাহনে ব্যয় করে। ঘরের দরজা এবং অন্যান্য যে সব জায়গায় মানুষের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলোকে কারুকার্য খচিত ও সুসজ্জিত করে রাখে, যাতে মানুষ তাদেরকে বিত্তশালী মনে করে।

আরও কিছু সংখ্যক লোক মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও সম্মানিত হওয়াকেই সৌভাগ্য মনে করে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাতে মানুষ তাদের আনুগত্য করে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং সরকারী দায়িত্ব পেলে প্রচুর আহলাদিত হয়। অধিকাংশ গাফেল লোকের মাঝে এই মনোভাব বিদ্যমান। জনগণের আনুগত্যের মহব্বতে তারা আল্লাহর আনুগত্য, এবাদত ও আখেরাতের চিন্তা বিসর্জন দেয়।

এসব দল ছাড়া আরও সত্তরেরও অধিক দল রয়েছে, যারা নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার কাজে লিপ্ত। এটা কেবল এ কারণে যে, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনে তারা ভুলে গেছে, এগুলো কি কারণে প্রয়োজন এবং এগুলোর কি পরিমাণ যথেষ্ট? অতএব, যে ব্যক্তি এই কারণ ও পরিমাণ জানবে, সে একথাও

জানবে যে, তার কাজ ও ব্যবসায়ের অংশ শুধু তার দেহের দেখাশুনা করা। সে যদি এই অংশও হ্রাস করে, তবে তার সকল কর্মব্যস্ততা দূর হয়ে যাবে এবং সে পূর্ণ অবসরে থেকে কায়মনোবাক্যে আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে।

এপর্যন্ত সে সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হল, যারা দুনিয়ার কাজ-কারবারে নিমজ্জিত থাকে। এখন শুনা দরকার যে, কিছু লোক এর বিপরীতে দুনিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতে বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান তাদের মনে নানাবিধ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ তাদের কেউ কেউ মনে করে, দুনিয়া পরিশ্রম ও বিপদাপদের জায়গা এবং আখেরাত সৌভাগ্যের আবাসস্থল। যে আখেরাতে পৌঁছে, সে সৌভাগ্যে প্রবেশ করে—এবাদত করুক বা না করুক। এতে তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, পার্থিব শ্রম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়া উত্তম (হিন্দু যোগীদের মধ্যে একদলের তাই বিশ্বাস)। তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মা হুতি দেয়। তারা মনে করে, এভাবে পার্থিব শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যাবে।

কেউ কেউ মনে করে, আত্মহত্যা করে মুক্তি পাওয়া যায় না। বরং প্রথমে মানবীয় গুণসমূহ বিলুপ্ত করতে হবে এবং কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে হবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। ফলে, কিছু সংখ্যক তো সাধনার সময়ই মারা যায় এবং কিছুসংখ্যক উন্মাদ ও বদ্ধপাগল হয়ে যায়। কেউ কেউ সিদ্ধি লাভে অক্ষম হয়ে শরীয়তের উপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

এগুলো ছাড়া আরও অনেক বাতিল মতবাদ ও পথভ্রষ্টতা প্রচলিত রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা সত্তরের কিছু বেশী। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একটি দল মুক্তি পাবে। এই দলটিতে তারাই রয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের তরীকা অনুসরণ করে। অর্থাৎ, যাদের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়া সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়; বরং দুনিয়া থেকে পাথেয় পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত এবং খাহেশের মূলোৎপাটন ততটুকুই করা দরকার, যতটুকু শরীয়তের নির্দেশ।

নবম অধ্যায়

কৃপণতার নিন্দা ও ধন-সম্পদের মহব্বত

দুনিয়ার ফেতনা ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু সবচাইতে বড় ফেতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। এর মধ্যে দুঃখ-কষ্টও বেশী। অনিষ্টের বেশীর ভাগ কারণ এই যে, ধন-সম্পদ থেকে কেউ বেপরওয়া নয় এবং নিরাপত্তারও কোন উপায় নেই। ধন-সম্পদ না থাকলে যে দারিদ্র্য আসে, তা মানুষকে কুফরের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। অপরপক্ষে ধন-সম্পদ থাকলে তা অবাধ্যতার কারণ হয়ে যায়, যার পরিণাম ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। মোটকথা, ধন-সম্পদ উপকার ও ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। এর উপকারগুলো উদ্ধারকারী এবং অপকারগুলো ধ্বংসকারী। কোন্ ধন-সম্পদ উত্তম এবং কোন্গুলো মন্দ, তা চেনা সুকঠিন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না। তাই পৃথকভাবে এটিকে বর্ণনা করা নেহায়েত জরুরী।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে সাধারণ দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, ধন-সম্পদের দিক দিয়ে নয়। কেননা, দুনিয়া বলা হয় মানুষের জীবনের অনেকগুলো অংশকে। তন্মধ্যে ধন-সম্পদও একটি অংশ। এ অধ্যায়ে আমরা কেবল ধন-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করব। কারণ, এতে বিপদাপদ ও ক্ষতি অনেক বেশী। ধন-সম্পদের অভাবে মানুষ দারিদ্র্যের বিশেষণে বিশেষিত হয় এবং এর উপস্থিতিতে ধনাঢ্যতার বিশেষণ এসে যায়। এই উভয় বিশেষণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তির দুই অবস্থা— অল্পে তুষ্টি ও লোভ। প্রথম অবস্থাটি প্রশংসনীয় এবং দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়। লোভীরও দুই অবস্থা। এক, মানুষের ধন-সম্পদে লোভ করা এবং দুই, অপরের ধন-সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে কারিগরি ও পেশায় তৎপর হওয়া। উভয় অবস্থার মধ্যে অপরের ধন-সম্পদে লোভ করা মস্তবড় বিপদ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরও দুই অবস্থা—অপব্যয় ও

মিতব্যয়িতা। তন্মধ্যে উত্তম মিতব্যয়িতা। এসব বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিধায় এগুলো বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী।

নিম্নে আমরা চৌদ্দটি বর্ণনায় এর বিশ্লেষণ পেশ করছি।

ধন-সম্পদের নিন্দা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল না করে দেয়। যারা তা করে অর্থাৎ গাফেল হয়ে যায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ -

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো অনিষ্টকারী বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ

অর্থাৎ, মানুষ নিজেকে ধনাঢ্য দেখে বলেই ঔদ্ধত্য করে।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

অর্থাৎ, প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে।

হাদীসে বলা হয়েছে— ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের মহব্বত অন্তরে নিফাক (কপটতা) সৃষ্টি করে। যেমন পানি দ্বারা শাক উৎপন্ন হয়। আরও বলা হয়েছে— যদি ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তারা এতটুকু ক্ষতি করবে না, যতটুকু ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের মহব্বত মুসলমানের ধর্মের ক্ষতি করে। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দুষ্ট কারা? তিনি বললেন ঃ ধনাঢ্যরা। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— তোমাদের পরে সত্বরই এমন লোক হবে, যারা মিহিন ও রকমারি খাদ্য খাবে, উৎকৃষ্ট ও

দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হবে, সুন্দরী ও সুগঠিত নারীদেরকে বিয়ে করবে, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, সামান্য বস্তুতে তাদের উদরপূর্তি হবে না এবং অনেক পেয়েও তুষ্ট হবে না। তারা দুনিয়ারই সেবাদাস হয়ে থাকবে। সকাল-সন্ধ্যায় দুনিয়াই দৃষ্টিতে থাকবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত দুনিয়াকেই উপাস্য ও প্রতিপালক জ্ঞান করবে। তোমাদের মধ্যে অথবা তোমাদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে যে কেউ সেই যুগে থাকে, তাকে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্র পক্ষ থেকে কসম, সে যেন এরূপ লোকদের সালাম না করে, তাদের রোগীদেরকে দেখতে না যায়, তাদের জানাযায় যোগদান না করে এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে। যে এরূপ করবে, সে ইসলামের ভিত ভূমিসাৎ করার কাজে উদ্যোক্তা ও সাহায্যকারী হবে।

আরও বলা হয়েছে— দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্যে ছেড়ে দাও। কেননা, যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় দুনিয়া অর্জন করবে, সে নিজের মৃত্যু অর্জন করবে অথচ, টেরও পাবে না। এক হাদীসে আছে—

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَّالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْلَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ

অর্থাৎ, আদম সন্তান বলে ঃ আমার ধন, আমার ধন! অথচ তোমার ধন তাই, যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করেছ অথবা পরে ছিন্ন করে দিয়েছ অথবা দান করে হস্তান্তর করেছ। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি মৃত্যু চাই না। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কি কিছু ধন-সম্পদ আছে? সে বলল ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার এই ধন-সম্পদ আখেরাতের জন্য ব্যয় করে ফেল। কেননা, ঈমানদারের অন্তর তার ধন-সম্পদের সাথে থাকে। আখেরাতের জন্যে দিয়ে দিলে সে নিজেও তার ধন-সম্পদের সাথে মিলিত হতে চাইবে। আর যদি ধন-সম্পদ পেছনে রেখে যায়, তবে সে-ও তার সাথে দুনিয়াতে থাকতে চাইবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মানুষের বন্ধু তিনটি। তন্মধ্যে এক বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত সাথে থাকে। দ্বিতীয় কবর পর্যন্ত এবং তৃতীয় কিয়ামত পর্যন্ত সাথে থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে ধন-সম্পদ। কবর পর্যন্ত পরিবারের লোকজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে তার আমলসমূহ।

একবার সহচররা হযরত ঈসা(আঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি পানির উপর দিয়ে চলেন অথচ আমাদের দ্বারা তা হয় না—এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে দীনার ও আশরফীর কোন মূল্য আছে কি? তারা জওয়াব দিল ঃ হাঁ, আমরা এগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এতদুভয় বস্তু এবং মাটির ঢিলা সমান।

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হযরত আবু দারদার কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন—প্রিয় ভাই, এতটা দুনিয়া সঞ্চয় করো না, যার শুকরিয়া তুমি আদায় করতে পার না। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—যে ধনী ব্যক্তি তার ধন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করবে, কিয়ামতে তাকে ধনসহ উপস্থিত করা হবে। সে যখন পুলসিরাতের এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়বে, তখন তার ধন বলবে, চলতে থাক। তুমি তো আমার মধ্য থেকে আল্লাহর হক দিয়ে দিয়েছ। এরপর এমন ধনী ব্যক্তি পুলসিরাতে আসবে, যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ধন ব্যয় করেনি। তার ধন তার কাঁধে চাপানো থাকবে। যখন সে পুলসিরাতে হেলতে দুলতে থাকবে, তখন তার ধন বলবে, তোর জন্যে দুর্ভাগ্য! তুই আল্লাহর হক আদায় করিসনি। অবশেষে সে হায় হায় করতে থাকবে।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দারিদ্র্যের অধ্যায়ে আমরা ধনাঢ্যতার নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছি। সেগুলোর সারমর্মও ধন-সম্পদের নিন্দা। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দুনিয়ার নিন্দায় যা বর্ণিত হয়েছে, তাও ধন-সম্পদের নিন্দারই অন্তর্ভুক্ত। এ অধ্যায়টি বিশেষভাবে ধন-সম্পর্কিত। সেমতে হাদীসে আছে—

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ

অর্থাৎ, যখন বান্দা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন ফেরেশতারা বলে ঃ সে আগে কি পাঠিয়েছে? আর মানুষ বলে ঃ সে পেছনে কি রেখে গেল?

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তিনি

বললেন ঃ ইলাহী, যে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাকে সুস্থ ও মুক্ত রাখ। তার আয়ু বৃদ্ধি কর এবং তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান কর। এখানে দেখা উচিত যে, দৈহিক সুস্থতা ও আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে অত্যধিক পরীক্ষা মনে করা হয়েছে। কেননা, এতে অবাধ্যতা অবশ্যই হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) একবার হাতের তালুতে একটি দেরহাম রেখে বললেন ঃ তুই এমন বস্তু যে, আমার কাছ থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত আমার কোন কাজেই লাগবি না।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশের খেদমতে কিছু অর্থ পাঠান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই অর্থ কিসের? লোকেরা বলল ঃ খলীফা হযরত উমর আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা উমরকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি একটি পর্দা খুলে সেটাকে টুকরা টুকরা করে থলে সেলাই করলেন এবং সমস্ত অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও এতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, এ বছরের পর যেন আমার কাছে উমরের দান না আসে। তাই হল। পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইন্তেকাল করলেন।

হযরত হাসান বলেন ঃ অর্থ-কড়ি যাকে সম্মান দান করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করেন।

বর্ণিত আছে, যখন প্রথম প্রথম আশরফী তৈরী হল, তখন ইবলীস তাকে নিজের মাথায় রাখল, অতঃপর চুম্বন করে বলল ঃ যে তোমাকে মহব্বত করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার গোলাম হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ টাকা-পয়সা একটি বিচ্ছু। যে এর মন্ত্র জানে না, সে যেন এটা গ্রহণ না করে। কেননা, দংশন করলে এর বিষক্রিয়ায় প্রাণ নাশ হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এর মন্ত্র কি? তিনি বললেন ঃ হালাল পথে উপার্জন করা এবং সৎপথে ব্যয় করা।

মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেদমতে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে গমন করে বলেন ঃ আপনি এমন কাজ করেছেন, যা এর পূর্বে কেউ করেনি। আপনি নিজের সন্তানদের জন্যে কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননি। তিনি বললেন ঃ আমি তাদের কোন হক দাবিয়ে

রাখিনি এবং অন্যের হকও তাদেরকে দেইনি। এছাড়া আমার সন্তানরা দু'রকমের হতে পারে। তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল হবে অথবা নাফরমান। যদি আনুগত্যশীল হয়, তবে তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ, তিনি সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবক।

আর যদি তারা গোনাহগার ও নাফরমান হয়, তবে তাদের জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই; যা হবার তাই হবে।

একবার মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী অনেক ধন-সম্পদ লাভ করেন। লোকেরা বলল ঃ এই বিপুল ধন-সম্পদ আপনার পুত্রের জন্যে রেখে দিলে ভাল হয়। তিনি বললেন ঃ না; বরং এই ধন-সম্পদ নিজের জন্যে আল্লাহর কাছে জমা রাখব এবং আল্লাহকে আমার পুত্রের জন্যে ছেড়ে যাব।

ধন-সম্পদের সংজ্ঞা এবং তার প্রশংসা ও নিন্দা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদে ধন-সম্পদকে কয়েক জায়গায় "খায়র" (কল্যাণ) শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এরশাদ হয়েছে إِنْ تَرَكَ خَيْرًا .. الخ — যদি খায়র অর্থাৎ ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়।

ধন-সম্পদের প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ

সৎলোকের জন্যে সৎ ধন-সম্পদ কতই না চমৎকার!

এছাড়া দান-খয়রাত ও হজ্জের যে সওয়াব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও ধন-সম্পদেরই প্রশংসা। কেননা, ধন-সম্পদ ছাড়া হজ্জও হতে পারে না, দান-খয়রাতও হতে পারে না। কোরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বান্দার প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا

অর্থাৎ, এবং তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা

বাড়িয়ে দেন এবং তৈরী করেন তোমাদের জন্যে বাগ-বাগিচা এবং তৈরী করেন নদ-নদী।

এক হাদীসে আছে— كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফর হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এটাও ধন-সম্পদেরই প্রশংসা।

আবার অন্যত্র অনেক জায়গায় ধন-সম্পদের নিন্দাও করা হয়েছে। এই প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে সমন্বয় বুঝা যাবে না, যে পর্যন্ত ধন-সম্পদের রহস্য, উদ্দেশ্য, বিপদাপদ ও প্রয়োজন জানা না যায়। এ বিষয়টিই জানলে বুঝা যায়, ধন-সম্পদ এক কারণে উত্তম এবং এক কারণে নিকৃষ্ট। উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে প্রশংসনীয় এবং নিকৃষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে নিন্দনীয়। কেননা, ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই কল্যাণ নয় এবং সম্পূর্ণই অকল্যাণ নয়। বরং এটা কল্যাণ ও অনিষ্ট উভয়ের কারণ। যে বস্তু উভয়ের কারণ হবে, তার কখনও প্রশংসা এবং কখনও নিন্দা করা হবে।

জ্ঞানী ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতের সৌভাগ্য। বাস্তবেও তা অক্ষয় সম্পদ ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ এর জন্যেই আগ্রহী। সেমতে হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন— সর্বাধিক মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তিনি বললেন ঃ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَّاَشَدُّهُمْ لَهٗ اِسْتِعْدَادًا

অর্থাৎ, যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্যে অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তিনটি ওসীলা ছাড়া দুনিয়াতে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। এক, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন এলম ও সচ্চরিত্রতা। দুই, দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন সুস্বাস্থ্য। তিন, বাইরের শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

মোটকথা, অর্থ-সম্পদও বাইরের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অন্যতম। এর মধ্যে নিম্নতম হচ্ছে আশরফী, টাকা। এগুলো খাদেম। এদের খাদেম কেউ নেই। অন্য বস্তুর কারণে এগুলো কামনা করা হয়। স্বয়ং এগুলোর সত্তা উদ্দেশ্য নয়।

সারকথা, ধন-সম্পদ অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় হয়ে থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য ভাল হলে ধন-সম্পদও ভাল হবে। এতে জানা গেল, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া গ্রহণ করে, সে যেন জেনে-শুনে নিজের মৃত্যুকে গ্রহণ করে। এ কারণেই পয়গম্বরগণ এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হাদীসে আছে—

اللهم اجعل قوت ال محمد كفافا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ পরিবারের রুযী এই পরিমাণে নির্ধারণ কর, যাতে তাদের চলে যায়।

আরও বলা হয়েছে—

اللهم احينى مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।

ধন-সম্পদের বিপদাপদ ও উপকারিতা ঃ প্রকাশ থাকে যে, ধন-সম্পদের ভেতরে সাপের বিষও আছে এবং বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী গুণও আছে। বিষের প্রতিক্রিয়া বিনাশকারী গুণ হচ্ছে তার উপকারিতা। যে ব্যক্তি উপকারিতা ও বিপদাপদ উভয়টি জানে, তার পক্ষে ধন-সম্পদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং কল্যাণপ্রার্থী হওয়া সম্ভব।

ধন-সম্পদের পার্থিব উপকারিতা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এর উপকারিতা সুবিদিত। যদি তারা এতে উপকারিতা না দেখত, তবে এর অন্বেষণে প্রাণান্তকর চেষ্টা কেন করত? কিন্তু এর ধর্মীয় উপকারিতা তিন প্রকারে সীমিত।

প্রথম প্রকার হচ্ছে ধন-সম্পদকে নিজের জন্যে ব্যয় করা অথবা এবাদতে ব্যয় করা অথবা এবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্যে ব্যয় করা। এবাদতে ব্যয় করা যেমন হজ্জ কিংবা জেহাদে ব্যয় করা। কেননা, এদুটি মৌলিক এবাদত ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত

ব্যক্তি এসব এবাদতের সওয়াব পেতে পারে না। এবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্য ব্যয় করার অর্থ পোশাক, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ব্যয় করা। এতে এবাদতের শক্তি অর্জিত হয়। কেননা, এসব প্রয়োজন অর্জিত না থাকলে অন্তর ধর্মকর্মের সময় ও সুযোগ পায় না। যে বস্তু ছাড়া এবাদত সম্পন্ন হয় না, তা অর্জন করাও এবাদত। সুতরাং প্রয়োজন পরিমাণে ধন-সম্পদ অর্জন করা ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। একে বিলাসিতায় ব্যয় করা অবশ্য দুনিয়ার অংশ।

দ্বিতীয় প্রকার, যা অন্যান্য মানুষের জন্যে ব্যয় করা হয়। তা চার প্রকার— সদকা দেয়া, মানবিক কারণে দেয়া, ইয্যত রক্ষার্থে দেয়া এবং চাকর-বাকরকে পারিশ্রমিক দেয়া। সদকার সওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ প্রশমিত হয়। মানবিক কারণে ব্যয় করার অর্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের দাওয়াতে, উপঢৌকন ইত্যাদিতে ব্যয় করা। একে সদকা বলা হয় না। কারণ, সদকা তাই, যা অভাবগ্রস্তকে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও এ ধরনের ব্যয় ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষ এই ব্যয় দ্বারা অপরকে বন্ধু ও ভাই বানিয়ে নেয় এবং এতে দানশীলতার গুণ অর্জিত হয়। সুতরাং এ ধরনের ব্যয়েও অনেক সওয়াব। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

ইয্যত রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ অপরকে নিন্দা, গীবত ও শত্রুতা থেকে বিরত রাখার জন্যে ব্যয় করা। এর উপকারিতা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও এটা ধর্মীয় উপকারিতার অন্যতম। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَاوَقَىٰ بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

অর্থাৎ, মানুষ যার দ্বারা তার ইযযত রক্ষা করে, তা তার জন্যে সদকা হিসাবে লেখা হবে।

এটা সদকা হবেই না কেন? এ ব্যয়ের কারণেই গীবতকারী গীবত থেকে বিরত থাকে। শত্রুতা ও হিংসাবশত যেসব কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে, সেগুলোও এরূপ ব্যয়ের ফলে মওকুফ থাকে।

চাকর-বাকরকে পারিশ্রমিক দেয়ার অবস্থা এই যে, মানুষ তার সাজসরঞ্জাম তৈরীতে যে সকল কাজের মুখাপেক্ষী হয়, সেগুলো অনেক। এ

সকল কাজ নিজে করলে অনেক সময় বিনষ্ট হয় এবং আখেরাতের চিন্তা ও যিকর করা কঠিন হয়।

তৃতীয় প্রকার, সে ব্যয় কোন নির্দিষ্ট মানুষের জন্যে নয়; বরং তাতে ব্যাপক জনগণের উপকার হয়। যেমন, মসজিদ, পুল, সরাইখানা, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, কূপ নির্মাণ করা অথবা খয়রাতের জন্যে ভূমি ও বিষয় সম্পত্তি ওয়াকফ করা। এধরনের ব্যয় দ্বারা মৃত্যুর পরও সওয়াব হয় এবং যে ব্যয় করে, তার জন্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দোয়া হতে থাকে। সুতরাং এর চেয়ে অধিক কল্যাণকর কাজ আর কি হবে?

ধন-সম্পদের বিপদাপদও দুই প্রকার- ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বিপদ তিনটি। প্রথম এই যে, ধন-সম্পদ থাকার কারণে মানুষ ক্রমশ গোনাহ করতে শুরু করে। কেননা মানুষের মধ্যে খাহেশের দাবী সবসময়ই বিদ্যমান। তবে নিঃস্বতার কারণে কিছু করতে পারে না। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা পায়, তখন আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন খাহেশ অনুযায়ী গোনাহ করতে শুরু করলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর সবর করলে দুঃখ ভোগ করে। কারণ, ক্ষমতা সত্ত্বেও সবর করা সুকঠিন। দ্বিতীয় এই যে, ধন-সম্পদ থাকলে মোবাহ বস্তু দ্বারা বিলাসিতা শুরু হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধনী, তার জন্যে যবের রুটি খাওয়া , মোটা বস্ত্র পরিধান করা এবং সুস্বাদু খাদ্য থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। অতএব, সে অবশ্যই সুখাদ্য খাবে এবং উত্তম পোশাক পরবে। তার অভ্যাস এভাবেই গড়ে উঠবে। এটা ছাড়া সে সবর করতে পারবে না। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে এক অভ্যাস থেকে অন্য অভ্যাস দেখা দিতে থাকবে। যখন সে বিলাসিতার প্রতি অধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়বে, তখন এমনও হবে যে, হালাল উপার্জন দ্বারা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। ফলে, সন্দেহযুক্ত অর্থ-সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

তৃতীয় বিপদ যা থেকে কেউ মুক্ত নয় তা এই যে, মানুষ ধন-সম্পদের সংশোধন ও গোছগাছ করার কাজে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। আল্লাহর স্মরণে যা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা ক্ষতির বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ ধন- সম্পদের মধ্যে তিনটি বিপদ। এক, হালাল উপার্জন না করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ যদি কেউ হালাল উপার্জন করে, তবে? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে দ্বিতীয় বিপদের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ সেই উপার্জন হক পথে ব্যয় না করা। লোকেরা বলল ঃ

যদি হক পথে ব্যয়ও করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে তৃতীয় বিপদ সামনে আসবে; অর্থাৎ তা সামলাতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। কেননা, সকল এবাদতের মূল হচ্ছে আল্লাহর যিকর ও তাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে ফিকর। এই যিকর ও ফিকরের জন্যে অবসর মুহূর্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ধনী ব্যক্তি দিবারাত্র অসংখ্য ঝামেলার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে।

লোভ-লালসার নিন্দা এবং অল্পে তুষ্টির প্রশংসা ঃ দরিদ্র থাকা একটি উত্তম বিষয়; কিন্তু দরিদ্রের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা এবং অন্যের ধন-দৌলতের প্রতি তাকিয়ে না থাকা। ধনীদের কাছে কোন কিছুর লোভ না করা। এটা তখন অর্জিত হবে, যখন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান থেকে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু নিয়েই তুষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে নিজের আশাকে একদিন অথবা এক মাসের চেয়ে বেশী দীর্ঘ না করাও উচিত। যদি কেউ অধিক ধন ও দীর্ঘ আশায় আগ্রহী হয়, তবে সে অল্পে তুষ্টির ইয্যত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং লোভের নাপাকী দ্বারা কলুষিত হবে। মানুষের সৃষ্টি ও মজ্জায় লোভ-লালসা নিহিত আছে। সেমতে হাদীসে আছে ঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى وَرَاءَ هُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

অর্থাৎ, যদি আদম সন্তানের দুটি স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে সে এগুলোর পরও তৃতীয়টি চাইবে। মাটিই কেবল মানুষের উদরপূর্তি করে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمُ الْعِلْمِ وَمَنْهُوْمُ الْمَالِ

অর্থাৎ, দুই লোভী কখনও তৃপ্ত হয় না— জ্ঞানের লোভী ও অর্থের লোভী।

আরও বলা হয়েছে ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اثْنَانِ الْأَمَلُ وَحُبُّ الْمَالِ

অর্থাৎ, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার আশা ও অর্থের মোহ যুবক হতে থাকে।

অর্থের প্রতি মানুষের এই মজ্জাগত লোভ-লালসার কারণেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) "কানায়াত" তথা অল্পে তুষ্টির প্রশংসা করেছেন। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

طُوبَى لِمَنْ يُهْدَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعَ بِهِ

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির জন্যে মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করা হয়, যার জীবিকা জীবন ধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলাকে প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া ইলাহী! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে অধিক ধনী? এরশাদ হল ঃ যে আমার দানে অধিকতর তুষ্ট থাকে। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ অধিক ন্যায়পরায়ণ কে? উত্তর হল ঃ যে নিজের সাথে ইনসাফ করে। হযরত আবু হুরাইয়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে আবু হুরায়রা, যখন তুমি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হও, তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানিকে যথেষ্ট মনে কর এবং দুনিয়াকে লাথি মার। তাঁরই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পরহেযগারী অবলম্বন কর। সকলের মধ্যে অধিক এবাদতকারী হয়ে যাবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাক। সকলের মধ্যে অধিক শোকরকারী হয়ে যাবে। অন্যের জন্যে তাই কামনা কর, যা নিজের জন্যে কামনা করে থাক। এতে ঈমানদার হয়ে যাবে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) লোভ করতে নিষেধ করেছেন। সেমতে আবু আইউব আনসারী বর্ণনা করেন- জনৈক বেদুইন হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ বিদায়ী ব্যক্তির মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যার আগামীকাল ওযর পেশ করতে হয়। অন্যের হাতে যা আছে, তার প্রতি আশা করো না অর্থাৎ লোভ করো না।

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী বলেন ঃ আমরা সাত অথবা আট অথবা নয় ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে বায়াত কর না কেন?

আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি বায়াত করিনি? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে বায়াত করনি। অতঃপর আমরা বায়াতের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এমন সময় আমাদের একজন বলে উঠল ঃ আমরা তো পূর্বে বায়াত করেছি। এখন কোন্ বিষয়ের জন্যে এই বায়াত? তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের জন্যে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঞ্জেগানা নামায পড়বে। সাগ্রহে আনুগত্য করবে। এরপর একটি কথা আস্তে বললেন ঃ মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। বর্ণনাকারী আওফ বলেন ঃ এই লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এই বায়াতটি এমনভাবে পালন করেন যে, তাদের চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও কাউকে তুলে দিতে বলতেন না। অর্থাৎ, তারা চাওয়া থেকে এতটুকু বেঁচে থাকতেন।,

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ লোভ হচ্ছে দরিদ্রতা এবং মানুষের কাছে আশা না করা ধনাঢ্যতা। যে অপরের কাছে কোন কিছু আশা করে না, সে অমুখাপেক্ষী থাকে। জনৈক দার্শনিককে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ ধনাঢ্যতা কি? উত্তর হল ঃ আশা কম করা এবং যতটুকুতে চলে, ততটুকুতে তুষ্ট হওয়ার নাম ধনাঢ্যতা। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ তোমার জন্যে দুনিয়া তখন উত্তম, যখন তুমি তাতে লিপ্ত না হবে। আর পার্থিব ধন-সম্পদের মধ্যে তোমার জন্যে তাই উত্তম, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়; অর্থাৎ, খয়রাতে ব্যয় হয়ে যায়।

লোভ-লালসার প্রতিকার এবং অল্পে তুষ্টি অর্জনের উপায় ঃ লোভ-লালসার প্রতিকার তিনটি একক বিষয় দ্বারা গঠিত। তা হল সবর, এলম ও আমল। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এগুলো এসে যায়। প্রথমত আমল অর্থাৎ, জীবিকায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং মিতব্যয়ী হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টির গৌরব অর্জন করতে চায়, সে যেন যথা সম্ভব খরচের দ্বার রুদ্ধ রাখে। কেননা, যার ব্যয়ের মাত্রা বেশী হবে, সে অল্পে তুষ্ট হতে পারবে না। উদাহরণতঃ একা হলে একটি মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং কম রুটি ও কম তরকারি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। আর সন্তান-সন্ততি থাকলে তাদের প্রত্যেককেই এভাবে ভরণ-পোষণ দেবে। কেননা, এতটুকু জীবিকা সামান্য পরিশ্রমেই অর্জিত হতে পারে। এতে

অন্বেষণও কম হবে এবং জীবন মধ্যবর্তী পথে অতিবাহিত হবে, যা অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে মূল বিষয়। একেই বলা হয় "রিফক ফিল ইনফাক" অর্থাৎ, অর্থ ব্যয়ে নম্রতা করা। হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন।

আরও বলা হয়েছে- مَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ. যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হয় না। আরও আছে—

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَالْعَدْلُ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ -

অর্থাৎ, উদ্ধারকারী বিষয় তিনটি— গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, ধনাঢ্যতায় ও দারিদ্র্যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও ক্রোধের অবস্থায় ন্যায় বিচার করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنِ اقْتَصَدَ اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ بَذَّرَ فَقَّرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَحَبَّهُ اللّٰهُ -

অর্থাৎ, যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ফকীর করে দেন। আর যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে প্রিয় করে নেন।

এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় সংকোচন করা একান্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ হাতে থাকলে ভবিষ্যতের জন্যে

অস্থির হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থা অর্জন করার জন্যে আকাংখা খাটো করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যে রিযিক তাকদীরে আছে, তা অবশ্যই পৌঁছবে। এতে লোভ করা-না করা সমান। লোভ করলেই রূযী পাওয়া যায় না।

লোভ মানুষের মধ্যে শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। অভিশপ্ত শয়তান অন্তরে জাগ্রত করে যে, বেশী ব্যয় করলে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সঞ্চয় না করলে অসুস্থতা ও অক্ষমতার সময়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে। সে এমনিভাবে মানুষকে অর্থ উপার্জনের কষ্টে লিপ্ত করে। এরপর নিজে তার কান্ডকীর্তি দেখে হাসে যে, দেখ, ভবিষ্যতে কষ্টের আশংকায় বর্তমানে কেমন কষ্ট করে যাচ্ছে। এটা কিরূপে জানা গেল যে, ভবিষ্যতে কষ্ট অবশ্যই হবে। কিছুই তো না হতে পারে।

বর্ণিত আছে, হযরত খালেদ (রাঃ)-এর দুই পুত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়াচড়া করে অর্থাৎ সারা জীবন রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না। দেখ, মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে রূযী দেন। একবার রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইবনে মাসউদের কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি তখন বিমর্ষ অবস্থায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দুঃখ করা অনর্থক। যা হবার তা হবেই। যে পরিমাণ রিযিক নসীবে আছে, তা আসবেই।

মানুষ যখন পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে, তার তাকদীরে অবশ্যই রিযিক আছে, তখনই সে লোভ-লালসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর সাথে একথাও বিশ্বাস করা উচিত যে, অন্বেষণে ত্রুটি করলেও তকদীরের রিযিক অবশ্যই পৌঁছবে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।

হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহকে ভয় করে, এমন কোন ব্যক্তিকে আমি অভাবগ্রস্ত দেখিনি। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ভীত ব্যক্তির প্রয়োজন অপূর্ণ রাখেন না। মুফাযযল যব্বী বলেন ঃ আমি জনৈক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি উপায়ে জীবিকা নির্বাহ কর? সে বলল ঃ হাজীগণ আসেন, এতেই আমার জীবিকা হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাজীরা চলে গেলে কি কর? এতে সে কেঁদে কেঁদে বলল ঃ অমুক জায়গা থেকে রূযী আসে বলে যদি জানাই থাকত, তবে জীবন কিসের?

তৃতীয়ত, অল্পে তুষ্টির উপকারিতা জানতে হবে যে, এর দৌলতে অমুখাপেক্ষিতার সম্মান অর্জিত হয় এবং লোভের কারণে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। এ বিষয়টি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মানুষ অল্পে তুষ্টির প্রতিই আগ্রহী হবে।

চতুর্থত, ইহুদী, খৃস্টান, নীচ জাতি, নির্বোধ ও বেদ্বীনদের বিলাসিতা ও জীবন ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করবে। এরপর পয়গম্বর, ওলী, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের অবস্থা দেখবে, শুনবে এবং পাঠ করবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে ইতর ব্যক্তিদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করবে, অথবা তাদের অনুসরণ করবে, যারা সৃষ্টিজগতে সর্বাধিক সম্মানিত। যদি কেউ মহাপুরুষগণের অনুসরণ করে, তবে সামান্য বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অল্পে সবর করা সহজ হবে। তখন তার বিষয়ে পয়গম্বর ও ওলীগণ ছাড়া কেউ তার শরীক হবে না। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত শ্রেণীতে থাকা পছন্দ করে,তবে কিছুই লাভ হবে না। উদাহরণতঃ যদি উদরপূর্তির বিলাসিতায় পড়ে, তবে এতে গাধা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি সহবাসের আনন্দ লাভে ব্যাপৃত হয়, তবে শূকর এ কাজে সবার উর্ধ্বে। যদি অঙ্গসজ্জা ও যানবাহনের বিলাসিতা লক্ষ্য হয়, তবে অধিকাংশ কাফের এতে তার তুলনায় বেশী হবে।

পঞ্চমত, অর্থ সঞ্চয় করার বিপদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, এতে কেমন চুরি, ডাকাতি ও লুটতরাজের আশংকা লেগে থাকে! হাত খালি থাকলে এসব দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সুখে ও শান্তিতে থাকা যায়। এছাড়া আমরা পূর্বে যেসব আর্থিক বিপদাপদ বর্ণনা করেছি, সেগুলোও চিন্তা করবে এবং ধ্যান করবে, ধন-সম্পদের কারণে জান্নাতের দরজা থেকে পাঁচ শ' বছর পর্যন্ত দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অল্পে সন্তুষ্ট হয় না, সে ধনীদের

দলভুক্ত হবে এবং ফকীরদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে। ফকীর ধনীর তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসসমূহে তাই বর্ণিত আছে। এই চিন্তা-ভাবনার উপায় হল দুনিয়াতে সব সময় নিজের চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন লোকদের প্রতি লক্ষ্য করা— বেশী অবস্থাসম্পন্নদের প্রতি লক্ষ্য না করা। সেমতে হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ) ওসিয়ত করেছেন যে, দুনিয়াতে তোমার চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন যারা, তাদের প্রতি দেখবে। যাদের আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল, তাদের দিকে নজর করবে না।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে অল্পে তুষ্টি আসতে পারে। একশ' কথার এক কথা এই যে, সবর করবে, আশাকে খাটো করবে এবং বুঝবে যে, অনন্তকাল পর্যন্ত ভোগ-বিলাস ও মজা উড়ানোর জন্যে দুনিয়াতে কয়েক দিনই সবর করতে হবে। যেমন রোগী ঔষধের তিক্ততায় এজন্যে সবর করে যে, এরপরে সে সর্বদা সুস্থ থাকবে।

দানশীলতার ফযীলত ঃ যদি কারো কাছে ধন-সম্পদ না থাকে, তবে তার উচিত অল্পে তুষ্ট ও কম লোভী হওয়া। আর যদি ধন-সম্পদ থাকে, তবে ত্যাগ ও দানশীলতায় ক্রটি না করা এবং কৃপণতা থেকে অনেক দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, দানশীলতা পয়গম্বরগণের চরিত্রের একটি অঙ্গ। মুক্তির মূল বিষয়বস্তুও এটাই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন— দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের একটি বৃক্ষ। এর বিভিন্ন ডালপালা আভূমি লম্বিত। যে কেউ এর একটি ডাল ধরে ফেলে, সে তাকে জান্নাতে টেনে নেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল পয়গম্বরকে দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতার উপরই সৃষ্টি করেছেন। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে, কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সবর ও দানশীলতা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দুটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং দুটি অপ্রিয়। প্রিয় অভ্যাস দুটি হচ্ছে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা এবং অপ্রিয় অভ্যাস দুটি হচ্ছে অসচ্চরিত্রতা ও কৃপণতা। আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান, তখন তাকে দিয়ে মানুষের অভাব পূরণ করান। আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার দয়ালু বান্দাদের কাছে দানের আবেদন কর এবং তাদের আশ্রয়ে জীবন

অতিবাহিত কর। আমি তাদের মধ্যে স্বীয় দয়া ও রহমত ভরে দিয়েছি। আর পাষাণহৃদয় লোকদের কাছে কিছু চেয়ো না। তাদের উপর আমি গযব নাযিল করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ দানশীল ব্যক্তির ত্রুটি ক্ষমা কর। কারণ, সে যখন ভুল করে, তখন আল্লাহ তার হস্ত ধারণ করেন। হযরত ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে আছে— অন্ন দানকারীর কাছে রিযিক এত দ্রুত পৌঁছে যে, উটের গলায় ছুরিও এত দ্রুত কার্যকর হয় না। হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বেছে বেছে নেয়ামত দান করেন, যাতে তাদের হাতে অন্যদের কার্যোদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি অপরের উপকার করতে কার্পণ্য করে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে অন্যকে সমর্পণ করেন।

হালালী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বনী আম্বরের কয়েদীদেরকে উপস্থিত করা হলে তিনি সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেন; কিন্তু এক ব্যক্তিকে এই নির্দেশের বাইরে রাখেন। হযরত আলী (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্ এক। তাঁর ধর্মও এক। যে গোনাহ্ এরা করেছে, তাও এক। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হল কিরূপে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ তাদের সকলকে হত্যা কর এবং এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। তার দানশীলতার কারণে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাশীল। এক হাদীসে বলা হয়েছে—

طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَطَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ

অর্থাৎ, দানশীলের খাদ্য ঔষধ বিশেষ আর কৃপণের খাদ্য রোগ বিশেষ।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যখন মানুষের কাছে দুনিয়া আসে, তখন তা থেকে ব্যয় করা উচিত। কেননা, ব্যয় করলে দুনিয়া চলে যাবে না। যদি চলে যায়, তবু ব্যয় করা দরকার। আমীর মোয়াবিয়া ইমাম হুসায়ন (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ ভদ্রতা, উচ্চতা ও দানশীলতা কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ ভদ্রতা হচ্ছে নিজের ও ধর্মের হেফাযত করা এবং নিজের কাজ

উত্তমরূপে করা। উচ্চতা হচ্ছে প্রতিবেশীর বিপদ দূর করা এবং সবরের জায়গায় সবর করা। দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়াই অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা।

কোন এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে কোন উদ্দেশ্যে দরখাস্ত লিখে পেশ করল। তিনি সেটি না পড়েই বলে দিলেন ঃ তোমার অভাব পূরণ করা হবে। এতে অন্য একজন আরয করল ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র, আপনি তার আবেদনটি পাঠ করেই জওয়াব দিতেন। তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ আমি পাঠ করতাম, ততক্ষণ সে আমার সামনে হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকত। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন— তুমি সওয়ালকারীকে এতক্ষণ হীন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন?

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়ালকারীকে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, সে দানশীল নয়; বরং দানশীল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের হক চাওয়া ছাড়াই পৌঁছে দেয়। মনে তার গ্রহণের জন্যে কৃতজ্ঞতার মোহ না থাকে; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ সওয়াবপ্রাপ্তির বিশ্বাস থাকে।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দানশীলতা কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে ধন- সম্পদ দিয়ে দেয়া। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ অপব্যয় কি? তিনি বললেন ঃ ক্ষমতার মোহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। ইমাম জা'ফর সাদেক বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে অধিক কোন সাহায্যকারী ধন নেই এবং মূর্খতার চেয়ে বড় কোন বিপদ নেই। পরামর্শের চেয়ে বড় কোন সমর্থন নেই। জেনে রেখ, আল্লাহ বলেন, আমি দাতা। কোন কৃপণ আমার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কৃপণতা কুফরের অংশ। কাফেররা দোযখে যাবে। দানশীলতা ঈমানের অঙ্গ। ঈমানদার জান্নাতে যাবে।

নিম্নে খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তিবর্গের কিছু অনুসরণযোগ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সেবিকা উম্মে দাররা বর্ণনা করেন ঃ একবার হযরত ইবনে যুবায়র (রাঃ) এক লাখ আশি হাজার দেরহাম হযরত আয়েশার খেদমতে পাঠালেন। তিনি এগুলো জনসাধারণের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন ঃ আমার ইফতার আন। আমি রুটি ও যয়তুনের তৈল সামনে রেখে দিলাম এবং বললাম ঃ আপনি

এতগুলো দেরহাম বন্টন করলেন। আমাদের ইফতারের জন্যে এক দেরহামের গোশত কেনাও কি সম্ভব ছিল না? তিনি বললেন ঃ তুমি আগে বললে তা অবশ্য করা যেত।

আব্বান ইবনে উসমান বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিছু ক্ষতি করতে মনস্থ করল। সেমতে সে সময় কোরায়শ সরদারদের কাছে গিয়ে মিছামিছি বলে দিল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আপনাদের সবাইকে তাঁর বাড়ীতে সকালে ভোজের দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত পৌছানোর জন্যে তিনি আমাকে বলেছেন। সরদাররা তার কথামত কাজ করল এবং সকাল বেলায় সবাই তাঁর বাড়ীতে সমবেত হল। এমনকি ঘরে জায়গা পর্যন্ত রইল না। হযরত আব্দুল্লাহ তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা ঘটনা বর্ণনা করল। শুনা মাত্রই তিনি ফল-মূল কিনে এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন এবং লোকজনকে খানা পাকানোর জন্যে নিযুক্ত করলেন। ফল খাওয়া শেষ হতে না হতেই দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হল। অতঃপর আহারান্তে সবাই প্রস্থান করল। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সে পরিমাণ প্রত্যেক দিন ব্যয় হতে পারে কিনা? তারা বলল ঃ অবশ্যই হতে পারে। তিনি বললেন ঃ তা হলে এই সরদারগণ যেন প্রত্যহ সকালের খানা আমার ঘরেই খায়।

মুসএব ইবনে যুবায়র বর্ণনা করেন, এক বছর আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) হজ্জে গমন করেন এবং সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। মদীনায় প্রবেশ করলে হযরত ইমাম হুসায়ন (রাঃ) নিজ ভ্রাতা ইমাম হাসান (রাঃ)-কে বললেন ঃ তুমি তার সাথে দেখা করতে যেয়ো না এবং সালাম-কালাম করো না। এরপর আমীর মোয়াবিয়া যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন ইমাম হাসান বললেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণ। আমি অবশ্যই আমীরের সাথে দেখা করব। সেমতে উটে সওয়ার হয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে সালাম-কালামের পর তিনি ঋণের কথা বললেন। সে সময় আশি হাজার দীনার বহনকারী একটি উট আমীরের কাছে ছিল। দীনারের ভারে উট চলতে পারছিল না। তাকে জোরজবরদস্তি হাঁকিয়ে আনা হচ্ছিল। আমীর মোয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, এর পিঠে কি? লোকেরা বলল ঃ আশি হাজার দীনার। তিনি বললেন ঃ এগুলো উটসহ হযরত ইমাম হাসানের কাছে পৌঁছে দাও।

ওয়াকেদ তার পিতা মোহাম্মদ ওয়াকেদীর অবস্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি খলীফা মামুনকে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণের বোঝা। এখন আর সহ্য করতে পারছি না। খলীফা পত্রের অপর পিঠে এই নির্দেশ লিখলেন ঃ তোমার মধ্যে দুটি চমৎকার অভ্যাস রয়েছে— দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা। দানশীলতার কারণে তুমি নিঃস্ব হয়ে গেছ এবং লজ্জাশীলতার কারণে তুমি কখনও নিজের অবস্থা আমাকে বলনি। এখন আমি এক লক্ষ দেরহাম তোমাকে দিলাম। মনোমত হলে মানুষকে খুব দান কর। মনোমত না হলে দোষ তোমারই। তুমি যে সময় খলীফা রশীদের পক্ষ থেকে বিচারপতি ছিলে, তখন আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলে যে, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে, যুহরী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে, আনাস রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইবনে আওয়ামকে বললেন ঃ হে যুবায়র, জেনে রাখ, বান্দার জন্য রিযিকের চাবি আরশের উল্টো দিকে রয়েছে। বান্দা যে পরিমাণ ব্যয় করে, আল্লাহ সে পরিমাণ তার কাছে পাঠিয়ে দেন। যে বেশী ব্যয় করে, তার জন্য বেশী এবং যে কম খরচ করে, তার জন্যে কম পাঠিয়ে দেন। ওয়াকেদী বলেন ঃ আল্লাহর কসম, খলীফা মামুনের এক লাখ দেরহাম পেয়ে আমি এমন প্রীত হলাম, যেমন এই হাদীসের বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয়ায় হলাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বসরার গভর্নর থাকাকালে একদিন সেখানকার ক্বারীগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল ঃ আমাদের এক প্রতিবেশী দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে। আপন কন্যার বিবাহ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে দিয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে কন্যাকে যৌতুক দেয়ার মত কিছুই তার কাছে নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন এবং আগন্তুকদের হাত ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি সিন্দুক খুলে তা থেকে ছয়টি থলে বের করলেন, অতঃপর বললেন ঃ এগুলো তুলে নাও। তারা তুলে নিলে তিনি বললেন ঃ একজন মুসলমানকে এমন জিনিস দেয়া ভাল নয়, যা তার রোযা ও রাত্রি জাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। চল, আমরা সবাই গিয়ে তার সাহায্যকারী হয়ে কন্যাকে তুলে দেই। অবশ্য দুনিয়ার এতটুকু সাধ্য নেই যে, একজন মুমিনকে আল্লাহর এবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখে; কিন্তু আমরাও এতটুকু

অহংকারী নই যে, আল্লাহর ওলীগণের খেদমত করব না। একথা বলে তিনি সবাইকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে চলে গেলেন এবং যথারীতি বিবাহকর্ম সম্পন্ন হল।

বর্ণিত আছে, আব্দুল হামিদ ইবনে সাদ (রহঃ)-এর আমলে মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন— আমি শয়তানকে দেখিয়ে দেব আমি তার দুশমন। সেমতে তিনি সমস্ত মানুষের অভাব পূরণ করতে থাকেন। পরে যখন তিনি পদচ্যুত হলেন, তখন তার যিম্মায় সওদাগরদের দশ হাজার দেরহাম প্রাপ্য ছিল। তিনি এর বিনিময়ে সওদাগরদের কাছে পত্নীদের পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মূল্যের অলংকার বন্ধক রেখে দিলেন। অতঃপর যখন এই অলংকার ছাড়াতে পারলেন না, তখন সওদাগরদেরকে লিখে পাঠালেন ঃ তোমরা অলংকার বিক্রি করে তা থেকে নিজেদের প্রাপ্য কেটে নাও। যা অবশিষ্ট থাকে, তা এমন লোকদেরকে দিয়ে দাও, যারা আমার কাছ থেকে কিছুই পায়নি।

আবু মুরছাদ একজন দানবীর ছিলেন। জনৈক কবি কিছু পাওয়ার আশায় তার প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি রিক্তহস্ত। তোমাকে দিতে কিছু পারছি না। তবে একটি ফন্দি করা যায়, তুমি দশ হাজার দেরহাম দাবী করে কাযীর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ কর। আমি তোমার দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নেব। এরপর অক্ষমতার কারণে তুমি আমাকে কয়েদী বানিয়ে দিয়ো। আমার পরিবারের লোক তোমাকে দশ হাজার দেরহাম দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনবে। কবি তাই করল। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আবু মুরছাদের পরিবারের লোকেরা দশ হাজার দেরহাম দিয়ে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে নিল।

আবুল হাসান মাদায়েনী বর্ণনা করেন, একবার হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) একত্রে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে তারা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এক সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। তাদের চলার পথে এক বৃদ্ধা তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসে ছিল। তারা তিনজন তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু পানি আছে? বৃদ্ধা বলল ঃ হাঁ আছে। একথা শুনে তারা উট থেকে নেমে পড়লেন। বৃদ্ধার ঘরে একটি ছোট বকরী ছিল। সে বলল ঃ এই ছাগলের দুধ বের করে পান করুন। দুধ পান

করার পর তারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু খাবারও আছে কি? বৃদ্ধা বলল ঃ এই ছাগলটি ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু নেই। আপনাদের কেউ যদি এটি যবাহ করে সাফ করে দেন, তবে আমি রান্না করে দিই। তাদের একজন একাজটি করলেন এবং বৃদ্ধা খানা তৈরী করে দিল। তারা পানাহার শেষ করে বিকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। চলার সময় বৃদ্ধাকে বললেন ঃ আমরা কোরায়শী। এখন হজ্জে যাচ্ছি। সেখান থেকে সহি-সালামতে দেশে ফিরলে তুমি আমাদের কাছে যেয়ো। আমরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব।

অনেক দিন পরের কথা। বৃদ্ধা তার স্বামীকে নিয়ে রোযগারের খোঁজে মদীনায় উপস্থিত হল। সেখানে পৌঁছে তারা উটের শুষ্ক বিষ্ঠা সংগ্রহ করে সেগুলো বিক্রয় করে কোনমতে দিন কাটাত। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধা একদিন সে গলিতে চলে গেল, যেখানে হযরত হাসান (রাঃ) নিজের ঘরের দরজায় বসে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে দেখেই চিনতে পারলেন। সেমতে খাদেমকে পাঠিয়ে তাকে আনলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাকে চিন? বৃদ্ধা আরয করল ঃ না, চিনতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ অমুক দিন তোমার ঘরে অতিথি হয়েছিলাম। বৃদ্ধা মনে করে বলল ঃ হাঁ। আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক। আপনি কি সেই মেহমান? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দীনার বৃদ্ধাকে দিয়ে নিজের খাদেমদের সাথে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ভাই তোমাকে কি দিয়েছে? সে আরয করল ঃ এক হাজার দীনার ও এক হাজার ছাগল। অতঃপর তিনিও সে পরিমাণ দীনার ও ছাগল দিয়ে বৃদ্ধাকে খাদেমের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হাসান-হুসাইন ভ্রাতৃদ্বয় তোমাকে কি দিয়েছে? সে বলল ঃ তারা দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার ছাগল দিয়েছেন। অতঃপর তিনি দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার ছাগল বৃদ্ধাকে দিয়ে বললেন ঃ যদি তুমি প্রথমে আমার কাছে আসতে, তবে আমি এই পরিমাণে দিতাম যে, হাসান-হুসাইনের জন্যে তা কঠিন হত। মোটকথা, বৃদ্ধা চার হাজার দীনার ও সম সংখ্যক ছাগল নিয়ে তার স্বামীর কাছে এসে বলল ঃ এ হল একটি ছাগলের প্রতিদান, যা কোরায়শ সরদারগণ খেয়েছিলেন।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমের একাকী মসজিদ থেকে ঘরে

ফিরছিলেন। পথে সকীফ গোত্রের একটি বালক তার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? বালকটি বলল ঃ না, কোন প্রয়োজন নেই। আপনি একা একা যাচ্ছিলেন, তাই সঙ্গ দিতে চলে এলাম, যাতে খোদা না করুন পথে কোন বিপদ দেখা দিলে তা নিজের উপর নিতে পারি। আব্দুল্লাহ্ তার হাত ধরে ফেললেন এবং ঘরে এনে তাকে এক হাজার দীনার দান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার মুরব্বিরা তোমাকে চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন। যাও, এই দীনারগুলো তুমি নিজের জন্যে ব্যয় করো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের নব্বই হাজার দেরহামের বিনিময়ে খালেদ ইবনে ওকবার বাড়ী কিনে নেন। বাড়ীটি বাজারে অবস্থিত ছিল। রাত হলে খালেদের বাড়ীর লোকজনদের কান্নার আওয়াজ আব্দুল্লাহর কানে ভেসে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কাঁদছে কেন? লোকেরা বলল ঃ বাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে বলে কাঁদছে। তিনি খাদেমকে ডেকে বললেন ঃ তাদের কাছে গিয়ে বলে দাও— নব্বই হাজার দীনার এবং বাড়ী সব তোমাদের।

বর্ণিত আছে, খলীফা হারূন-অর-রশীদ হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাসের খেদমতে পাঁচশ' দীনার প্রেরণ করেন। এ সংবাদ শুনে লায়ছ ইবনে সা'দ ইমাম সাহেবের খেদমতে এক হাজার দীনার পাঠিয়ে দেন। এরপর খলীফা লায়ছকে ডেকে এনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যে, তুমি আমার প্রজা হয়ে কি কারণে আমার সাথে পাল্লা দিতে গেলে? লায়ছ আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমার কাছে প্রত্যহ এক হাজার দীনারের শস্য আসে। তাই এমন সম্মানিত ব্যক্তিকে একদিনের আমদানীর চেয়ে কম দিতে আমি লজ্জাবোধ করেছি। লায়ছ ইবনে সা'দের দানশীলতা সুবিদিত ছিল। এ কারণেই প্রত্যহ হাজার দীনার আমদানী সত্ত্বেও তার উপর যাকাত ওয়াজেব হয়নি। একবার জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে সামান্য মধু চাইলে তিনি তাকে এক মশক মধু দিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করল ঃ সামান্য মধু দিলেই তার প্রয়োজন মিটে যেত। আপনি এত বেশী দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ মহিলা তার প্রয়োজন মাফিক চেয়েছিল। আমি আমার প্রতি আল্লাহর দান মাফিক দিয়েছি।

আ'মাশ বর্ণনা করেন, আমার একটি ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খায়ছামা ইবনে আবদুর রহমান প্রত্যহ তাকে দেখতে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন— ছাগলটি ঘাস-পানি ঠিকমত খেয়েছে কি না? তোমার

ছেলেরা দুধ ছাড়া কিরূপে সবর করে। তুমি প্রত্যহ আমার বিছানার নীচে যা পাও, নিয়ে এসো। ফলে, ছাগলের অসুস্থতার দিনগুলোতে আমার কাছে তিন শ' দীনারেরও বেশী পৌঁছে গেল। আমার মনে এই আকাংখা জন্ম নিল যে, ছাগলটি অসুস্থই থাকুক।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান একদিন আসমা বিনতে খারেজাকে বললেন ঃ তোমার কয়েকটি সদ্‌গুণের খবর আমি পেয়েছি। সেগুলো আমার কাছে বর্ণনা কর। আসমা বললেন ঃ সেগুলো অন্যের মুখে শুনলেই আমার কাছ থেকে শুনার চেয়ে উত্তম হত। খলীফা কসম দিয়ে বললেন ঃ না, তুমিই বল। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমি কখনও আমার সাথে বসা ব্যক্তির সামনে পা ছড়াইনি। যখনই আমি খাদ্য তৈরী করে মানুষকে খাইয়েছি, তখনই তাদের উপর আমার যা অনুগ্রহ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আমি তাদের অনুগ্রহ নিজের উপর মনে করেছি। যখনই কোন ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে, তখন আমি তাকে যা দিয়েছি, সেটাকে অনেক মনে করিনি।

দানবীর সা'দ ইবনে খালেদের নিয়ম ছিল, যদি দেয়ার মত তার কাছে কোন কিছু না থাকত, তবে প্রার্থীকে তমসুক অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিতেন এবং বলতেন ঃ আমি কোথাও থেকে কিছু পেলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ শোধ করে দেব। তিনি একবার সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের কাছে আগমন করলেন। খলীফা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি প্রয়োজন? তিনি বললেন ঃ আমার যিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পরিমাণ? উত্তর হল ঃ ত্রিশ হাজার দীনার। খলীফা বললেন ঃ ত্রিশ হাজার ঋণের এবং এই পরিমাণই তোমার জন্যে দেয়া হবে।

আবু সাঈদ খরকুশী নিশাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে হাফেয মোহাম্মদের কাছে শুনেছি— মিসরে এক ব্যক্তি ফকীরদের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে দিত। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সেই চাঁদা সংগ্রহকারীর কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন আমার হাতে কিছুই নেই। এ কথা শুনতেই লোকটি তার সঙ্গে চলল এবং বহু লোকের কাছে গেল। কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছুই পেল না। এরপর সে এক ব্যক্তির কবরের উপর এসে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি বেঁচে থাকতে অনেক দান

করতে। আজ আমি অনেকের কাছে গেলাম এবং এই লোকটির জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এরপর নিজের কাছ থেকে একটি দীনার বের করল এবং সে টি ভাঙ্গিয়ে অর্ধেক লোকটির হাতে দিয়ে বলল ঃ আমি তোমাকে কর্জ দিলাম। যখন পার পরিশোধ করে দিয়ো। লোকটি অর্ধেক দীনার নিয়ে বাড়ী ফিরে এল এবং সন্তান হওয়ার কারণে যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তা পূরণ করে নিল। রাতের বেলায় সে মিসরীয় চাঁদা সংগ্রহকারী লোকটি স্বপ্নে দেখল, কবরস্থ লোকটি তাকে বলছে ঃ তুমি আমার কবরের উপর বসে যা বলেছিলে, আমি সব শুনেছি। কিন্তু তখন জওয়াব দেয়ার অনুমতি ছিল না বিধায় জওয়াব দিতে পারিনি। এখন শুন, তুমি আমার ঘরে গিয়ে আমার সন্তানদেরকে চুল্লীর নীচে খনন করতে বলবে। সেখান থেকে একটি পাত্রে পাঁচশ' দীনার বের হবে। সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে সেই লোককে দিয়ে দাও, যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেমতে প্রত্যুষে সে সন্তানদের কাছে গেল এবং স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করল। তারা তাকে বসতে বলে চুল্লী খনন করল এবং পাঁচ শ' দীনার বের করে তার সামনে রেখে দিল। সে বলল ঃ এ ধন তোমাদের। আমার স্বপ্নের কি মূল্য! সন্তানরা বলল ঃ যার ধন, তিনি তো মৃত্যুর পরেও দান করেন। আমরা জীবিত অবস্থায় করব না কেন? মোটকথা, পরে লোকটি দীনার নিয়ে নিল এবং যার সন্তান হয়েছিল, তার কাছে এনে রাখল। সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলল ঃ এখন এই ধন তোমার। যা ইচ্ছা, কর। সে একটি দীনার ভাঙ্গিয়ে নিল। অর্ধেক দিয়ে কর্জ শোধ করল এবং অর্ধেক নিজে রেখে বলল ঃ আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকল দীনার তুমি ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না, এই তিনজনের মধ্যে সর্বাধিক দাতা কাকে বলা উচিত?

বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁকে গোসল দেবে। ওফাতের পর সেই ব্যক্তিকে ওসিয়তের কথা জানানো হলে সে এসে তাঁর খরচের হিসাব বহি দেখল। জানা গেল, তাঁর যিম্মায় সত্তর হাজার দেরহাম কর্জ রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ সেই কর্জ নিজের নামে স্থানান্তর করে ইমাম সাহেবকে মুক্ত করে দিল। অতঃপর বলল ঃ আমার গোসল দেয়া দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য এটাই ছিল; অর্থাৎ, আমি যেন তাঁকে কর্জের কলুষতা থেকে পাক-পবিত্র করে দিই।

আবু সাঈদ বলেন ঃ আমি যখন মিসরে গেলাম, তখন এই ব্যক্তির বাড়ী তালাশ করলাম। লোকদের বর্ণনা অনুযায়ী তার বাড়ী গিয়ে তার পুত্র ও পৌত্রদের কয়েক জনকে পেলাম। সকলেরই মুখমন্ডলে কল্যাণ ও বরকতের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তাদের পিতার কল্যাণ ও বরকত তাদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মোহাম্মদ ইবনে ওব্বাদ মুহাল্লেবী রেওয়ায়েত করেন, আমার পিতা খলীফা মামুনের কাছে গেলে তিনি তাকে এক লাখ দেরহাম দেন। খলীফার কাছ থেকে চলে আসার পর তিনি সমুদয় অর্থ খয়রাত করে দেন। খবর পেয়ে খলীফা তাকে ডেকে শাসালেন। আমার পিতা জওয়াবে আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! উপস্থিত অর্থ দান না করলে মাবুদের প্রতি কুধারণা করা হয়। এতে খলীফা অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং আরও দু'লাখ দেরহাম দিয়ে দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত তালহা (রাঃ)-এর যিম্মায় হযরত উসমান (রাঃ)-এর পঞ্চাশ হাজার দেরহাম প্রাপ্য ছিল। একদিন হযরত উসমান মসজিদে যাবার সময় হযরত তালহা এসে বললেন ঃ আপনার প্রাপ্য এখানে রয়েছে, নিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ আমি এই অর্থ আপনাকেই দিয়েদিলাম, যাতে আপনার আভিজাত্য রক্ষায় সহায়ক হয়।

সো'দা বিনতে আওফ বলেন ঃ আমি একদিন হযরত তালহার খেদমতে গিয়ে তাকে বিষণ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। ভাবছি, কি করা যায়। আমি বললাম ঃ ভাবনার কি আছে, আপনার সম্প্রদায়কে ডেকে বন্টন করে দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ গোলামকে পাঠিয়ে সবাইকে ডেকে আনলেন এবং সমুদয় অর্থ বিলিয়ে দিলেন। আমি গোলামকে অর্থের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ চার লাখ দেরহাম।

এক বেদুইন হযরত তালহার খেদমতে হাযির হয়ে কিছু চাইল এবং কিছু আত্মীয়তাও প্রকাশ করল। তিনি বললেন ঃ এ পর্যন্ত আত্মীয়তার কারণে কেউ আমার কাছে কিছু চায়নি। আমার এক খন্ড ভূমি আছে, যা উসমান তিন লাখ দেরহামে কিনতে চান। তুমি ইচ্ছা করলে সে জমিটি নিয়ে যাও। তা না হলে এর মূল্য তোমাকে দিয়ে দেব। বেদুইন ভূখন্ডের পরিবর্তে মূল্য নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সেমতে হযরত তালহা ভূখন্ডটি হযরত উসমানের কাছে বিক্রি করে মূল্য বেদুইনকে দিয়ে দিলেন।

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আলী (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখে লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ সাতদিন ধরে আমার ঘরে কোন মেহমান আসেনি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন বলে আশংকা হয়।

এক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল ঃ কি মনে করে? সে বলল ঃ আমার যিম্মায় চার শ' দেরহাম কর্জ রয়েছে। বন্ধু তৎক্ষণাৎ চার শ' দেরহাম গুণে তার হাতে তুলে দিল। অতঃপর সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী পৌঁছল। তার স্ত্রী বলল ঃ যদি এতগুলো দেরহাম দেয়া এতই কষ্টকর ছিল, তবে না দিলেই পারতে। সে বলল ঃ আমার কান্নার কারণ হল তার অবস্থা তার বলা ছাড়া আমি জানলাম না কেন? আমি যদি নিজেই খবর নিতাম, তবে তার চাওয়ার প্রয়োজন হত না।

কৃপণতার নিন্দা ঃ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, যাদেরকে মনের লোভ-লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই সফলকাম।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্যে উত্তম; বরং এটা তাদের জন্যে অনিষ্টকর। সত্বরই কিয়ামতের দিন যে বস্তুতে তারা কৃপণতা করেছিল, তার বেড়ী তাদেরকে পরানো হবে।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ -

অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর কৃপাকে গোপন রাখে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّسْفِكُوْا دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের রক্ত প্রবাহিত করতে উত্তেজিত করেছে এবং হারামসমূহকে হালাল করতে প্ররোচিত করেছে।

আরও বলা হয়েছে—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ وَلَا خِبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

অর্থাৎ, কৃপণ, প্রতারক, খেয়ানতকারী ও চরিত্রহীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, তোমার কাছে আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে পৌঁছা থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী লেহইয়ানের দূতদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের সরদার কে? তারা বলল ঃ আমাদের সরদার জুদ ইবনে কায়স। কিন্তু সে কিছুটা কৃপণ। তিনি বললেন ঃ কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ আর কি? সে তোমাদের সরদার নয়; বরং আমর ইবনে জামু। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ দাতা গোনাহগার আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃপণ আবেদ থেকে উত্তম।

এক হাদীসে আছে, কেউ কেউ বলে, কৃপণ যালেমের তুলনায় ক্ষমার্হ।

অথচ আল্লাহর কাছে কৃপণতার চেয়ে বড় কোন যুলুম নেই। আল্লাহ পাক তাঁর ইয্যতের কসম খেয়ে বলেন ঃ না কৃপণ জান্নাতে যাবে, না "শাহীহ" অর্থাৎ, যে অপরকে দান করতে দেখে গাত্রদাহ অনুভব করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কা'বার তওয়াফ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি কা'বার গেলাফ জড়িয়ে ধরে বলছে— ইলাহী, এই ঘরের ইয্যতের খাতিরে আমার গোনাহ মাফ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ কি, আমার কাছে বল। সে আরয করল ঃ আমার গোনাহ বর্ণনাতীত। তিনি বললেন ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না পৃথিবী তার সপ্ত স্তর সহ বেশী? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না পাহাড়-পর্বত বেশী? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গুনাহ বেশী, না সমুদ্র বেশী? লোকটি বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না সকল আকাশ? উত্তর হল ঃ আমার গোনাহ বেশী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ বড়, না আরশ বড়? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বড়। প্রশ্ন হল ঃ তোমার গোনাহ বড়, না করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বড়? লোকটি বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা অনেক বড়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার গোনাহ আমার কাছে বল। লোকটি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ধনী ব্যক্তি। কিন্তু যখন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চায়, তখন মনে হয় যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার সামনে রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। তোমার আগুনে আমাকে জ্বালিয়ো না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে হেদায়েত ও সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যদি তুমি রোকন ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দশ লক্ষ বছর নামায পড়, অতঃপর তত বছর ক্রন্দনের ফলে তোমার অশ্রুতে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, বৃক্ষ সিক্ত হয়, এরপর কৃপণ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ পাক তোমাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। তোমার সর্বনাশ হোক- তুমি কি জান না যে, কৃপণতা কুফরের একটি অংশ এবং কুফর দোযখে যাবে? তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ — অর্থাৎ, যে দান করে না, সে নিজেকেই দান করে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা "জান্নাতে আদন" সৃষ্টি করে তাকে বললেন ঃ তুমি সজ্জিত হও। জান্নাত সজ্জিত হল। আবার বললেন ঃ তোমার নির্ঝরিণীসমূহ প্রকাশ কর। সে "সালসাবিল", "আইনে কাফুর" ও "আবে তাসনীম" নির্গত করল। এসবের দ্বারা শরাব, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত হতে লাগল। আল্লাহ্ আবার এরশাদ করলেন ঃ তোমার কুরসী, অলংকার, পোশাক ও আয়তলোচনা হূর প্রকাশ কর। জান্নাত এ আদেশও পালন করল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত পরিদর্শন করে এরশাদ করলেন ঃ কিছু বল। জান্নাত বলল ঃ যে আমার মধ্যে থাকবে, সে চমৎকার হবে। এরশাদ হল ঃ আমার ইযযতের কসম, কৃপণকে তোমার ভিতরে স্থান দেব না।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের বোন বলেন ঃ কৃপণকে ধিক! কৃপণতা যদি কোর্তা হত, আমি তা পরিধান করতাম না। যদি পথ হত, আমি তাতে চলতাম না।

একদিন অভিশপ্ত শয়তানের সাথে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার (আঃ) সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, মানুষের মধ্যে তোমার সর্বাধিক প্রিয় এবং অপ্রিয় কে? সে আরয করল ঃ অধিক প্রিয় কৃপণ মুমিন এবং অধিক অপ্রিয় গোনাহগার দাতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল ঃ কেননা, কৃপণের জন্যে তার কৃপণতাই যথেষ্ট— আমার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে দাতা গোনাহ করে, তার ব্যাপারে আমার আশংকা থাকে, কোথাও দানশীলতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি না জানি কৃপা দৃষ্টি করেন! পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। এরপর শয়তান একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আপনি দাতা না হলে কখনও এসব কথা বলতাম না।

বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে আবু হাফসা কৃপণতাবশত গোশত খেত না। খুব মনে চাইলে সে গোলামকে একটি মস্তক কিনে আনতে বলত এবং তাই খেয়ে নিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি, তুমি শীতে ও গ্রীষ্মে সব সময় মস্তক খাও! সে বলল ঃ কারণ, মস্তকের মূল্য আমার জানা আছে। এতে গোলাম চুরি করতে পারবে না এবং আমাকে লোকসান দিতে হবে না। এছাড়া গোশত হলে সে রান্না করার সময় কিছু খেয়ে নিতে

পারে। মস্তকে এটাও সম্ভবপর নয়। যদি সে মস্তকের চোখ, কান অথবা গালে হস্তক্ষেপ করে, তবে আমি জানতে পারব। এগুলো ছাড়া মস্তকে আমি কয়েক প্রকারের স্বাদ পাই। চোখের স্বাদ ভিন্ন, কান ও জিহবার স্বাদ আলাদা এবং মগজের স্বাদ পৃথক। মস্তক রান্না করাও কঠিন নয়। এখন বুঝতেই পারছ এতে লাভ কত বেশী! এই মারওয়ানই একদিন খলীফার দরবারে যাচ্ছিল। তার বাড়ীর এক মহিলা বলল ঃ যদি তুমি পুরস্কার পাও, তবে আমাকে কি দেবে? সে বলল ঃ যদি এক লাখ দেরহাম পাই, তবে এক দেরহাম তোমাকে দেব। ঘটনাক্রমে সে খলীফার কাছ থেকে ষাট হাজার দেরহাম লাভ করল। সেমতে এই হিসাব অনুযায়ী সে মহিলাকে এক দেরহামের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ দিয়ে দিল। একবার সে এক দেরহামের গোশত কিনলে এক ব্যক্তি দাওয়াতের আবদার করল। সে তৎক্ষণাৎ গোশত কসাইয়ের হাতে ফেরত দিয়ে দেরহামের এক-চতুর্থাংশ কম গ্রহণ করে বলে ঃ আমার অপব্যয় করতে খারাপ লাগে।

হযরত আ'মাশ (রহঃ)-এর জনৈক পড়শী যারপরনাই কৃপণ ছিল। সে বরাবরই তাঁকে বলত ঃ আমার বাড়ী গিয়ে আপনি এক খন্ড রুটি নিমক দিয়ে খেলে কৃতার্থ হতাম। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করতেন। একদিন পড়শী অভ্যাস অনুযায়ী একথা আরয করল। তখন তাঁর ক্ষুধাও ছিল। তাই বললেন ঃ আচ্ছা চল। পড়শী তাঁকে বাড়ী এনে সত্যি সত্যিই এক খন্ড রুটি ও নিমক সামনে রেখে দিল। এমন সময় ভিক্ষুক এসে হাঁক দিলে পড়শী তাকে বলল ঃ মাফ কর। ভিক্ষুক দ্বিতীয়বার সওয়াল করলে সে পূর্ববৎ 'মাফ কর' বলল। কিন্তু তৃতীয়বার সওয়াল করতেই সে রেগে-মেগে বলল ঃ চলে যাও। নতুবা লাঠি নিয়ে আসছি। হযরত আ'মাশ ভিক্ষুককে ডেকে বললেন ঃ শাহজী, চলে যাও। এই গৃহকর্তা ওয়াদায় বড় পাক্কা। আল্লাহর কসম, আমি তার মত সাচ্চা লোক দেখিনি। বহুদিন ধরে আমাকে রুটির টুকরা নিমকসহ খেতে বলে আসছিল। আজ এ দুটি বস্তুর বেশী সে আমার সমনে রাখেনি।

আত্মত্যাগ ও তার ফযীলত ঃ প্রকাশ থাকে যে, দানশীলতা ও কৃপণতার অনেক স্তর রয়েছে। দানশীলতার স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আত্মত্যাগ; অর্থাৎ, নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অপরকে দান করা। দানশীলতা হচ্ছে নিজের যে জিনিসের প্রয়োজন নেই, তা অভাবগ্রস্তকে অথবা অভাবগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তিকে দান করা। নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও

অপরকে দান করা অত্যন্ত কঠিন। দানশীলতা যেমন উন্নীত হয়ে কখনও এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, মানুষ অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজের সম্পদ অপরকে দিয়ে দেয়, তেমনি কৃপণতাও কখনও এত নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায় যে, মানুষ নিজের অর্থ প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের জন্যে ব্যয় করে না। উদাহরণতঃ কোন কোন কৃপণ অর্থ-সম্পদকে এমনভাবে আগলে রাখে যে, নিজে অসুস্থ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত করে না এবং মনে কোন কিছু খাওয়ার অদম্য বাসনা থাকলে তা কিনে খায় না— বিনা পয়সায় পেলে খেয়ে নেয়। এরূপ ব্যক্তি প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের সাথে কৃপণতা করে। অপরপক্ষে আত্মত্যাগী ব্যক্তি নিজের অভাবের উপর অপরের অভাবকে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব, এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কত তফাৎ!

সচ্চরিত্র আল্লাহ তা'আলার একটি নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। দানশীলতার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের উপর কোন স্তর নেই। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এই আত্মত্যাগের কারণেই করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ, তারা ক্ষুধার্ত হলে কি হবে, তারা অপরকে নিজেদের চেয়ে অধিক হকদার মনে করে।

হাদীস শরীফে আছে—

اَيُّمَا امْرِؤٍ اشْتَهٰى شَهْوَةً فَرَدَّ شَهْوَتَهٗ وَاٰثَرَ عَلٰى نَفْسِهٖ غُفِرَ لَهٗ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কোন খায়েশ হয়, অতঃপর সে তা থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকে বাদ দিয়ে অপরকে দেয়া পছন্দ করে, তার মাগফেরাত হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) কখনও তিনদিন উপর্যুপরি পেটভরে আহার করেননি। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত এমনি অবস্থা অব্যাহত ছিল। আমরা ইচ্ছা করলে পেটভরে খেতে পারতাম। কিন্তু মোহাজিরগণকে পেটভরে খাওয়ানো আমাদের কাছে অগ্রগণ্য ছিল।

একবার আমাদের বাড়ীতে এক অতিথি আগমন করল। ঘরে তখন

কিছুই ছিল না। এমন সময় জনৈক আনসারী সেখানে এল এবং অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে গেল। বাড়ী পৌঁছে অতিথির সামনে সে খাবার রেখে দিল এবং স্ত্রীকে বাতি নিভিয়ে দিতে বলল। সে অন্ধকারে নিজের হাতও খানার দিকে বাড়াতে লাগল, যেন অতিথির সাথে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সে খাচ্ছিল না। অবশেষে অতিথি সম্পূর্ণ খাদ্য খেয়ে নিল। প্রত্যুষে রসূলে আকরাম (সাঃ) আনসারীকে বললেন ঃ তুমি রাতে মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করলে তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থাৎ, তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত হলেও অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

মোটকথা, দানশীলতা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম চরিত্র। এর সর্বোচ্চ স্তরের নাম আত্মত্যাগ। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিত্য দিনের অভ্যাস ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই চরিত্রকে মহান চরিত্র আখ্যায়িত করেছেন— إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

সোহায়ল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করলেন, ইয়া ইলাহী! আমাকে মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের কিছু মর্তবা দেখিয়ে দিন। এরশাদ হল ঃ হে মূসা, তুমি সহ্য করতে পারবে না। তবে একটি মহান মর্তবা দেখিয়ে দিচ্ছি, যার কারণে আমি তাকে তোমার উপর ও সমগ্র সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এরপর একবারই ঊর্ধ্বজগতের আবরণ সরিয়ে নেয়া হল। হযরত মূসা (আঃ) যখন তাদের একটি মর্তবা দেখলেন, তখন নূরের বিকিরণ ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রভাবে যেন তার প্রাণ নির্গত হওয়াই অবশিষ্ট ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদেরকে এই মাহাত্ম্য দান করা হল? এরশাদ হল ঃ একটি অভ্যাসের কারণে, যা আমি তাদের মধ্যে রেখেছি এবং অন্যকে দেইনি। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের কারণে তারা এই মর্তবা লাভ

করেছে। হে মূসা, যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন এই আত্মত্যাগ অবলম্বন করে এবং আমার কাছে আসে, তখন তার হিসাব নিতে আমি লজ্জাবোধ করব। সুতরাং তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতের যেখানে চাইবে, সেখানে জায়গা দেব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর নিজের কিছু জমি দেখার জন্যে বের হন। পথে এক বাগানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। বাগানে এক হাবশী গোলাম কাজ করছিল। যখন তার খাদ্য এল, ঠিক তখনি একটি কুকুর বাগানে ঢুকে গোলামের কাছে এল। গোলাম কুকুরটিকে একটি রুটি দিয়ে দিল। এটি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় রুটিটিও দিয়ে দিল। এরপর তৃতীয়টি দিয়ে দিল। এভাবে দিতে দিতে সে সবগুলো রুটিই কুকুরকে খাইয়ে দিল। হযরত আব্দুল্লাহ বসে বসে দেখছিলেন। অতঃপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ প্রতিদিন তোমার খাদ্য কতটুকু আসে? গোলাম আরয করল ঃ ততটুকুই , যতটুকু আপনি দেখেছেন। তিনি বললেন ঃ তাহলে সবটুকু খাদ্য কুকুরকে খাইয়ে দিলে কেন? নিজে খেলে না কেন? গোলাম আরয করল ঃ এখানে কোন কুকুর থাকে না। মনে হয় এ কুকুরটি মুসাফির। দূর থেকে এসেছিল এবং ক্ষুধার্ত ছিল। আমার কাছে তার ক্ষুধার্ত থাকা এবং নিজের পেটভরে খাওয়া ভাল মনে হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন সারাদিন কি খাবে? সে বলল ঃ উপবাস করব। হযরত আব্দুল্লাহ ভাবলেন, আমি তাকে দানশীলতার জন্যে তিরস্কার করছি। সে তো আমার চেয়েও অধিক দাতা। এরপর তিনি সেই বাগান, গোলাম এবং সেখানকার সমস্ত আসবাবপত্র কিনে নিয়ে গোলামকে মুক্ত করে দিলেন এবং বাগানটি তাকে দিয়ে দিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক সাহাবীর কাছে কেউ একটি মস্তক হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিল। তিনি ধারণা করলেন, আমার তুলনায় অমুক ভাই এই মস্তকের অধিক মুখাপেক্ষী। সেমতে তিনি মস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মস্তকটি সাত বাড়ী ঘুরে অবশেষে আসল মালিক অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তির হাতে পৌঁছে গেল। সোবহানাল্লাহ, কি অপূর্ব আত্মত্যাগ!

বর্ণিত আছে, যে রাত্রিতে হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত

করেছিলেন, সে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈলকে বললেন ঃ আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি এবং একজনের বয়স অপরজনের চেয়ে বেশী করেছি। এখন বল, তোমাদের মধ্যে কে কম জীবন চায় এবং অপরের জন্য অধিক জীবন পছন্দ করে? কিন্তু উভয়েই নিজের জীবন বেশী হওয়াই কামনা করলেন। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের বিষয়টি কেউ পছন্দ করলেন না। এরশাদ হল ঃ তোমরা উভয়েই কি হযরত আলীর মত হতে পারলে না? আমি তার ও আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি। আজ রাতে আলী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিছানায় তাঁর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং তার জীবিত থাকাকে নিজের জীবিত থাকার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এখন তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং শত্রুদের কবল থেকে আলীকে হেফাযত কর। অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল তাঁর শিয়রে এবং মীকাঈল পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ বাহ্ বাহ্ হে আবু তালেব-তনয়, আজ তোমার মত কেউ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করেন। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ, এমন লোক আছে, যে নিজেকে বিক্রি করে ফেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

হুযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি এয়ারমুক যুদ্ধের সময় সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলাম। আমি আমার চাচাত ভাইকে খোঁজ করছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি তার মধ্যে কিছু নিঃশ্বাস বাকী থাকে, তবে পানি পান করিয়ে দেব। তাই সামান্য পানি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে তালাশ করার পর তাকে জীবিত পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ পানি দেব? সে ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করল। যখন আমি পানি পান করাতে চাইলাম, তখন কাছ থেকে একজনের "আহ" শব্দ শুনতে পেলাম। আমার চাচাত ভাই ইশারা করল যে, প্রথমে তাকে পান করাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, হেশাম ইবনে আসা কাতরাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ পানি

দেব? ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একজনের "আহ" শব্দ কানে ভেসে এল। হেশাম ইশারা করল প্রথমে সেখানে নিয়ে যাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখি লোকটি মারা গেছে। আমি সেখান থেকে আবার হেশামের কাছে এলাম। তখন সে-ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। এরপর আমি আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে এসে তাকেও জীবিত পেলাম না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।

আব্বাস ইবনে দাহকান বলেন ঃ বিশর ইবনে হারেছ ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে দুনিয়াতে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই বিদায় নিয়েছে। বিশর ইবনে হারেছ অবশ্য যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। তার অন্তিম শয্যায় এক ব্যক্তি এসে কিছু সওয়াল করলে তিনি নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দেন। এরপর তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে নেন এবং তাতেই ইন্তেকাল করেন।

দানশীলতা ও কৃপণতার স্বরূপ ঃ শরীয়তসম্মত দলীলসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত ও স্বীকৃত যে, কৃপণতা বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। কিন্তু মানুষ কিসে কৃপণ গণ্য হয় এবং কৃপণতা কাকে বলে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। কেননা, প্রত্যেক মানুষ আপন অভিমত অনুযায়ী নিজেকে দাতা মনে করে, অথচ অপরের দৃষ্টিতে সে হয় কৃপণ। অথবা এক ব্যক্তি কোন কাজ করলে তাতে মানুষের মত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ বলে এটা কৃপণতা, আবার কেউ সিদ্ধান্ত দেয় এটা কৃপণতা নয়। এছাড়া কোন মানুষের মন ধন-সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত নয়। এই মোহের কারণে সে ধন-সম্পদের হেফাযত করে এবং তা আটকে রাখে। যদি আটকে রাখার কারণেই কেউ কৃপণ হয়ে যায়, তবে এ থেকে কেউ মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যদি আটকে রাখার কারণে কৃপণ না হয়, তবে কৃপণতার অর্থ কি, তা বুঝা দরকার। কৃপণতা তো আটকে রাখারই নাম। এর কোন্‌টি বিনাশকারী? যে দানশীলতার কারণে মানুষ দাতা কথিত হয় এবং সওয়াব পায়, তার সংজ্ঞা কি?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ ওয়াজিব হক আদায় না করাকে বলা হয় কৃপণতা। এদিক দিয়ে যে ব্যক্তি তার যিম্মায় যেসব ওয়াজিব রয়েছে, সেগুলো দিতে থাকে, সে কৃপণ নয়। কিন্তু এই সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কসাইয়ের কাছ থেকে গোশত কিনে মেহমানের ভয়ে তা কিছু কম দামে ফিরিয়ে দেয়, সে সবার মতেই

কৃপণ। অনুরূপভাবে যে তার পরিবারবর্গকে নির্ধারিত হারে খোরপোশ দেয়, যদি কেউ এক লোকমাও বেশী চায় অথবা তার ধন থেকে সামান্য বস্তু খেয়ে নেয়, তবে তা দিতে অস্বীকার করে, সে-ও কৃপণ বলেই গণ্য হয়। এমনিভাবে যদি কেউ রুটি খায় এবং অন্য কেউ সেখানে আসার পর রুটিতে শরীক হয়ে যাবে মনে করে রুটি লুকিয়ে রাখে, সে কৃপণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ এই তিনটি সিদ্ধান্তের কেউ এমন নয় যে, সে ওয়াজিব হক আদায় করেনি।

কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দান করাকে কঠিন মনে করে, সে-ই কৃপণ। এ সংজ্ঞাটিও অসম্পূর্ণ। কেননা, এর উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সকল প্রকার দান তার কাছে কঠিন, তবে অনেক কৃপণ এমন রয়েছে যারা অল্প দান করাকে কঠিন মনে করে না। এক-দুই পয়সা দিয়ে দেয়। বেশী পরিমাণে দেয়া অবশ্য তাদের জন্যে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, কতক দান কঠিন হয়, তবে এটা দাতার মধ্যেও বিদ্যমান আছে। উদাহরণতঃ সমস্ত ধন অথবা অধিকাংশ ধন দান করা কঠিন মনে হয়; কিন্তু এতে কেউ কৃপণ বলে কথিত হয় না।

কারও মতে বিনা দ্বিধায় অপরের অভাব পূরণ করার নাম দানশীলতা। কেউ বলেন ঃ সওয়ালকারীকে দেখে খুশী হওয়া এবং দেয়ার কারণে উল্লসিত হওয়ার নাম দানশীলতা। কিছু লোক বলেন ঃ দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়া কাউকে কিছু দেয়া এবং যা দেয়া হয়, তাকে অল্প জ্ঞান করা। কেউ বলেন ঃ এরূপ ধারণা করে ধন দেয়া যে, ধনও আল্লাহর এবং বান্দাও তাঁরই। কাজেই আল্লাহর ধন আল্লাহর বান্দাকে দেয়া হচ্ছে। এতে দারিদ্র্য ও উপবাসের ভয় কিসের? এরূপ মনে করে দান করার নাম দানশীলতা। কারও অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি কিছু অর্থ দান করে দেয় এবং কিছু নিজের জন্যে রেখে দেয়, সে দানশীল। আর যে নিজে কষ্ট করে এবং অপরের আশা পূরণ করে, সে আত্মত্যাগী। পক্ষান্তরে যে কিছুই দান করে না, সে কৃপণ।

কৃপণতা ও দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণিত এতগুলো উক্তি দ্বারা এ দুটি বিষয়ের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় না। তাই আমরা বিষয়টি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করছি।

মূলকথা, ধন-সম্পদ একটি রহস্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে সৃজিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনাদিকে সঠিক পথে রাখার জন্যে ধন-সম্পদের সৃষ্টি

হয়েছে। এখন ধন-সম্পদ যেখানে ব্যয় করা উচিত, সেখানে ব্যয় করতে বিরত থাকা কিংবা যেখানে ব্যয় করা উচিত নয়, সেখানে ব্যয় করা উভয়টিই সম্ভব। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এটাও সম্ভবপর যে, যেখানে ব্যয় না করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা এবং যেখানে ব্যয় করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা। সুতরাং জরুরী জায়গায় ব্যয় না করে ধন আটকে রাখা কৃপণতা এবং যেখানে আটকে রাখা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা অপব্যয়। এতদুভয়ের মাঝখানে ব্যয় করা এবং আটকে রাখা ভাল। এই মধ্যবর্তী স্তরের নাম দানশীলতা হওয়া উচিত। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেবল দান করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর এরশাদ হলঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

অর্থাৎ, আপন হাতকে গ্রীবার সাথে বাঁধা রাখবে না এবং তাকে পুরাপুরি প্রসারিতও করবে না।

আরও এরশাদ হল ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا -

অর্থাৎ, আর তারা, যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে না। এর মধ্যস্থলে রয়েছে একটি সরল ব্যয় পদ্ধতি।

এ থেকে জানা গেল যে, ব্যয় করা ও আটকে রাখাকে ওয়াজিব ও জরুরী পরিমাণের মধ্যে সীমিত করা দানশীলতা। কিন্তু এর সাথে এ শর্তটিও জুড়ে দিতে হবে যে, এ কাজটি শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত অন্তরও এতে সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিরোধ না করে। সুতরাং যদি উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করে; কিন্তু মন তাতে বিরোধ করে এবং সে বিরোধের মুখে সবর করে, তবে এরূপ ব্যক্তিকে দানশীল বলা হবে না; বরং দানশীল হওয়ার চেষ্টাকারী বলা হবে। এ বিষয়টি কোন্ ব্যয় ওয়াজিব, তা চিনার উপর নির্ভরশীল। জানা উচিত যে, ওয়াজিব ব্যয় দু'রকম। এক, যা শরীয়তের নির্দেশে ওয়াজিব। যেমন, যাকাত দেয়ার জন্যে ব্যয় করা। দুই, যা আভিজাত্য ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করে জরুরী।

অতএব দানশীল সেই হবে, যে তার ধন-সম্পদকে না শরীয়তের ওয়াজিব থেকে আটকে রাখে এবং না অভ্যাস ও ভদ্রতার জরুরী বিষয়াদি থেকে আটকে রাখে। যদি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে ত্রুটি করে, তবে সে হবে কৃপণ। কিন্তু যে শরীয়তের ওয়াজিব আদায় করবে না, সে হবে অধিক কৃপণ। উদাহরণতঃ কেউ ধন-সম্পদের যাকাত দেয় না অথবা নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ আদায় করে না, তাকে কৃপণ মনে করতে হবে। কিংবা ধন দেয়ার সময় কেউ বেছে বেছে খারাপটি দেয়। এটাও কৃপণতাই। ভদ্রতার কারণে যে ব্যয় জরুরী, তা হল সামান্য সামান্য বিষয়ে সংকোচন নীতি অবলম্বন করা। এটি অত্যন্ত খারাপ কথা। এটা অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কতক বিষয়ে ধনী ব্যক্তির সংকোচন নীতি খারাপ মনে হয়, ফকীরের নয়। কিংবা পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের সাথে সংকোচন নীতি অবলম্বন করা খারাপ মনে হয়— বেগানাদের সাথে খারাপ মনে হয় না। পড়শীর সাথে সংকোচন নীতি দূরবর্তীদের তুলনায় খারাপ মনে হয়। তদ্রূপ অতিথি সেবায় সংকোচন নীতি ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য কাজ-কারবারের তুলনায় খারাপ মনে হয়।

অতএব কৃপণ তাকে বলা হয়, যে ধনকে এমন জায়গায় ব্যয় করা থেকে আটকে রাখে, যেখানে শরীয়তের নির্দেশে অথবা ভদ্রতার দাবীর কারণে আটকে রাখা উচিত নয়।

সারকথা, যে ব্যক্তি শরীয়তের ওয়াজিব ও ভদ্রতার ওয়াজিব আদায় করে, সে কৃপণতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তবে দানশীলতার গুণে তখন গুণান্বিত হবে, যখন এই পরিমাণের চেয়ে বেশী ব্যয় করবে। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্তবা এতেই পাওয়া যায়। সুতরাং যে স্থানে শরীয়তের দৃষ্টিতে ধন ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, সেখানে যার মনে ব্যয় করার যে পরিমাণ অবকাশ থাকবে, সে সেই পরিমাণে দাতা হবে। বলা বাহুল্য, এর স্তর অসংখ্য হতে পারে। এ কারণেই অনেকে অনেকের চেয়ে অধিক দাতা হয়ে থাকে। তবে দাতা হওয়ার জন্য শর্ত হল, মনের খুশীতে দান করা। খেদমত পাওয়ার আশায় অথবা প্রতিদান, শোকর ও প্রশংসা লাভের আকাংখায় যারা দান করে, সে দাতা নয়; বরং সে ধন দিয়ে প্রশংসা ক্রয় করে নেয়। সুতরাং তাকে সওদাগর ও ব্যবসায়ী বলা উচিত। কারণ, নিঃস্বার্থ ব্যয়কেই দান বলা হয়। বাস্তবে এ ধরনের দান আল্লাহ্ পাকের সত্তা ছাড়া অন্য কারও

জন্যে সম্ভব নয়। তবে মানুষকে দাতা বলা হয় রূপক অর্থে। কারণ, তার কোন ব্যয় স্বার্থমুক্ত হয় না। কিন্তু সে স্বার্থ যদি কেবল আখেরাতের সওয়াব এবং কৃপণতার কলুষতা থেকে নিজেকে পবিত্র করা হয়, তবেই তাকে দানশীল বলা হবে।

কৃপণতার প্রতিকার কেমন করে সম্ভব ঃ পূর্বেই জানা গেছে, কৃপণতার কারণ হচ্ছে ধন-সম্পদের মহব্বত। এখন জানা দরকার যে, ধন-সম্পদের মহব্বতের কারণ দুটি। প্রথম কারণ খাহেশপ্রীতি। ধন-সম্পদ ছাড়া এটা অর্জিত হতে পারে না। এতে অনেক দিন বেঁচে থাকার আশাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষ যদি জানতে পারে, সে আগামীকাল মারা যাবে, তবে ধন-সম্পদের কৃপণতা না করার সম্ভাবনাই বেশী। যে পরিমাণ ধন মানুষের একদিন, একমাস অথবা এক বছরের জন্যে যথেষ্ট, তা স্বল্প পরিমাণই বটে। এর বেশী ধন রাখা অনর্থক। মাঝে মাঝে বেশী আশা এভাবে হয় যে, নিজের জীবনের আশা তো বেশী হয় না, কিন্তু সন্তানদের রিযিকের চিন্তা যত বেশী করে, ততই কৃপণতাও শক্তিশালী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ স্বয়ং ধন-সম্পদই ভাল মনে হওয়া। উদাহরণতঃ কোন কোন লোকের কাছে এত বেশী ধন-সম্পদ থাকে যে, নিজের নিয়মানুযায়ী ব্যয় করলে সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট হয় এবং হাজারো বেঁচে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান হয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও যাকাত দিতে মন চায় না। নিজে অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসায়ও ব্যয় করা ভাল মনে করে না। কেননা, সে টাকা-পয়সার প্রেমিক। টাকা-পয়সা হাতে থাকাটা তার কাছে অত্যন্ত প্রশস্তিকর বিবেচিত হয়। তাই একে মাটিতে পুঁতে রাখে। অথচ জানে, মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে কিংবা শত্রুর হস্তগত হবে। অন্তরের এ রোগটির প্রতিকার খুব কঠিন। বিশেষত বার্ধক্যে তো এটা দুরারোগ্যই বটে। এ রোগীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ কারও প্রেমে পড়ে এবং তার সাথে তার দূতকেও ভালবাসতে থাকে। এরপর দূতের মহব্বতে এমন মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আসল প্রেমাস্পদকে ভুলে যায়। টাকা-পয়সাও অভাব-অনটনের দূত। এর কারণে অভাব-অনটন হাসিল হয়। তাই টাকা-পয়সা প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে অভাব-অনটনের প্রতি লক্ষ্যও থাকে না; কেবল টাকা-পয়সাকেই প্রিয় মনে করা হয়।

অতএব, খাহেশপ্রীতির চিকিৎসা হল, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এবং সবর করা। আর দীর্ঘ আশার প্রতিকার হচ্ছে হরদম মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং সমসাময়িকদের মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করা যে, তারা কেমন দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে এবং বিপদাপদ সহ্য করে অর্থকড়ি সঞ্চয় করেছে, কিন্তু শেষে খালি হাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। যদি সন্তান-সন্ততির ভাবনা অন্তরে থাকে, তবে চিন্তা করবে, যে সৃষ্টিকর্তা ছেলে দিয়েছেন, তিনি তার রিযিকও দিয়েছেন। অনেক সন্তানের কাছে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা পিতা-মাতার কাছ থেকে সম্পত্তিপ্রাপ্ত সন্তানদের চেয়ে অনেক বেশী সচ্ছল হয়ে থাকে। আর এটাও জানার কথা যে, সন্তানদের জন্যে অর্থ সঞ্চয়ের পিছনে নিয়ত এটাই থাকে যে, তাদের অবস্থা ভাল থাকুক। কিন্তু কখনও এর বিপরীত অবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সন্তান যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, তবে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট। আর যদি পাপাচারী হয়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি যা পাবে, তা গোনাহের কাজে উড়িয়ে দেবে এবং এর শাস্তি পিতাকেও ভোগ করতে হবে।

কৃপণতার এক প্রতিকার এটাও যে, কৃপণতার নিন্দায় ও দানশীলতার প্রশংসায় যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা কৃপণের জন্যে যেসব শাস্তি ও কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আরও একটি উপকারী চিকিৎসা এই যে, কৃপণদের অবস্থা চিন্তা করবে এবং তাদেরকে ঘৃণা করবে। এমন কোন কৃপণ নেই, যে অপরের কৃপণতাকে খারাপ মনে না করে। সুতরাং চিন্তা করবে যে, যদি আমি কৃপণতা করি, তবে অপরের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাব; যেমন আমার কাছে অন্য কৃপণ হেয় ও নিকৃষ্ট।

আরও একটি তদবীর এই যে, ধন-সম্পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এটা সৃষ্টি করার কারণ কি? যখন জানা যাবে, ধন-সম্পদ কেবল অভাব-অনটন পূরণের জন্যে সৃজিত হয়েছে, তখন যতটুকু অভাব পূরণে যথেষ্ট, সে পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করবে, অর্থাৎ, ব্যয় করে সওয়াবের ভান্ডার গড়ে তুলবে। এ পর্যন্ত বর্ণিত সবগুলো প্রতিকার এলম তথা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ বুদ্ধির জোরে যখন জানবে যে, ব্যয় করা আটকে রাখার তুলনায় দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গলজনক, তখন সে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহিত হবে। কিন্তু

এটা অপরিহার্য যে, ব্যয় করার কল্পনা অন্তরে আসার সাথে সাথে অবিলম্বে তা বাস্তবায়িত করবে— টালবাহানা করবে না। কেননা, শয়তান সর্বক্ষণ দারিদ্র্যের ভয় দেখাতে থাকে এবং ব্যয় করতে বাধা দেয়। বর্ণিত আছে, আবুল হাসান পুশঙ্গী (রহঃ) একদিন পায়খানায় বসা ছিলেন, এমন সময় এক শিষ্যকে ডেকে বললেন ঃ আমার জামাটি শরীর থেকে খুলে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। শাগরেদ আরয করল ঃ আপনি পায়খানা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতে পারলেন না? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে জামা দিয়ে দেয়ার কথা মনে পড়েছে। আমি নফ্সের তরফ থেকে আশংকা করি যে, সে এই কল্পনা বদলে দেবে। তাই অবিলম্বে কল্পনাটি বাস্তবায়িত করছি।

কৃপণতার স্বভাবটি তখনই দূরীভূত হয়, যখন মনের উপর জোর দিয়ে ব্যয় করার অভ্যাস করা হয়। যেমন, প্রেমাস্পদ সামনে থাকা পর্যন্ত প্রেম দূরীভূত হয় না। হাঁ, যদি প্রেমাস্পদ থেকে বিছিন্ন হওয়া যায় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনের উপর জোর দিয়ে বিরহে সবর করা হয়, তবে ক্রমান্বয়ে অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কৃপণতার চিকিৎসা করতে চায়, তার উচিত, ধন-সম্পদ থেকে মনের উপর জোর দিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলা। বলা বাহুল্য, আদর করে রেখে দেয়ার চেয়ে সমুদয় ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দেয়া উত্তম।

কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি সূক্ষ্ম কৌশল রয়েছে। তা হল নফ্সকে এই বলে ধোকা দেয়া যে, লেনদেন করলে তোর সুখ্যাতি হবে এবং দাতা বলে খ্যাত হবে। এভাবে রিয়া তথা লোক-দেখানোর ইচ্ছায় ব্যয় করবে। এতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কৃপণতা দূর করে রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে রিয়া দূর করে নিতে হবে। মোটকথা, ধন-সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার পর নাম ও সুখ্যাতি মানুষের সান্ত্বনার বিষয়। উদাহরণতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ ছাড়ানোর সময় পাখী ইত্যাদির সাথে খেলা লাগিয়ে দেয়া হয়, যাতে দুধের কথা মনে না করে। এটা উদ্দেশ্য থাকে না যে, সারা জীবনই পাখী নিয়ে খেলা করবে। বরং যখন দুধের কথা ভুলে যায়, তখন এ খেলা থেকেও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়। কিন্তু এই চিকিৎসা এমন ব্যক্তির জন্যই উপকারী, যার মধ্যে রিয়ার তুলনায় কৃপণতা প্রবল। এমতাবস্থায় যেন শক্তিশালী গুণটিকে দুর্বল

গুণ দ্বারা বদলে দেয়া হবে। কিন্তু যদি রিয়া ও কৃপণতা উভয়টি সমান হয়, তবে এ চিকিৎসায় তার কোন উপকার হবে না। এর পরীক্ষা এই যে, যদি লোক-দেখানো ভাবে ব্যয় করা তার জন্যে কঠিন মনে না হয়, তবে রিয়া গুণটি প্রবল বলে জানতে হবে। আর যদি লোক-দেখানো ভাবেও ব্যয় করা তার কাছে কঠিন মনে হয়, তবে কৃপণতা প্রবল বলে জানতে হবে।

রিয়া, কৃপণতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলো যে একটি অপরটির দ্বারা দূর হয়ে যায়, এর দৃষ্টান্ত এরূপ বুঝা উচিত যে, কবরে মৃতের সমস্ত অংশ কৃমি তথা কীট হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ এটাই যে, এসব কীট একে অপরকে খেয়ে বড় হয় এবং সংখ্যা হ্রাস পায়। অবশেষে এদের মধ্যে দু'টি শক্তিশালী কীট থেকে যায়। এরপর এরাও পরস্পর লড়াই করতে থাকে এবং পরিশেষে একটি প্রবল হয়ে অপরটিকে হজম করে ফেলে। এরপর নিজেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। এমনিভাবে মন্দ স্বভাবগুলোর মধ্যেও এটা সম্ভব যে, সবল স্বভাবটি দুর্বল স্বভাবকে খেয়ে ফেলবে এবং অবশেষে একটিই থেকে যাবে। এই একটিকে খতম করার উপায় হচ্ছে তার খোরাক বন্ধ করে দেয়া। মন্দ-স্বভাবের খোরাক বন্ধ করার অর্থ সেই স্বভাবের দাবী অনুযায়ী কাজ না করা। অর্থাৎ, কোন মন্দ স্বভাব যেসব কাজ করতে চায়, তা কখনও না করা। এভাবে তার খোরাক বন্ধ করে দিলে সেই স্বভাবটি দুর্বল হয়ে মরে যাবে। উদাহরণতঃ কৃপণতার দাবী হচ্ছে ধন আটকে রাখা এবং ব্যয় না করা। কেউ যখন এর খেলাফ করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে বারবার ব্যয় করবে, তখন কৃপণতা মরে যাবে এবং ব্যয় করার স্বভাব মজ্জাগত হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত আমলের মাধ্যমে কৃপণতার প্রতিকার বর্ণিত হল।

কিন্তু কৃপণতা স্বভাবটি মাঝে মাঝে এত শক্তিশালী হয় যে, মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ফলে, মানুষ এর অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং দানশীলতার উপকারিতাও বুঝে না। যখন এ দু'টি বিষয়ের জ্ঞানই অর্জিত হয় না, তখন আগ্রহ কোথা থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় এ রোগটি চিরস্থায়ী হয়ে যায়। যেমন, কোন রোগীর মধ্যে ঔষধের যথার্থ ব্যবহার সম্ভবপর না হলে তার মৃত্যুর জন্যে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

ধন-সম্পদ সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে কল্যাণ এবং একদিক দিয়ে অনিষ্ট। এটা যেন

সাপের মত। যারা মন্ত্র জানে, তারা সাপকে ধরে তার মধ্য থেকে বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী পাথরটি বের করে নেয়, যা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি একে ধরলে তার মারাত্মক বিষে অঘোরে প্রাণ হারায়। নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় লক্ষ্য না রাখলে ধন-সম্পদের বিষ থেকে কেউ আত্মরক্ষা করতে পারে না।

প্রথমত, ধন-সম্পদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ জানতে হবে। এটা জানা হয়ে গেলে মানুষ যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই জীবিকা উপার্জন করবে এবং ততটুকুরই হেফাযত করবে।

দ্বিতীয়ত, উপার্জনের পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যা পুরোপুরি হারাম, তা থেকে বেঁচে থাকবে। যা বেশীর ভাগ হারাম কিংবা মকরূহ, তা থেকেও বিরত থাকবে। উদাহরণতঃ কোন ঘুষখোরের হাদিয়া গ্রহণ করা এবং মানুষের কাছে হাত পেতে কোন কিছু গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, জীবিকার পরিমাণের প্রতি খেয়াল রাখবে, যাতে প্রয়োজনের বেশীও না হয়, কমও না হয়। প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এদের প্রত্যেকটির তিনটি করে স্তর রয়েছে- নিম্ন, উচ্চ ও মধ্যবর্তী স্তর।

চতুর্থত, ব্যয়ের খাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। হালাল উপার্জনকে হালাল খাতেই ব্যয় করবে।

পঞ্চমত অর্থ অর্জন, বর্জন, ব্যয় ও আটকে রাখার ক্ষেত্রে নিয়ত ঠিক রাখবে। অর্থাৎ যে অর্থ অর্জন করবে, তাতে এবাদতে সাহায্য লাভের নিয়ত করবে এবং যে অর্থ বর্জন করবে তাতে সংসার নির্লিপ্ততা ও ধন-সম্পদের নিকৃষ্টতার নিয়ত করবে। এরূপ করলে ধন-সম্পদের উপস্থিতি ক্ষতিকর হবে না।

এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেয় এবং নিয়ত আল্লাহ তা'আলার খাতিরেই হয়, তবু সে সংসারত্যাগীই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ বর্জন করে এবং "আল্লাহর খাতিরে" নিয়ত না হয়, তবে সে সংসারত্যাগী হবে না। সুতরাং মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি ও স্থিরতা আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া উচিত। অর্থাৎ, গতি ও স্থিতি সেটাই করবে, যা এবাদত কিংবা এবাদতে সহায়ক। দেখ, এবাদতের সর্বাধিক পরিপন্থী কাজ হচ্ছে খাওয়া ও পায়খানা করা। কিন্তু এগুলোর দ্বারাও এবাদতে সহায়তা

হয়। সুতরাং যদি কেউ সহায়তার নিয়তে আহার ও পায়খানা করে, তবে এগুলো তার জন্যে এবাদত হিসাবে লেখা হবে। এমনিভাবে জামা, পায়জামা, বিছানা, পাত্র ইত্যাদির হেফাযতেও এই নিয়ত রাখা উচিত। কেননা, ধর্মকর্মে এগুলোরও প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধন-সম্পদ থাকে, তাতে আল্লাহর কোন বান্দার উপকার করার নিয়ত করবে। সুতরাং কোন সময় কেউ এরূপ বস্তু চাইলে তাকে দিতে অস্বীকার করবে না।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলবে, ধন-সম্পদের আধিক্য তার জন্যে ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু এটা সে-ই অর্জন করতে পারে, যে ধর্মকর্মে পাকাপোক্ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তারা এই মনে করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে যে, কতক সাহাবী বিত্তশালী ছিলেন এবং তাদের কাছে অগাধ ধনরাশি ছিল। আমিও তেমনি অর্থ সঞ্চয় করি। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা সেই নির্বোধ বালকের মত, যে কোন তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকে সাপ ধরতে দেখে মনে করে, সে সুন্দর আকৃতি ও নরম ত্বকের কারণে সাপ ধরেছে। এরপর সে-ও তার দেখাদেখি সাপ ধরে এবং তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, সাপে কাটা ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে মরে গেছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ যাকে দংশন করে, সে মরে গেছে বলে জানা যায় না।

মোটকথা, পাহাড়ে চলাফেরা করা, নদীর তীরে ভ্রমণ করা এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে যেমন অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, তেমনি ধনসম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ আলেমের সমান হতে পারে না।

প্রাচুর্যের নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা ঃ জানা উচিত যে, শোকরকারী ধনীর মর্তবা উচ্চে, না সবরকারী দরিদ্রের মর্তবা উচ্চে এ বিষয়ে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে কেবল এতটুকু লিখতে চাই যে, প্রাচুর্যের তুলনায় দারিদ্র্যই মোটামুটি উত্তম। দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে আমরা হারেছ মুহাসেবী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি, যা তিনি জনৈক ধনী আলেমের বক্তব্যের জওয়াবে এক পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেছেন। ধনী আলেম তার ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রমাণ স্বরূপ সাহাবায়ে

কেরামের প্রাচুর্য এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করে নিজেকে তাদের সাথে তুলনা করেছিলেন।

এলমে মোয়ামালায় হারেছ মুহাসেবীর জুড়ি নেই। নফসের দোষ-ত্রুটি, আমলের বিপদাপদ এবং এবাদতের স্বরূপ তিনি যতটুকু লিখেছেন অন্য কেউ ততটুকু লিখেননি। তিনি প্রথমে বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি হযরত ঈসা (আঃ) মন্দ আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন—হে মন্দ আলেমগণ, তোমরা নামায পড়, রোযা রাখ এবং দান-খয়রাত কর। কিন্তু যা করতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তা কর না। তোমরা নিজে যা কর না, তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমাদের এ কাজ খুবই মন্দ। বাহ্যত তোমরা মুখে তওবা কর, কিন্তু অন্তরে রিপুর কামনা-বাসনা অনুযায়ী আমল কর। বাহিরকে পাকসাফ রেখে অন্তরকে নাপাক রাখা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আমি সত্য বলছি, তোমরা চালনির মত হয়ো না, যার ভিতর দিয়ে উত্তম আটা বের হয়ে যায় এবং ভুষি থেকে যায়। তোমাদের মুখ দিয়েও প্রজ্ঞার কথাবার্তা বের হয় কিন্তু অন্তর আবর্জনায় পূর্ণ। হে দুনিয়ার সেবাদাসরা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে তার খাহেশ ও আগ্রহ ছিন্ন করে না, সে আখেরাত কিরূপে পাবে? আল্লাহর কসম, তোমাদের অন্তর তোমাদের আমল দেখে কাঁদে। দুনিয়াকে তোমরা জিহ্বার নিচে রেখেছ এবং আমলকে পায়ের নিচে। তোমাদের কাছে দুনিয়ার কল্যাণ আখেরাতের কল্যাণ অপেক্ষা উত্তম। তোমরা নিজেদের আখেরাত বরবাদ করেছ। তোমরা আর কতদিন অন্ধকারের পথিকদেরকে পথ বলে দেবে এবং নিজেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। মনে হয়, তোমরা দুনিয়াদারদের হাত থেকে দুনিয়াকে এজন্যে ছাড়িয়ে নাও, যাতে সবটুকু দুনিয়াই তোমাদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। যদি তোমাদের মুখ থেকে এলমের নূর বের হয় এবং অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তবে এতে লাভ কি? হে দুনিয়ার দাসরা, তোমরা পরহেযগার নও— স্বাধীনচেতা বুযুর্গগণের মতও নও। অতএব, আশ্চর্যের কি থাকতে পারে যদি দুনিয়া তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে উপুড় করে মাটিতে নিক্ষেপ করে এবং এমনি অবস্থায় হেঁচড়াতে শুরু করে। তোমাদের পাপ তোমাদের মাথার কেশ ধরে রাখবে এবং এলম পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেবে। এরপর তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবে। সেখানে না থাকবে কোন সঙ্গী, না থাকবে কোন

সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। অতঃপর সেখানে তোমরা নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

এরপর হারেছ মুহাসেবী বলেন ঃ এ হচ্ছে আলেমদের অবস্থা। এরাই মানুষরূপী শয়তান এবং সকল ফেতনার কারণ। এরা দুনিয়া তথা জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদার লোভে আখেরাতকে ত্যাগ করেছে এবং ধর্মকে অপমানিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা নিজের কৃপায় ক্ষমা না করলে এরা আখেরাতে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর জানা দরকার, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিমজ্জিত থাকে, আমি দেখেছি, তার আনন্দ অমলিন নয়। সে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টে জড়িত থাকে এবং তার দ্বারা বিভিন্ন পাপকর্ম সম্পাদিত হয়। পরিণামে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া সে কিছুই পায় না। সে আশায় আশায় সুখী থাকে; কিন্তু না পায় দুনিয়া, না ধর্ম ঠিক থাকে।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

অর্থাৎ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

আহা! এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হবে। ভাইসব, আল্লাহকে ধ্যান কর, শয়তানের চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ো না এবং শয়তানের বন্ধুদের ধোকায় পড়ো না। যারা মিথ্যা দলীলের ভিত্তিতে দুনিয়া অর্জন করার কাজে ডুবে রয়েছে, তারা এ জন্যে এই ওযর পেশ করে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের কাছেও বিপুল ধনরাশি ছিল। এটা এ জন্যে করে, যাতে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ে মানুষ তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে কর। অথচ এটা শয়তানের একটি কুমন্ত্রণা, যা তারা টের পাচ্ছে না। হে হতভাগারা, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পত্তির প্রমাণ পেশ করা তোমাদের জন্যে শোভা পায় না। শয়তান তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তোমাদের মুখ থেকে এই প্রমাণ বের করায়। কেননা, যখন তোমরা বল, সাহাবায়ে কেরাম অগাধ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, তখন তাদের গীবত করে এবং তাদের প্রতি দোষারোপ কর। আর যখন বল, হালাল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা তা বর্জন করার চেয়ে উত্তম, তখন তোমরা যেন রসূলে করীম (সাঃ) ও পয়গম্বরগণকে ভ্রান্ত ও অজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন কর, আর বল যে, তাঁরা অযথাই

সংসারবিমুখতা অবলম্বন করেছিলেন। ধন-সঞ্চয়ের যে তত্ত্ব তোমরা আবিষ্কার করেছ, তা তারা বুঝতে সক্ষম হননি। অন্যথায় তোমাদের মত তাঁরাও ধন-সঞ্চয় করতেন। তোমাদের বক্তব্য থেকে এ কথাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; অর্থাৎ, তিনি অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তোমাদের ধারণায় অর্থ সঞ্চয় করা উম্মতের জন্যে অধিক কল্যাণকর। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন উম্মতকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা না দিয়ে ধোকা দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, তোমাদের এ সব বক্তব্য প্রলাপোক্তি ছাড়া কিছুই নয়। রসূলে করীম (সাঃ) উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

তোমরা অর্থ সঞ্চয় করাকে উত্তম বলে থাক। এ থেকে এটাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেননি। কারণ, তিনি আমাদেরকে অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থ সঞ্চয় করার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব একথা আল্লাহ তা'আলা জানতে পারলেন না এবং না জেনেই নিষেধ করে দিয়েছেন। আর তোমরা অর্থের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব চমৎকাররূপে জেনে নিয়েছ। তাই অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছ। আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ মূর্খতা থেকে রক্ষা করুন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধনরাশিকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী নয়। কিয়ামতের দিন তিনি নিজে বাসনা প্রকাশ করবেন যে, দুনিয়াতে যদি আমি কোনরূপে জীবনধারণ করার মত জীবিকা পেতাম, তবেই ভাল হত। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, যখন আবদুর রহমান ইবনে আওফের ওফাতের পর কোন কোন সাহাবী বললেন ঃ হযরত আবদুর রহমান যে ধন-সম্পদ ছেড়ে গেছেন, সে কারণে তার জন্যে আমাদের খুব ভয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, ভয় কিসের। তিনি হালাল ধন-সম্পদ উপার্জন করেছেন, হালাল পথে ব্যয় করেছেন এবং হালাল উপার্জন ছেড়ে গেছেন। হযরত কা'বের এই উক্তি কেউ গিয়ে আবুযর গেফারী (রাঃ)-এর কাছে বলে দিল। তিনি রাগে অস্থির হয়ে গেলেন এবং একটি চুলের রশি হাতে নিয়ে কা'বের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। কা'ব এ সংবাদ অবগত হয়ে পলায়ন করলেন এবং খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হয়ে

ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু যরও তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে হযরত উসমানের ঘরে আগমন করলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই কা'ব খলীফার পেছনে গিয়ে বসলেন। হযরত আবুযর তাঁকে লক্ষ্য করে সজোরে বললেন ঃ হে ইহুদীর বাচ্চা, তুমিই বলেছিলে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যে সম্পত্তি ছেড়ে গেছে, তাতে কোন দোষ নেই! অথচ রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে গমন করেন। সেখানে তিনি আমাকে ডাক দিলেন ঃ আবুযর! আমি জওয়াব দিলাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ (অর্থাৎ, আমি হাযির আছি)। তিনি বললেন ঃ

الاكثرون هم الاكثرون يوم القيامة الا من قال هكذا
وهكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه وهم قليل -

অর্থাৎ, অধিক ধনশালীই কিয়ামতের দিন স্বল্প পুঁজিবিশিষ্ট হবে, কিন্তু যে ডান হাতে ও বাম হাতে, অগ্রে ও পশ্চাতে এমন এমন করবে। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম হবে।

এরপর তিনি আবার আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি লাব্বায়েকা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড়ের সমান ধন-ভাণ্ডার থাকে, আমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করি. কিন্তু মৃত্যুর দিন তা থেকে দুটি যব পরিমাণও আমার পরে অবশিষ্ট থেকে যায়, এটাকে আমি ভাল মনে করি না। আমি আরয করলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি দুটি স্তূপের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ না, বরং দুটি যব অবশিষ্ট থাকার কথা বলছি। আমি তো কম বলি, আর তুমি বাড়িয়ে বল। এখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো একথা বলেন, আর তুমি ইহুদীর বাচ্চা হয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফের বিরাট সম্পত্তি ছেড়ে যাওয়ার ভেতরে কোন দোষ দেখতে পাও না! তুমিও মিথ্যুক এবং যে একথা মানে, সে-ও মিথ্যুক। হযরত আবুযরের এই স্পষ্টোক্তির জওয়াব কোন সাহাবী দেননি। তিনি তাঁর কথা বলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা আরও হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পণ্যবাহী উট এয়ামন থেকে ফিরে এসে মদীনায় হঠাৎ ধুমধাম ও

গোলমালের আওয়াজ শুনা যেতে লাগল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ গোলমাল কিসের? লোকেরা আরয করল ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের উট এসেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও রসূল সত্য বলেছেন। হযরত আবদুর রহমান এই সংবাদ পেয়ে এই হাদীসটি সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— আমি জান্নাতে মুহাজির ও মুসলমানদের মধ্যে যারা ফকীর, তাদেরকে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছি এবং ধনীদের কাউকে তাদের সাথে জান্নাতে যেতে দেখিনি। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়ে তাদের সাথে যাচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান এই হাদীস শুনে বললেন ঃ এই উটগুলো তাদের সমুদয় বোঝাসহ আল্লাহ্র ওয়াস্তে খয়রাত। আর যে সকল গোলাম এসব উটের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদেরকেও আমি মুক্ত করে দিলাম, যাতে ফকীরদের সাথে আমিও দৌড়ে জান্নাতে যেতে পারি।

আমরা আরও একটি রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, রসূলে করীম (সাঃ) একবার আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন ঃ আমার উম্মতের ধনীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে যাবে; কিন্তু সম্ভবত হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে।

হযরত আবদুর রহমান তাকওয়া, অনুগ্রহ ও আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয়ে অগ্রণী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর পবিত্র সংসর্গপ্রাপ্ত এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ধন-সম্পদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে ফকীরদের পিছনে পড়ে থাকবেন। অথচ এই ধন-সম্পদ তিনি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছিলেন, যাতে অপরের কাছে সওয়াল করতে না হয়। এই ধন-সম্পদ দ্বারা তিনি মানুষের উপকারও করেছেন। নিজের জন্যে মধ্যবর্তী পন্থায় ব্যয় করেছেন এবং আল্লাহ্র পথে বিস্তর লুটিয়েছেন। তবু তিনি জান্নাতে মুহাজির ফকীরদের সাথে দৌড়ে যেতে পারবেন না। তাঁরই যখন এই অবস্থা, তখন আমরা যারা দুনিয়ার ব্যস্ততায় নিমজ্জিত, আমাদের কি অবস্থা হবে?

আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সর্বদা সন্দেহযুক্ত ও হারাম ধন-সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং এই হাতের ময়লার জন্যে অন্যদের সাথে দম্ভ প্রদর্শন করতে থাক। তোমরা খাহেশ, সাজসজ্জা, আত্মগর্ব ও নানা ধরনের

অবাঞ্ছিত কাজে আবদ্ধ রয়েছ। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পদের প্রমাণ কেমন করে পেশ করতে পার? এটা শয়তানী তুলনা। শয়তান তার বন্ধুদেরকে এমনি ধরনের প্রমাণাদি তালীম দিয়ে থাকে।

এখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের, সাহাবায়ে কেরামের এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা বর্ণনা করে শুনাচ্ছি, যাতে তোমরা নিজেদের নিকৃষ্টতা ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে পার। জানা উচিত যে, কোন কোন সাহাবীর কাছে অর্থ-সম্পদ থাকার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অপরের কাছে সওয়াল না করা এবং আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করা। তাঁরা হালাল উপায়ে উপার্জন করেছেন, পবিত্র ধন ভোগ করেছেন এবং মধ্যবিত্তের ন্যায় পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করেছেন। তারা দুনিয়াতে কারও হক নষ্ট করেননি এবং কার্পণ্য করেননি; বরং নিজেদের অধিকাংশ ধন-সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে দান করেছেন। কোন কোন সাহাবী তাদের সমুদয় অর্থই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরাও কি তেমনি? না, তোমরা এরূপ হতে যাবে কেন? বিশ্ব-জাহানের সাথে সামান্য মাটির কি তুলনা?

এছাড়া অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন দারিদ্র্যপ্রিয়, নিঃস্বতার ভয় থেকে মুক্ত, জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, তাকদীরে সন্তুষ্ট, বিপদাপদে সম্মত, নেয়ামতের শোকরকারী, দুঃখ-কষ্টে সবরকারী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং গর্ব ও অহংকার থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন বল, তোমরাও কি তেমনি?

তাঁদের নীতি ছিল দুনিয়ার ঐশ্বর্য তাঁদের হাতে এসে গেলে তাঁরা দুঃখ করে বলতেন— মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা কোন গোনাহের আযাব দুনিয়াতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার আগমনকে শাস্তি মনে করতেন। পক্ষান্তরে যখন দারিদ্র্যকে আসতে দেখতেন, তখন খুশী হয়ে বলতেন—ভাল হয়েছে। সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য আমরা প্রাপ্ত হয়েছি।

বর্ণিত আছে, জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ সকাল বেলায় ঘরে কিছু সামগ্রী দেখলে দুঃখিত ও বিষণ্ন হতেন, আর গৃহে কিছু না থাকলে প্রফুল্ল হতেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ তো ঘরে কিছু না থাকলে দুঃখ করে এবং থাকলে খুশী থাকে। আপনার অবস্থা এর বিপরীত কেন? তিনি

বললেন ঃ কারণ, আমি সকাল বেলায় উঠে যখন পরিবার-পরিজনের কাছে কিছু না দেখি, তখন এই ভেবে আনন্দিত হই যে, আজ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ নসীব হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন ঘরে কিছু থাকে, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ না হওয়ার কারণে দুঃখিত হই। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা ছিল এই। আমরা এখানে কমই লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অসংখ্য ও অগণিত। এখন তোমরা বল, তোমাদের অবস্থাও কি তেমনি? নাউযুবিল্লাহ, তোমরা এরূপ হবে কেন? তোমাদের অবস্থা তো সম্পূর্ণ তাদের বিপরীত। তোমরা প্রাচুর্যে ঔদ্ধত্য কর, সহজলভ্যতায় গর্ব কর এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বিলাসিতা কর এবং নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতায় গাফেল হয়ে যাও। বিপদ এলে তোমরা ক্রুদ্ধ হও এবং নিঃস্বতায় নিরাশ হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর বিধি-বিধানে খুশী নও। দারিদ্র্যকে খারাপ মনে কর এবং মিসকীনীর কারণে অতিষ্ঠ হয়ে যাও। অথচ মিসকীনীর কারণে পয়গম্বরগণ গর্ব করতেন। তাঁদের গর্বের বস্তু তোমাদের কাছে মন্দ। দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে থাক। এতেও আল্লাহর প্রতি কুধারণা করা হয় এবং তিনি রিযিক পৌঁছানোর যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তা বিশ্বাস না করা জরুরী হয়ে পড়ে। এতটুকু গোনাহ কি কম? আমার মনে হয়, তোমরা দুনিয়ার আনন্দ, কামনা-বাসনা এবং জাঁকজমক অর্জনের জন্যেই ধন-সম্পদ সঞ্চয় কর। অথচ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দুষ্ট লোক তারাই, যারা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং এতেই তাদের বপু ফুলে-ফেঁপে উঠে। জনৈক আলেম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু লোক তাদের পুণ্যসমূহ দেখতে চাইবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا -

অর্থাৎ, তোমরা পার্থিব জীবনেই তোমাদের পবিত্র বস্তুসমূহ বিনষ্ট করেছ এবং সেখানেই ভোগ করেছ।

অর্থাৎ তোমরা কি জান না যে, দুনিয়ার নেয়ামতের কারণে আখেরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছ? জিজ্ঞাসা করি, এর চেয়ে বেশী বিপদ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হবে?

আশ্চর্য নয় যে, তোমরা গর্ব, অহংকার ও জাগতিক সাজসজ্জার জন্যে ধনৈশ্বর্য সঞ্চয় কর। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি গর্ব, অহংকার ও প্রাচুর্যের জন্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, সে আল্লাহর কাছে এমনভাবে যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। হয়তো বা আল্লাহর কাছে যাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে থাকা তোমাদের কাছে উত্তম। এ কারণেই আল্লাহর দীদারকে খারাপ মনে কর। অথচ আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ কর। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَسَفَ عَلٰى دُنْيَا فَاتَتْهُ اِقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةَ سَنَةٍ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়া ফওত হয়ে যাওয়ার কারণে অনুতাপ করে, সে এক বছরের পথ পরিমাণ দোযখের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

কিন্তু অনুতাপ করলে যে আযাব নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তোমাদের এ বিষয়ে পরওয়া নেই। বরং আশ্চর্য নয় যে, দুনিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তোমরা দ্বীন থেকেও বের হয়ে যাবে। দুনিয়ার আগমনে তোমরা আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে যাও। তোমাদের খবর নেই যে, হাদীসে বলা হয়েছে —

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسُرَّ بِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ -

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে ভালবাসে এবং তাকে নিয়ে আনন্দ করে, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দুনিয়া হ্রাস পাওয়ার তুলনায় গোনাহের বিপদ তোমাদের কাছে হালকা মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা, তোমরা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ভয় বেশী কর এবং গোনাহের কম। হাতের এই ময়লা থেকে যা কিছু দীন-দুঃখীকে দান কর, তাও উচ্চ মর্যাদা ও অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিয়তেই দান কর। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেও মানুষ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক এবং তোমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুক, এই থাকে তোমাদের কামনা। অর্থাৎ, কিয়ামতে আল্লাহ তোমাদেরকে হেয় জ্ঞান করুন—এটা দুনিয়াতে মানুষের হেয় জ্ঞান করার তুলনায় তোমাদের কাছে সহজতর।

নিজেদের দোষত্রুটি মানুষের কাছে গোপন রাখ; কিন্তু আল্লাহ যে জানেন, তার পরওয়া নেই। মানুষের কদর যেন তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে বেশী। নাউযুবিল্লাহ। যখন এতগুলো দোষ তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং এমন সব আর্বজনার সাথে তোমরা জড়িত, তখন জ্ঞানীদের সামনে কোন্ মুখে বল, তোমাদের ধন-সম্পদও আল্লাহর নেক বান্দাদের ধন-সম্পদের মত? অথচ তোমরা কোথায় এবং তারা কোথায়? তারা তো হালাল সম্পদের প্রতিও এতটুকু বিমুখ ছিলেন, যা তোমরা হারাম সম্পদের প্রতিও নও। তাদের দ্বারা সগীরা গোনাহ হয়ে গেলে তারা তাকে এতবড় মনে করতেন, যা তোমরা কবিরা গোনাহকেও কর না। যদি তোমাদের হালাল ও পবিত্র ধন-সম্পদ তাদের সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের মতও হত, তবে তা হত ভাগ্যের কথা। হায়, তোমরা যদি তোমাদের কুকর্মের কারণে এতটুকু ভীত হতে, যতটুকু তারা তাঁদের সৎকর্ম কবুল না হওয়ার ভয়ে ভীত হতেন। অথবা তোমাদের রোযা রাখা যদি তাঁদের রোযা না রাখার সমান হত! অথবা তোমাদের পরিশ্রম তাঁদের এবাদতের অলসতা ও ঘুমের সমতুল্য হত! অথবা তোমাদের সমস্ত নেকী তাদের একটি নেকীরই সমান হত! এক রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক সাহাবী বলেন ঃ সিদ্দীকগণ থেকে যে পরিমাণ দুনিয়া ফওত হয়ে যায় এবং আলাদা থাকে, সে পরিমাণে তাদের জন্যে সেটা আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন নয়, সে তাদের সঙ্গী দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়।

এখন দেখা উচিত যে, উভয়পক্ষের পার্থক্য কতটুকু। এক পক্ষ সাহাবায়ে কেরাম, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে উচ্চ মর্তবার অধিকারী এবং অপরপক্ষ তোমরা এবং তোমাদের মত লোক, যারা নিম্নতম মর্যাদার অধিকারী; কিন্তু যদি আল্লাহ পাক নিজের কৃপায় ক্ষমা ও মার্জনা করেন।

হে উদ্ধত, তোমরা বল, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণেই তোমরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে থাক, যাতে সওয়ালের প্রয়োজন না থাকে এবং আল্লাহর পথে দান করা যায়। তোমাদের চিন্তা করা উচিত, সাহাবায়ে কেরামের আমলে হালাল উপার্জন যতটুকু সহজলভ্য ছিল, বর্তমান যুগে তা আছে কি না। তাঁরা হালাল উপার্জনে যে পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন, তোমাদের দ্বারা তা সম্ভবপর কি না। আমি কোন এক সাহাবী

সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলতেন ঃ আমরা হালাল উপায়ের সত্তরটি পথ একারণে বর্জন করতাম যে, কোথাও হারামে লিপ্ত হয়ে না পড়ি! তোমরাও কি নিজেদের তরফ থেকে এ ধরনের সাবধানতার আশা কর? আল্লাহর কসম, তোমরা এমন সাবধানতা অবলম্বন করবে— তা আমি কখনও আশা করি না। নিশ্চিত জেনো, অনুগ্রহ ও সৎকর্মের জন্যে ধন সঞ্চয় করা শয়তানের একটি প্রতারণা। সে অনুগ্রহ ও দান-খয়রাতের বাহানায় তোমাদেরকে সন্দেহযুক্ত ও হারাম মিশ্রিত ধন উপার্জনে লাগিয়ে দিতে চায়। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দুঃসাহস করে সন্দেহযুক্ত কাজ করে, তার হারামে পড়ে যাওয়া খুব নিকটবর্তী।

হে গর্বিত, তোমাদের জানা দরকার যে, সন্দেহযুক্ত বস্তু উপার্জন করে আল্লাহর পথে দান করার তুলনায় সর্বক্ষণ সন্দেহে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করা উত্তম, যাতে আল্লাহ পাকের সামনে সম্মান ও মর্তবা উচ্চ হয়। সেমতে আলেমগণ বলেন ঃ যদি এক ব্যক্তি হালাল না হওয়ার আশংকায় এক টাকা ত্যাগ করে, তবে এটা তার জন্যে সন্দেহযুক্ত এক হাজার আশরফী দান করার তুলনায় উত্তম। তোমরা যদি নিজেদেরকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু মনে কর, যে কারণে শয়তান তোমাদেরকে ধোকা দিতে পারবে না, তবে আমি বলি, তোমরা মুত্তাকী হলেও কিয়ামতের হিসাব নিজেদের উপরে রাখা উচিত নয়। কেননা, শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ কিয়ামত দিবসে! জিজ্ঞাসাবাদকে ভয় করতেন। সেমতে জনৈক সাহাবী বলেন ঃ যদি আমি প্রত্যহ এক হাজার আশরফী হালাল উপায়ে উপার্জন করি এবং সমস্তই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেই— এতে আমার জামাতের নামাযও বিঘ্নিত না হয়, তবু এরূপ দান-খয়রাত আমি পছন্দ করি না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ নিঃস্ব থাকলে আমি কিয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে যাব। ধনীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে—হে বান্দা! বল, কোথা থেকে তুমি উপার্জন করলে? কোথায় ব্যয় করলে? অতএব দেখ, এরা ছিলেন মুত্তাকী। সে যুগে হালাল বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও হিসাবের ভয়ে তাঁরা ধন-সম্পদ বর্জন করেছেন। আর তোমরা যে যুগে আছ, সে যুগে তো হালালের অস্তিত্বই নেই। অতএব, তোমরা কি সঞ্চয় করছ? কোন কোন সাহাবী তো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদও এই ভয়ে গ্রহণ করতেন না যে, কোথাও অন্তরে পরিবর্তন ও ভ্রষ্টতা এসে না

যায়। তোমরা কি নিজেদের অন্তরকে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক মুত্তাকী মনে কর? এরূপ মনে করলে তোমরা নফসে আম্মারার প্রতি খুব সুধারণা পোষণ করছ বলতে হবে। আমরা উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলছি, প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়েই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সৎকর্ম করার উদ্দেশ্যে ধন সঞ্চয় করে হিসাবের সম্মুখীন না হওয়া উচিত। হাদীসে আছে—যাকে হিসাবে জড়িত করা হবে, সে আযাবে পতিত হবে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে, যে হারাম উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং হারামেই ব্যয় করেছে। তাকে দোষখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ হবে। অতঃপর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে হারাম উপায়ে উপার্জন করেছে এবং হালাল খাতে ব্যয় করেছে। তাকেও দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ হবে। এরপর তৃতীয় এক ব্যক্তিকে আনা হবে, সে হালাল উপায়েই উপার্জন করেছে এবং হালাল পথেই ব্যয় করেছে। তাকে বলা হবে ঃ থাম, সম্ভবত তুমি ধন-সম্পদের অন্বেষণে অন্য কোন ফরয কর্মে ত্রুটি করেছ। উদাহরণতঃ সঠিক সময়ে নামায আদায় করনি। অথবা রুকু, সেজদা ও উযু পূর্ণরূপে করনি। সে আরয করবে ঃ ইলাহী! আমি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছি এবং হালাল পথেই ব্যয় করেছি। তোমার ফরযসমূহের মধ্যে কোন ফরযেও ত্রুটি করিনি। বলা হবে সম্ভবত তুমি ধন-সম্পদের কারণে অহংকার করেছ অথবা যানবাহন ও পোশাকে গর্ব প্রকাশ করেছ। সে আরয করবে—ইলাহী! আমি অহংকারও করিনি এবং কোনরূপ গর্বও প্রকাশ করিনি। এরশাদ হবে—হয়তো যাদের হক তোমার উপর ফরয ছিল, তাদের কিছু হক আত্মসাৎ করেছ অথবা আত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে কিছু দান করনি। সে বলবে ঃ ইলাহী! আমি হালাল উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন করেছি, হালাল পথে ব্যয় করেছি, তোমার কোন ফরয নষ্ট করিনি, অহংকার ও গর্বও করিনি এবং কারও হক আত্মসাতও করিনি। এরপরও তাকে বলা হবে—আমি তোমাকে পানাহার ও আনন্দের যে সব সামগ্রী দান করেছিলাম, সবগুলোর শোকর পেশ কর।

মোটকথা, এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ হতে থাকবে। এখন আমি বলি ঃ এই তৃতীয় ব্যক্তি, যে হালাল পথে উপার্জন করেছে, হালাল পথে ব্যয় করেছে এবং সকল হক ও ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করেছে, তাকেই যখন এপরিমাণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন আমাদের মত লোকের কি অবস্থা

হবে, যারা দুনিয়ার ফেতনা, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি, খাহেশ ও সাজসজ্জায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি? হে হতভাগারা,এসব জিজ্ঞাসাবাদের কারণেই মুত্তাকীরা দুনিয়ার সাথে জড়িত হয় না এবং প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম সম্পাদন করে। তোমাদের উচিত, এহেন মুত্তাকীগণের অনুসরণ করা।

আর যদি একথাই মনে কর যে, তোমরা সর্বাধিক মুত্তাকী, ধন-সম্পদও হালাল পথে উপার্জন কর, ব্যয়ের মধ্যেও কারও হক তোমাদের যিম্মায় থাকে না, অন্তরে কোন বিরূপ পরিবর্তনও আসে না এবং সবকিছু আল্লাহর মরযী অনুযায়ী কর, তবে এমনটা হওয়া যদিও সম্ভব নয়, তবু তোমাদের উচিত প্রয়োজন পরিমাণ ধন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কিয়ামতের দিন ধনীদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মুক্ত থাকা এবং প্রথম কাফেলাতেই জান্নাতে প্রবেশ করার গৌরব অর্জন করা।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—ফকীর মুহাজিরগণ জান্নাতে ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে—ফকীর মুমিনগণ জান্নাতে ধনীদের পূর্বে প্রবেশ করবে। তারা খাবে এবং মজা করবে। আর ধনীরা হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ আমার দাবী তোমাদের কাছেই। তোমরা মানুষের শাসক ও বাদশাহ ছিলে। বল, আমি যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে তোমরা কি কি করেছ?

ভাইসব, এমন চেষ্টা কর, যাতে হালকা-পাতলা হয়ে পয়গম্বরগণের কাফেলায় শামিল হয়ে যাও এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে আলাদা হয়ে পেছনে পড়ে থাকাকে ভয় কর। আমি এমন রেওয়ায়েতও পেয়েছি যে, একজন সাহাবী তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইলে লোকেরা তাকে মধুর শরবত এনে দিল। তিনি যখন সেটি আস্বাদন করলেন, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিজেও কাঁদলেন এবং উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন। এরপর মুখ থেকে অশ্রু মুছে কিছু কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এই শরবতের কারণেই আপনি কাঁদছেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। কক্ষে আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন ঃ আমার কাছ থেকে সরে যা। আমি আরয করলাম ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি তো আপনার সামনে কাউকে দেখছি না। আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? তিনি বললেন ঃ এ সময় দুনিয়া আমার দিকে তার মাথা বাড়িয়ে বলল ঃ আমাকে গ্রহণ কর। আমি তাকে বললাম ঃ আমার কাছ থেকে সরে যা। সে জওয়াব দিল—হে মোহাম্মদ, যদি আপনি আমার মোহ থেকে বেঁচেও থাকেন, তবে আপনার পরবর্তী লোকেরা আমার মোহ থেকে বেঁচে থাকবে না। তাই আমি আশংকা করছি, এই শরবত পান করে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে না বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

ভাইসব, এরা ছিলেন সৎলোক। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকায় কেঁদে বুক ভাসাতেন। আর তোমরা তো নানাবিধ নেয়ামত ও কামনা-বাসনায় মগ্ন। তোমাদের উপার্জনও হারাম ও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তোমরা হাবীবে পাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় কর না। ধিক্কার তোমাদের প্রতি!

এক হাদীসে বলা হয়েছে—যদি এক ব্যক্তি আশরফীর থলি কোলে নিয়ে বণ্টন করে এবং অপর ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তবে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় যিকরকারী শ্রেষ্ঠ হবে। প্রথম সারির কোন এক তাবেঈকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অর্জন করল এবং তা দ্বারা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহায়তা করল। অপর ব্যক্তি এ থেকে অনেক দূরে সরে রইল। সে না দুনিয়া তলব করল, না পেল। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাবেঈ বললেন ঃ তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যে দুনিয়া থেকে দূরে সরে রইল, সে শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে এবং অপর ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের তফাৎ। অতএব হে হতভাগ্য, যদি তোমরা দুনিয়া ছেড়ে দাও, তবে তোমরাও দুনিয়াদারদের উপর এই মর্তবা পেয়ে যাবে।

দুনিয়া ছেড়ে দেয়ার মধ্যে দুনিয়াতেও অনেক উপকারিতা রয়েছে। এতে দেহ আরাম পায়। অধিক পরিশ্রম করতে হয় না। জীবন সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হয়। অতএব, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার পক্ষে আর কি যুক্তি থাকতে পারে? ধরে নাও, যদি ধন সঞ্চয় করার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকেও,

তবু তোমার উচিত উত্তম চরিত্রে রসূলে আকরাম (সাঃ) -এর অনুসরণ করা, যাঁর দৌলতে তোমরা হেদায়াত লাভ করেছ। তিনি যেমন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন, তোমরাও তেমনি কর। বিশ্বাস কর, দুনিয়া থেকে সরে থাকার মধ্যেই সৌভাগ্য ও সাফল্য নিহিত। অতএব, মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) -এর ঝাণ্ডা নিয়ে প্রথম দলে জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা কর।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ ঈমানদারদের নেতা সে ব্যক্তি, যে সকালের খাদ্য পেলে সন্ধ্যার পায় না, কর্জ চাইলে যাকে কেউ কর্জ দেয় না, যার ফরয অঙ্গ ঢাকার অতিরিক্ত পোশাক নেই এবং যে পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ খেতে সক্ষম নয়; কিন্তু এরপরও যে সকাল-সন্ধ্যায় নিজের পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا -

অর্থাৎ, এরাই সেই সমস্ত মহাপুরুষের সঙ্গী হয়ে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, অর্থাৎ পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মপরায়ণদের সঙ্গী হবে। সঙ্গী হিসাবে এরা খুবই চমৎকার।

ভাইসব, এই বিবৃতির পর যদি তোমরা অর্থ সঞ্চয় কর এবং সৎকর্ম করার দাবী কর, তবে তোমাদের দাবী নির্জলা মিথ্যা হবে। সত্য এই যে, তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে বিলাসিতা, প্রাচুর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে এবং গর্ব, আত্মম্ভরিতা, রিয়া, খ্যাতি এবং সম্মান অর্জন করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে যাচ্ছ। আর মুখে বলছ, সৎকর্ম সম্পাদন করার জন্যে সঞ্চয় করছ। আল্লাহকে ধ্যান কর এবং মিথ্যা দাবীর জন্যে লজ্জিত হও। যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদের মহব্বত তোমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে থাকে, তবে এটা মুখে স্বীকার কর। ধন সঞ্চয়ের সময় নিজেদেরকে হেয় মনে কর এবং নিজেদের ভুল স্বীকার কর। এছাড়া হাশরের দিনের হিসাবকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্যে মুক্তির কারণ হতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষে অনর্থক প্রমাণাদি খোঁজ করে লাভ কি?

ভাইসব, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় হালাল বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সর্বাধিক মুত্তাকী, খোদাভীরু ও সংসারবিমুখ ছিলেন। আজকাল হালাল

উপায় বিলুপ্ত। এমনকি, রোযকার খাদ্য এবং জরুরী অঙ্গ আবৃত করার বস্তুও হালাল উপায়ে সহজলভ্য নয়। সুতরাং এমন যুগে অর্থ সঞ্চয় করা থেকে আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

এছাড়া আমাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মত তাকওয়া, পরহেযগারী, সংসারবিমুখতা ও সাবধানতা কোথায় এবং তাদের অন্তর ও নিয়তের মত অন্তর ও নিয়ত কোথায়? আল্লাহর কসম, আমাদের অন্তর নফসের বিপদাপদে তার কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ। অতিসত্বর আমাদেরকে কিয়ামতে যেতে হবে; বড় ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে সেদিন হালকা-পাতলা থাকবে। আর যারা বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক— হারাম ও হালাল একত্রে ভক্ষণকারী, সেদিন তাদের অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আমি উপদেশ স্বরূপ তোমাদেরকে এসব কথা বলে দিলাম। এখন গ্রহণ করা তোমাদের কাজ। তবে যারা গ্রহণ করবে—এমন লোকের সংখ্যা খুবই বিরল। আল্লাহ্ পাক বিশেষ রহমতে আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

এ পর্যন্ত হারেছ মুহাসেবী (রহঃ)-এর উক্তি সমাপ্ত হল। এ থেকে প্রাচুর্যের উপর দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুন্দর প্রতীয়মান হল। এতটুকুই যথেষ্ট। তবে এরই সমর্থক আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তা এই ঃ একবার ছা'লাবা ইবনে হাতেব আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে ছা'লাবা, অল্প ধন-সম্পদ, যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে, অনেক ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তম যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে না। ছা'লাবা আরয করলেন ঃ আপনি দোয়া করুন, যাতে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হই। এরশাদ হল ঃ ছা'লাবা, তুমি কি আমার অনুসরণ কর না? আল্লাহর কসম, যদি আমি ইচ্ছা করি যে, পাহাড় সোনা-রূপায় রূপান্তরিত হয়ে আমার সাথে সাথে চলুক, তবে তা সম্ভব। ছা'লাবা আবার আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন। যদি আপনার দোয়ায় আমি ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হই, তবে আমি সকল হকদারের হকও আদায় করব, তদুপরি এটা করব, ওটা করব। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ ইলাহী! ছা'লাবাকে ধন-সম্পদ দান কর। এরপর থেকে ছা'লাবার অল্প সংখ্যক ছাগল পিঁপড়ার ন্যায় বেড়ে যেতে লাগল। এমনকি

তার পক্ষে মদীনায় থাকা সম্ভব হল না। তিনি ছাগপালসহ মাঠে-ময়দানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। কেবল যোহর ও আসরের জামাতে হাযির হতেন এবং অন্যান্য জামাত ছেড়ে দিতেন। এরপর ছাগলের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। ফলে, সেই জঙ্গলে থাকাও আর সম্ভব হল না। তিনি আরও দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন এবং কেবল জুমআর নামাযের জন্যে মদীনায় আসতেন।

এদিকে ছাগলের সংখ্যা পিঁপড়ার মত অনবরত বেড়েই চলল। অবশেষে তিনি জুমআর নামাযও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। জুমআর দিন পথিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংবাদ জিজ্ঞেস করে নিতেন। এ দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামের কাছে ছা'লাবার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তারা ছাগলের প্রাচুর্য, ছা'লাবার মদীনা ত্যাগ এবং ক্রমান্বয়ে জামাত বর্জন করার বৃত্তান্ত শুনালেন। সব কথা শুনে তিনি তিনবার বললেন ঃ وَيْحُ ثَعْلَبَةَ —ছা'লাবার দুর্ভোগ!

এ সময়েই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

অর্থাৎ, আপনি মুসলমানদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পাকসাফ করে দেবে এবং তাদেরকে দোয়া দিন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা।

এতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জুহায়না গোত্রের কাছ থেকে এবং এক ব্যক্তিকে সুলায়ম গোত্রের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে নিযুক্ত করলেন । তিনি যাকাত সম্পর্কিত ফরমান লিখে তাদের কাছে দিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা মদীনার বাইরে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় কর। ছা'লাবা ইবনে হাতেব এবং বনী সুলায়মের অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে যাকাত আদায় করবে।

সেমতে উভয় আদায়কারী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে ছা'লাবার

কাছে গেল এবং তার ধন-সম্পদের যাকাত চাইল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমানও ছা'লাবার সামনে পেশ করল। তিনি বললেন ঃ এটা তো জরিমানা! ভাই এটা জরিমানা! তোমরা যাও, অন্য জায়গার কাজ শেষ করে আমার কাছে এসো। সেমতে তারা উভয়েই সুলায়ম গোত্রের লোকটির কাছে গেল এবং যাকাত চাইল। সে শুনামাত্রই উঠে গেল এবং তার উটগুলোর মধ্য থেকে বেছে বেছে সর্বোত্তম উট যাকাতের জন্যে আলাদা করল। এরপর তাদের সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এগুলো যাকাতের উট। উট দেখে আদায়কারীরা বলল ঃ সর্বোৎকৃষ্ট উট যাকাতে দেয়া তোমার উপর ফরয নয়। আমরা এগুলো নেব না। লোকটি আরয করল ঃ আপনারা এগুলোই নিন। আমি মনের খুশীতে দিচ্ছি এবং এজন্যেই এখানে উপস্থিত করেছি।

মোটকথা, তারা সব জায়গা থেকে যাকাত আদায় করে পুনরায় ছা'লাবার কাছে এসে যাকাত চাইল। ছা'লাবা বলল ঃ তোমরা আমাকে লিখিত আদেশ দেখাও। আদেশ দেখার পর সে আবার বলল ঃ এটা তো জরিমানা! ভাই এটা জরিমানা! তোমরা এখন যাও। আমি চিন্তা করে দেখি।

অতঃপর আদায়কারীদ্বয় মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদের কথা বলার আগেই বললেন ঃ ছা'লাবার দুর্ভোগ! তিনি সুলায়ম গোত্রের লোকটির জন্যে নেক দোয়া করলেন। অতঃপর তারা উভয়েই বর্ণনা করল যে, ছা'লাবা এমন করেছে এবং বনী সুলায়মের লোকটি এই ব্যবহার করেছে। তখনই ছা'লাবা সম্পর্কে কোরআন পাকের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

অর্থাৎ, "তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই দান করব এবং সৎকর্মপরায়ণদের দলভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা করল এবং অঙ্গীকারের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তারা যে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করল, একারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে কপটতা স্থাপন করে দিলেন সে দিন পর্যন্ত যেদিন তারা আল্লাহর সাথে দেখা করবে।"

তখন মজলিসে ছা'লাবার এক আত্মীয় উপস্থিত ছিল। সে আয়াতটি শুনল এবং ছা'লাবার কাছে গিয়ে বলল ঃ তোমার মা মরুক, আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ নাযিল করেছেন। ছা'লাবার চৈতন্য ফিরে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি যাকাত দিচ্ছি। আপনি গ্রহণ করুন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আল্লাহ পাক আমাকে বারণ করেছেন। এ কথা শুনে ছা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন করেছিলে, তেমনি ফল পেয়েছ। আমি যা বলেছিলাম, তা তুমি মানলে না। তিনি যখন দেখলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার যাকাত কবুল করবেনই না, তখন বাড়ীতে ফিরে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকরের খেদমতে যাকাত উপস্থিত করা হলে তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমরের খেদমতে পেশ করা হলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর ছা'লাবা মৃত্যুমুখে পতিত হল।

অতএব, উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা উচিত যে, ধন-সম্পদের ঔদ্ধত্য ও দুর্ভাগ্য কতটুকু। দারিদ্র্যে বরকত এবং প্রাচুর্যে অমঙ্গল নিহিত বিধায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্যে এবং পরিবারবর্গের জন্যে দারিদ্র্যকে পছন্দ করেছেন। এমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মর্যাদাশালী মনে করতেন। একবার তিনি আমাকে বললেন— হে এমরান, তুমি আমার কাছে মর্যদাশালী ব্যক্তি। আমার আদরের দুলালী ফাতেমা অসুস্থ। তাকে দেখার জন্যে ইচ্ছা হলে তুমি আমার সাথে চল। আমি আরয করলাম ঃ খুব ভাল। অতঃপর আমরা উভয়েই হযরত

ফাতেমার ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি ভেতরে আসব? হযরত ফাতেমা জওয়াব দিলেন ঃ আসুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি এবং আমার সঙ্গী উভয়েই আসব? প্রশ্ন হল ঃ আপনার সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ এমরান ইবনে হুসায়ন। হযরত ফাতেমা আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে একটি "আবা" (আরবদেশীয় পরিচ্ছদ বিশেষ) ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতে ইশারা করে বললেন ঃ সেটি এভাবে শরীরে জড়িয়ে নাও। তিনি আরয করলেন ঃ শরীর তো ঢেকে নিয়েছি। এখন মাথা কেমন করে ঢাকব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পুরনো চাদরটি তাঁর কাছে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এর দ্বারা মাথা ঢেকে নাও। এরপর হযরত ফাতেমা আমাদেরকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্দরে গিয়ে বললেন ঃ হে কলিজার টকুরা, আসসালামু আলাইকুম, আজ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি আরয করলেন। আমার ব্যথা আছে। এই ব্যথার সাথে আরেকটি ব্যথা যোগ হয়েছে যে, আজ আমার কাছে খাওয়ার কিছুই নেই। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে কলিজার টকুরা, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম, আমি তিন দিন ধরে কিছুই খাইনি। আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে আমার মর্তবা বেশী। আমি আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি আমাকে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমার কাঁধে হাত মেরে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ। তুমি জান্নাতী মহিলাদের সরদার। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ তাহলে ফেরাউন-পত্নী আছিয়া, এমরান-তনয়া মরিয়ম ও খুয়ায়লিদ-তনয়া খাদীজা কোথায় থাকবেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা নিজ নিজ যুগের মহিলাদের সরদার ছিলেন। আর তুমি তোমার যুগের মহিলাদের সরদার। তোমরা সবাই পুষ্পরাগ-নির্মিত ও চুনি-পান্না খচিত ঘরে বসবাস করবে। তাতে কোন প্রকার কষ্ট ও শোরগোল থাকবে না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। আমি এমন ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি, যে দুনিয়াতে সরদার এবং আখেরাতেও সরদার হবে।

এখন লক্ষ্য করা উচিত, হযরত ফাতেমা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হয়েও কেমন দরিদ্র জীবন যাপন করেছেন এবং কিভাবে ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন। যে কেউ পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থা ও তাদের বাণীসমূহ অনুধাবন করবে, সে-ই নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, ধন-সম্পদ না থাকা থাকার তুলনায় উত্তম তা যদিও দান-খয়রাতেই ব্যয়িত হয়। কেননা, হক আদায় করা, কামনা-বাসনা থেকে বেঁচে থাকা এবং দান-খয়রাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও ধন-সম্পদের নিম্নতম অনিষ্ট এই যে, নিয়ত তারই সংশোধনে সদা ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহর যিকর হয় না। কারণ, মন ও মস্তিষ্ক খালি থাকলেই যিকর হতে পারে। ধন-সম্পদের ব্যস্ততায় মন খালি থাকে না।

জরীর (রহঃ) হযরত লায়ছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে রওয়ানা হল। তিনি তাকে সঙ্গে নিলেন এবং নদীর তীরে পৌঁছে নাশতা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তিনটি রুটি। দুটি খেলেন এবং একটি বাকী রইল। হযরত ঈসা (আঃ) অতঃপর নদীতে গিয়ে পানি পান করে ফিরে এলেন। এসে দেখেন বাকী রুটিটি নেই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রুটি কে নিল? সে আরয করল ঃ আমি জানি না। অতঃপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথে একটি হরিণী পাওয়া গেল। তার সঙ্গে ছিল দুটি বাচ্চা। তিনি একটিকে ডাকলে সে কাছে এল। তিনি বাচ্চাটিকে যবাহ করে ভাজা করলেন এবং উভয়ে মিলে খেলেন। এরপর বাচ্চার অবশিষ্টাংশকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও। বাচ্চাটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে জঙ্গলে চলে গেল। অতঃপর ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি তোমাকে এই মোজেযা দেখিয়েছেন। বল, রুটি কে নিয়েছে? সে জওয়াব দিল ঃ আমি জানি না। এরপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঝরনার কাছে পৌঁছলেন। তিনি তার হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে অপর পারে চলে গেলেন। অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ তোমাকে এই মোজেযা প্রদর্শনকারী আল্লাহর কসম, বল, রুটি কে খেয়েছে? সে পূর্ববৎ আরয করল ঃ আমি জানি না। এরপর তারা এক জঙ্গলে গেলেন। সেখানে বসে হযরত ঈসা (আঃ) মাটি ও বালু একত্রিত করতে লাগলেন।

অতঃপর একটি স্তূপ তৈরি করে বললেন ঃ আল্লাহর আদেশে স্বর্ণ হয়ে যা। স্তূপটি অমনি স্বর্ণ হয়ে গেল। তিনি সেটিকে তিন ভাগ করলেন এবং বললেন ঃ এক ভাগ আমার, একভাগ তোমার এবং এক ভাগ সেই ব্যক্তির, যে রুটি খেয়েছে। একথা শুনতেই লোকটি বলে উঠল ঃ রুটি আমি খেয়েছি। তিনি বললেন ঃ এগুলো সব তুমিই রাখ। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ গন্তব্য পথে চলে গেলেন। লোকটি স্বর্ণের স্তূপ নিয়ে জঙ্গলে রয়ে গেল। এমন সময় দু'ব্যক্তি তার কাছে এল এবং তাকে হত্যা করে স্বর্ণস্তূপ নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল ঃ মিছামিছি ঝগড়া করার প্রয়োজন কি? এটি আমরা সমান অংশে ভাগ করে নেব। আগে এক ব্যক্তি গ্রামে গিয়ে আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসুক। সেমতে তাদের একজন খাবার আনতে চলে গেল। পথিমধ্যে সে মনে মনে চিন্তা করল ঃ যদি খাবারে বিষ মিশ্রিত করে দেই, তবে দু'জনই মারা যাবে এবং গোটা স্বর্ণস্তূপটি আমিই পেয়ে যাব। সেমতে সে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিল। এদিকে দু'ব্যক্তি পরামর্শ করল যে, যদি তৃতীয় ব্যক্তি মারা যায়, তবে স্বর্ণস্তূপ আধা-আধি আমাদের ভাগে পড়বে। কাজেই সে খাবার নিয়ে আসতেই তাকে মেরে ফেলা উচিত। সেমতে যখন তৃতীয় ব্যক্তি খাবার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, তখন উভয়ে মিলে তাকে হত্যা করল এবং তার আনীত সব খাবার খেয়ে ফেলল। আর যায় কোথায়? বিষক্রিয়ার ফলে তারাও সেখানে মরে পড়ে রইল। স্বর্ণস্তূপ যেমন ছিল, তেমনি জঙ্গলে পড়ে রইল। তার আশে-পাশে ছিল তিন ব্যক্তির মৃতদেহ। এমনি অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) ফেরার পথে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ এ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা। তোমরা এই দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক।

বর্ণিত আছে, হযরত যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করেন। তাদের কাছে দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী যেমন অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি বলতে কিছুই ছিল না। তারা কবর খনন করে রেখেছিল। সকালে এসব কবর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার রাখত এবং এগুলোর কাছে নামায পড়ত। জীবিকাস্বরূপ তারা জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় শাক চরে খেত। আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রকার শাক তাদের জন্যে সেখানে বিদ্যমান ছিল। হযরত যুলকারনাইন এই মর্মে তাদের সরদারের কাছে দূত পাঠালেন যে, বাদশাহ

যুলকারনাইন তোমাদেরকে তলব করেছেন। দূত এই বার্তা পৌঁছে দিলে সরদার বলল ঃ আমার কোন প্রয়োজন নেই। যদি তার কোন মতলব থাকে, তবে আমার কাছে আসতে বল। হযরত যুলকারনাইন এই জওয়াব অবগত হয়ে বললেন ঃ বাস্তবে সে ঠিকই বলেছে। সেমতে তিনি স্বয়ং সরদারের কাছে গিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি যেতে অস্বীকার করায় আমি নিজেই এসেছি। সরদার বলল ঃ আমার কোন প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই যেতাম। যুলকারনাইন বললেন ঃ আমি তোমাদের যে অবস্থা দেখছি, তেমনি আজ পর্যন্ত কারও দেখিনি। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাদের কাছে নেই কেন? তোমরা সোনা-রূপা উৎপন্ন কর না কেন? এতে তো তোমাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসত। সরদার উত্তর দিল ঃ আমরা সোনা রূপাকে অশুভ বস্তু মনে করি। কারণ, এগুলো যে-ই পায়, তার মন আরও উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়ার নেশায় মেতে উঠে। যুলকারনাইন বললেন ঃ তাহলে তোমরা কবর খনন করে রেখেছ কেন? সে বলল ঃ এর উদ্দেশ্য, যদি দুনিয়ার লোভ-লালসা আমাদেরকে পেয়েই বসে, তবে কবরগুলো দেখে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারব এবং দীর্ঘ আশা আমাদের মন থেকে মুছে যাবে। হযরত যুলকারনাইন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বল, তোমরা শাক খাও কেন? পশুপালন করে সেগুলোর দুধ, মাংস ইত্যাদি খাও না কেন? সরদার বলল ঃ আমরা আমাদের উদরকে পশুদের কবর বানাতে চাই না। মাটিতে উৎপন্ন শাক দিয়েই প্রয়োজন মিটে যায়। জীবন ধারণের জন্যে সামান্যতম বস্তুই যথেষ্ট। এরপর সে হাত বাড়িয়ে যুলকারনাইনের পিছন থেকে একটি খুলি তুলে নিল এবং জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি জানেন এটা কার খুলি? যুলকারনাইন বললেন ঃ আমি কেমন করে জানব? সে বলল ঃ সে ছিল পৃথিবীর একজন সম্রাট। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পৃথিবীর রাজত্ব দান করেছিলেন; কিন্তু তাকে সীমালজ্ঘন ও মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচার করতে দেখে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিলেন। এখন সে একটি ঢিলের মত গড়ে রয়েছে। তার সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহ্ জানেন। কিয়ামতের দিন সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। এরপর আরও একটি প্রাচীন খুলি তুলে নিয়ে সরদার বলল ঃ এটা কার জানেন? যুলকারনাইন

বললেন ঃ না। সে বলল ঃ এটা আরেক সম্রাটের খুলি, যে তার পরবর্তী কালে ছিল। সে পূর্বসূরীর অত্যাচার-অবিচারের কথা জানত। সে মানুষের প্রতি বিনয় ও ন্যায় বিচার করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার আমলও গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন সে তার সওয়াব পাবে।

অতঃপর সরদার যুলকারনাইনের মস্তকের দিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে যুলকারনাইন, এই খুলিটিও পূর্বোক্ত উভয় খুলির মত হয়ে যাবে। অতএব, আপনি চিন্তাভাবনা করে কাজ করুন। হযরত যুলকারনাইন বললেন ঃ হে সরদার, যদি তুমি আমার সাথে চল, তবে আমি তোমাকে আমার উত্তরসূরী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সাম্রাজ্যের অংশীদার করব। সরদার আরয করল ঃ আমার এবং আপনার এক জায়গায় একত্রে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, আপনার কাছে অগাধ ধনৈশ্বর্য ও বিপুল বিলাস-বৈভব থাকার কারণে জনসাধারণ আপনার শত্রু। অপরপক্ষে সকল মানুষ আমার মিত্র। কেননা, শত্রুতার কারণ হচ্ছে দুনিয়া। আমি দুনিয়াকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। একথা শুনে যুলকারনাইন তার কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি সরদারের কথাবার্তাকে চরম বিস্ময়, শিক্ষা ও উপদেশ মনে করতেন।

উপরোক্ত কাহিনী থেকেও প্রাচুর্যের ক্ষতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ঃ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ঃ